সপ্তম খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৫৫

সম্পাদক

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

সুমথনাথ ঘোষ

সবিতেন্দ্রনাথ রায়

মণীশ চক্রবর্তী

প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা

শ্রীচুনী বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ-মুদ্রণ

সিল্ক স্ক্রীন ও

চয়নিকা প্রেস

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও নিউ শশী প্রেস, ১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৬ হইতে অশোককুমার ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

ভূমিকা

সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেবকে বেশ কয়েকবার চোখে দেখেছি, তাঁর মজলিশি বৈঠক কিংবা মশলাদার বক্তৃতাও শুনেছি। যদিচ সে সব স্মৃতি মনের অটোগ্রাফ-খাতায় দস্তখত রাখার মত ব্যাপার। কালেভদ্রে খুলে দেখা আর অটোগ্রাফ-শিকারিদের কাছে ছাতি-ফোলানো ছাড়া তা দিয়ে আর কিছুই করা যায় না। ভূমিকা লেখা তো দূরে থাক। তবু হক কথা, আলী সাহেব আমার বন্ধু, আমার মতো আরো অসংখ্য পাঠকের অন্তরঙ্গ বন্ধু, আমাদের তিনি কস্মিনকালে না চিনলেও। বয়েসের যে ব্যবধানই থাকুক, তাঁর সেই দেশে বিদেশে থেকে শুরু করে পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়, মায় এই রচনাবলী প্রকাশ পর্যন্ত, এত কাছের মানুষ তামাম দুনিয়ায় আর কেউ হতে পারে বলে জানি না। আমি বিদেশ ঢুঁড়ি নি (দেশটাই ভাল করে চষা হল না), জর্ডনের জল খাই নি, ডুসেলডর্ফের কাদায় পা হড়কে যায়নি, জিবুটি বন্দরের শস্তা কাফের বসে নিম্বুপানির গেলাসের ওপর থেকে চামর দিয়ে ভনভনে মাছি তাড়াইনি, জালালাবাদের ১২০ ডিগ্রি গরম থেকে খাস-ই জব্বারের ৬০ ডিগ্রিতে পৌঁছিয়ে আরামের সুখনিশ্বাস ছাড়িনি, কাইরোর মুস্তাঙ্গন হোটেলে বসে পোলাও-পোরা শসা চিবোইনি, গডেসবার্গের নির্জন রাস্তায় গেরস্তবাড়ি ঢুকে কেক-প্যাস্ট্রিও সাঁটাইনি। কিন্তু এর সবই আমার নখদর্পণে। হয়ত বা আপনাদের অনেকেরও। কারণ আলী সাহেবের সঙ্গে এসব জায়গায় আমাদের জবর ঘোরা হয়ে গেছে। প্লেনে চেপে সাহেববাবুর মত নয়; সির্ফ পায়ে হেঁটে, লজ্ঝড় ট্যাক্সিতে উঠে, কখনো বা জাহাজের জনতা-ডেকে, কভুবা ট্রেনে, যখন যেমন সুবিধে। কখন পেরিয়ে এসেছি লণ্ডন, প্যারিস, রোম, সেখান থেকে মিউনিক—খেয়ালও নেই। আলী সাহেব আমাকে হাত ধরে ট্রাফালগার স্কোয়ারে নিয়ে যাননি, বাকিংহাম প্যালেস দেখাননি, বাঙাল হয়েও হাইকোর্ট দেখাননি। ইফেল টাওয়ারের ধারে-কাছেও তিনি নেই। গ্লস্টরের ডুাক যেখানে লাঞ্চ খান সেখানেও উনি আপনাকে ঢোকাবেন না। বেশি পীড়াপীড়ি করলে বড়জোর উনি কেনসিংটন গার্ডেনে কোন খানদানি ইংরেজের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন, কিন্তু নিজে বনু শহরের শহরতলির প্রান্তে টেরমের-এর বাড়ি গিয়ে তার খাণ্ডারনি গিন্নির কাছে বসে গরম সুপ খাবেন। অবশ্য এরই মধ্যে আপনার আমার আরো কিছু অভিজ্ঞতা

হয়ে গেছে। যেমন ধর্ন, এক বদম ব্রিটিশ মিউজিয়াম ঘোরা হয়ে গেছে, বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আজহার বিশ্ববিদ্যালয় খ্ুঁটিয়ে দেখে নিয়েছি—এখন পাস্তাড়ি বগলে ঢুকে পড়তে যা বাকি, শুধু স্কলারশিপটা জোটেনি। কাইরোর রাস্তাঘাট মোটামুটি চেনা হয়ে গেছে, পোর্ট সঈদ গিয়ে জাহাজ ধরতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না। চাই কি, জুরিখ এ্যারপোর্টে নেমে ট্রানজিট প্যাসেঞ্জারের খোঁয়াড় থেকে কী কৌশলে বিনা 'ভিজা'য় বাইরে বেরুনো যায়, তাও শেখা হয়ে গেছে। তবে আপশোষের কথা কোন শ্রীমতী ফ্রিডি বাওয়ান বা ফিজেল সেখানে আপনার-আমার জন্যে হাপিত্যেশে অপেক্ষা করবে না।

সৈয়দ মুজতবা আলীর সাহিত্যিক জীবন দীর্ঘকালের নয়, গ্রন্থসংখ্যা খুব একটা কম না হলেও বেশি নয়, আর সেগুলো না গল্প না উপন্যাস। রম্যরচনা কথাটা আমার তেমন পছন্দ নয়। বেল লেৎরই বলি আর পারসোনাল এসে-ই বলি, আলী সাহেবকে তেমন ধারা অ্যাকাডেমিক শিরোনামের মধ্যে বাঁধতে মন চায় না। ভ্রমণসাহিত্য হিসেবে তাঁর কিছু কিছু গ্রন্থের পরিচিতি হয়ত বেমানান নয়, যদিও তার জাত আলাদা, সঞ্জীবচন্দ্র যেমন পিঁয়াজ আর পলাণ্ডুর জাতিভেদ করেছিলেন। অথচ এ সবই আলী সাহেবের জীবনকথা, তাঁর নিজেরই অভিজ্ঞতার ঝুলিঝাড়া সম্পদ। আত্মজীবনের বাইরে গিয়ে তিনি কোন গল্প ফাঁদেননি। দু-চারটে কেতাব ছাড়া, আলীসাহিত্য সবটাই তাঁর নিজের জীবনের বর্ণালী, বানিয়ে বলার চতুরালি নয়। অস্তাচলের ধারে এসেই তিনি পূর্বাচলের পানে তাকিয়েছেন, মারিয়ানের ঠাকুরমার মত বলেছেন, এস্ ইস্ট্ সো লাঙে হের—সে সব কত পুরনো কথা, সব কি মনে আছে? তা নেই-নেই করেও কম নেই। তাই ঝাড়া চল্লিশ বছরের ইতিহাস ঠারেঠোরে রয়ে-বসে বলতে হয়েছে। তাঁর মুসাফির পুঁথির এক জায়গায় তিনি কবুল করেছেন, "সে সব অভিজ্ঞতা সুসংলগ্ন ভাবে ক্রমানুক্রমে লিখে উঠতে পারি নি। কিন্তু আমি ভরসা রাখি যে, সুচতুর পাঠক আমার প্রকাশিত পুস্তক থেকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত টুকিটাকি ছিটেফোঁটা জুড়ে দিয়ে জিগ্‌শ্যো পাজ্‌ল সমাধান করতে পারবেন—অর্থাৎ একটি মোজাইক নির্মাণ করতে পারবেন; তদর্থ: মোটামুটি একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি পেয়ে যাবেন। যদিও তার আউটলাইনগুলো সূক্ষ্ম শার্প হবে না, বহু ডীটেল বাদ পড়ে যাবে, কিন্তু তাতে করে কিছু আসে যায় না।" সত্যি কিছু আসে-যায় না, কিতু তাও কি তিনি সহজে লিখেছেন? তাঁর মত 'মুডি' লেখক বাঙলা

সাহিত্যে সম্ভবত বেশি নেই, ছিলেন না। ঐ মুসাফির বইতেই এক জায়গায় তিনি বায়নাক্কা ধরে বলেছেন, 'আমার জীবনস্মৃতি লিপিবদ্ধ করার মত দুর্গতি আমার কখনো হবে না সে আমি জানি।' গ্রুস গট্ ভগবানের আশীর্বাদ, এত কাণ্ডের পরও গোটা কুড়ি বই !

আলী সাহেবের ভবঘুরে বইতে কিছু বিষয়াশ্রিত রচনা আছে, তাছাড়া জলে-ডাঙায় ভবঘুরে মুসাফির সবই ভ্রমণকথা। কিন্তু এ কেমন ভ্রমণ? স্বীকার করি তিনি অনেক মুলুক চষে বেড়িয়েছেন, অনেক শহর-বন্দরের ধুলো অনেক নদীর পানি খেয়েছেন। কিন্তু ভ্রমণের জন্য কদাচ নয়—মুসাফিরের কৈফিয়তেই সে কথা কবুল করা হয়েছে। আর তাঁর ভ্রমণকাহিনীও তাঁর 'অনিচ্ছার' সৃষ্টি এবং তাও ভ্রমণের অনেককাল পরে, যখন ভ্রমণের স্মৃতির ওপর ধুলোর পলেস্তারা পড়ে গেছে। ভ্রমণের তো অ্যানিভারসারি হয় না—পুরনো ভ্রমণের জাবর কাটা সবাই পছন্দ করেন না। পুরনো ঘিয়ে বাতের ব্যথা কমে কিন্তু ভাত খাওয়া যায় না। আমাদের এক প্রাচীনকালের হাফগিন্নি লেখক সঞ্জীবচন্দ্র বুড়ো বয়েসে পালামৌ ভ্রমণের বৃত্তান্ত লিখতে গিয়ে দুই বয়েসের চোখ আর মনের মধ্যে গুবলেট করে ফেলেছেন। আলী সাহেবও সেই উমরে কলম ধরেছেন, যখন চোখে-দেখা কানে-শোনা জিভে-চাখা অভিজ্ঞতা অনেকটাই পিছনে হটে গেছে, এখন সম্বল শুধু স্মৃতির গুমর। একে ভ্রমণকথা পাঠক বলতে চান বলবেন, না হয় নাই বলবেন। এখানে কোন দিনলিপি নেই, সময়ের গরমিল যথেষ্ট, কখনো ত্রেতা থেকে দ্বাপরে হাজির, এটা বলতে সেটা এসে ঢুকেছে, আশকথা পাশকথার ছড়াছড়ি। লেখক নিজেও তা জানেন। তাই প্রায় লেখাতেই এই বেপাত্তা বর্ণনার জন্য হাত কচলাতে থাকেন। বলেন, "কোথা থেকে কোথা এসে পড়লুম। ট্র্যাম্পকে নিয়ে এই তো বিপদ। সে যে রকম রাস্তায় নাক বরাবর চলতে জানে না, তার কাহিনীও ঠিক তেমনি পারলেই সদর রাস্তা ছেড়ে এর খিড়কির দরজার দিকে তাকায়, ঝোপের আড়াল থেকে ওর পিছনের পুকুরের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ভবঘুরে।" কিন্তু আলী সাহেবের অনুরক্ত পাঠকদের এইটেই লাভের, কারণ এই ধরনের রসকরা মশকরা শুনতেই তাঁরা ভালবাসেন বেশি। এ কালের পাঠক নিশ্চয় আলী সাহেবের কাছ থেকে 'ইয়োরোপে সাড়ে তিন মাস', 'হাবুলের কাবুল-ভ্রমণ' শুনতে চায় না। লেখক নিজেও জানেন, "এখন এত শত লোক নিত্য নিত্য বঙ্গো ইন কঙ্গোতে উইক এণ্ড

কাটাতে যায়, জবল্ অল্ অলবীয়াতে হানিমুনের প্রথমার্ধ চুষে আসে যে 'ফ্রান্স ভ্রমণ' কিংবা 'মন্তে কার্লো দর্শন' শিরোনামা এখন সে অবজ্ঞার চোখে দেখে। এইজন্যই বলছিলুম, আলী সাহেবের ভ্রমণকাহিনী গতানুগতিক ট্রাভেল্ লিটারেচার নয়। কোনো দেশের মননসাধনা চিৎপ্রকর্ষের পরিচয় তো লাইব্রেরিতে বসেই পাওয়া যায়। কিন্তু সে দেশের আসল রূপ সেখানকার সাধারণ মানুষের কাছে। মুজতবা আলী লিখেছেন, "সে দেশের টাঙ্গাওলা-বিড়িওলা-ড্রাইভার কারখানার মজুর কী ভাবে কী চিন্তা করে সেটা জানতে হলে সে দেশে না গিয়ে উপায় নেই। কারণ তারা বই লেখে না, খবরের কাগজে সম্পাদককে চিঠি লিখে নালিশ ফরিয়াদ জানায় না। তাদের কান্নাকাটি গালমন্দ যা কিছু করার সব কিছুই তারা করে এদেশের চায়ের দোকানে, ওদেশে 'পাবে', অর্থাৎ শরাবখানায়।" আলী সাহেবের সঙ্গী হয়ে তাই ভিনদেশের পাবে-শরাবখানায়-কাফে-রেস্তোরায় ঢুকে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয় তা পুরো একটা দেশ আবিষ্কারেরই সমতুল। কেনসিংটন গির্জার পাশে ছোট্ট শরাবখানায় সেই বুড়ির সঙ্গে আলাপের কথা কি ভুলে যাচ্ছেন? সেই সঙ্গে কত খুঁটিনাটি, রান্নাঘরের মেনু, পানভোজনের ফিরিস্তি, গাছপালা-গাড়িঘোড়ার ছবি, কত প্রবাদপ্রবচন, আবহাওয়ার তত্ত্ব, সাহিত্যের খবর, রাজনীতি-সমাজনীতি, মামলা ও হামলার বিবরণ, পথঘাটের নকশা, কত বয়েৎ ও কটুবাক্য ফুলঝুরির মত ঝরে তাঁর কলমে। মুজতবা আলীর সাহিত্যকে তাই বলতে ইচ্ছে করে এনসাইক্লোপিডিয়া আলীয়ানা। তামাম দুনিয়ার খালাসীদের খবর রাখেন মানুষটি, তা সে নোয়াখাল্যা সিলেট্যাই হোক, আর হামবুর্গ ভেনেসেরই হোক। ইহুদি থেকে বেদে, উদ্বাস্তু থেকে যাযাবর, অনেক অনিকেত জীবনের কাহিনী আমরা পড়েছি। কিন্তু জলঅন্তপ্রাণ সমুদ্র-সমর্পিত, জাহাজের মাঝিমাল্লা খালাসী কাপ্তেনদের উদ্ভূমি জীবনের কাহিনী এমন লবণাক্ত ভিজে ভাষায় আর কে বলতে পারেন? কিন্তু এও সব নয়। আলীর থলিতে হরেক পশরা। তাতে বিবিসির আবহাওয়ার পূর্বাভাস (ঝড়ের পরে ঘোষিত), এলিয়টের ক্যাথলিক রক্ষণশীলতা, আকাশবাণীর রেডিয়ো একটিভিটি-নিরোধক স্টুডিও, হিটলার বরিশালের লোক, আরব সাগরের আবহাওয়া, ফরাসি খাদ্যের উৎপত্তির ইতিহাস, আহার সম্পর্কে ফরাসি গুণী রশফুকোনের বাণী, 'ক্রন্দসী'র বৈদিক শব্দতত্ত্ব, ইন্ডোলজির ইতিবৃত্ত, এশিয়াটিক সোসাইটির জন্মকথা, বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত চর্চার ইতিহাস, জর্মন এনসাই-ক্লোপিডিয়ায় 'ঠাকুর' শব্দের ব্যাখ্যান, হিটলারের বিবাহকালীন আবেদনপত্র,

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ভিলহেল্‌ম্‌ ফন হুমবল্‌ট্‌-এর মনীষা, সোকোত্রা দ্বীপের ভূতত্ত্ব, সোমালিল্যাণ্ডের উপর ইয়োরোপের রাজনীতির জুডো, 'বোম্বেটে' শব্দের হন্দমুদ্দ—কী নেই সেখানে? অথচ লেখক বলছেন, তিনি নতুন কিছু লেখেননি, নতুন কিছু দেখেননি—প্ল্যু সা শাঁজ প্ল্যু সে লা সেম শোজ, দি মোর ইট চেঞ্জেস দি মোর ইট ইজ দি সেম থিং।

তবু এর মধ্যে রসনার্ঘ্যের দিকেই মুজতবা সাহেবের নেকনজর বেশি, তাতে সন্দ নেই। তাঁর দেহাবসানের পর দেশ পত্রিকার একটি প্রবন্ধে ('সৈয়দ মুজতবা আলী') হীরেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছিলেন, তিনি যেমন করে বলতেন ঠিক তেমনি করেই লিখতেন, বলার আর্ট আর লেখার আর্ট তাঁর কাছে অভিন্ন ছিল। আলী সাহেবের এক অন্তরঙ্গজন আমীনুর রশীদ চৌধুরী আর একটি প্রবন্ধে ('মুজতবাকথা') সজনীকান্ত দাসের স্মৃতি উদ্ধার করে জানিয়েছিলেন যে একবার আলী সাহেব নাকি রাস্তায় দাঁড়িয়ে, এবং পায়ে ঝিঁঝিঁ ধরে গেলে পাশের কাফেয় বসে, দুনীয়ার মদ্যপানীয়ের জাতগুষ্ঠির ফিরিস্তি দিয়েছিলেন। কথা শেষ হলে দেখা গেল, সাঁঝবাতি জ্বলে গেছে অথচ শ্রোতাদের দুপুরের খাওয়া হয়নি। 'ভবঘুরে ও অন্যান্য' নামক গ্রন্থের 'হুঁসিয়ার' লেখাটি পাঠ করলেই পাঠকের মালুম হবে এ সব কথা কত সত্যি ছিল আলী সাহেবের জীবনে। এই এক চিলতে প্রবন্ধেই তিনি হুড়মুড় করে হর-দুনিয়ার মদ্যপানীয়ের নাড়িনক্ষত্রের বিবরণ দিয়েছেন। ফ্রান্সের বোর্দো অঞ্চলের ক্লারেট মদ, বার্গেণ্ডির ওয়াইন, শ্যাম্পেন কেন বুজবুজ করে বার্গেণ্ড করে না, হাঙ্গেরির টকাই ও বাঙলার পচাই, সাঁওতালি হাড়িয়া আর ইতালির কিয়ান্তি, আপেল ফার্মেণ্ট করে কেমন করে সাইডার ও মধু ফার্মেণ্ট করে মীড হয়, চোলাই কাকে বলে—এসব খবরে রচনাটি জবজব করছে। তিপ্পান্ন সালের নীয়েনস্টাইনায়ের কী গুণ, লণ্ডনের বারের ভুঁড়িওয়ালা ওয়াইন মাস্টারের চেয়ে আলী সাহেব কম জানেন, এ কথা হলফ করে কেউ বলতে সাহস পাবেন না। আর দুনিয়ার পানশালের খবর তাঁর পকেটে—একটু একটু করে খুশবু ছাড়েন, চারদিক ম-ম করে। একবার চটেমটে তিনি লিখেছিলেন, "ভোজনাদি সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করলেই কোনো কোনো উন্নাসিক পাঠক নাকি বিরক্ত হন" (মুসাফির দ্রষ্টব্য)। তওবা তওবা। সে পাঠকের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ নেই। সেই মুকুন্দরামের আমল থেকেই বাঙালির মন পাকশালে। আর সেই পাকশালের বেদব্যাস মুজতবাজীর মহাভারত খাদ্য-পর্ব শোনাই হল গিয়ে পুণ্যবানের কাজ। ঘ্রাণে যদি অর্ধ, শ্রবণে তাহলে

কোয়ার্টার ভোজন। আমরা আলী সাহেবের দৌলতে স্প্যানিশ রেস্তোরাঁয় মুর পদ্ধতিতে তৈরি বিরয়ানি চেখেছি, ফরাসি মেনুর পিয়েস দ্য রেজিসতাঁসে চোখ বুলিয়েছি, মারিয়ানার ঠাকুরমার তৈরি 'রে রাগু' অর্থাৎ কিনা কোফতাকাটা হরিণের মাংস আর ফ্রান্সের মাটির নিচে ফলানো সবজি 'ট্রাফেল' টেস্ট করেছি। বাঁধাকপির টক আচার 'ক্রাউট' আর পিঁয়াজ পুদিনার ওমলেট 'ওর্জেব' দুটোই পছন্দ। কিন্তু এখানেই তো সৈয়দ মুজতবা আলীর কেরামতি নয়। সালাদ রুস, সালাদ আলা, মায়োনেজ-এর স্বাদ শেষ হবার আগেই তাঁর পকেট থেকে বেরোয় হাইনের কবিতা। রাইনের ধারে গেঁয়ো 'পাবে' কুমারী ক্যেটে লেখককে হাইনের যে কবিতা শোনায়, সঙ্গে সঙ্গে ফস করে তিনি যতীন বাগচী কৃত তার অনুবাদ আমাদের শুনিয়ে দেন ; মারিয়ানার মুখে হাইনের কবিতা শুনে সত্যেন দত্তের ঠিক-ঠিক অনুবাদটি তাঁর মনে পড়ে ; ওমর খৈয়ামের জুতসই বয়েৎ ঝেড়ে তৎক্ষণাৎ কান্তিচন্দ্র ঘোষের অনুবাদ পেশ করেন তিনি, এমন কি ফিটজেরালডের পাশে দুম করে তার ফরাসি অনুবাদটিও দিয়ে দেন। আলী সাহেব তাই অতুলনীয়—কিন্তু তুলনামূলক তত্ত্বালোচনায় তাঁর বড়ই আগ্রহ। নিজে তিনি তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব আর তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের ছাত্র। কিন্তু তুলনামূলক পানভোজনতত্ত্ব, ভূগোলতত্ত্ব, নারীমনস্তত্ত্ব, পুলিসি কর্তব্যতত্ত্ব কিছুতেই তাঁর কৌতূহলের কমতি নেই। হাইনের গঙ্গাস্তব আর কলকাতার জাপানি আক্রমণের সময়কার ছড়া, পাশাপাশি গ্যাঁট হয়ে বসে তাঁর লেখায়। মিশরের মরুভূমিতে আবুল আফসিয়ার ভাড়া-করা ট্যাক্সির শব্দের সঙ্গে সাদৃশ্যসূত্রে তুলসীদাসী রামায়ণের ভাষা ফিনকি দিয়ে ওঠে তাঁর কানে (কটকটাহি মরকট বিকট ভট কোটি কোটিনহ ধাবহি—বানরদের কোলাহলের বর্ণনা)। কাইরোর রাস্তায় Fools Restaurant (ফুল আরবি শব্দ,=সিমবীচি) দেখে তাঁর মনে পড়ে যায় কলকাতার রাস্তায় 'কপির সিঙাড়া' বিজ্ঞাপনের দিকে)।

এই তুলনামূলক মেজাজেই দুনিয়ার খোশগল্প গুরগুরিয়ে ওঠে আলী সাহেবের পেটে, মোকা মাফিক বেরুবার জন্য। পৃথিবীর সব দেশের সমাজেই মৌখিক গল্পসাহিত্যের একটি বিচিত্র বিপুল সম্পদ অলিখিত হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়। আলী সাহেব সেই গল্পের একজন পাকা ভাণ্ডারী। কিন্তু তিনি মার্চেন, সাগা, ইভেনতির, হালাড্রি, নভেলা, হিরোটেল-এর কারবারি নন। অ্যানেকডোট, খোশ গল্প, ক্ষুদ্র উপাখ্যান, ড্রল, টিটবিট্স্, জেস্ট, কৌতুক নকশা ঝিলমিলিয়ে ওঠে তাঁর মুখে, আর তখনি, কিছু কিছু তুলনাসূত্রে, ঠিক ঠিক

মোকায় এসে পড়ে তার দেশবিদেশের জাতভাইগুলো। তাঁর সাহিত্যের একটা বড় আকর্ষণ এই গল্প। অনেকক্ষণ অন্ধকারে ট্রেন ছুটলে ছোট্ট ছেলে ভাবে ইস্টিশান আসছে না কেন? তেমনি অনেকক্ষণ ভারি ভারি কথা চললে পাঠক ভাবে গল্প আসছে না কেন? তা আলী সাহেবের ট্রেন লোকাল গাড়ি, ইস্টিশান ঘন ঘন। গুরু কথার মাঝখানে হৈ হৈ করে ওঠে অ্যানেকডোট। এই প্রত্যাশায় তাঁর লেখার পাতায় এঁটেল পোকার মত চোখ আটকে থাকে পাঠকের। চুটকুলা স্টেটের রায়বাহাদুর তিনি, দিল্লগীপসন্দ কিসসার দিল্লীশ্বরো। আর এখানেও সেই তুলনার আগ্রহ ঘনিয়ে ওঠে তাঁর চিত্তে, একই গল্পের দেশান্তরী রূপ বা সাইকেল্ অনর্গল তিনি শুনিয়ে যান। খোশ গল্প যে একটা আর্ট এ সত্য একালে আলী সাহেবই প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

এই বইয়ের ভূমিকা একমাত্র আলী সাহেবই লিখে দিতে পারতেন, তাঁরই লেখা উচিত ছিল, তিনিই একমাত্র তাঁর বইয়ের ভূমিকা লেখার হকদার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই লেখা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু হায়, আমরা যখন জলে-ডাঙায়, মুসাফির, ভবঘুরের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছি, তখন আলী সাহেব গ্রহসূর্য তারায় তারায় ভ্রাম্যমান। 'সে বড় মজার ভ্রমণ, তাতে টিকিট লাগে না, 'ভিজার'ও দরকার হয় না।' জলে-ডাঙায়-এর উৎসর্গপত্রে ফোঁস করে নিশ্বাস ছেড়ে তিনি লিখে গেছেন, 'কিন্তু হায় সেখান থেকে ভ্রমণকাহিনী পাঠাবার কোনো ব্যবস্থা এখনো হয় নি। ফেরবারও উপায় নেই।'

তাই ভবঘুরে আলী সাহেবের গ্রহসূর্য-তারালোক ভ্রমণের কাহিনী আর এই লোকে আমাদের পড়ার সুযোগ হবে না।

অরুণ বসু

জলে-ডাঙায়

উৎসর্গ

বাবা ফিরোজ,

ভ্রমণ-কাহিনী তুমি যেদিন প্রথম পড়তে শুরু করবে সেদিন খুব সম্ভব আমি গ্রহ-সূর্যে তারায়-তারায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। সে বড় মজার ভ্রমণ—তাতে টিকিট লাগে না, 'ভিজা'রও দরকার নেই। কিন্তু, হায়, সেখান থেকে ভ্রমণ-কাহিনী পাঠাবার কোনো ব্যবস্থা এখনো হয়নি। ফেরবারও উপায় নেই।

তাই এই বেলাই এটা লিখে রাখছি।

তোমার
আব্বু

॥ ১ ॥

বন্দর থেকে জাহাজ ছাড়ার কর্মটি সব সময়ই এক হুলুস্থুল ব্যাপার, তুমুল কাণ্ড ! তাতে দুটো জিনিস সক্কলেরই চোখে পড়ে ; সে দুটো—ছুটোছুটি আর চেঁচামেচি।

তোমাদের কারো কারো হয়তো ধারণা যে সায়েব-সুবোরা যাবতীয় কাজকর্ম সারা করে যতদূর সম্ভব চুপিসাড়ে আর আমরা চিৎকারে চিৎকারে পাড়ার লোকের প্রাণ অতিষ্ঠ না করে কিছুই করে উঠতে পারি নে। ধারণাটা যে খুব ভুল সে কথা আমি বলবো না। সিনেমায় নিশ্চয়ই দেখেছ, ইংরেজরা ব্যাঙকুইট্ (ভোজ) খায় কি রকম কোনো প্রকারের শব্দ না করে। বাটলাররা নিঃশব্দে আসছে যাচ্ছে, ছুরিকাঁটার সামান্য একটু ঠুং-ঠাং ; কথাবার্তা হচ্ছে মৃদু গুঞ্জরণে, সব-কিছু অতিশয় পরিপাটি, ছিমছাম।

আর আমাদের দাওয়াতে, পাল-পরবের ভোজে, যগ্যির নেমন্তন্নে ?

তার বর্ণনা দেবার ক্ষমতা কি আমার আছে ? বিশেষ করে এ-সব বিষয়ে আমার গুরু সুকুমার রায় যখন তাঁর অজর অমর বর্ণনা প্ল্যাটিনামাক্ষরে রেখে দিয়ে গিয়েছেন। শোনো ঃ

'এই দিকে এসে তবে লয়ে ভোজভাণ্ড
সমুখে চাহিয়া দেখ কি ভীষণ কাণ্ড !
কেহ কহে 'দে আন্' কেহ হাঁকে 'লুচি'
কেহ কাঁদে শূন্য মুখে পাতখানি মুছি।
হোথা দেখি দুই প্রভু পাত্র লয়ে হাতে
হাতাহাতি গুঁতাগুঁতি দ্বন্দ্বরণে মাতে।
কেবা শোনে কার কথা সকলেই কর্তা
অনাহারে কত ধারে হল প্রাণহত্যা।'

বলে কি ! ভোজের নেমন্তন্নে অনাহারে প্রাণহত্যা ! আলবাত ! না হলে বাঙালীর নেমন্তন্ন হতে যাবে কেন ? পছন্দ না হলে যাও না ফাপেতে। খাও না আলোনা, আধাসেদ্ধ শুয়ারের মুণ্ডু কিংবা কিসের যেন ন্যাজ !

কিন্তু জাহাজ ছাড়ার সময় সব শেয়ালের এক রা।

আমি ভেনিসে দাঁড়িয়ে ইটালির জাহাজ ছাড়তে দেখেছি—জাহাজে বন্দরে, ডাঙায় জলে উভয় পক্ষের খালাসীরা মাক্কারনি-খেকো খাঁটি ইটালিয়ান ; আমি মার্সেলেসের বন্দরেও ঐ কর্ম দেখেছি—উভয় পক্ষের খালাসীরাই ব্যাঙ-খেকো সরেস ফরাসিস্ ; আমি ডোভারে দাঁড়িয়ে ঐ প্রক্রিয়াই সাতিশয় মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করেছি—দু পক্ষের বাঁদরগুলোই বীফস্টেক-খেকো খাটাশ-মুখো ইংরেজ। আর গঙ্গায়, গোয়ালন্দে, চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জে যে কতশত বার এই লড়াই দেখেছি তার তো লেখাজোখা নেই। উভয় পক্ষে আমরাই দেশভাই জাতভাই দাড়ি-দোলানো, লুঙি-ঝোলানো সিলট্যা, নোয়াখাল্যা।

বন্দরে বন্দরে তখন যে চিৎকার, অট্টরব ও হুংকারধ্বনি ওঠে সে সর্বত্র

একই প্রকারের। একই গন্ধ, একই স্বাদ। চোখ বন্ধ করে বলতে পারবে না, নারায়ণগঞ্জে দাঁড়িয়ে চাটগাঁইয়া শুনছ, না হামবুর্গে জর্মন শুনছ।

ডেকে রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে প্রথমটায় তোমার মনে এই ধারণা হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয় যে, জাহাজ এবং ডাঙার, উভয়ের পক্ষের খালাসীরা একমত হয়ে জাহাজটাকে ডাঙার দড়াদড়ির বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি দিতে চায়। কিন্তু ঐ তো মারাত্মক ভুল করলে, দাদা? আসলে দু পক্ষের মতলব একটা খণ্ডযুদ্ধ লাগানো। জাহাজ ছাড়ানো-বাঁধানো নিছক একটা উপলক্ষ্য মাত্র। যে খালাসী জাহাজের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত অবধি তুর্কী ঘোড়ার তেজে ছুটছে, সে যে মাঝে মাঝে ডাঙার খালাসীর দিকে মুখ খিঁচিয়ে কি বলছে তার শব্দ সেই ধুন্দুমারের ভিতর শোনা যাচ্ছে না সত্যি কিন্তু একটু কল্পনাশক্তি এবং ঈষৎ খালাসী-মনস্তত্ত্ব তোমার রপ্ত থাকলে স্পষ্ট বুঝতে পারবে, তার অতিশয় প্রাঞ্জল বক্তব্য, 'ওরে ও গাড্‌গুম্‌ ইস্টুপিড, দড়িটা যে বাঁ দিকে গিঁট খেয়ে গিয়েছে, সেটা কি তোর চোখে মাস্তুল গুঁজে দেখিয়ে দিতে হবে। ওরে ও'—(পুনরায় কটুবাক্য)—

এই মধুরসবাণীর জুতসই সদুত্তর যে ডাঙার কনে-পক্ষ চড়াক্‌সে দিতে পারে না, সে কথা আদপেই ভেব না। অবশ্য তারও গলা শুনতে পাবে না, শুধু দেখতে পাবে অতি রমণীয় মুখভঙ্গি কিংবা মুখ-বিকৃতি, এবং বুঝতে হবে অনুমানে।

জাহাজের দিকে মুখ তুলে ফ্যাঁচ করে খানিকটে থুথু ফেলে বলবে, 'ওরে মর্কটস্য মর্কট, তোর দিকটা ভাল করে জড়িয়ে নে না। জাহাজের টানে এ-দিকটা তো আপনার থেকে খুলে যাবে। একটা দড়ির মনের কথা জানিস নে আর এসেছিস জাহাজের কামে। তার চেয়ে দেশে গিয়ে ঠাকুরমার উকুন বাছতে পারিস নে? ওরে ও হামান-দিস্তের থ্যাঁতলামুখো'—(পুনরায় কটুবাক্য)—

একটুখানি কল্পনার সাবান হাতে থাকলে ঐ অবস্থায় বিস্তর বাস্তবের বুদ্বুদ ওড়াতে পারবে।

ওদিকে এসব কলরব—মাইকেলের ভাষায় 'রথচক্র-ঘর্ঘর-কোদণ্ড-টংকার' ছাপিয়ে উঠছে ঘন ঘন জাহাজের ভেঁপুর শব্দ—ভেঁা, ভেঁা—ভেঁা, ভেঁা—

তার অর্থ, যদি সে ছোট জাহাজের প্রতি হয়, 'ওরে ও ছোকরা, সর্ না। আমি যে এক্ষুনি ওদিকে আসছি দেখতে পাচ্ছিস নে? ধাক্কা লাগলে যে সাড়ে বত্রিশভাজা হয়ে যাবি, তখন কি টুকরোগুলো জোড়া লাগাবি গাঁদাপাতার রস দিয়ে?' আর যদি তোমার জাহাজের চেয়ে বড় জাহাজ হয়, তবে তার অর্থ, 'এই যে দাদা, নমস্কারম্। একটু বাঁ দিকে সরতে আজ্ঞা হয়, আমি তা হলে ডান দিকে সুড়ুৎ করে কেটে পড়তে পারি।' এবং এই ভেঁপু বাজানোর একটা তৃতীয় অর্থও আছে। প্রত্যেক জাহাজের মাঝিমাল্লারা আপন ভেঁপুর শব্দ চেনে। কেউ যদি তখনো বন্দরের কোনো কোণে আনন্দরসে মত্ত হয়ে থাকে, তবে ভেঁপুর শব্দ শুনে তৎক্ষণাৎ তার চৈতন্যোদয় হয় এবং জাহাজ ধরার জন্য

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগায়।

আমি একবার একজন খালাসীকে সাঁতরে এসে জাহাজে উঠতে দেখেছি। তখন তার আর সব খালাসী ভাইয়ারা যা গালিগালাজ দিয়েছিল তা শুনে আমি কানে আঙুল দিয়ে বাপ বাপ করে সরে পড়েছিলুম। ইংরাজিতে বলে, 'হি ক্যান্ সুঅ্যার লাইক্ এ সেলার' অর্থাৎ খালাসীরা কটুবাক্য বলাতে এ দুনিয়ার সব চাইতে ওস্তাদ। ওরা যে-ভাষা ব্যবহার করে সেটা বর্জন করতে পারলে দেশ-বিদেশে তুমি মিষ্টভাষীরূপে খ্যাতি অর্জন করতে পারবে।

তোমার যদি ফার্সী-পড়নে-ওলা ক্লাস-ফ্রেন্ড থাকে তবে তাকে জিজ্ঞেস করো, 'ইস্‌কন্দর্-ই-রুমীরা পুর্‌সীদ্—অর্থাৎ 'আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল'—দিয়ে যে গল্প আরম্ভ, তার গোটাটা কি? গল্পটা হচ্ছে, সিকন্দরশাহকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'ভদ্রতা আপনি কার কাছ থেকে শিখেছেন?' উত্তরে তিনি বললেন, 'বে-আদবদের কাছ থেকে? 'সে কি প্রকারে সম্ভব?' 'তারা যা করে আমি তাই বর্জন করেছি।'

খুব যে একটা দারুণ চালাক গল্প হল তা বলছি নে। তবে জাহাজের খালাসীদের—বিশেষ করে ইংরেজ খালাসীদের—ভাষাটা বর্জন করলেই লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

জাহাজের সিঁড়ি ওঠার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দেখবে দু-একটা লোক এক লাফে তিন ধাপ ডিঙোতে ডিঙোতে জাহাজে উঠছে। এরা কি একটু সময় করে আগে-ভাগে আসতে পারে না? আসলে তা নয়। কোনো বেচারীকে কাস্টম-হাউস (যারা আমদানী-রপ্তানী মালের উপর কড়া নজর রেখে মাশুল তোলে) আটকে রেখেছিল, শেষ মুহূর্তে খালাস পেয়েছে, কেউ বা আধ ঘণ্টা আগে খবর পেয়েছে কোন যাত্রী এ জাহাজে যাবে না বলে খালি বার্থটা সে পেয়ে গিয়েছে কিংবা কেউ শহর দেখতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছিল, কোনো গতিকে এইমাত্র বন্দর আর জাহাজ খুঁজে পেয়েছে।

'বদর বদর' বলে জাহাজ বন্দরের বন্ধন থেকে মুক্তি পেল।

অজানা সমুদ্রের বুকে ভেসে যাওয়ার ঔৎসুক্য এক দিকে আছে, আবার ডাঙা থেকে ছুটি নেবার সময় মানুষের মন সব সময়ই একটা অব্যক্ত বেদনায় ভরে ওঠে। অপার সমুদ্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, সীমার শেষের দিগ্বলয়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মুক্ত মনের যত অগাধ আনন্দই পাও না কেন, ঝঞ্চাবাত্যার সঙ্গে দুর্বার সংগ্রাম করে করে ক্ষণে-বাঁচা ক্ষণে-মরার অতুলনীয় যত অভিজ্ঞতাই সঞ্চয় কর না কেন, মাটির কোলে ফিরে আসার মত মধুময় অভিজ্ঞতা অন্য কিছুতেই পাবে না। তাই ভ্রমণকারীদের গুরু, গুরুদেব বহু নদ-নদী সাগর-সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার পর বলেছেন,—

'ফিরে চল, ফিরে চল মাটির টানে
যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে মুখের পানে।'

জাহাজ ছাড়তে ছাড়তে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল।

আমি জাহাজের পিছন দিকে রেলিঙের উপর ভর করে তাকিয়ে রইলুম

আলোকমালায় সুসজ্জিত মহানগরীর—পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ বন্দরের দিকে। সেখানে রাস্তায় রাস্তায়, সমুদ্রের জাহাজে জাহাজে আর জেলেদের ডিঙিতে ডিঙিতে কোথাও বা সারে সারে প্রদীপশ্রেণী আর কোথাও বা এখানে একটা, ওখানে দুটো, সেখানে একঝাঁক—যেন মাটির সাত-ভাই-চম্পা।

আমরা দেয়ালি জ্বালি বছরের মাত্র এক শুভদিনে। ওখানে সম্বৎসর দেয়ালির উৎসব। এদের প্রতিদিনের প্রতি গোধূলিতে শুভ লগ্ন। আর এদের এ উৎসব আমাদের চেয়ে কত সর্বজনীন! এতে সাড়া দেয় সর্ব ধর্ম সর্ব সম্প্রদায়ের নর-নারী···হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ-জৈন-পার্সিক-মুসলমান-খৃষ্টানী!

আমি জানি, বৈজ্ঞানিকরা বলেন, কোনো কোনো ছোট্ট পাখির রঙ যে সবুজ তার কারণ সে যেন গাছের পাতার সঙ্গে নিজের রঙ মিলিয়ে দিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারে, যাতে করে শিকরে পাখি তাকে দেখতে পেয়ে ছোঁ মেরে না নিয়ে যেতে পারে! তাই নাকি আমের রঙও কাঁচা বয়সে থাকে সবুজ—যাতে পাখি না দেখতে পায়, এবং পেকে গেলে হয়ে যায় লাল, যাতে করে পাখির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে—যাতে সে যেন ঠুকরে ঠুকরে তাকে গাছ থেকে আলাদা করে দেয়, নিচে পড়ে তার আঁটি যেন নতুন গাছ গজাতে পারে।

বৈজ্ঞানিকদের ব্যাখ্যা ভুল, আমি বলি কি করে। বিজ্ঞানের আমি জানি কতটুকু, বুঝি কতখানি? কিন্তু আমার সরল সৌন্দর্য-তিয়াসী মন এসব জেনেশুনেও বলে, 'না, পাখি যে সবুজ, সে শুধু তার নিজের সৌন্দর্য আর আমার চোখের আনন্দ বাড়াবার জন্যে। এর ভিতর ছোট হোক, বড় হোক, কোনো স্বার্থ লুকনো নেই। সৌন্দর্য শুধু সুন্দর হওয়ার জন্যই।'

ঠিক তেমনি আমি জানি, পৃথিবীর বন্দরে বন্দরে প্রতি গোধূলিতে যে আলোর বান জেগে ওঠে, তার মধ্যে স্বার্থ লুকনো আছে। ঐ আলো দিয়ে মানুষ একে অন্যকে দেখতে পায়, বাপ ঐ আলোতে বাড়ি ফেরে, মা তার শিশুকে খুঁজে পায়, সবাই আপন আপন গৃহস্থালির কাজ করে; কিন্তু তবু, যখনই আমি দূরের থেকে এই আলোগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখি, তখনি মনে হয় এগুলো জ্বালানো হয়েছে সুদ্ধমাত্র দেয়ালির উৎসবকে সফল করার জন্য। তার ভিতরে যেন আর কোনো স্বার্থ নেই।

অকূল সমুদ্রে পথহারা নাবিক তারার আলোয় ফের পথ খুঁজে পায়। সেই স্বার্থের সত্য উপেক্ষা করে রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন—

> 'তুমি কত আলো জ্বালিয়েছ এই গগনে
> কি উৎসবের লগনে।'

বন্দরের আলোর দিকে তাকিয়ে যদি আমিও ভগবানের উদ্দেশে বলি,—

> 'মোরা কত আলো জ্বালিয়েছি ঐ চরণে
> কি আরতির লগনে।'

তবে কি বড্ড বেশী ভুল বলা হবে?

অনেক দূরে চলে এসেছি! পাড়ের আলো ক্রমেই ম্লান হয়ে আসছে। তবু এখনো দেখতে পাই, হুশ করে এক-একখানা জেলে-ডিঙি আমাদের পাশ

দিয়ে উলটো দিকে চলে যাচ্ছে। আসলে কিন্তু সে হুশ করে চলে যায় নি। সে ছিল দাঁড়িয়েই, কারণ তার গলুই সমুদ্রের দিকে মুখ করে আছে, আমরা তাকে পেরিয়ে গেলুম মাত্র।

আশ্চর্য, এত রাত অবধি পাড় থেকে এত দূরে তারা মাছ ধরছে!

এখন যদি ঝড় ওঠে তবে তারা করবে কি? নৌকো যদি ডুবে যায় তবে তারা তো এতখানি জল পাড়ি দিয়ে ডাঙায় পৌঁছতে পারবে না। তবে তারা এ রকম বিপজ্জনক পেশা নিয়ে পড়ে থাকে কেন? লাভের আশায়? নিশ্চয় নয়। সে তত্ত্ব আমি বিলক্ষণ জানি। আমি একবার কয়েক মাসের জন্য মাদ্রাজের সমুদ্রপাড়ে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে ছিলুম। তারই পাশে ছিল, একেবারে সমুদ্রের গা ঘেঁষে এক জেলেপাড়া। আমি পাকা ছটি মাস ওদের জীবনযাত্রাপ্রণালী দেখেছি। ওদের দৈন্য দেখে আমি স্তম্ভিত হয়েছি। আমাদের গরিব চাষারাও এদের তুলনায় বড়লোক, এমন কি, আমাদের আদিবাসীরা, সাঁওতাল ভীলেরাও এদের চেয়ে অনেক বেশী সুখস্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করে। তোমাদের ভিতর যারা পুরীর জেলেদের দেখেছ তারাই আমার কথায় সায় দেবে।

তবে কি এরা অন্য কোনো সুযোগ পায় না বলে এই বিপদসংকুল, কঠিন অথচ দুঃখের জীবন নিয়ে পড়ে থাকে? আমার সেই মাদ্রাজী বন্ধু বললে, তা নয়, এরা নাকি খোলা সমুদ্র এত ভালোবাসে যে তাকে ছেড়ে মাঠের কাজে যেতে কিছুতেই রাজী হয় না। ঝড়ের সময় মাছ ধরা প্রায় অসম্ভব বলে তখন উপোস করে দিন কাটাবে, ক্ষুধায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হলে, ভূখা কাচ্চাবাচ্চাদের কান্না সহ্য করতে না পারলে সেই ঝড়েই বেরয় মাছ ধরতে আর ডুবে মরে সমুদ্রের অথৈ জলে।—তবু জল ছেড়ে ডাঙার ধান্দায় যেতে রাজী হয় না।

এবং নৌকোর মাঝি-মাল্লা, জাহাজের খালাসীদের বেলাও তাই। এদের জীবন এতখানি অভিশপ্ত নয়, জানি, কিন্তু এরাও ডাঙায় ফিরে যেতে রাজী হয় না। এমন কি, যে চাষা সাতশ পুরুষ ধরে খেতের কাজ করেছে, সেও যদি দুর্ভিক্ষের সময় দু পয়সা কামাবার জন্য সমুদ্রে যায় তবে কিছুদিন পরই তাকে আর ডাঙার কাজে নিয়ে যাওয়া যায় না। আর পুরনো খালাসীদের তো কথাই নেই। গোঁপদাড়ি পেকে গিয়েছে, সমুদ্রের নোনা জল আর নোনা হাওয়ায় চামড়ার রঙটি ব্রোনজের মতো হয়ে গিয়েছে, আর কদিন বাঁচবে তার ঠিক নেই, জাহাজে কেউ চাকরি দিতে চায় না, তবু পড়ে থাকবে খিদিরপুরের এক ঘিঞ্জি আড্ডায় আর উদয়াস্ত এ-জাহাজ ও-জাহাজ করে করে বেড়াবে চাকরির সন্ধানে। ওদিকে বেশ দু পয়সা জমিয়েছে। ইচ্ছে করলেই দেশের গাঁয়ের তেঁতুলগাছতলায় নাতি-নাতনীর পাখার হাওয়া খেতে খেতে গল্পগুল বলতে বলতে দুটি চোখ বুঝতে পারে।

সমুদ্রের প্রতি এদের কেমন যেন একটা 'নেশা' আছে, সে সম্বন্ধে তারা একটু লজ্জিত। কেন, তা জানি নে। তুমি যদি বল, 'তা, চৌধুরীর পো' চৌধুরী পো বলে সম্বোধন করলে ওরা বড় খুশী হয়—'দু-পয়সা তো

কামিয়েছ, আর কেন এ-জাহাজে ও-জাহাজে ঝকমারির কাজ করা। তার চেয়ে দেশে গিয়ে আল্লা-রসুলের নাম স্মরণ কর, আখেরের কথা ভাববার সময় কি এখনো আসে নি?'

বড় কাচুমাচু হয়ে বুড়ো বলবে, 'না, ঠাকুর, তা নয়।' দাড়ি চুলকোতে চুলকোতে বলবে, 'আর দুটি বচ্ছর কাম করলেই সব সুরাহা হয়ে যাবে। দু-পয়সা না নিয়ে নাতি-নাতনীদের ঘাড়ে চাপতে লজ্জা করে।'

একদম বাজে কথা। বুড়ো জাহাজের কামে ঢোকে যখন তার বয়স আঠারো। আজ সে সত্তর। এই বাহান্ন বৎসর ধরে সে দেশে টাকা পাঠিয়েছে ভালো করে ঘর-বাড়ি বানাবার জন্য, জমি-জমা কেনার জন্য। এখন তার পরিবারের এত সচ্ছল অবস্থা যে, ওরা জমিদারকে পর্যন্ত টাকা ধার দেয়। আর বুড়ো বলে কিনা ব্যাটা-ভাইপো নাতি-নাতনী তাকে দু-মুঠো অন্ন খেতে দেবে না!

সমুদ্রের প্রতি কোনো কোনো জাহাজ-কাপ্তেনের এত মায়া যে বুড়ো বয়সে তারা বাড়ি বানায় ঠিক সমুদ্রের পাড়ে, এবং বাড়িটার ঢপ্‌ও কিম্ভূত-কিমাকার! দেখতে আদপেই বাড়ির মতো নয়, একদম হুবহু জাহাজের মতো—অবশ্য মাটির সঙ্গে যোগ রেখে যতখানি সম্ভব। আর তারই চিলে-কোঠায় সাজিয়ে রাখে কম্পাস, দুরবীন, ম্যাপ, জাহাজের স্টিয়ারিঙ হুইল এবং জাহাজ চালাবার অন্যান্য যাবতীয় সরঞ্জাম। বাড়ির আর কাউকে বুড়ো সেখানে ঢুকতে দেয় না—য়ুনিফর্ম পরা না থাকলে জাহাজের ও-জায়গায় তো কাউকে যেতে দেওয়া হয় না—এবং সে সেখানে পাইপটা কামড়ে ধরে সমস্ত দিন বিড়বিড় করে 'খালাসীদের' বকাঝকা করে। ঝড়বৃষ্টি হলে তো কথাই নেই। তখন সে একাই একশ। 'জাহাজ' বাঁচাবার জন্য সে তখন খেপে গিয়ে 'ব্রিজ'ময় দাবড়ে বেড়ায়, 'টেলিফোনে' চিৎকার করে 'এঞ্জিন-ঘরকে' হুকুম হাঁকে, 'আরো জলদি'; 'পুরো স্পীডে', কখনো বা বরসাতিটা গায়ে চাপিয়ে 'ডেকের' তদারকি করে ভিজে কাঁই হয়ে ফিরবে। ঝড় না থামা পর্যন্ত তার দম ফেলার ফুরসত নেই, ঘুমুতে যাবার তো কথাই ওঠে না। ঝড় থামলে হাঁফ ছেড়ে বলবে, 'ওঃ, কি বাঁচনটাই না বেঁচে গিয়েছি। আমি না থাকলে সব ব্যাটা আজ ডুবে মরত। আজকালকার ছোঁড়ারা জাহাজ চালাবার কিসসু-টি জানে না।' তারপর টেবিলে বসে আঁকাবাঁকা অক্ষরে 'জাহাজের' ক্রুদের ধন্যবাদ জানাবে, তারা যে তার হুকুম তামিল করে জাহাজ বাঁচাতে পেরেছে তার জন্য। তার পর ঝড়ের ধাক্কায় জাহাজ যে কোথায় ছিটকে পড়েছে তার 'বেয়ারিঙ' নেবে বিস্তর ল্যাটিটুড-লঙ্গিটুড কষে এবং শেষটায় হাঁটু গেড়ে ভগবানকে ধন্যবাদ জানিয়ে পরম পরিতৃপ্তি সহকারে হাই তুলতে তুলতে আপন 'কেবিনে' শুতে যাবে।

তিন দিন পরে গুম গুম করে 'জাহাজ' থেকে নেমে সে পাড়ার আড্ডায় যাবে গল্প করতে—'জাহাজ' বন্দরে এসে ভিড়েছে কি না! সেখানে সেই মারাত্মক ঝড়ের একটা ভয়ংকর বর্ণনা দিয়ে শেষটায় পাইপ কামড়াতে কামড়াতে

বলবে, 'আর না, এই আমার শেষ সফর। বুড়ো হাড়ে আর জলঝড় সয় না।' সবাই হা-হা করে বলবে, 'সে কি, কাপ্তেন, আপনার আর তেমন কি বয়স হল?' কাপ্তেনও 'হেঁ-হেঁ' করে মহাখুশী হয়ে 'জাহাজে' ফিরবে।

আমি আরো দুই শ্রেণীর লোককে চিনি যারা কিছুতেই বাসা বাঁধতে চায় না।

দেশ-বিদেশে আমি বিস্তর বেদে দেখেছি। এরা আজ এখানে কাল ওখানে, পরশু আরো দূরে, অন্য কোথাও। কখন্ কোন্ জায়গায় কোন্ মেলা শুরু হবে, কখন্ শেষ হবে, সব তাদের জানা! মেলায় মেলায় গিয়ে কেনা-কাটা করবে, নাচ দেখাবে, গান শোনাবে, হাত গুনবে, কিন্তু কোথাও স্থির হয়ে বেশী দিন থাকবে না। গ্রীষ্মের খরদাহ, বর্ষার অবিরল বৃষ্টি সব মাথাও করে চলেছে তো চলেছে, কিসের নেশায় কেউ বলতে পারে না। বাচ্চাদের লেখাপড়া শেখাবার চাড় নেই, তাদের অসুখ-বিসুখ করলে ডাক্তার বদ্যিরও তোয়াক্কা করে না। যা হবার হোক, বাসা তারা কিছুতেই বাঁধবে না। বাড়ির মায়া কি তারা কখনো জানে নি, কোন দিন জানবেও না।

ইংলণ্ড দুশ বছর ধরে চেষ্টা করে আসছে এদের কোনো জায়গায় পাকাপাকি ভাবে বসিয়ে দিতে। টাকা-পয়সা দিয়েছে, কিন্তু না, না, না, এরা কিছুতেই কোনো জায়গার কেনা-গোলাম হয়ে থাকতে চায় না। ইংলণ্ড যে এখনো তার দেশে প্রাথমিক শিক্ষার হার শতকরা পুরো একশ করতে পারে নি তার প্রধান কারণ এই বেদেরা। এরা তো আর কোনো জায়গায় বেশী দিন টিকে থাকে না যে এদের বাচ্চারা ইস্কুলে যাবে? শেষটায় ইংরেজ এদের জন্য ভ্রাম্যমান পাঠশালা খুলেছে, অর্থাৎ পাঠশালার মাস্টার শেলেট-পেনসিল নিয়ে ভবঘুরে হয়ে তাদের পিছন পিছন তাড়া লাগাচ্ছে, কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা, তারা যেমন ছিল তেমনি আছে।

খোলা-মেলার সন্তান এরা,—গণ্ডীর ভিতর বন্ধ হতে চায় না।

কিন্তু এদের সবাইকে হার মানায় কারা জান?

রবীন্দ্রনাথ যাদের সম্বন্ধে বলেছেন,

'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন
চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন।'

এই যে আরব-সাগর পাড়ি দিয়ে আদন বন্দরের দিকে যাচ্ছি এরা সেই দেশের লোক। সৃষ্টির আদিম প্রভাত থেকে এরা আরবের এই মরুভূমিতে ঘোরাঘুরি করছে। এরা এদিক-ওদিক যেতে যেতে কখনো ইরানের সজল উপত্যকার কাছে এসে পৌঁছেছে, কখনো লেবাননের ঘন বনমর্মরধ্বনিও শুনতে পেয়েছে কিন্তু এসব জায়গায় নিশ্চিন্ত মনে বসবাস করার কণামাত্র লোভ এদের কখনো হয় নি। বরঞ্চ মরুভূমির এক মরূদ্যান থেকে আরেক মরূদ্যান যাবার পথে সমস্ত ক্যারাভান (দল) জলের অভাবে মারা গেল—এ বীভৎস সত্য তাদের কাছে অজানা নয়, তবু তারা ঐ পথ ধরেই চলবে, কোনো জায়গায় স্থায়ী বসবাসের প্রস্তাব তাদের মাথায় বজ্রাঘাতের ন্যায়।

জানি, এক কালে আরব দেশ বড় গরিব ছিল, কৃত্রিম উপায়ে জলের ব্যবস্থা করতে পারত না বলে সেখানে চাষ-আবাদের কোনো প্রশ্নই উঠত না। কিন্তু হালে নজদ-হিজাজের রাজা ইবনে সউদ[১] পেট্রল বিক্রি করে মার্কিনদের কাছ থেকে এত কোটি কোটি ডলার পেয়েছেন যে সে-কড়ি কি করে খরচা করবেন তার কোনো উপায়ই খুঁজে পাচ্ছেন না। শেষটায় মেলা যন্ত্রপাতি কিনে তিনি বিস্তর জায়গায় জল সেঁচে সেগুলোকে খেত-খামারের জন্য তৈরী করে বেদুইনদের বললেন, তারা যেন মরুভূমির প্রাণঘাতী যাযাবরবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে এসব জায়গায় বাড়িঘর বাঁধে।

কার গোয়াল, কে দেয় ধুঁয়ো!

সে সব জায়গায় তখন তালগাছের মতো উঁচু আগাছা গজাচ্ছে।

বেদুইন তার উট-খচ্চর, গাধা-ঘোড়া নিয়ে আগের মতোই এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়। উটের লোমের তাঁবুর ভিতর রাত্রিবাস করে। তৃষ্ণায় যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হয় তখন তার প্রিয় উটের কণ্ঠ কেটে তারই ভিতরকার জমানো জল খায়। শেষটায় জলের অভাবে গাধা-খচ্চর, বউ-বাচ্চা সহ গুষ্ঠীসুদ্ধ মারা যায়।

তবু 'পা-জমিয়ে' কোথাও নীড় বানাবে না।

এই সব তত্ত্বচিন্তায় মশগুল হয়ে ছিলুম এমন সময় হুশ করে আরেকখানা জেলে-নৌকা পাশ দিয়ে চলে গেল। দেখি, ক্যাম্বিসের ছইয়ের নিচে লোহার উনুন জেবলে বুড়ো রান্না চাপিয়েছে। কল্পনা কি না বলতে পারব না, মনে হল ফোড়নের গন্ধ যেন নাকে এসে পৌঁছল। কল্পনা হোক আর যাই হোক তত্ত্বচিন্তা লোপ পেয়ে তদ্দণ্ডেই ক্ষুধার উদ্রেক হল।

ওদিকে কবে শেষ ব্যাচের শেষ ডিনার খাওয়া হয়ে গিয়েছে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিরীক্ষণ, তত্ত্বচিন্তায় মনোবীক্ষণ বিলক্ষণ সুখনীয় প্রচেষ্টা কিন্তু ভক্ষণ-ডিণ্ডিম উপেক্ষা করা সর্বাংশে অর্বাচীনের লক্ষণ।

তবু দেখি, যদি কিছু জোটে, না হলে পেটে কিল মেরে শুয়ে পড়বো আর কি।

দশ পা যেতে না যেতেই দেখি আমার দুই তরুণ বন্ধু পল আর পার্সি 'রামি' খেলছে। আমাকে দেখে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'গুড ঈভনিং, স্যার!'

আমি বললুম, 'হ্যালো', অর্থাৎ 'এই যে।'

তারপর ঈষৎ অভিমানের সুরে বললুম, 'আমাকে একলা ফেলে তাস খেলছ যে বড়! জান, তাস ব্যসন-বিশেষ, তাসে অযথা কালক্ষয় হয়, গুণীরা বলেন—'

ওরা বাধা দিচ্ছে না বলে আমাকেই থামতে হল।

পার্সি বললে, 'যথার্থ বলেছেন, স্যার!'

পল বললে, 'হক্ কথা। কিন্তু স্যার, আমরা তো এতক্ষণ আপনার

১। এঁর ছেলে সম্প্রতি করাচীতে বেড়াতে এসেছিলেন

ডিনার যোগাড় করে কেবিনে গুছিয়ে রাখাতে—'

আমি বললুম, 'সে কি হে ?'

পার্সি বললে, 'আজ্ঞে। যখন দেখলুম, আপনি ডিনারের ঘণ্টা শুনেও উঠলেন না, তখনই আমরা ব্যবস্থাটা করে ফেললুম।'

সোনার চাঁদ ছেলেরা। ইচ্ছে হচ্ছিল, দুজনকে দু-বগলে নিয়ে উল্লাসে নাগানৃত্য জুড়ে দি। কিন্তু বয়সে কম হলে হবে কি, ওজনের দিক দিয়ে ওরা আমার চেয়ে ঢের বেশী ভারিক্কী মুরুব্বী। বাসনাটা তাই বিকাশ লাভ করল না। বললুম, 'তবে চলো ব্রাদার্স, কেবিনে।'

॥ ২ ॥

'গড্ডলিকা-প্রবাহে' অর্থাৎ ভিড়ের সঙ্গে মানুষ গা ভাসিয়ে দেয় কেন ? তাতে সুবিধে এই ;—আর পাঁচজনের যা গতি, তোমারও তাই হবে। এবং যেহেতু সংসারের আর পাঁচজন হেসে-খেলে বেঁচে আছে, অতএব তুমিও দিব্য তাদেরই মতো সুখে-দুঃখে বেঁচে থাকবে।

আর যদি গড্ডলিকায় না মিশে একলা পথে চল তবে যেমন হঠাৎ গুপ্তধনের সন্ধান পেয়ে যেতে পার ঠিক তেমনি মোড় ফিরতেই আচমকা হয়তো দেখতে পাব, ব্যাঘ্রাচার্য-বৃহল্লাঙ্গুল থাবা পেতে সামনে বসে ন্যাজ আছড়াচ্ছেন !

গুপ্তধনটা একা পেয়েছিলে বলে সেটা যেমন তোমার একারই, ঠিক তেমনি বাঘের মোকাবেলা করতে হবে তোমাকে একাই।

তাই বেশির ভাগ লোক সর্বনাশা ক্ষতির ভয়ে অত্যধিক লাভের লোভ না করে গড্ডলিকার সঙ্গে মিশে যায়।

জাহাজেও তাই। তুমি যদি আর পাঁচজনের সঙ্গে ঘুম থেকে জাগ তবে সেই ভিড়ে তুমি ঝটপট তোমার 'বেড-টী'র কাপটি পাবে না। আর যদি খুব সকাল সকাল কিংবা আর সকলের চেয়ে দেরিতে ওঠো তবে চা-টি পেয়ে যাবে তন্মুহূর্তেই, কিন্তু আবার কোনো দিন দেখবে, তখনো আগুন জ্বালা হয় নি বলে চায়ের অনেক দেরি, কিংবা এত দেরিতে উঠেছ যে 'বেড-টী'র পাট উঠে গিয়ে তখন 'ব্রেকফাস্ট' আরম্ভ হয়ে গিয়েছে বলে তোমার 'বেড-টী' মাঠে অর্থাৎ দরিয়ায় মারা গিয়েছে।

ইংরিজিতে একেই বলে, 'নো রিস্ক্, নো গেন' অর্থাৎ একটুখানি ঝুঁকি যদি নিতে রাজী না হও তবে লাভও হবে না। লটারি জিততে হলে অন্তত একটা টিকিট কেনার রিস্ক্ নিতে হয়।

সেদিন ঝুঁকিটা নিয়ে সুবিধে হল না। চা-টা মিস্ করে বিরসবদনে ডেকে এসে বসলুম।

এক মিনিটের ভিতর পল আর পার্সির উদয়।

পল ফিস-ফিস করে কানে কানে বলল, 'নূতন সব 'বাডি'দের (—অর্থাৎ

'চিড়িয়াদের') দেখেছেন, স্যার ?'

এরা সব নবাগত যাত্রী। কলম্বোয় জাহাজ ধরেছে। বেচারীরা এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, ডেক-চেয়ার পাতবার ভালো জায়গার সন্ধানে। কিন্তু পাবে কোথায় ? আমরা যে আগে-ভাগেই সব জায়গা দখল করে আসন-জমীন জমিয়ে বসে আছি—মাদ্রাজ থেকে।

এ তো দুনিয়ার সর্বত্র হামেশাই হচ্ছে। মীটিঙে, ফুটবলের মাঠে সর্বদাই আগে গিয়ে ভালো জায়গা দখল করার চেষ্টা সবাই করে থাকে। এমন কি রান্নাঘরের দাওয়ায় বসি ঠিক দরজাটির কাছে। মা রান্নাঘর থেকে খাবার নিয়ে বেরিয়েই সক্কলের পয়লা দেবে আমাকে।

ভাল জায়গায় বসতে পারাতে দুটো সুখ। একটা ভালো জায়গা পেয়েছ বলে এবং দ্বিতীয়টা তার চেয়েও বড়। বেশ আরাম করে বসে চিনে-বাদাম খেতে খেতে অলস নিরাসক্ত ভাবে তাকিয়ে দেখতে, অন্যেরা ফ্যা-ফ্যা করে কি ভাবে ভালো জায়গার সন্ধানে ঘুরে মরছে। পরিচিত এবং অপ্রিয় লোক হলে তো কথাই নেই। 'এই যে ভড় মশাই, জায়গা পাচ্ছেন না বুঝি ?' বলে ফিক করে একটুখানি সদুপদেশ বিতরণ করবে, 'কেন, ঐ দিকে তো মেলা জায়গা রয়েছে', বলে হাতখানা মাথার উপর তুলে চতুর্দিকে ঘুরিয়ে দেবে। তার থেকে কেউই বুঝতে পারবে না, কোন্ দিকে জায়গা খালি। লোকটা দৃষ্টি দিয়ে বিষবৃষ্টি নিক্ষেপ করে গজরাতে গজরাতে তোমার সৃষ্টির আড়াল হবে !

আঃ ! এ সংসারে ভগবান তাঁর অসীম করুণায় আমাদের জন্য কত আনন্দই না রেখেছেন ! কে বলে সংসার মায়াময় অনিত্য ? সে বোধ হয় ফুটবলের মাঠে কখনো ভাল সীট পায় নি।

আমি পল-পার্সিকে জিজ্ঞেস করলুম, 'অদ্যকার প্রোগ্রাম কি ?'

পল বললে, 'প্রথমত, জিমনাসটিক্-হলে গমন।'

'সেখানকার কর্ম-তালিকা কি ?'

'একটুখানি রোইং করব।'

'রোইং ? সেখানে কি নৌকো, বৈঠে, জল আছে ?'

'সব আছে, শুধু জল নেই।'

'?'

বৈঠেগুলোর সঙ্গে এমন ভাবে স্প্রিং লাগানো আছে যে জল থাকলে বৈঠাকে যতখানি বাধা দিত স্প্রিং ঠিক ততখানি দেয়। কাজেই শুকনোয় বসে বৈঠে চালানোর প্র্যাকটিস আর পরিশ্রম দুই-ই হয়।'

আমি বললুম, 'উঁহু। আমার মন সাড়া দিচ্ছে না। আমাদের দেশে আমরা বৈঠে মারি দু হাত দিয়ে তুলে ধরে। তোমার কায়দাটা রপ্ত করে আমার কোনো লাভ হবে না।'

পল বললে, 'তাহলে প্যারালেল বার, ডামবেল কিছু একটা ?'

'উঁহু।'

পার্সি বললে, 'তাহলে পলে আমাতে বক্‌সিং লড়ব। আপনি রেফারী

হবেন।'

'আমি তো ওর তত্ত্ব কিছুই জানি নে।'

'আমরা শিখিয়ে দেব।'

'উঁহু।'

পল তখন ধীরে ধীরে বলল, 'আসলে আপনি কোনো রকম নড়াচড়া করতে চান না। একসেরসাইজের কথা না হয় রইল কিন্তু আর সবাই তো সকাল-বিকেল জাহাজটাকে কয়েকবার প্রদক্ষিণ দেয় শরীরটাকে ঠিক রাখবার জন্য। আপনি তো তাও করেন না। কেন বলুন তো?'

আমি বললুম, 'আরেক দিন হবে। উপস্থিত অদ্যকার অন্য কর্মসূচী কি?'

পার্সি বললে, 'আজ এগারোটায় লাউঞ্জে চেম্বার ম্যুজিক। তাই না হয় শোনা যাবে।'

পল আপত্তি জানাল। বললে, 'যে লোকটা বেহালা বাজায় তার বাজনা শুনে মনে হয়, দুটো হুলো বেরালে মারামারি লাগিয়েছে।'

পার্সি বললে, 'ঐ তো পলের দোষ। বড্ড পিটপিটে। আরে বাপু, যাচ্ছিস তো সস্তা ফরাসী 'মেসাজেরি মারিতিম' জাহাজে আর আশা করছিস, ক্রাইজলার এসে তোর কেবিনের জানলার কাছে চাঁদের আলোতে বেহালা দিয়ে সেরেনেড বাজাবেন!'

আমি বললুম, 'আমাদের দেশে এক বুড়ী কিনে আনল এক পয়সার তেল। পরে দেখে তাতে একটা মরা মাছি। দোকানীকে ফেরত দিতে গিয়ে বললে, 'তেলে মরা মাছি।' দোকানী বললে, 'এক পয়সার তেলে কি তুমি একটা মরা হাতি আশা করেছিলে?'

পার্সি বললে, 'এইবার আপনাকে বাগে পেয়েছি, স্যার! আপনি যে গল্পটি বললেন তার যে বিলিতি মুদ্রণটি আমি জানি সে এর চেয়ে সরেস।'

আমি চোখ বন্ধ করে বললুম, 'কীর্তন কর।'

পার্সি বললে, 'এই আমাদের পলেরই মতো এক পিটপিটে মেমসায়েব গিয়েছেন মোজা কিনতে। কোন মোজাই তাঁর পছন্দ হয় না। শেষটায় সবচেয়ে সস্তায় এক শিলিঙে তিনি এক জোড়া মোজা কিনলেন। দোকানী যখন মোজা প্যাক করছে তখন তাঁর চোখে পড়ল মোজাতে অতি ছোট্ট একটি ল্যাডার—'

আমি শুধোলুম, 'ল্যাডার মানে কি? ল্যাডার মানে তো মই।'

'আজ্ঞে, মোজার একগাছা টানার সুতো যদি ছিঁড়ে যায় তবে ঐ জায়গায় শুধু পড়েনগুলো একটার উপর একটা এমন ভাবে থাকে যেন মনে হয় সিঁড়ি কিংবা মই। তাই ওটাকে তখন ল্যাডার বলা হয়।'

আমি বললুম, 'থ্যাঙ্কিউ; শেখা হল। তারপর কি হল?'

'মেম বললেন, "ও মোজা আমি নেব না, ওতে একটা ল্যাডার রয়েছে।"

দোকানী বললে, "এক শিলিঙের মোজাতে কি আপনি একটা মার্বেল স্টেয়ারকেস আশা করেছিলেন, ম্যাডাম?"'

আমি বললুম, 'সাবাস, তোমার বলা গল্পটি আমার গার্হস্থ্য সংস্করণের রাজসংস্করণ বলা যেতে পারে। তদুপরি তোমরা তো রাজার জাত।'

পার্সি বললে, 'ও কথাটা নাই বা তুললেন, স্যর !'

আমি আমার চোখ বন্ধ করে বললুম, 'জাহাজের দুর্বিষহ গতানুগতিক জীবনকে বৈচিত্র্যপূর্ণ করবার জন্য কোম্পানি অদ্য অন্য কি ব্যবস্থা করেছেন ?'

পার্সি বললে, 'সঙ্গীতে যখন পলের আপত্তি তখন আমি ভাবছি ঐ সময়টায় আমি সেলুনে চুল কাটাতে যাবো।'

আমি হন্তদন্ত হয়ে বললুম, 'অমন কর্মটি গলা কেটে ফেললেও করতে যেয়ো না, পার্সি ! তোমার চুল কেটে দেবে নিশ্চয়ই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তোমার 'হজামত'ও করে দেবে।'

কথাটা বুঝতে পারলুম না, স্যর !'

আমি বললুম, ওটা একটা উর্দু কথার আড়। এর অর্থ, তোমার চুল নিশ্চয়ই কেটে দেবে ভালো করে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মাথাটিও মুড়িয়ে দেবে।'

পার্সি আরো সাত হাত জলে। শুধোলে, চুল যদি ভালো করে কাটে তবে মাথা মুড়োবে কি করে ?'

আমি বললুম 'তোমার চুল কাটবে শব্দার্থে, কিন্তু মাথা মুড়োবে বক্রার্থে, অর্থাৎ মেটাফরিকালি। মোদ্দা কথা তোমার সর্বস্ব লুণ্ঠন করবে। জাহাজে চুল কাটানোর দর্শনী পঞ্চ মুদ্রা।'

পল বললেন, 'সে কি স্যর ? চীন দেশে তো পাঁচ টাকায় কুড়ি বার চুল কাটানো যায় !'

আমি বললুম, 'ভারতবর্ষেও তাই। এমন কি বিশ্বফ্যাশানের রাজধানী প্যারিসেও চুল কাটাতে পাঁচ টাকা লাগে না। ব্যাপারটা হয়েছে কি, জাহাজের ফার্স্ট ক্লাসে যাচ্ছেন পয়সাওলা বড়লোকেরা। তাঁরা পাঁচ টাকার কমে চুল কাটান না। কাজেই রেট বেঁধে দেওয়া হয়েছে পাঁচ টাকা। আমাদের কথা বাদ দাও, এখন যদি কোন ডেকপ্যাসেঞ্জারও চুল কাটাতে যায় তবে তাকেও দিতে হবে পাঁচ টাকা।'

'তা হলে উপায় ? একমাথা চুল নিয়ে লণ্ডনে নামলে পিসিমা কি ভাববেন ? তার উপর পিসিমাকে দেখব জীবনে এই প্রথম, পিসিমার কথা উঠলে বাবা মা যে ভাবে সমীহ করে কথা বলেন তার থেকে মনে হয় তিনি খুব সোজা মহিলা নন। তা হলে পাঁচটা টাকা দরিয়ার জলে ভেসে গেল আর কি, একদম শব্দার্থে।'

আমি বললুম, 'আদপেই না। জিবুটি বন্দরে চুল কাটাবে। বিবেচনা করি, সেখানে চুল কাটাতে এক শিলিঙেরও কম লাগবে।'

পল বললে, 'আমরা যখন বন্দরে রোঁদ লাগাব তখন পার্সিটা একটা ঘিঞ্জি সেলুনে বসে চুল কাটাবে। তা হলে তার উপযুক্ত শিক্ষা হয়।'

পার্সি আমার দিকে করুণ নয়নে তাকাল।

আমি বললুম, 'তা কেন ? বন্দর দেখার পর তোমাতে আমাতে যখন

কাফেতে বসে কফি খাবো তখন পার্সি চুল কাটাবে। চাই কি, হয়তো সেলুনের বারান্দায় বসেই কফি খেতে খেতে পার্সিকে আমাদের মহামূল্যবান সঙ্গসুখ দেব, অমূল্য উপদেশ বিতরণ করব।'

পার্সি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে বাও করে বললে, 'এ যাত্রায় আপনার সঙ্গে পরিচয় না হলে, স্যর, আমাদের যে কি হত—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'কিছুই হত না। আমার সঙ্গে বজর-বজর না করে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করতে, পাঁচ-রকমের ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে আলাপচারি হত। অনেক দেখতে, কম শুনতে।'

দুজনাই সঙ্গে সঙ্গে কেটে পড়ল!

আমি আরব সাগরের আবহাওয়া সম্বন্ধে একখানা বিরাট কেতাব নিয়ে পড়তে লেগে গেলুম।

॥ ৩ ॥

আরবের তুলনায় বাঙালী যে অতিশয় নিরীহ সে বিষয়ে কারো মনে কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয় কিন্তু আরব সাগর, সাগর হয়েও বঙ্গোপসাগরের উপসাগরের চেয়ে অনেক বেশী শান্ত এবং ঠাণ্ডা। মাদ্রাজ থেকে কলম্ব পর্যন্ত অধিকাংশ যাত্রী সী-সিকনেসে বেশ কাবু হয়ে থাকার পর এখানে তাঁরা বেশ চাঙা হয়ে উঠেছেন। উত্তর-পূব দিকে মৃদুমন্দ মৌসুমী হাওয়া বইছে তখনো—এই হাওয়ায় পাল তুলে দিয়েই ভাস্কো দা গামা আফ্রিকা থেকে ভারতে পেঁছতে পেরেছিলেন। কিন্তু এই সময়ে ঐ হাওয়া ভারতের দিকে বয় সে আবিষ্কার গামার নয়। আরবরা এ হাওয়ার গতিবিধি সম্বন্ধে বিলক্ষণ ওকিব-হাল ছিল এবং বিশেষ ঋতুতে (মৌসুম) এ হাওয়া বয় বলে এর নাম দিয়েছিল মৌসুমী হাওয়া। ইংরিজী শব্দ 'মনসুন' এবং বাঙলা 'মরশুম' এই মৌসুম শব্দ থেকে এসেছে। কিন্তু মৌসুমী হাওয়ার খানিকটে সন্ধান পাওয়ার পরও গামা একা সাহস করে আরব সাগর পাড়ি দিতে পারেন নি। আফ্রিকা থেকে একজন আরবকে জোর করে জাহাজের 'পাইলট' রূপে এনেছিলেন।

রোমানরাও নিশ্চয়ই এ হাওয়ার খবর কিছুটা রাখত। না হলে আরবদের বহু পূর্বে দক্ষিণ-ভারতের সঙ্গে তারা এতখানি ব্যবসা-বাণিজ্য করল কি করে? এখনো দক্ষিণ-ভারতের বহু জায়গায় মাটির তলা থেকে রোমান মুদ্রা বেরোয়।

তারও পূর্বে গ্রীক, ফিনিশিয়ানরা এ হাওয়ার খবর কতখানি রাখত আমার বিদ্যে অত দূর পেঁছয় নি। তোমরা যদি কেতাবপত্র ঘেঁটে আমাকে খবরটা জানাও তবে বড় খুশী হই।

এই হাওয়াটাকেই ট্যারচা কেটে কেটে আমাদের জাহাজ এগোচ্ছে। এ হাওয়া যতক্ষণ মোলায়েম ভাবে চলেন ততক্ষণ কোনো ভাবনা নাই। জাহাজ অল্প-স্বল্প দোলে বটে তবু উলটো দিক থেকে বইছে বলে গরমে বেগুন-পোড়া হতে হয় না। কিন্তু ইনি রুদ্রমূর্তি ধরলেই জাহাজময় পরিত্রাহি চিৎকার

উঠবে। এবং বছরের এ সময়টায় তিনি যে মাসে অন্তত দু-তিনবার জাহাজ-গুলোকে লণ্ডভণ্ড করে দেবার জন্য উঠে পড়ে লেগে যান সে 'সুখবরটা' আবহাওয়ার বইখানাতে একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে।

আবহাওয়ার বিজ্ঞান ঝড় ওঠবার পূর্বাভাস খানিকটা দিতে পারে বটে কিন্তু আরব সাগরের মাঝখানে যে ঝড় উঠল সে যে তার পর কোন্ দিকে ধাওয়া করবে সে সম্বন্ধে আগে-ভাগে কোনোকিছু বলে দেওয়া প্রায় অসম্ভব।

তাই সে ঝড় যদি পূব দিকে ধাওয়া করে তবে ভারতের বিপদ ; বোম্বাই, কারওয়ার, তিরু অনন্তপুরম্ (শ্রীঅনন্তপুর, ত্রিভাণ্ডরম্) অঞ্চল লণ্ডভণ্ড করে দেবে যদি উত্তর দিকে যায় তবে পার্সিয়ান গল্ফ্ এবং আরব-উপকূলের বিপদ আর যদি পশ্চিম পানে আক্রমণ করে তবে আদন বন্দর এবং আফ্রিকার সোমালি-দেশের প্রাণ যায়-যায়।

একবার নাকি এই রকম একটা ঝড়ের পর সোমালিদের ওবোক শহরে মাত্র একখানা বাড়ি খাড়া ছিল। যে ঝড়ে শহরের সব বাড়ি পড়ে যায়, তার সঙ্গে যদি মাঝদরিয়ায় আমাদের জাহাজের মোলাকাত হয় তবে অবস্থাটা কি রকম হবে খানিকটা অনুমান করা যায়।

তবে আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস, এ রকম ঝড়ের সঙ্গে মানুষের এক বারের বেশী দেখা হয় না। প্রথম ধাক্কাতেই পাতাল-প্রাপ্তি !

'পাতাল-প্রাপ্তি' কথাটা কি ঠিক হল ? কোথায় যেন পড়েছি, জাহাজ ডুবে গেলে পাতাল অবধি নাকি পেঁছিয় না। খানিকটে নাবার পর ভারী জল ছিন্ন করে জাহাজ নাকি আর তলার দিকে যেতে পারে না। তখন সে ত্রিশংকুর মতো ঐখানেই ভাসতে থাকে।

ভাবতে কি রকম অদ্ভূত লাগে ! সমুদ্রের এক বিশেষ স্তরে তাহলে যত সব জাহাজ ডোবে তারা যতদিন না জরাজীর্ণ হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায় তত-দিন শুধু ঘোরাফেরাই করবে !

জলে যা, হাওয়াতেই বোধকরি তাই। বেলুন-টেলুন জোরদার করে ছাড়তে পারলে বোধ হয় উড়তে উড়তে তারা এক বিশেষ স্তরে পেঁছিলে ঐখানেই ঝুলতে থাকবে—না পারবে নিচের দিকে নামতে, না পারবে উপরের দিকে যেতে। তারই অবস্থা কল্পনা করে বোধ হয় মুনি-ঋষিরা ত্রিশঙ্কুর স্বর্গ-মর্ত্যের মাঝখানে ঝুলে থাকার কথা কল্পনা করেছিলেন।

আমাকে অবশ্য কখনো কোনো জায়গায় ঝুলে থাকতে হবে না। দ্বিপ্রহরে এবং সন্ধ্যায় যা গুরুভোজন করে থাকি তার ফলে ডুবলে পাথরবাটির মতো তরতর করে একদম নাক-বরাবর পাতালে পেঁছে যাব। আহারাদির পর আমার যা ওজন হয় সে গুরুভার সমুদ্রের যে-কোনো নোনা জলকে অনায়াসে ছিন্ন করতে পারে। আমার ভাবনা শুধু আমার মুণ্ডুটাকে নিয়ে। মগজ সেটাতে এক রত্তিও নেই বলে সেটা এমনি ফাঁপা যে, কখন যে ধড়টি ছেড়ে হুশ করে চন্দ্র-সূর্যের পানে ধাওয়া করবে তার কিছু ঠিক-ঠিকানা নেই। হাজারো লোকের ভিড়ের মধ্যে যদি আমাকে সনাক্ত করতে চাও তবে শুধু লক্ষ্য কোরো

কোন্ লোকটা দু হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরে নড়া-চড়া করছে।

অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিলুম আমার সখা এবং সতীর্থ—একই তীর্থে যখন যাচ্ছি তখন 'সতীর্থ' বলাতে কারো কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়—শ্রীমান্ পল কোথা থেকে একটা টেলিস্কোপ যোগাড় করে একদৃষ্টে দক্ষিণ পানে তাকিয়ে আছে। ভাবলুম, ঐ দিক দিয়ে বোধ হয় কোনো জাহাজ যাচ্ছে আর সে তার নামটা পড়ার চেষ্টা করছে।

আমাকে দাঁড়াতে দেখে কাছে এসে বললে, 'ঐ দূরে যেন ল্যান্ড দেখা যাচ্ছে।'

আমি বললুম 'ল্যান্ড নয়, আইল্যান্ড। ওটা বোধ হয় মাল-দ্বীপপুঞ্জের কোনো একটা হবে।'

পল বললে, 'কই, ওগুলোর নাম তো কখনো শুনি নি!'

আমি বললুম, 'শুনবে কি করে? এই জাহাজে যে এত লোক, এঁদের সব্বাইকে জিজ্ঞেস করো ওঁদের কেউ মালদ্বীপ গিয়েছেন কি না? অন্দুরেই বা কেন? শুধু জিজ্ঞেস করো, মালদ্বীপবাসী কারো সঙ্গে কখনো ওঁদের দেখা হয়েছে কি না? তাই মালদ্বীপ নিয়ে এ বিশ্বভুবনে কারো কোনো কৌতূহল নেই।'

'আপনি জানলেন কি করে?'

'শুনেছি ম্যলদ্বীপের লোকেরা খুব ধর্মভীরু হয়। এক মালদ্বীপবাসীর তাই ইচ্ছা হয়, তার ছেলেকে মুসলিম শাস্ত্র শেখাবার। মালদ্বীপে তার কোনো ব্যবস্থা নেই বলে তিনি ছেলেকে কাইরোর আজহর বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান;—ঐটেই ইসলামী শাস্ত্র শেখার জন্য পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা বিশ্ববিদ্যালয়। ছেলেটির সঙ্গে আমার আলাপ হয় ঐখানে। বহুবার দেখা হয়েছিল বলে সে আমাকে তার দেশ সম্বন্ধে অনেক কিছুই বলেছিল, তবে সে অনেককাল হল বলে আজ আর বিশেষ কিছু মনে নেই।

'ওখানে নাকি সবসুদ্ধ হাজার দুই ছোট ছোট দ্বীপ আছে এবং তার অনেকগুলোতেই খাবার জল নেই বলে কোনো প্রকারের বসতি নেই। মাল-দ্বীপের ছেলেটি আমায় বলেছিল, "আপনি যদি এ রকম দশ-বিশটা দ্বীপ নিয়ে বলেন, এগুলো আপনার, আপনি এদের রাজা, তা হলে আমরা তাতে কণামাত্র আপত্তি জানাব না।" অন্যগুলোতেও বিশেষ কিছু ফলে না; সবচেয়ে বড় দ্বীপটার দৈর্ঘ্য নাকি মাত্র দু মাইল। মালদ্বীপের সুলতান সেখানে থাকেন এবং তাঁর নাকি ছোট্ট একখানা মোটর গাড়ি আছে। তবে সেখানে সব চেয়ে লম্বা রাস্তার দৈর্ঘ্য মাত্র দু মাইল সেখানে ওটা চালিয়ে তিনি কি সুখ পান তা তিনিই বলতে পারবেন।

'মালদ্বীপে আছে প্রচুর নারকেল গাছ আর দ্বীপের চতুর্দিকে জাত-বেজাতের মাছ কিলবিল করছে। মাছের শুঁটকি আর নারকোলে নৌকো ভর্তি করে পাল তুলে দিয়ে তারা রওয়ানা হয় সিংহলের দিকে মৌসুমী হাওয়া বইতে আরম্ভ করলেই। হাওয়া তখন মালদ্বীপ থেকে সিংহলের দিকে বয়। সমস্ত বর্ষাকালটা

সিংহলে ঐ সব বিক্রি করে এবং বদলে চাল ডাল কাপড় কেরোসিন তেল কেনে। কেনাকাটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরও তাদের নাকি সেখানে বহুদিন কাটাতে হয়, কারণ উলটো হাওয়া বইতে আরম্ভ করবে শীতের সুরুতে। তার আগে তো ফেরার উপায় নেই।'

পার্সি বললে, 'কেন স্যর, এখন তো শীতকাল নয়। আমরা তো হাওয়ার উলটো দিকেই যাচ্ছি।'

আমি বললুম, 'ভ্রাতঃ, আমাদের জাহাজ চলে কলে, হাওয়ার তোয়াক্কা সে করে থোড়াই। মালদ্বীপে কোনো কলের জাহাজ যায় না, খরচায় পোষায় না বলে। তাই আজ পর্যন্ত কোনো টুরিস্ট মালদ্বীপ যায় নি।

'তাই মালদ্বীপের ছোকরাটি আমায় বলেছিল, "আমাদের ভাষাতে 'অতিথি' শব্দটার কোনো প্রতিশব্দ নেই। তার কারণ বহুশত বৎসর ধরে আমাদের দেশে ভিনদিশী লোক আসেনি। আমরা এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে যা অল্পস্বল্প যাওয়া-আসা করি তা এতই কাছাকাছির ব্যাপার যে কাউকে অন্যের বাড়িতে রাত্রিযাপন করতে হয় না।" তারপর আমায় বলেছিল, "আপনার নেমন্তন্ন রইল মালদ্বীপ ভ্রমণের, কিন্তু আমি জানি, আপনি কখনো আসবেন না। যদিস্যাৎ এসে যান তাই আগের থেকে বলে রাখছি, আপনাকে এর বাড়ি ওর বাড়ি করে করে অন্তত বছর তিনেক সেখানে কাটাতে হবে। খাবেন-দাবেন, নারকোল গাছের তলাতে চাঁদের আলোয় গাওনা-বাজনা শুনবেন, ব্যস, আর কি চাই!"

'যখন শুনেছিলুম তখন যে যাবার লোভ হয় নি এ-কথা বলব না। ঝাড়া তিনটি বচ্ছর (এবং মালদ্বীপের ছেলেটি আশা দিয়েছিল যে সেখানে যাহা তিন তাহা তিরানব্বুই) কিচ্ছুটি করতে হবে না, এবং শুধু তিন বৎসর না, বাকি জীবনটাই কিছু করতে হবে না। এ-কথাটা ভাবলেই যেন চিত্তবনের উপর দিয়ে মর্মর গান তুলে মন্দমিঠে মলয় বাতাস বয়ে যায়। একজামিনের ভাবনা, কেষ্টার কাছে দু টাকার দেনা, সব কিছু ঝেড়ে ফেলে দিয়ে এক মুহূর্তেই মুক্তি। অহো!

> 'কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ
> দিবা-রাত্রি নাচে মুক্তি, নাচে বন্ধ—
> সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে
> তা তা থৈ থৈ তা তা থৈ থৈ তা তা থৈ থৈ॥'

এ-সব আত্মচিন্তার সব কিছুই যে পল-পার্সিকে প্রকাশ করে বলেছিলুম তা নয়, তবে একটা কথা মনে আছে, ওরা যখন উৎসাহিত হয়ে মালদ্বীপে বাকি জীবনটা কাটাবে বলে আমাকে সে খবরটা দিলে তখন আমি বলেছিলুম,—

'বাকি জীবন কেন, তিনটি মাসও সেখানে কাটাতে পারবে না। তার কারণ যেখানে কোন কাজ করার নেই, সেখানে কাজ না করাটাই হয়ে দাঁড়ায় কাজের কাজ। এবং সে ভয়াবহ কাজ। কারণ, অন্য যে-কোন কাজই নাও না কেন, যেমন মনে করো এগজামিন্—তারও শেষ আছে, বি-এ, এম-এ, পি-এইচ্-ডি,—তার পর আর কোনো পরীক্ষা নেই। কিংবা মনে করো উঁচু

পাহাড়ে চড়া। পাঁচ হাজার, দশ হাজার, ত্রিশ হাজার ফুট, যাই হোক না কেন তারও একটা সীমা আছে। কিন্তু 'কাজ নেই'—এ হল একটা জিনিস যা নেই, কাজেই তার আরম্ভও নেই শেষও নেই। যে জিনিসের শেষ নেই সে জিনিস শেষ পর্যন্ত সইতে পারা যায় না।

'কিংবা অন্য দিক দিয়ে ব্যাপারটাকে দেখতে পারো।

'আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মনে করো একটা ঘর। ঘরে আসল জিনিস—দি ইমপর্টেণ্ট্ এলমণ্ট—হল তার ফাঁকাটা, আমরা তাতে আসবাবপত্র রাখি, খাই-দাই, সেখানে রৌদ্রবৃষ্টি থেকে শরীরটা বাঁচাই। ঘরের দেয়ালগুলো কিন্তু এসব কাজে লাগছে না। অর্থাৎ ইমপর্টেণ্ট্ হল ফাঁকাটা, নিরেট দেয়ালটা নয়। তাই বলে দেয়ালটা বাদ দিলে চলবে না। দেয়ালহীন ফাঁকা হল ময়দানের ফাঁকা, সেখানে আশ্রয় জোটে না।

'তাই গুরুদেব বলেছেন, মানুষের জীবনের অবসরটা হচ্ছে ঘরের ফাঁকটার মতো, সে-ই দেয় আমাদের প্রবেশের পথ কিন্তু কিছুটা কাজের দেয়াল দিয়ে সেই ফাঁকা অবসরটাকে যদি ঘিরে না রাখো তবে তার থেকে কোন সুবিধা ওঠাতে পারো না। কিন্তু কাজ করবে যতদূর সম্ভব কম। কারণ স্পষ্ট দেখতে পাচ্চো, ঘরের মধ্যে ফাঁকাটা দেয়ালের তুলনায় পরিমাণে অনেক বেশী।'

তারপর আমি বললুম, 'কিন্তু ভ্রাতৃদ্বয়, আমার গুরুদেব এই তত্ত্বটি প্রকাশ করেছেন ভারি সুন্দর ভাষায় আর সুমিষ্ট ব্যঞ্জনায়, কিছুটা উস্টার সসের হাস্য-কৌতুক মিশিয়ে দিয়ে। আমি তার অনুকরণ করব কি করে?

'কিন্তু মূল সিদ্ধান্ত এই,—মালদ্বীপের একটানা কর্মহীনতার ফাঁকাটা অসহ্য হয়ে দাঁড়াবে, কারণ তার চতুর্দিকে সামান্যতম কাজের দেয়াল নেই বলে।'

একটানা এতখানি কথা বলার দরুন ক্লান্ত হয়ে ডেক-চেয়ারে গা এলিয়ে দিলুম।

তখন লক্ষ্য করলুম, পল ঘন ঘন ঘাড় চুলকোচ্ছে। তার পর হঠাৎ ডান হাতটা মুঠো করে মাথায় ধাঁই করে গুত্তা মেরে বললে; 'পেয়েছি, পেয়েছি, এই বারে পেয়েছি।'

কি পেয়েছে সেইটে আমি শুধোবার পূর্বেই পার্সি বললে, 'ঐ হচ্ছে পলের ধরন। কোনো একটা কথা স্মরণে আনবার চেষ্টা করার সময় সে ঘন ঘন ঘাড় চুলকোয়। মনে এসে যাওয়া মাত্রই ঠাস করে মাথায় মারবে এক ঘুষি। ক্লাসেও ও তাই করে আমরা তাই নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে থাকি। এইবারে শুনুন, ও কি বলে।'

পল বললে, 'কোনো নতুন কথা নয়, স্যার! তবে আপনার গুরুর তুলনাতে মনে পড়ে গেল আমাদের গুরু 'কন্‌ফুৎস'র (আমার মনে বড় আনন্দ হল যে ইংরেজ ছেলেটি 'কন্-ফু-ৎস'কে 'আমাদের গুরু' বলে সম্মান জানাল—ভারতবর্ষের ইংরেজ ছেলে-বুড়ো বুদ্ধকে কখনো 'আমাদের গুরু' বলে নি) এ বিষয়ে অন্য এক তুলনা। যদি অনুমতি দেন—'

আমি বললুম, 'কী জ্বালা! তোমার এই চীনা লৌকিকতা—ভদ্রতা

আমাকে অতিষ্ঠ করে তুললে। 'কন্-ফু-ৎস'র তত্ত্বচিন্তা শুনতে চায় না কোন্ মর্কট ? জানো, ঋষি কন্-ফু-ৎস আমাদের মহাপুরুষ গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক ? ঐ সময়েই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ইরানে জরথুস্ত্র, গ্রীসে সোক্রাতেস-প্লাতো-আরিস্তেতেলেসে, প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের ভিতরে—তা থাক গে, তোমার কথা বলো।'

পল বললে, 'সরি, সরি। কন্-ফু-ৎস বলেছেন, 'একটি পেয়ালার আসল (ইমপর্টেণ্ট্) জিনিস কি ? তার ফাঁকা জায়গাটা, না তার পর্সেলেনের ভাগটা ? ফাঁকা জায়গাটাতেই আমরা রাখি জল, শরবত, চা। কিন্তু পর্সেলেন না থাকলে ফাঁকাটা আদপেই কোনো উপকার করতে পারে না। অতএব কাজের পর্সেলেন দিয়ে অকাজের ফাঁকাটা ঘিরে রাখতে হয়। এবং শুধু তাই নয়, পর্সেলেন যত পাতলা হয়, পেয়ালার কদর ততই বেশী। অর্থাৎ কাজ করবে যতদূর সম্ভব সামান্যতম।'

তার পর হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে আমাকে কাও-টাও করে অর্থাৎ চীনা পদ্ধতিতে আমাকে হাঁটু আর মাথা নীচু করে অভিবাদন জানিয়ে বললে,—

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'ফের তোমার চীনে সৌজন্য ?'

বললে, 'সরি, সরি। কিন্তু স্যার ঐ মালদ্বীপের কথা ওঠাতে আর আপনি আপনার গুরুদেবের কথা বলতে আমার কাছে 'কন-ফু-ৎস'র তত্ত্বচিন্তা আজ সরল হয়ে গেল। ওঁর এ বাণী বহুবার শুনেছি, অনেকবার পড়েছি কিন্তু আজ এই প্রথম—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'চোপ্।'

॥ ৪ ॥

কোনো কোনো জাহাজে কি যেন এক রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় হাওয়াকে ঠাণ্ডা করে সেইটে জাহাজের সর্বত্র চালিয়ে দেওয়া হয়। মনে হয়, এই রৌদ্রদগ্ধ, জ্বরতপ্ত বিরাট জাহাজরূপী লৌহদানবকে তার মা যেন ঠাণ্ডা হাত বুলিয়ে বুলিয়ে তার গায়ের জ্বালা জুড়িয়ে দিতে চান। কিন্তু পারেন কতখানি ? বরঞ্চ রেলগাড়ি প্ল্যাটফর্মে প্ল্যাটফর্মে ছায়াতে দু-দশ মিনিট ঠাণ্ডা হবার সুযোগ পায়, কিংবা উপত্যকার ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় তার গায়ে এসে পাহাড়ের ছায়া পড়ে, ঘন শালবনের ভিতর দিয়েও গাড়ি কখনো কখনো বনানীর স্নিগ্ধচ্ছায়া লাভ করে, এবং সুড়ঙ্গ হলে তো কথাই নেই—সেখানকার ঠাণ্ডা তো রীতিমত বরফের বাক্সের ভিতরকারের মতো—কিন্তু জাহাজের কপালে এসব কিছুই নেই। একে তো দিগ্‌দিগন্তব্যাপী জ্বলছে রৌদ্রের বিরাট চিতা, তার উপর সূর্য তার প্রতাপ বাড়িয়ে দিচ্ছেন সমুদ্রের জলের উপর প্রতিফলিত হয়ে। কালো চশমা পরেও তখন সেদিকে তাকানো যায় না। রাত্রে অল্প অল্প ঠাণ্ডা হাওয়া বয় বটে, কিন্তু সে ঠাণ্ডাতে গা জুড়োবার পূর্বেই দেখা দেন পূর্বাকাশে সূয্যি-মাস্টার ফের তাঁর রোদের চাবুক হাতে নিয়ে। ভগবান তাঁকে দিয়েছেন লক্ষ লক্ষ কর,

এবং সেই লক্ষ লক্ষ হাতে তিনি নিয়েছেন লক্ষ লক্ষ পাকা কঞ্চির সোনালি রঙের চাবুক। দেখা মাত্রই গায়ের সব কটা লোম কাঁটা দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের জাহাজে ঠাণ্ডা বাতাস চালানোর ব্যবস্থা ছিল না—অর্থাৎ সেটা অ্যার-কণ্ডিশনড্ নয়। কাজেই কি দিনের বেলা কি রাত্রে কখনো ভালো করে ঘুমোবার সুযোগ বঙ্গোপসাগর, আরব সমুদ্র কিংবা লাল দরিয়ায় মানুষ পায় না।

দুপুর রাত থেকে হয়তো ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে আরম্ভ করল। ডেকে বসে তুমি গা জুড়োলে। কিন্তু তখন যে কেবিনে ঢুকে বিছানা নেবে তার উপায় নেই। সেখানে ওই ঠাণ্ডা হাওয়া যেতে পারে না বলে অসহ্য গুমোট গরম। গড়ের মাঠে ঠাণ্ডা হয়ে ফিরে এসে গলিবাড়িতে ঘুমোবার চেষ্টা করার সঙ্গে এর খানিকটে তুলনা হয়।

ডেকে যে আরাম করে ঘুমোবে তারও উপায় নেই। ঘুমোলে হয়তো রাত দুটোর সময়। চারটে বাজতে না বাজতেই খালাসীরা ডেকে বালতি বালতি জল ঢেলে সেখানে যে বন্যা জাগিয়ে তোলে তার মাঝখানে মাছও ঘুমোতে পারে না। তখন যাবে কোথায়? কেবিনে ঢুকলে মনে হবে যেন রুটি বানানোর তন্দুরে—আভনে—তোমাকে রোস্ট করা হবে।

এই অবস্থা চলবে ভূমধ্যসাগর না পৌঁছনো পর্যন্ত।

তবে সান্ত্বনা এইটুকু যে, তোমাদের বয়েসী ছেলেমেয়েরা ঠাণ্ডা-গরম সম্বন্ধে আমাদের মত এতখানি সচেতন নয়। পল পার্সি তাই যখন কেবিনের ভিতর নাক ফরফরাত আমি তখন ডেকে বসে আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে থাকতুম। তখন বই পড়তে কিংবা দেশের আত্মীয়স্বজনকে চিঠি লিখতে পর্যন্ত ইচ্ছে করে না।

মাঝে মাঝে ডেক-চেয়ারেই ঘুমিয়ে পড়তুম।

একদিন কেন জানি নে হঠাৎ ঘুম ভাঙতেই সামনে দেখি এক অপরূপ মূর্তি!

ভদ্রলোক কোট-পাতলুন-টাই পরেছেন ঠিকই কিন্তু সে পাতলুন ঢিলে পাজামার চেয়েও বোধ করি চোড়া, কোট নেবে এসেছে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত আর মান-মুনিয়া দাড়ির তলায় টাইটা আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে মাত্র। ওঁর বেশ-ভূষায়—ভুল করলুম, 'ভূষা'-জাতীয় কোনো বালাই ওঁর বেশে ছিল না—অনেক কিছুই দেখবার মতো ছিল কিন্তু প্রথম দর্শনেই আমি সব কটা লক্ষ্য করি নি, পরে ক্রমে ক্রমে লক্ষ্য করে অনেক কিছুই শিখেছিলুম। উপস্থিত লক্ষ্য করলুম, তাঁর কোটে ব্রেসট্ পকেট বাদ দিয়েও আরো দু সারি ফালতো পকেট। তাই বোধ হয়, কোটটা দৈর্ঘ্যে হাঁটু পর্যন্ত নেমে এসেছে।

এঁকে তো এতদিন জাহাজে দেখি নি! ইনি ছিলেন কোথায়? তবে কি ইনি কলম্বতে উঠেছেন? তা হলেও এ দুদিন ইনি ছিলেন কোথায়?

ভদ্রলোক সোজাসুজি বললেন, 'গুড নাইট।'

বিলিতি কায়দা-কেতা যদিও আমি ভালো করে জানি নে তবু অন্তত এইটুকু

জানি যে 'গুড নাইট' ওদেশে বিদায় নেবার অভিবাদন—আমরা যে রকম যে কোনো সময় বিদায় নিতে হলে বলি, 'তবে আসি।' দেখা হওয়া মাত্রই কেউ যদি বলে, 'তবে এখন আসি' তবে বুঝব লোকটা বাঙালী নয়। তাই তাঁর 'গুড নাইট' থেকে অনুমান করলুম, ইনি যদিও বিলিতি বেশ ধারণ করেছেন তবু আসলে ভারতীয়।

আমি বললুম, 'বেঁঠিয়ে।'

আমার বাঁদিকে পার্সির শূন্য ডেক-চেয়ার। তিনি তার-ই উপরে বসে পড়ে আমাকে বললেন, 'আমার নাম আবুল্ আস্‌ফিয়া, নুর উদ্দীন, মুহম্মদ আব্দুল করীম সিদ্দীকী।'

আমার অজানাতেই আমি বলে ফেলেছিলুম 'বাপ্‌স্'। কেন, সে কথা কি আর খুলে বলতে হবে? তবু বলি।

আমি মুসলমান। আমার নাম সৈয়দ মুজতবা আলী, আমার পিতার নাম সৈয়দ সিকন্দর আলী। আমার ঠাকুরদাদার নাম সৈয়দ মুশর্‌রফ্ আলী। ভারতীয় মুসলমানের নাম সচরাচর তিন শব্দেই শেষ হয়। তাই এঁর আড়াই-গজী নামে যে আমি হকচকিয়ে যাব তাতে আর বিচিত্র কি?

বিবেচনা করি, তিনিও বিলক্ষণ জানতেন। কারণ চেয়ারে বসেই, তিনি তাঁর অন্যতম পকেট থেকে বের করলেন একটি সুন্দর সোনার কেস্। তার থেকে একটি ভিজিটিং কার্ড বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'নামটা একটু লম্বা। তাই এইটে নিন।'

আমি তো আরো অবাক। ভিজিটিং কার্ডের কেস্ হয় তা আমি জানি। কারণ ভিজিটিং কার্ড সুন্দর সুচিক্কণ। যাঁদের তা থাকে তাঁদের কেউ কেউ সেটা কেসে রাখেন। যেমন মনে করো, ইনশুওরেন্সের দালাল, খবরের কাগজের সংবাদদাতা কিংবা ভোটের ক্যানভাসার। কিন্তু ওঁদেরও তো কেস্ দেখেছি জর্মন সিলভারের তৈরী। ভিজিটিং কার্ডের সোনার কেস্ পূর্বে আমি কখনো দেখি নি।

সেই বিস্ময় সামলাতে না সামলাতেই তিনি আরেক পকেটে হাত চালিয়ে ডুবুরির মতো গভীর তল থেকে বের করলেন এক সোনার সিগারেট কেস্। ও রকম কেস্ আমি শুধু স্বপ্নে আর সিনেমায় ফিল্ম-স্টারদের হাতে দেখেছি, বাস্তবে এই প্রথম সাক্ষাৎ। ডেকের অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ আলোতেও সেটা যা ঝলমল করে উঠল তার সঙ্গে তুলনা দেওয়া যায় শুধু স্যাকরা-বাড়ি থেকে সদ্য-আসা গয়নার সঙ্গে। কেসের এক কোণে আবার কি যেন এক নীল রঙের পাথর দিয়ে আলপনা এঁকে ইংরিজি অক্ষরে ভদ্রলোকের সেই লম্বা নামের গুটি দু-তিন আদ্যক্ষর। কেস্‌টি আবার সাইজেও বিরাট। নিদেনপক্ষে ত্রিশটি সিগারেট ধরবে। আমার সামনে কেসটি খুলে ধরে আরেক পকেট থেকে বের করলেন একটি লাইটার। তার উপরে জয়পুরী মিনার কাজ। হঠাৎ দেখলে মনে হয় জমিদারবাড়ির বড় গিন্নিমার কবচ কিংবা মাদুলি।

আমার মনের ভিতর দিয়ে হুড়-হুড় করে এক পল্টন সেপাইয়ের মতো

পঞ্চাশ সার প্রশ্ন চলে গেল।

তার মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, এ রকম লজঝড় কোট-পাতলুনের ভিতর অত সব সুন্দর সুন্দর দামী দামী জিনিস লোকটা রেখেছে কেন ?

দ্বিতীয় প্রশ্ন, এমন সব দামী মাল যার পকেটে আছে, সে ফার্স্ট ক্লাসে না গিয়ে, আমার মতো গরিবের সঙ্গে টুরিস্ট্ ক্লাসে যাচ্ছে কেন ?

তৃতীয় প্রশ্ন—তা সে যাক গে। কারণ সব কটা প্রশ্নের পুরো ফর্দ এখানে দিতে গেলে আমার বাকি দিনটা কেটে যাবে। আর তোমাদেরও বুদ্ধিসুদ্ধি আছে, ভদ্রলোকের বর্ণনা শুনে তোমাদের মনেও সেই সব প্রশ্ন জাগবে যেগুলো আমার মনে জেগেছিল। তবে আর সেগুলো সবিস্তার বলি কেন ?

কিন্তু প্রশ্নগুলোর উত্তর পাই কি প্রকারে ?

তিনি বয়সে আমার চেয়ে ঢের বড়। তিনি যদি আলাপচারি আরম্ভ না করেন তবে আমি তাঁকে প্রশ্ন শুধাই কি করে ? মুরুব্বীদের আদেশ, ছেলেবেলা থেকেই শুনেছি, বড়রা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন—ছোটরা উত্তর দেবে। সে আদেশ লঙ্ঘন করব কি করে ? বিশেষ করে বিদেশে, যেখানকার কায়দা-কেতা জানিনে। সেখানে দেশের গুরুজনদের আদেশ স্মরণ করা ভিন্ন অন্য পুঁজি আছে কি ?

আধ ঘণ্টাটাক কেটে গিয়েছে। ইতিমধ্যে আমি তাঁর দু-দুটো সিগারেট পুড়িয়েছি। ফের যখন তৃতীয়টা বাড়িয়ে দিলেন তখন আমাকে বেশ দৃঢ় ভাবে 'না' বলতে হল। সঙ্গে সঙ্গে সাহস সঞ্চয় করে শুধালুম, 'আপনি যাচ্ছেন কোথায় ?'

যেন প্রশ্ন শুনতে পান নি। আমিও চাপ দিলুম না।

আমি খানিকক্ষণ পরে বললুম, 'মাফ করবেন, আমি শুতে চললুম, গুড নাইট।' বললেন, 'গুড নাইট।'

কী জানি, লোকটা কেন কথা বলে না। বোধ হয় জিভে বাত হয়েছে। কিংবা হয়তো ওর দেশে কথা বলাতেও রেশনের আইন চলে। যাক গে, কি হবে ভেবে।

পরদিন সকালবেলা পল-পার্সিকে নিয়ে আমি যখন সংসারের যাবতীয় কঠিন কঠিন প্রশ্ন এবং সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত, এমন সময় সেই ভদ্রলোক এসে আবার উপস্থিত। আমিও ওদের সঙ্গে তাঁর আলাপ করিয়ে দিতেই তিনি তাঁর আরেকটা পকেটে হাত চালিয়ে বের করলেন একরাশ সুইস চকলেট, ইংরিজী টফি এবং মার্কিন চুইংগাম্। পল-পার্সি গুটি কয়েক হাতে তুলে নিয়ে যতই বলে, 'আর না, আর না', তিনি কিন্তু বাড়ানো হাত গুটোন না। ওদিকে মুখে কোনো কথা নেই। শেষটায় বিষণ্ণ বদনে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন।

আমরা খানিকটে ইতি-উতি করে পুনরায় নিজেদের গল্পে ফিরে গেলুম। তখন দেখি, ভাষণে অরুচি হলেও তিনি শ্রবণে কিছুমাত্র পশ্চাদ্‌পদ নন। আমাদের গল্পের মাঝে মাঝে তাগমাফিক 'হুঁ', 'হাঁ', দিব্যি বলে যেতে লাগলেন। তারপর আমাদের তিনজনকে কিছুতেই 'লাইম স্কোয়াশ' খাওয়াতে না পেরে আস্তে আস্তে উঠে চলে গেলেন।

উঠে যাওয়া মাত্রই আমি পলকে শুধালুম, 'এ কি রকম চিড়িয়া হে?'

পল বললে, 'কলম্বতে উঠেছেন। পকেট-ভর্তি দুনিয়ার সব টুকিটাকি, মিষ্টি-মিঠাই। যার সঙ্গে দেখা তাকেই কিছু-না-কিছু একটা অফার করেন। কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁকে কথা বলতে শুনি নি।'

আমি বললুম, 'জিজ্ঞেস করে দেখতে হবে তো।'

পল বললে, 'উত্তর কি পাবেন?'

বললুম, 'ঠিক বলেছ, কাল রাত্রে তো পাই নি।'

এঁর সম্বন্ধে যে এত কথা বললুম, তার কারণ এঁর সঙ্গে পরে আমাদের খুব বন্ধুত্ব জমে গিয়েছিল; সে কথা সময় এলে হবে।

॥ ৫ ॥

পল বিজ্ঞ কণ্ঠে বললে, 'কলম্বো থেকে আদন বন্দর ২০৮২ মাইল রাস্তা। জাহাজে ছদিন লাগে। মাঝখানে দ্বীপ-টীপ নেই, অন্তত আমার ম্যাপে নেই। তবে আদনের ঠিক আগেই সোকোত্রা দ্বীপ। সেটা হয়তো দেখতে পাব।'

আমি বললুম, 'যদি রাত্রিবেলা ঐ জায়গা দিয়ে যাই তবে দেখবে কি করে? আর দিনের বেলা হলেও অতখানি পাশ দিয়ে বোধ হয় জাহাজ যাবে না। তার কারণ, বড় বড় দ্বীপের আশপাশে বিস্তর ছোট ছোট দ্বীপও জলের তলায় মাথা ডুবিয়ে শুয়ে থাকে। এর কোনোটার সঙ্গে জাহাজ যদি ধাক্কা খায় তবে আর আমরা সামনের দিকে এগব না—এগিয়ে যাব তলার দিকে।'

এদিকে কথা বলে যাচ্ছি, ওদিকে আমার বার বার মনে হতে লাগল, সোকোত্রা নামটা যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। হঠাৎ আমার মাথার ভিতর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। আমার বাবার মাসী, মেসোমশাই তাঁদের দুই ছেলেকে নিয়ে গত শতকের শেষের দিকে মক্কায় হজ করতে গিয়েছিলেন এবং আমার খুব ছেলেবেলায় তাঁর কাছ থেকে সে ভ্রমণের অনেক গল্প আমি শুনেছিলুম। আমার এই দাদীটি ছিলেন গল্প বলায় ভারি ওস্তাদ। রাত্রির রান্না না হওয়া পর্যন্ত তিনি আমাদের গল্প বলে বলে দিব্য জাগিয়ে রাখতে পারতেন এবং যেই চাচীরা খবর দিতেন, রান্না তৈরী, অমনি তিনি বেশ কায়দা করে গল্পটা শেষ করে দিতে পারতেন। আমরা টেরই পেতুম না, আমাদের সামনে তিনি একটা ন্যাজকাটা হনুমান রেখে চলে গেলেন। আমাদের মনে হত গল্পটা যেন একটা আস্ত ডানাকাটা পরী।

সেই দাদীর মুখে শুনেছিলুম, সোকোত্রার কাছে এসে নাকি যাত্রীদের মুখ শুকিয়ে যেত। জলের স্রোতের তোড়ে আর পাগলা হাওয়ার থাবড়ায় জাহাজ নাকি হুড়মুড়িয়ে গিয়ে পড়ত কোনো একটা ডুবন্ত দ্বীপের ঘাড়ে আর হয়ে যেত হাজারো টুকরোয় খানখান। কেউ বা জাহাজের তক্তা, কেউ বা ডুবন্ত দ্বীপের শ্যাওলা-মাখানো পাথর আঁকড়ে ধরে প্রাণপণ চিৎকার করত 'বাঁচাও, বাঁচাও',

কিন্তু কে বাঁচায় কাকে, কোথায় আলো, কোথায় তীর ! ক্রমে ক্রমে তাদের হাতের মুঠি শিথিল হয়ে আসত, একে একে জলের তলে লীন হয়ে যেত।

দাদী যে ভাবে বর্ণনা দিয়ে যেতেন, তাতে আমি সব কিছু ভুলে দুশ্চিন্তায় আকুল হয়ে উঠতুম, দাদী বাঁচলেন না, দাদীও ডুবে গেলেন ! মনেই হত না, জলজ্যান্ত দাদী আমাকে কোলে বসিয়ে গল্প বলছেন। শেষটায় বলতেন, 'আমাদের জাহাজের কিছু হয় নি, এ সব ঘটেছিল অন্য জাহাজে। সে জাহাজে করে গিয়েছিলেন তোর বন্ধু ময়না মিয়ার ঠাকুর্দা। জানিস তো, তিনি আর ফেরেন নি। খুদাতালা তাঁকে বেহেশ্‌তে নিয়ে গিয়েছেন। মক্কার হজের পথে কেউ যদি মারা যায় তবে তার আর পাপ-পুণ্যের বিচার হয় না, সে সোজা স্বর্গে চলে যায়।

দাদী এ রকম গল্প বলে যেতেন অনেকক্ষণ ধরে আর একই গল্প বলতে পারতেন বহুবার। প্রতিবারেই মনে হত চেনা গল্প অচেনা রূপে দেখছি। কিংবা বলতে পারো, দাদী-বাড়ির রাঙা বৌদিকে যেন কখনো দেখছি রাস-মণ্ডল শাড়িতে, কখনো বুলবুল চশ্‌মে। (হায়, এ সব সুন্দর সুন্দর শাড়ি আজ গেল কোথায় !)

দাদীর গল্পের কথা আজ যখন ভাবি তখন মনে হয় দাদী তাঁর বর্ণনাতে আরব্য উপন্যাসের সাহায্য বেশ কিছু নিতেন। আরব্য উপন্যাসের রকম-বেরকমের গল্পের মধ্যে সমুদ্রযাত্রা, জাহাজডুবি, অচেনা দেশ, অজানা দ্বীপ সম্বন্ধে গল্প বিস্তর। সিন্দবাদ নাবিকের গল্প পড়ে মনে হয়, জলের পীর বদর সাহেব যেন আইন বানিয়ে দিয়েছিলেন, যে জাহাজ ডুববে সেটাতেই যেন সিন্দবাদ থাকে।

আরব্য উপন্যাসে যে এত সমুদ্র-যাত্রার গল্প, তার প্রধান কারণ, আরবরা এক কালে সমুদ্রের রাজা ছিল আজ যে রকম মার্কিন-ইংরেজের জাহাজ পৃথিবীর বন্দরে বন্দরে দেখা যায়। তার কারণ বুঝতে কিছুমাত্র বেগ পেতে হয় না। আরব দেশের সাড়ে তিন দিকে সমুদ্র, তাই আরবরা সমুদ্রকে ডরায় না, আমরা যে রকম পদ্মা-মেঘনাকে ডরাই নে, যদিও পশ্চিমারা গোয়ালন্দের পদ্মা দেখে হনুমানজীর নাম স্মরণ করতে থাকে—বোধ হয় লম্ফ দিয়ে পেরবার জন্য। আরবদের পূর্বে ছিল রোমানরা বাদ্‌শা—আরবরা তাদের যুদ্ধে হারিয়ে ক্রমে ক্রমে তাদেরই মতো অবাধে অনায়াসে সমুদ্র যাতায়াত আরম্ভ করল। ম্যাপে দেখতে পাবে, মক্কা সমুদ্র থেকে বেশী দূরে নয়। আরবরা তখন লাল দরিয়া পেরিয়ে মৌসুমী হাওয়ায় ভর করে ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্যবসা জুড়ল।

এ সব কথা ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ আবার সোকোত্রার কথা মনে পড়ে গেল। দাদীমার সোকোত্রা স্মরণ করিয়ে দিল গ্রীকদের দেওয়া সোকোত্রার নাম 'দিয়োস্‌কোরিদেস্‌', সঙ্গে সঙ্গে হুশ-হুশ করে মনে পড়ে গেল যে পণ্ডিতেরা বলেন, এই 'দিয়োস্‌কোরিদেস্‌' নাম এসেছে সংস্কৃত 'দ্বীপ-সুখাধার' থেকে। আরবরা যখন এই দ্বীপে প্রথম নামল তখন ভারতীয় বোম্বেটেদের সঙ্গে এদের

লাগল ঝগড়া। সে ঝগড়া কত দিন ধরে চলছিল বলা শক্ত, কারণ আমাদের সমাজপতিরা তখন সমুদ্রযাত্রার বিরুদ্ধে কড়া কড়া আইন জারি করতে আরম্ভ করেছেন। আমার মনে হয়, এদেশ থেকে কোনো সাহায্য না পাওয়াতে এরা ক্রমে ক্রমে লোপ পেয়ে যায়, কিংবা ঐ দেশের লোকের সঙ্গে মিলে মিশে গিয়ে এক হয়ে যায়—যে রকম শ্যাম, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে বহু শতাব্দীর আদান-প্রদানের পর এক দিন আমাদের যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। খুব সম্ভব ঐ সমুদ্রযাত্রা নিষেধ করারই ফলে। ভারতীয়েরা কিন্তু সোকোত্রায় তাদের একটি চিহ্ন রেখে গিয়েছে; সোকোত্রার গাই-গোরু জাতে সিন্ধু দেশের। আশ্চর্য, সভ্যতার ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় কিন্তু তার পোষা গোরু-ঘোড়া শতাব্দীর পর শতাব্দী বেঁচে থেকে তার প্রভুর কথা চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। মোগল-পাঠানের রাজত্ব ভারতবর্ষ থেকে কবে লোপ পেয়ে গিয়েছে কিন্তু তাদের আনা গোলাপ ফুল আমাদের বাগানে আরো কত শত বৎসর রাজত্ব করবে কে জানে!

আমি চোখ বন্ধ করে আত্মচিন্তায় মগ্ন হলেই পল-পার্সি আস্তে আস্তে চেয়ার ছেড়ে অন্য কিছু একটায় লেগে যেত। আমি তাদের সন্ধানে বেরিয়ে দেখি, তারা লাউঞ্জে বসে চিঠি লিখছে। আমাকে দেখে পার্সি শুধালে, 'জাহাজে যে ফরাসী ডাক-টিকিট পাওয়া যায় তাই দিয়ে এ চিঠি চীন দেশে যাবে তো?'

আমি বললুম, 'নিশ্চয়। এমন কি জিবুটি বন্দরের ডাকঘরেও যদি ছাড় তবু যাবে। কারণ জিবুটি বন্দর ফরাসীদের। কিন্তু যদি পোর্টসঈদ বন্দরে ছাড় তবে টিকিট মিশর দেশে বাতিল বলে চিঠিখানা যাবে বেয়ারিং পোস্টে।'

'কিন্তু যদি পোর্টসঈদে পৌঁছে জাহাজের লেটার-বকসে ছাড়ি?'

'তা হলে ঠিক।'

তারপর বললুম, 'হুঁ। তবে বন্দরে নেমে মিশরী ডাক-টিকিট লাগানোই ভালো।'

'কেন, স্যার?'

আমি বললুম, 'বৎস, আমার বিলক্ষণ স্মরণ আছে, চীন দেশে তোমার একটি ছোট বোন রয়েছে। সে নিশ্চয়ই ডাক-টিকিট জমায়। তুমি যদি বন্দরে বন্দরে ফরাসী টিকিট সাঁটো তাতে তার কি লাভ? মিশরী টিকিট পেলে কি সে খুশী হবে না? তাও আবার দাদার চিঠিতে!'

পার্সি আবার ভ্যাচর-ভ্যাচর আরম্ভ করলে—চুলকাটা সমস্যার সমাধান যখন আমি করে দিয়েছিলুম ঠিক সেই রকম—আমার সঙ্গে দেখা না হলে—

আমি বললুম, 'ব্যস, ব্যস। আর শোনো স্ট্যাম্প লাগাবার সময়, এক পয়সা, দু পয়সা, এক আনা, ছ পয়সা করে চোদ্দ পয়সার টিকিট লাগাবে—দুম করে সুদ্ধ একটা চোদ্দ পয়সার টিকিট লাগিয়ো না। বোন তাহলে এক ধাক্কাতেই অনেকগুলো টিকিট পেয়ে যাবে।'

ততক্ষণে পল এসে আমার সঙ্গ নিয়েছে। আস্তে আস্তে শুধাল, 'সোকোত্রা দ্বীপের কথা ওঠাতে আপনি কি ভাবছিলেন?'

আমি বললুম, 'অনেক কিছু।' এবং তার খানিকটে তাকে শুনিয়ে দিলুম।

পল দেখেছি পার্সির মতো সমস্তক্ষণ এটা-ওটা নিয়ে মেতে থাকে না। মাঝে মাঝে জাহাজের এক কোণে বসে বই-টই পড়ে। তাই খানিকক্ষণ চুপ করে আমার কথাগুলো হজম করে নিয়ে বলল, 'বিষয়টা সত্যি ভারি ইনট্রেস্টিঙ্। সমুদ্রে সব প্রথম কে আধিপত্য করলে, তার পর কে, তারাই বা সেটা হারাল কেন, আজ যে মার্কিন আর ইংরেজ আধিপত্য করছে সেটাই বা আর কত দিন থাকবে? এবং তার পর আধিপত্য পাবে কে?'

আমি একটু ভেবে বললুম, 'বোধ হয় আফ্রিকার নিগ্রোরা। ফিনিশিয়ান, গ্রীক, রোমান, ভারতীয়, চীনা, আরব, পোর্তুগীজ, ওলন্দাজ ইত্যাদি যাবতীয় জাতই তো পালা করে রাজত্ব করলে—একমাত্র ওরাই বাদ গেছে। এখন বোধ হয় ওদের পালা। আর ম্যাপে দেখছ তো, কী বিরাট মহাদেশ, ওতে কোটি কোটি লম্বা-চওড়া স্বাস্থ্যবান স্ত্রী-পুরুষ গম্‌গম্ করছে।'

পল বললে, 'কিন্তু ওদের বুদ্ধিসুদ্ধি?'

আমি বললুম, 'সে তো দুই পুরুষের কথা। লেগে গেলে একশ বছরের ভিতর একটা জাত অন্য সব কটা জাতকে হারিয়ে দিতে পারে। বরঞ্চ পুরনো সভ্য জাত যারা আধ-মরা হয়ে গিয়েছে, তাদের নূতন করে বলিষ্ঠ প্রাণবন্ত করে রাজার আসনে বসানো কঠিন। একবার ছাঁচে ঢালাই করে যে মাল তৈরী করা হয়েছে তাকে ফের পিটে-ঠুকে নূতন আকার দেওয়া কঠিন—সেই তো হচ্ছে আজকের দিনের চীনা, ভারতীয় এবং আরো মেলা প্রাচীন জাতের নূতন সমস্যা।'

পল জিজ্ঞেস করলে, 'ভারতীয়েরাও এককালে সমুদ্রে রাজত্ব করেছে নাকি?'

আমি বললুম, সে-কথা আজ প্রায় সবাই ভুলে গিয়েছে। কিন্তু সেজন্য তাদের দোষ দেওয়া অনুচিত। কারণ, ভারতীয়েরা নিজেই সে ইতিহাসের সন্ধান রাখে না। অথচ আমার যতদূর জানা, তাতে তারা লাল দরিয়া থেকে চীনা সমুদ্র পর্যন্ত ব্যবসা-বাণিজ্য করেছে শ্যাম, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়াতে রাজত্বও করেছে। তার পর একদিন আমাদের সমাজপতিরা সমুদ্রযাত্রা বারণ করে দিলেন। খুব সম্ভব আমাদের সাম্রাজ্য বিস্তার তাঁরা পছন্দ করেন নি। তাই হয়তো তাঁরা বলতে চেয়েছিলেন, যে-দেশ জয় করেছ তারই আর পাঁচ জনের সঙ্গে মিলে-মিশে এক হয়ে যাও, আপন দেশে ফিরে আসার কোনো প্রয়োজন নেই।'

পল বললে, 'আমার জীবনের এই ষোল বৎসর কাটল চীনে কিন্তু ভারতের সঙ্গে চীনের কখনো কোনো যোগ হয়েছিল বলে শুনি নি। শুধু শুনেছি বৌদ্ধধর্ম ভারত থেকে এসেছিল। কিন্তু সে তো কটমটে ব্যাপার!'

আমি বললুম, 'অতিশয়। ও পাড়া মাড়িয়ো না। কিন্তু চীন-ভারতের মধ্যে একবার একটি ভারি চমৎকার মজাদার দোস্তি হয়েছিল। শুনবে?'

পল বললে, 'তা আর বলতে! কিন্তু পার্সিটা গেল কোথায়? কুকুর-ছানার মতো ও যেন সমস্তক্ষণ নিজের ল্যাজ খুঁজে বেড়ায়। ওরে ও পার্সি!'

জিরাফ-কাহিনী

দিল্লীতে যখন পাঠান-মোগল রাজত্ব করত তখন সামান্যতম সুযোগ পেলেই বাঙলা দেশ স্বাধীন হয়ে যাবার চেষ্টা করত। বাঙলার প্রধান সুবিধে এই যে, সেখানে নদী-নালা বিল-হাওর বিস্তর এবং পাঠান-মোগলের আপন পিতৃভূমি কিংবা দিল্লীতে ও-সব জিনিস নেই বলেই তারা যখনই বিদ্রোহ দমন করতে এসে বাঙলার জল দেখত তখনই তাদের মুখে জল যেত শুকিয়ে। দেশটা পিছলে, অভ্যাস না থাকলে দাঁড়ানো কঠিন।

এই রকম একটা সুযোগ পেয়ে বাঙলার এক শাসন-কর্তা স্বাধীন হয়ে রাজা হয়ে যান। রাজাটি একটু খামখেয়ালি ছিলেন। তা না হলে কোথায় ইরান আর কোথায় বাঙলা দেশ! তিনি সেখানে দূত পাঠালেন বিস্তর দামী দামী সওগাত সঙ্গে দিয়ে ইরানের সব চেয়ে সেরা কবি হাফিজকে বাঙলা দেশে নিমন্ত্রণ করার জন্য। চিঠিতে লিখলেন, 'হে কবি, তোমার সুমধুর তথা উদাত্ত কণ্ঠে তামাম ইরান দেশ ভরে গিয়েছে। ইরান ক্ষুদ্র দেশ, তোমার কণ্ঠস্ফূর্তির জন্য সেখানে আর স্থান নেই। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষ বিরাট দেশ, এখানে এস, তোমার কণ্ঠস্বর এখানে প্রচুর জায়গা পাবে।' তার সরল অর্থ, ইরানে আর কটা লোক তোমার সত্যকার কদর করতে পারবে? এ-দেশের লোকসংখ্যা প্রচুর। এইখানে চলে এস।

হাফিজের তখন বয়স হয়েছে। তাঁর বুড়ো হাড়-কখানা তখন আর দীর্ঘ ভ্রমণ আর দীর্ঘতর প্রবাসের জন্য দেশ ছাড়তে নারাজ। তাই কবি একটি সুন্দর কবিতা লিখে না আসতে পারার জন্য বিস্তর দুঃখ প্রকাশ করলেন।

বাঙলা দেশের সরকারী দলিল-দস্তাবেজে এ ঘটনার কোনো উল্লেখ নাই। এর ইতিহাস পাওয়া গিয়েছে ইরানের খাতাপত্র থেকে[১]।

তার পরের রাজার দৃষ্টি গেল সেই সুদূর চীন দেশের দিকে। কিন্তু চীন সম্রাটকে তো আর বাঙলা দেশে নিমন্ত্রণ করা যায় না? কাজেই রাজদূতকে বহু উত্তম উপঢৌকন দিয়ে চীনের সম্রাটকে বাঙলার রাজার আনন্দ-অভিবাদন জানালেন।

চীন-সম্রাট সুদূর বাঙলা দেশের রাজার সৌজন্য-ভদ্রতার পরিচয় পেয়ে পরম আপ্যায়িত হলেন। চীন বিত্তশালী দেশ। প্রতিদানে পাঠালেন আরো বেশী মূল্যবান উপঢৌকন। সে রাজা কিন্তু ততদিনে রাজার রাজার দেশে চলে গিয়েছেন।

নূতন রাজা তখন ভাবলেন, চীনের সম্রাটকে আমি কি দিতে পারি যা তাঁর নেই! রাজদূতকে মনের কথা খুলে তাঁর উপদেশ চাইলেন। রাজদূতটি

১। এককালে বাঙলা দেশে প্রচুর হাফিজ পড়া হত। এখনও কেউ কেউ 'নেত্র নাই বাঞ্ছা হেরি বিধুর বদন, কর্ণ নাই, চাই শুনি ভ্রমর গুঞ্জন' 'সদ্ভাব শতক'-এর বাঙলা অনুবাদ পড়েন। হাফিজের সব চেয়ে উত্তম বাঙলা অনুবাদ করেছেন কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

ছিলেন অতিশয় বিচক্ষণ লোক। তিনি যখন চীনে ছিলেন তখন চীন দেশের আচার-ব্যবহার বিশ্বাস-অবিশ্বাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করেছিলেন। বললেন, 'চীনের বহু লোকের বিশ্বাস, গাছের চেয়ে উঁচু মাথাওলা যে এক পয়মন্ত প্রাণী আছে সে যদি কখনো চীন দেশে আসে তবে সে দেশের শস্য তার-ই মাথার মতো উঁচু হবে।

রাজা শুধালে, 'কি সে প্রাণী?'

রাজদূত বললেন, 'জিরাফ। আফ্রিকাতে পাওয়া যায়।'

রাজা বললেন, 'আনাও আফ্রিকা থেকে।'

যেন চাট্টিখানি কথা! কোথায় বাঙলা দেশ, আর কোথায় আফ্রিকা! আজ যে এই বিরাট বিরাট কলের জাহাজ দুনিয়ার সর্বত্র আনাগোনা করে, তার-ই একটাতে জিরাফ পোরা কি সহজ! তখনকার দিনের পালের জাহাজে আফ্রিকা থেকে বাঙলা দেশ, সেখান থেকে আবার চীন—ক'মাস, কিংবা ক-বছর লাগবে কে জানে? ততদিন তার জন্য ঐ অকূল দরিয়ায় ঘাস-পাতা পাবে কোথায়—দেখতি পাচ্ছি এই কলের জাহাজেই আমাদের শাক-সবজী স্যালাড্ খেতে দেয় অল্প—তার অন্যান্য তদারকি কি সহজ?

তখনকার দিনে আরব কারবারীরা আফ্রিকা, সোকোত্রা, সিংহল হয়ে বাঙলা দেশে ব্যবসা করতে যেত। রাজা হুকুম দিলেন, 'জিরাফ নিয়ে এস।'

জিরাফ এল। কি খেয়ে এল, কত দিনে এল, কিছুই বলতে পারব না। রাজা জিরাফ দেখে ভারি খুশী। হুকুম দিলেন, 'চীন সম্রাটকে ভেট দিয়ে এস।'

সেই চীন! জাহাজে করে! কত দিন লাগল কে জানে!

চীন-সম্রাট সংবাদ পেয়ে যে কতখানি খুশী হয়েছিলেন তার খানিকটে কল্পনা করা যায়। তিনি হুকুম দিলেন, প্রাণীটার জন্য খুব উঁচু করে আস্তাবল বানাও।

বলা তো যায় না, তার মুণ্ডুটা মেঘে ঠেকবে, না চাঁদে ঠোক্কর লাগাবে!

দীর্ঘ ভ্রমণের পর জিরাফ যখন জিরিয়ে-জুরিয়ে তৈরী তখন শুভদিন শুভক্ষণ দেখে,চীন-সম্রাট পাত্র-অমাত্য-সভাসদসহ শোভাযাত্রা করে জিরাফদর্শনে বেরলেন। সঙ্গে নিলেন, বিশেষ করে, রাজচিত্রকর এবং সভাকবি।

সম্রাট জিরাফ দেখে গভীর আনন্দ লাভ করলেন। সভাসদ ধন্য ধন্য করলেন। আপামর জনসাধারণ গভীরতর সন্তোষ লাভ করল,—তাদের গুরুজন বলেছিলেন যে এ রকম অদ্ভুত প্রাণী পৃথিবীতে আছে, এবং সে একদিন চীন দেশে আসবে, সেটা কিছু অন্যায় বলেন নি। যারা সন্দেহ করত তাদের মুণ্ডু-গুলো এখন টেনে টেনে ঐ জিরাফের মুণ্ডুটার মতো উঁচু করে দেওয়া উচিত।

সম্রাট চিত্রকরকে আদেশ দিলেন, 'এই শুভদিবস চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য তুমি এই জিরাফের একটি উত্তম চিত্র অঙ্কন করো!'

ছবি আঁকা হল।

সম্রাট কবিকে আদেশ করলেন, 'তুমি এই শুভ অনুষ্ঠানের বর্ণনা ছন্দে বেঁধে ছবিতে লিখে রাখো।'

তাই করা হল।

গল্প শেষ করে বললুম, 'সে ছবির প্রিন্ট আমি কাগজে দেখেছি।'

পল শুধালে, 'স্যর, আপনি কি চীনা ভাষা পড়তে পারেন?'

আমি বললুম, 'আদপেই না। আমার এক বন্ধু চীনা শিখেছে সে-ভাষাতে বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ পড়ার জন্য। জানো তো, আমাদের বহু শাস্ত্র এ দেশে বৌদ্ধধর্ম লোপ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হয়ে যায়, কিন্তু চীনা অনুবাদে এখনো বেঁচে আছে। আমার বন্ধু বৌদ্ধ শাস্ত্র খুঁজতে খুঁজতে এই অদ্ভুত কাহিনীর সাক্ষাৎ পায়। তারই বাঙলা অনুবাদ করে, ছবিসুদ্ধ সেটা বাঙলা কাগজে ছাপায়। তা না হলে বাঙলা দেশের লোক কখনো এ কাহিনী জানতে পারত না, কারণ বাঙলা দেশে এ-সম্বন্ধে কোনো ইতিহাস বা দলিল-পত্র নেই।

পার্সি বললে, 'কিন্তু স্যর, এটা তো ইতিহাসের মতো শোনাল না! এ যে গল্পকে ছাড়িয়ে যায়।'

আমি বললুম, 'কেন বৎস, তোমার মাতৃভাষাতেই তো রয়েছে, 'ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান্ ফিক্‌শন্' - সত্য ঘটনা গল্পের চেয়েও চমকপ্রদ।'

এবং আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস যে ঘটনার বর্ণনা মানুষকে গল্পের চেয়েও বেশী সজাগ করে না তুলতে পারে, সে ঘটনার কোনো ঐতিহাসিক মূল্য নেই। কিংবা বলব, যে লোক ঘটনাটার বর্ণনা দিয়েছে সে সত্যকার ঐতিহাসিক নয়। আমার দেশে এ রকম কাঠখোট্টা ঐতিহাসিক বেশী।

॥ ৬ ॥

কলরব, চিৎকার, তারস্বরে আর্তনাদ! কি হল, কি হয়েছে? তবে কি জাহাজে বোম্বেটে পড়েছে? বায়স্কোপে যে রকম দেখি, বোম্বেটেরা দু হাতে দুই পিস্তল, দুপাটি দাঁতে ছোরা কামড়ে ধরে লাফিয়ে লাফিয়ে এক জাহাজ থেকে আরেক জাহাজ আক্রমণ করে? তার পর হঠাৎ কানের পর্দা ফাটিয়ে এক ভয়ংকর প্রলয়ংকর বিস্ফোরণ—বারুদ-গোদামে আগুন লেগে সেটা ফেটে গিয়েছে। তারই আগুন জাহাজের দড়াদড়ি পাল-মাস্তুলে লেগে গিয়ে সমস্ত জাহাজ দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠেছে।

নাঃ! স্বপ্ন। বাঁচলুম। সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গিয়েছে। চোখ মেলতে দেখি, কেবিনের সব কটা আলো জ্বলছে আর সামনে দাঁড়িয়ে পল আর পার্সি। পল দাঁড়িয়ে আছে সত্যি কিন্তু পার্সিটা জুলু না হটেনটট্ কি যেন এক বিকট আফ্রিকান নৃত্য জুড়েছে—আফ্রিকান-ই হবে, কারণ ঐ মহাদেশেরই গা ঘেঁষে তো এখন আমরা যাচ্ছি।

তা আফ্রিকার হটেনটটীয় মার্তণ্ড-তাণ্ডব নৃত্যই হোক আর ইয়োরোপীয় মাৎসুর্কা কিংবা ল্যামবেথ-উয়োক্-ই হোক—আমি অবশ্য এ দুটোর মধ্যে কোনো পার্থক্যই দেখতে পাই নে, সঙ্গীতে তো আদৌ না—পার্সি এ সময়ে

আমার কেবিনে এসে বিনা-নোটিশে নাচ জুড়বে কেন ?

নাঃ, নাচ নয়। বেচারী উত্তেজনায় তিড়িং-বিড়িং করছে আর যে কাতর রোদন জানাচ্ছে সেটার 'সামারি' করলে দাঁড়ায় ;—

'হায়, হায়, সব কিছু সাড়ে-সর্বনাশ হয়ে গেল, স্যর! আপনি এখনো অকাতরে নাক ডাকাচ্ছেন। আমার জীবন বিফল হল, পলের জীবনও বৃথায় গেল। জাহাজ রাতারাতি ডুবসাঁতার কেটে জিবুটি বন্দরে পেঁছে গিয়েছে। সবাই জামা-কাপড় পরে, ব্রেকফাস্ট খেয়ে পারে নামবার জন্য তৈরী, আর আপনি,—হায়, হায়!'

(এ বইখানার যদি ফিল্ম্ হয় তবে এ স্থলে 'অশ্রুবর্ষণ ও ঘন ঘন দীর্ঘ-নিশ্বাস')

আমি চোখ বন্ধ করলুম দেখে পার্সি এবারে ডুকরে কেঁদে উঠল।

আমি শান্ত কণ্ঠে শুধালুম, 'জাহাজ যদি জিবুটি পেঁছে গিয়ে থাকে তবে এখনো এঞ্জিনের শব্দ শুনতে পারছি কেন ?

পার্সি অসহিষ্ণুতা চাপবার চেষ্টা করে বললে, 'এঞ্জিন বন্ধ করা না-করা তো এক মিনিটের ব্যাপার।'

আমি বললুম, 'নৌ-ভ্রমণে আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা বলে, এঞ্জিন বন্ধ হওয়ার পরও জাহাজ থেকে নামতে নামতে ঘণ্টা দুয়েক কেটে যায়।'

পল এই প্রথম মুখ খুললে ; বললে, 'বন্দর যে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।'

আমি বললুম, 'দার্জিলিং থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার চুড়োটা স্পষ্ট দেখা যায়, তাই বলে কি সেখানে দশ মিনিটে পেঁছানো যায় ?'

তার পর বললুম, 'কিন্তু এ সব কুতর্ক। আমি হাতে-নাতে আমার বক্তব্য প্রমাণ করে দিচ্ছি।'

তার পর অতি ধীরে-সুস্থে দাড়ি কামাতে আরম্ভ করলুম। পল আমার কথা শুনে অনেকখানি আশ্বস্ত হয়েছে কিন্তু পার্সি তখনো ব্যস্ত-সমস্ত। আমাকে তাড়া লাগাতে গিয়ে দাড়ি কামানোর বুরুশটা এগিয়ে দিতে গিয়ে তুলে ধরে দাঁতের বুরুশ—ঐটে দিয়ে গাল ঘষলে মুখপোড়া হনুমান হতে কতক্ষণ—টাই ভেবে সামনে ধরে ড্রেসিং গাউনের কোমরবন্ধটা। তারপর চা-রুটি, মাখম-আণ্ডাতে অপূর্ব এক ঘঁ্যাট বানিয়ে আমার সামনে ধরে চতুর্দিকে ঘোরপাক খেতে লাগল—বাড়িতে জিনিসপত্র বাঁধাই-ছাঁদাই করার সময় পাপিটা যে রকম এর পা ওর পার ভিতর দিয়ে ঘোরপাক খায় এবং বাড়িসুদ্ধ লোককে চটিয়ে তোলে।

শেষটায় বেগতিক দেখে আমিও একটু তাড়াহুড়ো করে সদলবলে ডেকে এলুম

উপরে তখন আর সবাই অপেক্ষা করে করে ক্লান্ত হয়ে তাস পাশা, গালগল্পে ফিরে গিয়েছে।

পল চোখে দুরবীন লাগিয়ে বললে, 'কই, স্যর, বন্দর কোথায় ? আমি তো দেখতে পাচ্ছি, ধু-ধু করছে মরুভূমি আর টিনের বাক্সের মতো কয়েক সার এক-

ঘেয়ে বাড়ি।' -

আমি বললুম, 'এর-ই নাম জিবুটি বন্দর।'

'ঐ মরুভূমিতে দেখবার মতো আছে কি ?'

'কিচ্ছু না। তবে কি জানো, ভিন্‌দেশ পরদেশের ভিতর দিয়ে যাবার সময় অত-শত বাছবিচার করতে নেই—বিশেষত এই অল্প বয়সে। চিড়িয়াখানায় যখন ঢুকেছ, তখন বাঘ-সিংগিও দেখার সঙ্গে সঙ্গে খটাশটাও দেখে নেওয়াই ভালো। আর কে জানে, কোন্ মোড় ঘুরতে কোন্ এক অপ্রত্যাশিত জিনিস বা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হবে না ? মোকামে পৌঁছনোর পর না হয় জমা-খরচ করা যাবে, কোন্‌টা ভালো লাগল আর কোন্‌টা লাগল না।'

জাহাজ থেকে তড়-তড় করে সিঁড়ি ভেঙে ডাঙায় নামা যায় পৃথিবীর ভালো ভালো বন্দরেই। এখানে তাই পারে যেতে হল মোটর লঞ্চ করে। জিবুটির চেয়েও নিকৃষ্ট বন্দর পৃথিবীতে হয়তো আছে কিন্তু আমার দেখার মধ্যে ঐটেই সব চেয়ে অপ্রিয়দর্শন ও বৈচিত্র্যহীন বন্দর। মরুভূমির প্রত্যন্ত-ভূমিতে বন্দরটি গড়ে তোলা হয়েছে একমাত্র রাজ্যবিস্তারের লোভে। এবং এ মরুভূমিকে কোনো প্রকারের শ্যামলিমা দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব জেনেই কেউ কোনোদিন কণামাত্র চেষ্টা করে নি একে একটুখানি আরামদায়ক করার।

ডাঙা থেকে সোজা চলে গিয়েছে একটা ধুলোয় ভর্তি রাস্তা বন্দরের চৌক বা ঠিক মাঝখানে। তার পর সেখান থেকে এদিকে ওদিকে দু-চারটে রাস্তা গিয়েছে বটে কিন্তু বড় রাস্তাটা দেখার পর ও-সব গলিতে ঢোকার প্রবৃত্তি সুস্থলোকের হওয়ার কথা নয়। বড় রাস্তার দুদিকে সাদা চুনকাম-করা বাড়িগুলো এমনি মুখ গুমসো করে দাঁড়িয়ে আছে যে, বাড়ির বাসিন্দারাও বোধ করি এ-সব বাড়িতে ঢোকার সময় দোরের গোড়ায় দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ শুকনো ঢোক গেলে কিংবা বাঁ হাত দিয়ে ঘাড়ের ডান দিকটা চুলকে নেয়। ছোট গলির মুখে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখি, মাটির তৈরী দেয়াল-ছাদের ছোট ছোট ঘর, না, ঘর নয়, গহ্বর কিংবা গুহাও বলতে পারো। বৃষ্টি এদেশে এতই ছিটেফোঁটা হয় যে, ছাত গলে গিয়ে পড়ে যাবার সম্ভাবনা নেই। আর থাকলেই বা কি, এদেশে তো আর ঘাস-পাতা গজায় না যে তাই দিয়ে চাল বানাবে ?

এর-ই ভিতরে মানুষ থাকে, মা ছেলেকে ভালোবাসে, তাই ভাইকে স্নেহ করে, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ সবই হয়।

কিন্তু আমি এত আশ্চর্য হচ্ছি কেন ? আমি কি কখনো গলির ঘিঞ্জি বস্তির ভিতর ঢুকি নি—কলকাতায় ? সেখানে দেখি নি কী দৈন্য, কী দুর্দশা ! তবে আজ এখানে আশ্চর্য হচ্ছি কেন ? বোধ হয় বিদেশে এ জিনিস প্রত্যাশা করি নি বলে, কিংবা দেশের দৈন্য দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি বলে বিদেশে তার অন্য রূপ দেখে চমকে উঠলুম।

এইখানেই মহামানব এবং হীনপ্রাণে পার্থক্য ! মহাপুরুষরা দৈন্য দেখে

কখনো অভ্যস্ত হন না। কখনো বলেন না, এ তো সর্বত্রই হচ্ছে, অহরহ হচ্ছে, ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি। দৈন্য তাঁদের সব সময়ই গভীর পীড়া দেয়— যদিও আমরা অনেক সময় তাঁদের চেহারা দেখে সেটা বুঝতে পারি নে। তার পর একদিন তাঁরা সুযোগ পান, যে সুযোগের প্রতীক্ষায় তাঁরা বছরের পর বছর প্রহর গুনছিলেন, কিংবা যে সুযোগ তাঁরা ক্ষণে ক্ষণে দিনে দিনে আপন হাতে গড়ে তুলছিলেন, এবং এরই বর্ণনা দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

"অখ্যাত অজ্ঞাত রহি দীর্ঘকাল হে রাজবৈরাগী, গিরিদরী-তলে
বর্ষার নির্ঝর যথা শৈল বিদারিয়া উঠে জাগি পরিপূর্ণ বলে
সেই মত বাহিরিলে ; বিশ্বলোক ভাবিলে বিস্ময়ে যাহার পতাকা
অম্বর আচ্ছন্ন করে এত কাল এত ক্ষুদ্র হয়ে কোথা ছিল ঢাকা ॥"

তাই যখন হঠাৎ একদিন এক অরবিন্দ ঘোষ, এক চিত্তরঞ্জন দাশ এসে আমাদের মাঝখানে দেখা দেন তখন আমাদের আর বিস্ময়ের অবধি থাকে না। আজন্ম, আশৈশব, অনটনমুক্ত বিলাসে জীবন যাপন করে হঠাৎ একদিন তাঁরা সব কিছু বিসর্জন করে গিয়ে দাঁড়ান গরীব দুঃখী, আতুর অভাজনের মাঝখানে। যে দৈন্য দেখে ভিতরে ভিতরে গভীর বেদনা পেতেন, সে দৈন্য ঘুচাতে গিয়ে তাঁরা তখন পান গভীরতর বেদনা। কিন্তু সত্যের জয় শেষ পর্যন্ত হবেই হবে।

"—তাই উঠে বাজি
জয়শঙ্খ তাঁর ? তোমার দক্ষিণ করে
তাই কি দিলেন আজি কঠোর আদরে
দুঃখের দারুণ দীপ আলোক যাহার
জ্বলিয়াছে বিদ্ধ করি দেশের আঁধার
ধ্রুবতারকার মতো। জয় তব জয়।"

কিন্তু এত সব কথা তোমাদের শোনাচ্ছি কেন ? তার কারণ গত রাত্রে জাহাজে বসে বসে আফ্রিকা মহাদেশ এবং বিশেষ করে যে সোমালি দেশের ভিতর জিবুটি বন্দর অবস্থিত তারই কথা ভাবছিলুম বলে। এবং সেই সোমালিদের দুঃখ-দৈন্য ঘুচাবার জন্য যে একটি লোক বিদেশী শত্রুদের সঙ্গে প্রাণ দিয়ে লড়েছিল তার কথা বার বার মনে পড়ছিল বলে।

ইয়োরোপীয় বর্বরতার চূড়ান্ত বিকাশ দেখতে হলে পড়তে হয় আফ্রিকার ইতিহাস—ইংরেজ শাসিত ভারতের ইতিহাস তার তুলনায় নগণ্য।

পর্তুগীজ, ইংরেজ, জর্মন, ফরাসী বেলজিয়াম—কত বলব। ইয়োরোপীয় বহু জাত, কম জাত, বজ্জাত, এই আফ্রিকায় একদিন এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সাম্রাজ্য বিস্তারের বর্বর পাশবিক ক্ষুধা নিয়ে, শকুনের পাল যে-রকম মরা গোরুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ভুল বললুম ; শকুনিদের উপর অবিচার করা হল, কারণ তারা তো জ্যান্ত পশুর উপর কোনো ঝাঁপ দেয় না। এই ইয়োরোপীয়রা এসে ছেঁকে ধরল সোমালি, নিগ্রো, বান্টু, হটেনটটদের। তাদের হাতে-পায়ে বেঁধে মুর্গীলাদাই ঝাঁকার মতো জাহাজ ভর্তি করে নিয়ে গেল আমেরিকায়।

কত লক্ষ নিগ্রো দাস যে তখন অসহ্য যন্ত্রণায় মারা গেল তার নিদারুণ করুণ বর্ণনা পাবে 'আঙকল্ টমস্ ক্যাবিন' পুস্তকে—বইখানা পড়ে দেখো। ইংরিজী ভালো বুঝতে না পারলে বাঙলা অনুবাদ 'টম কাকার কুটির' পড়লেই হবে—আমি ছেলেবেলায় বাঙলাতেই পড়েছিলুম।

আর আফ্রিকার ভিতরে যা করলে তার ইতিহাস আজও লেখা হয় নি। বিখ্যাত ফরাসী লেখক আঁদ্রে জিদ কঙ্গো সম্বন্ধে একখানা বই লিখে এমনই বিপদগ্রস্ত হয়েছিলেন যে তাঁর মতো দুঃসাহসী না হলে ঐ সম্বন্ধে কেউ আর উচ্চবাচ্য করতে সাহস পায় না। আর লিখলেই বা কি, প্রকাশক পাবে না। প্রকাশক পেলেই বা কি ? কাগজে কাগজে বেরুবে তার বিরুদ্ধে রূঢ় মন্তব্য, অশ্লীল সমালোচনা। তখন আর কোনো পুস্তক-বিক্রেতা তোমার বই তার দোকানে রাখবে না। তবু জেনে রাখা ভাল, এমন মহাজনও আছেন যাঁরা এ সব বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও বই লেখেন, ছাপান, প্রকাশ করেন এবং লোকে সে সব পড়ে বলে দেশে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সৃষ্টি হয়।

সোমালি দেশের উপর রাজত্ব করতে এসেছিল বিস্তর জাত ঃ তাদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত টিকে রইল ফরাসী, ইংরেজ ও ইতালীয়।

ব্রিটিশ-সোমালি দেশে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেন মুহম্মদ বিন আব্দুল্লা ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে। নিরস্ত্র কিংবা ভাঙাচোরা বন্দুক আর তীর-ধনুকে সজ্জিত সোমালিরা তাঁর চতুর্দিকে এসে জড়ো হল অসীম সাহস নিয়ে—ইয়োরোপীয় কামান মেশিনগানের বিপক্ষে। এদিকে ইতালীয় এবং ব্রিটিশে সোমালি দেশের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে মারামারি, ওদিকে কিন্তু দুই দলই এক হয়ে গেলেন মোল্লা মুহম্মদের স্বাধীনতা প্রচেষ্টাকে সমূলে উৎপাটিত করার জন্য।

দুই পক্ষেরই বিস্তর হার-জিত হল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মোল্লাই ইয়োরোপীয়দের খেদিয়ে খেদিয়ে লাল-দরিয়ার পার পর্যন্ত পেঁছিয়ে দিলেন। ইংরেজ তখন সোমালিদের উপর রাজত্ব করার আশা ছেড়ে দিয়ে সমুদ্রপারে দুর্গ বানিয়ে তার-ই ভিতর বসে রইল লাল-দরিয়ার বন্দরগুলোকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য।

সারা সোমালি দেশে জয়ধ্বনি জেগে উঠল—সোমালি স্বাধীন। তখন ইংরেজ তাঁকে নাম দিল, 'ম্যাড্ মোল্লা' অর্থাৎ 'পাগলা মোল্লা', আমাদের গাঁধীকে যে-রকম একদিন নাম দিয়েছিল, 'নেকেড্ ফকীর' অর্থাৎ 'উলঙ্গ ফকীর।' হেরে যাওয়ার পর মুখ ভ্যাংচানো ছাড়া করবার কী থাকে, বলো ?

কিন্তু হায়, খুব বেশী বৎসর গেল না। ১৯১৪-১৮র প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইয়োরোপীয়রা অ্যারোপ্লেন থেকে বোমা মেরে মানুষকে কাবু করার কৌশল শিখে গিয়েছে। তাই দিয়ে যখন আবার তারা হানা দিলে তখন মোল্লাকে সে সময়কার মতো পরাজয় স্বীকার করে আশ্রয় গ্রহণ করতে হল ভিন দেশে।

মোল্লা সেই অনাদৃত অবহেলায় আবার সাধনা করতে লাগলেন স্বাধীনতা জয়ের নূতন সন্ধানে। কিন্তু হায়, দীর্ঘ বাইশ বৎসরের কঠিন যুদ্ধ, নিদারুণ কৃচ্ছ্রসাধনে তাঁর স্বাস্থ্য তখন ভেঙ্গে গিয়েছে। শেষ পরাজয়ের এক বৎসর পর, যে-ভগবানের নাম স্মরণ করে বাইশ বৎসর পূর্বে তিনি স্বাধীনতা-সংগ্রামে

নেমেছিলেন তাঁরই নাম স্মরণ করে সেই লোক চলে গেলেন যেখানে খুব সম্ভব সাদা-কালোর দ্বন্দ্ব নেই।

এই যে জিবুটি বন্দরে বসে বসে চোখের সামনে তাগড়া লম্বা জোয়ান সোমালিদের দেখছি, তারাও নাকি তখন চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিল।

বীরের কাহিনী থেকে আমরা উৎসাহ সঞ্চয় করব, তা না হলে আমি এ দুঃখের কাহিনী তুললুম কেন? তার কারণ বুঝিয়ে বলার পূর্বে একটি কথা আমি বেশ জোর দিয়ে বলতে চাই।

'ফরাসীরা বড় খারাপ', ইংরেজ চোরের জাত' এ রকম কথার কোনো অর্থ হয় না। ভারতবর্ষে বিস্তর পকেটমার আছে, তাই বলে কেউ যদি গাল দেয় 'ভারতবাসীরা পকেটমার' তা হলে অধর্মের কথা হয়। 'ইংরেজ জাত অত্যাচারী' এ-কথা বলার কোনো অর্থ হয় না।

তাই যখন অধর্ম অরাজকতা দেখি, তখন সংযম বর্জন করে তন্দণ্ডেই অস্ত্র-ধারণ করা অনুচিত। বহু জাত বহু বার করে দেখেছে, কোনো ফল হয় নি; হিংসা আর রক্তপাত শুধু বেড়েই গিয়েছে।

তাই মহাত্মাজী অহিংসার বাণী প্রচার করেছেন। অহিংসা দিয়ে হিংসা জয় করতে হবে। এর চেয়ে মহৎ শিক্ষা আর কিছু নেই। ভারতবর্ষ যদি তাই দিয়ে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ-সংগ্রাম, লুণ্ঠন-শোষণ রুদ্ধ করতে পারে তবে পৃথিবীর ইতিহাসে সে সর্বসভ্য জাতি বলে গণ্য হবে।

এবং শেষ কথা—সব চেয়ে বড় কথা—

আমাদের যেন রাজ্যলোভ না হয়। এদের অন্যায় আচরণ দেখে আমরা যেন সতর্ক হই। আমরা দু'শ বৎসর ধরে পরাধীন ছিলুম। পরাধীনতার বেদনা আমরা জানি। আমরা যেন কাউকে পরাধীন না করি!

॥ ৭ ॥

পল জিজ্ঞেস করলে, 'একদৃষ্টে কি দেখছেন স্যর? আমি তো তেমন কিছু নয়নাভিরাম দেখতে পারছি নে।'

বললুম, 'আমি কিঞ্চিৎ শার্লক হোমসগিরি করছি। ঐ যে লোকটা যাচ্ছে দেখতে পারছ? সে ঐ পাশের দোকান থেকে বেরিয়ে এল তো? দোকানের সাইন-বোর্ডে লেখা 'ফ্রিজোর', তাই লোকটার ঘাড়ের দিকটা দেখে অনুমান করছিলুম, জিবুটি বন্দরের নাপিতদের কোন্ পর্যায়ে ফেলি?'

পার্সি বললে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনার ঠিক মনে আছে। আমি তো চুল কাটাবার কথা বেবাক ভুলে গিয়েছিলুম। চলুন ঢুকে পড়ি।'

আমি বললুম, 'তা পারো। তবে কি না, মনে হচ্ছে, এ-দেশে কোদাল দিয়ে চুল কাটে।'

পার্সি বললে, 'কোদাল দিয়েই কাটুক, আর কাস্তে দিয়েই কামাক, আমার তো গত্যন্তর নেই।'

নাপিত ভায়া ফরাসী ভিন্ন অন্য কোনো ভাষা জানেন না। আমি তাকে মোটামুটি বুঝিয়ে দিলুম, পার্সি'র প্রয়োজনটা কি।

কিন্তু দোকানটা এতই ছোট যে, পল আর আমি সেখানে বসবার জায়গা পেলুম না। বারান্দাও নেই। পার্সিকে বললুম, তার চুল কাটা শেষ হলেই সে যেন বন্দরের চৌমাথার কাফেতে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়।

চৌমাথায় একটি মাত্র কাফে। সব কটা দরজা খোলা বলে স্পষ্ট দেখতে পেলুম, খদ্দের গিস-গিস করছে। কিন্তু এইটুকু হাতের-তেলো-পরিমাণ বন্দর, এখানে মেলার গোরুর হাট বসল কি করে?

ভিতরে গিয়ে দেখি, এ কি, এ যে আমাদের জাহাজেরই ডাইনিঙ রুম! খদ্দেরের সব কজনাই আমাদের অতিশয় সুপরিচিত সহযাত্রীর দল। এ বন্দর 'দেখা' দশ মিনিটেই শেষ হয়ে যায় বলে, সবাই এসে জড়ো হয়েছেন ঐ একটি মাত্র কাফেতেই। তাই কাফে গুলজার। এবং সবাই বসেছেন আপন আপন টেবিল নিয়ে। অর্থাৎ জাহাজের ডাইনিঙ রুমে যে চারজন কিংবা ছজন বসেন এক টেবিল নিয়ে, ঠিক সেই রকম এখানেও বসেছেন আপন আপন গুষ্টি নিয়ে।

এক কোণে বসেছে গুটিকয়েক লোক, উদাস নয়নে, শূন্যের দিকে তাকিয়ে। জাহাজে এদের কখনো দেখি নি। আন্দাজ করলুম, এরাই তবে জিবুটির বাসিন্দা। জরাজীর্ণ বেশভূষা।

কিন্তু এ সব পরের কথা। কাফেতে ঢুকেই প্রথম চোখে পড়ে এ দেশের মাছি। 'চোখে পড়ে' বাক্যটি শব্দার্থেই বললুম, কারণ কাফেতে ঢোকার পূর্বেই এক ঝাঁক মাছি আমার চোখে থাবড়া মেরে গেল।

কাফের টেবিলের উপর মাছি বসেছে আলপনা কেটে, 'বারের' কাউন্টারে বসেছে ঝাঁকে ঝাঁকে, খদ্দেরের পিঠে, হ্যাটে,—হেন স্থান নেই যেখানে মাছি বসতে ভয় পেয়েছে।

দু-গেলাস 'নিম্বু-পানি' টেবিলে আসা মাত্রই তার উপরে, চুমুক দেবার জায়গায়, বসল গোটা আণ্ডেক মাছি। পল হাত দিয়ে তাড়া দিতেই গোটা কয়েক পড়ে গেল শরবতের ভিতর। পল বললে, 'ঐ যুঃ যা।'

আমি বললুম, 'আরেকটা অর্ডার দি?'

সবিনয়ে বললে, 'না, স্যর; আমার এমনিতেই ঘিন-ঘিন করছে। আর পয়সা খরচা করে দরকার নেই।'

তখন তাকিয়ে দেখি, অধিকাংশ খদ্দেরের গেলাসই পুরো ভর্তি।

ততক্ষণে ওয়েটার দুটি চামর দিয়ে গেছে। আমরাও চামর দুটি হাতে নিয়ে অন্য সব খদ্দেরদের সঙ্গে কোরাসে মাছি তাড়াতে শুরু করলুম।

সে এক অপরূপ দৃশ্য! জন পঞ্চাশেক খদ্দের যেন এক অদৃশ্য রাজাধিরাজের চতুর্দিকে জীবন-মরণ পণ করে চামর দোলাচ্ছে। ডাইনে চামর,

বাঁয়ে চামর, মাথার উপরে চামর, টেবিলের তলায় চামর। আর তার-ই তাড়ায় মাছিগুলো যূথভ্রষ্ট কিংবা ছন্নছাড়া হয়ে কখনো ঢোকে পলের নাকে, কখনো ঢোকে আমার মুখে। কথাবার্তা পর্যন্ত প্রায় বন্ধ। শুধু চামরের সাঁই-সাঁই আর মাছির ভন্-ভন্! রুশ-জর্মনে লড়াই!

মাত্র সেই চারটি খাস জিবুটি বাসিন্দে নিশ্চল নীরব। অনুমান করলুম, মাছি তাদের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে, এবং মাছিদের সঙ্গে লড়নেওলা জাহাজ-যাত্রীর দলও তাদের গা-সওয়া। এরকম লড়াইও তারা নিত্যি নিত্যি দেখে।

তখন লক্ষ্য করলুম তাদের শরবৎ পানের প্রক্রিয়াটা। তারা চামর তো দোলায়ই না, হাত দিয়েও গেলাসের মুখ থেকে মাছি খেদায় না। গেলাস মুখে দেবার পূর্বে সেটাতে একটু মোলায়েম ঠোনা দেয়, সঙ্গে সঙ্গে মাছিগুলো ইঞ্চি তিনেক উপরে ওঠা মাত্রই গেলাসটি টুক করে টেনে এনে চুমুক লাগায়। ঘিনপিত এদের নেই।

পলও লক্ষ্য করে আমাকে কানে কানে শুধোলে, 'এ লক্ষ্মীছাড়া জায়গায় এ-সব লোক থাকে কেন?'

আমি বললুম, 'সে বড় দীর্ঘ কাহিনী। অর্থাৎ এদের প্রত্যেককে যদি জিজ্ঞেস কর তবে শুনবে, প্রত্যেকের জীবনের দীর্ঘ এবং বৈচিত্র্যময় কাহিনী।'

এ সংসারে সর্বত্রই এক রকম লোক আছে যারা রাতারাতি লক্ষপতি হতে চায়। খেত-খামার, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-নোকরি কোনো কাজেই ওদের মন যায় না। অত খাটে কে, অত লড়ে কে?—এই তাদের ভাবখানা।

সিনেমায় নিশ্চয় দেখেছ, হঠাৎ খবর রটল আফ্রিকার কোথায় যেন সোনা পাওয়া গিয়েছে; সেখানে মাটির উপর-নিচে সর্বত্র তাল তাল সোনা পড়ে আছে আর অমনি চলল দলে দলে দুনিয়ার লোক—সেই সোনা যোগাড় করে রাতা-রাতি বড়লোক হওয়ার জন্য। সিনেমা কত রঙ-চঙেই না সে দৃশ্য দেখায়। অনাহারে তৃষ্ণায় পড়ে আছে, এখানে মড়া সেখানে মড়া। কোনো কোনো জায়গায় বাপ-মা, বেটা-বেটী চলেছে এক ভাঙা গাড়িতে করে—ছেলেটার মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে, মেয়েটা ভিরমি গেছে। বাপ টিনের ক্যানাস্তারা হাতে করে ধুঁকতে ধুঁকতে জল খুঁজতে গিয়ে এ পাথরে টক্কর খেয়ে পড়ে যাচ্ছে ও পাথরে ঠোক্কর খেয়ে জখম হচ্ছে। মায়ের চোখে জলের কণা পর্যন্ত নেই—যেন অসাড় অবশ হয়ে গিয়েছে।

এগিয়ে চলেছে, এগিয়ে চলেছে, এরা এগিয়ে চলেছে। এ ছাড়া উপায় নেই। থামলে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু, এগুলে বাঁচলে বাঁচতেও পারো।

কজন পেঁছয়, কজন সোনা পায়, তার ভিতর কজন জনসমাজে ফিরে এসে সে ধন ভোগ করতে পারে, তার কোনো সরকারী কিংবা বে-সরকারী সেনসাস্ কখনো হয় নি। তার হলেই বা কি? যাদের এ ধরনের নেশা জন্মগত তাদের ঠেকাবে কোন্ আদমশুমারী?

কিংবা হয়তো এদেরই একজন লেগে গেল কোম্পানী বানিয়ে, শেয়ার বিক্রি করে টাকা তুলতে। কেন? কোন্ এক বোম্বেটে কাপ্তান কোন্ এক অজানা

দ্বীপে কোটি কোটি টাকার ধন নিয়ে উধাও হয়ে যায়। সেই দ্বীপ খুঁজে বের করতে হবে, সেই ধন উদ্ধার করে রাতারাতি বড়লোক হতে হবে। যে সমুদ্রে ঐ দ্বীপটার থাকার কথা সেখানে যাত্রী-জাহাজ বা মাল-জাহাজ কিছুই যায় না। সে দ্বীপে নাকি খাবার জল পর্যন্ত নেই। ঐ বোম্বেটে কাপ্তান নাকি জলতৃষ্ণায় মারা গিয়েছিল। আরো কত রকম উড়ো খবর।

যে কোম্পানি খুললে, সে বলে বেড়াচ্ছে তার কাছে ম্যাপ রয়েছে ঐ দ্বীপে যাবার জন্য। সাধারণ লোক বলে, 'কই, ম্যাপটা দেখি।' লোকটা বলে, 'আব্দার! তারপর তুমি টাকাটা মেরে দাও আর কি?' কিন্তু রাতারাতি বড়লোক হওয়ার দল অত-শত শুধায় না। তারা কোম্পানির শেয়ারও কেনে না—পয়সা থাকলেও কেনে না। তারা গিয়ে কান্নাকাটি লাগায় লোকটার কাছে—'খালাসী করে, বাবুর্চি করে আমাদের নিয়ে চল তোমার সঙ্গে। তনখা-মাইনে কিছু চাই নে।' কাপ্তেনও ঐ রকম লোকই খুঁজছে,—শক্ত তাগড়া জোয়ান, মরতে যারা ডরায় না।

তারপর একদিন সে জাহাজ রওয়ানা হল। কিন্তু আর ফিরে এল না।

কিংবা ফিরে এল মাত্র কয়েকজন লোক। কিছুই পাওয়া যায় নি বলে এরা তাকে খুন করেছে। তখন লাগে পুলিস তাদের পিছনে। মোকদ্দমা হয়, আরো কত কি?

পল কাফের সেই চারটি জিবুটিবাসীর দিকে তাকিয়ে ফিস-ফিস করে আমাকে শুধালে, 'এরা সব ঐ ধরনের লোক?'

আমি বললুম, 'না, তবে ওদের বংশধর। বংশধর অর্থে ওদের ছেলে-নাতি নয়, কারণ ও ধরনের লোক বিয়ে-থা বড় একটা করে না। 'বংশধর' বলছি, এরা ঐ দলেরই লোক, যারা রাতারতি বড়লোক হতে চায়। কিন্তু আজকের দিনে তো আর সোনা পাওয়ার গুজোব ভালো করে রটতে পারে না,—তার আগেই খবরের কাগজওয়ালা প্লেন ভাড়া করে সব কিছু তদারক করে জানিয়ে দেয়, সমস্তটা ধাপ্পা। কিংবা জাহাজ ভাড়া করার কথাও ওঠে না। প্লেনে করে ঝটপট সব কিছু সারা যায়। হেলিকপ্টার হওয়াতে আরো সুবিধে হয়েছে। একেবারে মাটির গা ছুঁয়ে ভালো করে সব কিছুই তদারক করা যায়।'

তাই এরা সব করে আফিং চালান, কিংবা মনে করো কোনো দেশে বিদ্রোহ হয়েছে—বিদ্রোহীদের কাছে বে-আইনী ভাবে বন্দুক-মেশিনগান ইত্যাদি বিক্রি।

যখন কিছুতেই কিছু হয় না, কিংবা সামান্য যে টাকা করেছিল তা ফুঁকে দিয়েছে, ওদিকে বয়সও হয়ে গিয়েছে, গায়ে আর জোর নেই, তখন তারা জিবুটির মতো লক্ষ্মীছাড়া বন্দরে এসে দু পয়সা কামাবার চেষ্টা করে, আর নূতন নূতন অসম্ভব অসম্ভব অ্যাভভেঞ্চারের স্বপ্ন দেখে। জিবুটির মতো অসহ্য গরম আর মারাত্মক রোগ-ব্যাধির ভিতর কোন্ সুস্থ-মস্তিষ্ক লোক কাজের সন্ধানে আসবে? কিন্তু এদের আছে কষ্ট সহ্য করার অসাধারণ ক্ষমতা। তাই এদের জন্য এখানে কিছু একটা জুটে যায়। এই যেমন মনে করো, এখান থেকে যে রেল-লাইন শুরু হয়ে আবিসিনিয়ার রাজধানী আদ্দিস-আবাবা অবধি গিয়েছে—প্রায় পাঁচ

শ মাইলের ধাক্কা। সে লাইনে তো নানা রকমের কাজ আছেই, তার উপর ওরই মারফতে ব্যবসা-বাণিজ্য যা হবার তা-ও হয়। ঐ সব করে, আর একে অন্যকে আপন আপন যৌবনের দুর্দমির গল্প বলে।

পাছে পল ভুল বোঝে তাই তাড়াতাড়ি বললুম, 'কিন্তু এই যে চারটি লোক বসে আছে, ঠিক এরাই যে এ ধরনের অ্যাডভেঞ্চারার সে কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে হওয়ার সম্ভাবনা আছে—ঐটুকু যা কথা।'

ইতিমধ্যে মুখে একটা মাছি ঢুকে যাওয়াতে বিষম খেয়ে কাশতে আরম্ভ করলুম। শান্ত হলে পর পল শুধালে, 'এদের কথা শুনে এদের প্রতি করুণা হওয়া উচিত, না অন্য কোনো প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত, ঠিক বুঝে উঠতে পারছি নে।'

আমি অনেকক্ষণ ভেবে নিয়ে বললুম, 'আমার কি মনে হয় জানো? কেউ যখন করুণার সন্ধান করে তখনই প্রশ্ন জাগে, এ লোকটা করুণার পাত্র কি না? কিন্তু এরা তো কারো তোয়াক্কা করে না। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এরা আশা রাখে, স্বপ্ন দেখে, রাস্তার মোড় ঘুরতেই, নদীর বাঁক নিতেই সামনে পাবে পরী-স্থান, যেখানে গাছের পাতা রুপোর, ফল সোনার, যেখানে শিশিরের ফোঁটাতে হাত দিলেই তারা হীরের দানা হয়ে যায়, যেখানে—'

আরেকটুখানি কবিত্ব করার বাসনা হয়েছিল কিন্তু ইতিমধ্যে পার্সি মাছি তাড়াতে তাড়াতে এসে উপস্থিত। চেয়ারে বসে টেবিলের উপর রাখলো ও-দ্য-কলনের এক ঢাউস বোতল। মুখে হাসি, চোখে খুশি—বোতলের নয় পার্সির।

আমি বোতলটা হাতে নিয়ে দেখি, দুনিয়ার সব চাইতে ডাকসাইটে ও-দ্য-কলন—খাস কলন শহরের তৈরী কলনের জল—Eau de Cologne! 4711 মার্কা!

পার্সি বললে, 'দাঁও মেরেছি স্যর! বলুন তো এর দাম বোম্বাই কিংবা লণ্ডনে কত?'

আমি বললুম, 'শিলিং বারো-চোদ্দ হবে।'

লঙ্কা জয় এবং সীতাকে উদ্ধার করেও বোধ হয় রামচন্দ্রজী এতখানি পরিতৃপ্তির হাসি হাসেন নি। তবু হনুমান কি করেছিলেন তার খানিকটে আভাস পেলুম, পার্সির বুক চাপড়ানো দেখে।

'তিন শিলিং, স্যর, তিন শিলিং! সবে মাত্র, কুল্লে, জস্ট্; তিন শিলিং! নট্ এ পেনি মোর, নট ঈভন এ রেড ফার্দিং মোর।'

এমন সময় দেখি, কাফের আরেক কোণ থেকে সেই আবুল আসাফিয়া—কি কি যেন—সিদ্দীকী সায়েব তার সেই লম্বা কোট আর ঝোলা পাতলুন পরে আমাদের দিকে আসছেন। ইনি আমাদের সেই বন্ধু যিনি সবাইকে লাইমজুস, চকলেট খাওয়ান—কিন্তু যাঁর কঞ্জুসি কথা কওয়াতে।

আমরা উঠে তাকে অভ্যর্থনা জানালুম।

তিনি বসেই বোতলটা হাতে তুলে নিয়ে ডাক্তাররা যে রকম এক্স্রের প্লেট দেখে সেই রকম ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন।

পার্সি পুনরায় মৃদু হাস্য করে বললে, 'একদম খাঁটি জিনিস।'

আবুল আসফিয়া মুখ বন্ধ রেখেই নাক দিয়ে বললেন, 'হুঁ।'

তারপর অনেকক্ষণ পরে অতি অনিচ্ছায় মুখ খুলে শুধালেন, 'ওটা কার জন্য কিনলে?'

পার্সি বললে 'পিসিমার জন্য।'

আবুল আসফিয়া বললেন, 'বোতলটার ছিপি না খুললে বিলেতে নামবার সময় তোমাকে প্রচুর কাস্টম্সের ট্যাক্স দিতে হবে। এমন কি এ জাহাজে ওঠার সময়ও—তবে সে আমি ঠিক জানি নে।'

পার্সি আমার দিকে তাকালে।

আমি বললুম, 'ছিপি খোলা থাকলে ওটা তোমার আপন ব্যবহারের জিনিস হয়ে গেল; তাই ট্যাক্স দিতে হয় না।'

অনেকক্ষণ পর আবুল আসফিয়া বললেন, 'যখন খুলতেই হবে তখন এই বেলা খুলে ফেলাই ভালো।'

আমরা সবাই—পার্সিও—বললুম, 'সেই ভালো।'

ওয়েটার একটা কর্ক স্ক্রু নিয়ে এল। আবুল আসফিয়া পরিপাটী হাতে বোতল খুলে প্রথম কর্কটার ভিতরের দিক শুঁকলেন, তারপর বোতলের জিনিস।

একটু ভেবে নিয়ে আমাদের শোঁকালেন।

কোনো গন্ধ নেই।

যেন জল—প্লেন, 'নির্জলা' জল!

পার্সি তো একেবারে হতভম্ব। অনেকক্ষণ পর সামলে নিয়ে ধীরে ধীরে বললে, 'কিন্তু ছিপি, সীল সবই তো ঠিক?'

আবুল আসফিয়া বললেন, 'এ সব ছোট বন্দরে পুলিশের কড়াক্কড়ি নেই বলে নানা রকমের লোক অনেক অজানা প্রক্রিয়ায় আসল জিনিস সরিয়ে নিয়ে মেকি কিংবা প্লেন জল চালায়।'

আমি পলকে কানে কানে বললুম, 'হয়তো আমাদেরই একজন "অ্যাড-ভেঞ্চারার"।'

পাশের টেবিলের দিকে তাকিয়ে দেখি, খাস জিবুটি-বাসিন্দারা দরদ-ভরা আঁখিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। অনুমান করতে বেগ পেতে হল না, এরা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে।

পার্সিও খানিকটে বুঝতে পেরেছে। বলল, 'যাত্রীরা বোকা কি না, তাই এ শয়তানিটা তাদের উপরই করা যায়। আর প্রতি জাহাজেই আসে এক জাহাজ—'

পল বাধা দিয়ে বললে, 'পার্সি!'

পার্সি চটে উঠে বললে, 'ওঃ, আর উনিই যেন এক মহা কন্-ফু-ৎস!'

জাহাজে ফেরার সময়, আবুল আসফিয়াকে একবার একা পেয়ে শুধালুম, 'ছোঁড়াটাকে বড় নিরাশ করলেন।'

বললেন, 'উপায় কি? না হলে প্রতি বন্দরে মার খেত যে!'

॥ ৮ ॥

গুণীরা বলেন, অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে কথা বলবে।

জিবুটি ত্যাগ করার সময় পার্সি বন্দরের দিকে তাকিয়ে বললে, 'লক্ষ্মীছাড়া জায়গাটা। ও-দ্য-কলনের খেদটা তখনো তার মন থেকে যায় নি। তাই অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই কথাটা বলল।

ঘণ্টা খানেকের ভিতর উঠল ঝড়। তেমন কিছু মারাত্মক নয় কিন্তু 'সী সিকনেস্' দিয়ে মানুষের প্রাণ অতিষ্ঠ করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। পার্সি'ই প্রথম বিছানা নিল। বমি করতে করতে তার মুখ তখন সরষে ফুলের রঙ ধরেছে। ভাঙা গাল দুটো দেখে মনে হয় সত্তর বছরের বুড়ো।

আমি নিজে যে খুব সুস্থ অনুভব করছিলুম তা নয়; তবু পার্সি'কে বললুম, 'তবে যে, বৎস, জিবুটি বন্দরকে কটু-কাটব্য করছিলে? এখন ঐ লক্ষ্মীছাড়া বন্দরেই পা দিতে পারলে যে দু মিনিটেই চাঙ্গা হয়ে উঠতে। মাটিকে তাচ্ছিল্য করতে নেই—অন্তত যতক্ষণ মাটির থেকে দূরে আছে—তা সে জলের তলাতে সাবমেরিনেই হোক, উপরে জাহাজেই হোক, কিংবা তারো উপরে বাতাসে ভর করে অ্যারোপ্লেনেই হোক। তা সে যাক গে। এখন বুঝতে পারলে গুণীরা কেন বলেছেন, অগ্র-পশ্চাৎ ইত্যাদি?'

পার্সি কিন্তু তৈরী ছেলে। সেই ছট্‌ফটানির ভিতর থেকে কাতরাতে কাতরাতে বলল, 'কিন্তু এখন যদি কোনো ডুবন্ত দ্বীপের মাটিতে ধাক্কা লেগে জাহাজখানা চৌচির হয়ে যায় তখনো মাটির গুণগান করবেন নাকি?'

আমি বললুম, 'ঐ য্‌ যা! এতখানি ভেবে তো আর কথাটা বলি নি।'

পল তার খাটে বসে আমাদের কথাবার্তা শুনছিল। আস্তে আস্তে বললে, 'জাহাজ যদি মাটিতে লেগে চৌচির হয়ে যায় তবে তো সেটা মাটির দোষ নয়। জাহাজ জোরের সঙ্গে ধাক্কা দেয় বলেই তো খানখান হয়ে যায়। আস্তে আস্তে চললে মাটির বাধা পেয়ে জাহাজ বড় জোর দাঁড়িয়ে যাবে—ভাঙবে কেন? মাকে পর্যন্ত জোরে ধাক্কা দিলে চড় খেতে হয়, আর মাটি দেবে না?'

আমি উল্লসিত হয়ে বললুম, 'সাধু, সাধু! তুলনাটি চমৎকার! তবে কি না আমার দুঃখ, বাঙলা ভাষায় এ নিয়ে যে শব্দ দুটো আছে তার pun তোমরা বুঝবে না। মা হচ্ছেন 'মাদার' আর 'মাটি' হচ্ছেন 'দি মাদার' কিংবা 'আর্থ'।'

পল বললে, 'বিলক্ষণ বুঝেছি, Good Earth!'

পার্সি বিরক্ত হয়ে বললে, 'পলের তুলনাটা নিশ্চয়ই চোরাই মাল।'

আমি বললুম, 'সাধুর টাকাতে দু সের দুধ, চোরের টাকাতেও দু সের দুধ। টাকার দাম একই। তুলনাটা ভালো। তা সে পলের আপন মালই হোক আর চোরাই মালই হোক। তা সে কথা থাক। তুমি কিন্তু 'সী সিকনেসে' কাতর হয়ে ভয় পেয়ো না। এ ব্যামোতে কেউ কখনো মারা যায় নি।'

পার্সি চিঁ-চিঁ করে বললে, 'শেষ ভরসাটাও কেড়ে নিলেন, স্যর? আমি তো ভরসা করেছিলুম, আর বেশীক্ষণ ভুগতে হবে না, মরে গিয়ে নিষ্কৃতি পাবো।'

পল বললে, 'আগাছা সহজে মরে না।'

আমি বললুম, 'থাক, থাক। চলো, পল, উপরে যাই। আমরা তিনজনা মিলে 'সী সিকনেসকে' বড্ড বেশী লাই দিচ্ছি।'

পল বেরুতে বেরুতে বললে, 'হক কথা। পার্সির সঙ্গে একা পড়লে যে-কোনো ব্যামো বাপ-বাপ করে পালাবার পথ পাবে না।'

উপরে এসে দেখি, আবুল আসফিয়া কোথা থেকে এক জোরদার দুরবীন যোগাড় করে কি যেন দেখবার চেষ্টা করছেন। এ সব জাহাজ কখনো পাড়ের গা ঘেঁষে চলে না। তাই জোরালো দুরবীন দিয়েও বিশেষ কিছু দেখা যায় না। পল আমাকে শুধালে, 'কি দেখছেন উনি?'

আমি বললুম, 'আবুল আসফিয়া মুসলমান এবং মনে হচ্ছে ধর্মে তাঁর অনুরাগও আছে। লাল দরিয়ার এক পারে সোমালি-ভূমি, হাবসী মুল্লুক এবং মিশর, অন্য পারে আরব দেশ। মহাপুরুষ মুহম্মদ আরব দেশে জন্মেছিলেন, ঐ দেশে ইসলাম প্রচার করেন। মক্কা-মদীনা সবই তো ঐখানে।'

পল বললে, 'ইংরিজীতে যখনই কোনো জিনিসের কেন্দ্রভূমির উল্লেখ করতে হয় তখন বলা হয়, যেমন ধরুন সঙ্গীতের বেলায়, 'ভিয়েনা ইজ দি মেক্কা অব মিউজিক'—এ তো আপনি নিশ্চয়ই জানেন। কিন্তু বিশেষ করে মক্কা বলা হয় কেন? মক্কা তো আর তেমন কিছু বড় শহর নয়।'

আমি বললুম, 'পৃথিবীতে গোটা তিনেক বিশ্বধর্ম আছে অর্থাৎ এ ধর্ম-গুলো যে দেশে জন্মগ্রহণ করেছে সেখানেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে নি—দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। যেমন মনে করো বৌদ্ধধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম এবং ইসলাম। কিন্তু পৃথিবীর বহু বৌদ্ধ কিংবা খ্রীষ্টান কোনো বিশেষ পুণ্যদিবসে এক বিশেষজায়গায় একত্র হয় না—মুসলমানরা যে রকম হজের দিনে মক্কায় একত্র হয়। কোথায় মরক্কো, কোথায় সাইবেরিয়া আর কোথায় তোমার চীন—পৃথিবীর যে সব দেশে মুসলমান আছে সে সব দেশের লোককে সেদিন তুমি মক্কায় পাবে। শুনেছি, সেদিন নাকি মক্কার রাস্তায় দুনিয়ার প্রায় সব ভাষাই শুনতে পাওয়া যায়।'

'তাতে করে লাভ?'

আমি বললুম, 'লাভ মক্কাবাসীদের নিশ্চয়ই হয়। তীর্থযাত্রীরা যে পয়সা খরচ করে তার সবই তো ওরা পায়। কিন্তু আসলে সে উদ্দেশ্য নিয়ে এ-প্রথা সৃষ্টি হয় নি। মুহম্মদ সাহেবের ইচ্ছা ছিল যে পৃথিবীর সব দেশের মুসলমানকে যদি একত্র করা যায় তবে তাদের ভিতর ঐক্য এবং ভ্রাতৃভাব বাড়বে। আমরা যখন বাড়িতে উপাসনা না করে গির্জায় কিংবা মসজিদে যাই তখন তারও তো অন্যতম উদ্দেশ্য আপন ধর্মের লোকের সঙ্গে এক হওয়া। মুহম্মদ সাহেব বোধ হয় এই জিনিসটাই বড় করে, সমস্ত পৃথিবী নিয়ে করতে চেয়েছিলেন।'

পল অনেকক্ষণ ভেবে নিয়ে বললে, 'আমরা তো বড়দিনের পরবে প্রভু যীশুর জন্মস্থল বেথলেহেমে জড়ো হই নে। হলে কি ভালো হত না? তা হলে তো খ্রীষ্টানদের ভিতরও ঐক্য সখ্য বাড়ত।'

আমি আরো বেশী ভেবে বললুম, 'তা হলে বোধ হয় রোমে পোপের প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হত।'

কিন্তু থাক এসব কথা। আমার কোনো ক্যাথলিক পাঠক কিংবা পাঠিকা যেন মনে না করেন যে আমি পোপকে শ্রদ্ধা করি নে। পৃথিবীর শত শত লক্ষ লক্ষ লোক যাঁকে সম্মানের চোখে দেখে তাঁকে অশ্রদ্ধা করলে সঙ্গে সঙ্গে সেই শত শত লক্ষ লক্ষ লোককে অশ্রদ্ধা করা হয়। অতটা বেয়াদব আমি নই। বিশেষত আমি ভারতীয়। ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি, সব ধর্মকে শ্রদ্ধা জানাতে হয়।

॥ ৯ ॥

ঝড় থেমেছে। সমুদ্র শান্ত। ঝড়ের পর বাতাস বয় না বলে অসহ্য গরম আর গুমোট। এ যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পাই কি প্রকারে?

নিষ্কৃতির জন্য মানুষ ডাঙায় যা করে, জলে অর্থাৎ জাহাজেও তা-ই। এক দল লোক বুদ্ধিমান। কাজে কিংবা অকাজে এমনি ডুব মারে যে, গরমের অত্যাচার সম্বন্ধে অনেকখানি অচেতন হয়ে যায়। বোকার দল শুধু ছটফট করে। ক্ষণে এটা করে, ক্ষণে ওটা নাড়ে, ক্ষণে ঘুমাবার চেষ্টা করে, ক্ষণে জেগে থাকতে গিয়ে আরো বেশী কষ্ট পায়।

জাহাজেও তাই। একদল লোক দিবা-রাত্তির তাস খেলে। সকাল বেলাকার আণ্ডা-রুটি খেয়ে সেই যে তারা তাসের সায়রে ডুব দেয়, তারপর রাত বারোটা-একটা-দুটো অবধি তাদের টিকি টেনেও সে সায়র থেকে তোলা যায় না। লাঞ্চ সাপার খেতে যা দু-একবার তাস ছাড়তে হয়, ব্যাস—ঐ। তখন হয় বলে 'কী গরম', নয় ঐ তাসের জেরই খানার টেবিলে টানে। চার ইস্কাপন্ না ডেকে তিন বে-তরুপ বললে ভালো হত, পুনরপি ডবল না বলে সে কি আহাম্মুকিই না করেছে!

জাহাজের বে-সরকারী ইতিহাস বলে, একটানা ছত্রিশ ঘণ্টা তাস খেলেছে এমন ঘটনাও নাকি বিরল নয়। এরা গরমে কাতর হয় না, শীতেও বেকাবু হয় না। ভগবান এদের প্রতি সদয়।

দাবাখেলার চর্চা পৃথিবীতে ক্রমেই কমে আসছে। আসলে কিন্তু দাবাড়েরাই এ ব্যাপারে দুনিয়ার আর সবাইকেই মাত করতে পারে। দাবাখেলায় যে মানুষ কি রকম বাহ্যজ্ঞানশূন্য হতে পারে, সেটা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। 'পরশুরাম' লিখেছেন, এক দাবাড়েকে যখন চাকর এসে বললে, 'চা দেব কি করে?—দুধ ছিঁড়ে গেছে' তখন দাবাড়ে খেলার নেশায় বললে, 'কি জ্বালা,

সেলাই করে নে না।'

আরেক দল শুধু বই পড়ে। তবে বেশীর ভাগই দেখছি, ডিটেকটিভ উপন্যাস। ভালো বই দিবা-রাত্র পড়ছে এরকম ঘটনা খুব কমই দেখেছি।

আরেক দল মারে আড্ডা। সঙ্গে সঙ্গে গুনগুন করে—আড্ডার যেটা প্রধান 'মেনু'—পরনিন্দা, পরচর্চা। সেগুলো বলতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু পাছে কোনো পাঠক ফস করে শুধায়, 'এগুলো আপনি জানলেন কি করে, যদি নিজে পরনিন্দা না করে থাকেন?' তাই আর বললুম না।

আরো নানা গুষ্ঠী নানা সম্প্রদায় আছে, কিন্তু আবুল আসফিয়া কোনো গোত্রেই পড়েন না। তিনি আড্ডাবাজদের সঙ্গে বসেন না বটে, কিন্তু আড্ডা মারেন না—খেয়া-নৌকার মাঝি যে রকম নদী পেরয়, কিন্তু ওপারে নাবে না। এ-কথা পূর্বেই বলেছি, কিন্তু আজ হঠাৎ তাঁকে দেখি অন্যরূপে। খুলে কই।

পার্সি সেরে উঠে আবার জাহাজময় লম্ফ-ঝম্প লাগিয়েছে। যেখানেই যাই সেখানেই পার্সি। মাঝে মাঝে সন্দেহ জাগে, তবে কি পার্সির জন আষ্টেক যমজ ভাই আছে নাকি? একই লোক সাত জায়গায় একসঙ্গে থাকবে কি করে?

সে-ই খবরটা আনলে।

কি খবর?

জাহাজ সুয়েজ বন্দরে পেঁছনোর পর ঢুকবে সুয়েজ খালে। খালটি একশ মাইল লম্বা। দু পাড়ে মরুভূমির বালু বলে জাহাজকে এগতে হয় ঘণ্টায় পাঁচ মাইল বেগে। তাহলে লাগল প্রায় কুড়ি-বাইশ ঘণ্টা। খালের এ-মুখে সুয়েজ বন্দর, ও-মুখে সঈদ বন্দর। আমরা যদি সুয়েজ বন্দরে নেমে ট্রেন ধরে কাইরো চলে যাই এবং পিরামিড দেখে সেখান থেকে ট্রেন ধরে সঈদ বন্দর পেঁছই, তবে আপনাদের আপন জাহাজই আবার ধরতে পারব। যদিও আমরা মোটামুটি একটা ত্রিভুজের দুই বাহু পরিভ্রমণ করব—আর সুয়েজ খাল মাত্র এক বাহু—তবু রেলগাড়ি তাড়াতাড়ি যাবে বলে আমরা কাইরোতে এটা ওটা দেখবার জন্য ঘণ্টা দশেক সময় পাব।

কিন্তু যদি সুয়েজ বন্দরে নেমে সময়মত ট্রেন না পাই, কিংবা যদি কাইরো থেকে সময়মত সঈদ বন্দরের ট্রেন না পাই আর সেখানে জাহাজ না ধরতে পারি, তখন কি হবে উপায়?

পার্সি অসহিষ্ণু হয়ে বললে, 'সে তো কুক কোম্পানির জিম্মাদারি। তারাই তো এ টুর—না এক্সকার্শন, কি বলব?—বন্দোবস্ত করেছে। প্রতি জাহাজের জন্যই করে। বিস্তর লোক যায়। চলুন না, নোটিশ বোর্ডে দেখিয়ে দিচ্ছি—কুকের বিজ্ঞাপন।'

ত্রিমূর্তি সেখানে গিয়ে সাতিশয় মনোযোগ সহকারে প্রস্তাবটি অধ্যয়ন করলুম।

কিন্তু প্রস্তাবটির শেষ ছত্র পড়ে আমাদের আক্কেল গুড়ুম নয়, দড়াম করে ফেটে গেল। এই এক্সকার্শন—বন-ভোজ কিংবা শহর-ভোজ, যাই বলো, যাচ্ছি তো কাইরো 'শহরে'—যাঁরা করতে চান তাঁদের প্রত্যেককে দিতে হবে সাত

পৌণ্ড অর্থাৎ প্রায় একশ টাকা। পল বললে, 'হরি, হরি,' (অবশ্য ইংরিজীতে 'গুড হেভেনস', 'মাই গুডনেস' এই জাতীয় কিছু একটা) এত টাকা যদি আমার থাকবেই তবে কি আমি এই জাহাজে ফার্স্ট ক্লাসে যেতুম না?'

আমি বেদনাতুর হওয়ার ভান করে বললুম, 'কেন ভাই, আমরা কি এতই খারাপ লোক যে আমাদের এড়াবার জন্য তুমি ফার্স্ট ক্লাসে যেতে চাও?'

পল তো লজ্জায় লাল হয়ে তোতলাতে আরম্ভ করলে।

আর পার্সি? সে তো হনুমানের মতো চক্রাকারে নৃত্য করে বলতে লাগল, 'বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে। করো মস্করা স্যরের সঙ্গে! বোঝো ঠ্যালা!'

আমি বললুম, 'ব্যস, ব্যস্। হয়েছে। হয়েছে। কিন্তু পার্সি, একশ টাকা তো চাট্টিখানি কথা নয়। আমাকেই তো টাল-মাটাল হয়ে টাকাটা টানতে হবে।'

পার্সিকে দমানো শক্ত। বললে, 'অপরাধ নেবেন না, স্যর, কিন্তু আমি-ই বা কোন হেনরি ফোর্ড কিংবা মিডাস্ রোট্‌শিলল্ট্? কিন্তু আমি মনস্থির করেছি, আমার জেবের শেষ পেনি দিয়ে আমি পিরামিড দেখবই দেখব। চীনা দেওয়াল দেখার পর পিরামিড দেখব না আমি? মুখ দেখাব তা হলে কি করে? তার চেয়েও খারাপ, আয়নাতে নিজেরই মুখ দেখব কি করে?'

অনেক আলোচনা, বিস্তর গবেষণা করা হল। শেষটায় স্থির হল, পিরামিড-দর্শন আমাদের কপালে নেই। গালে হাত দিয়ে যখন ত্রিমূর্তি আপন মনে সেই শোক ভোলাবার চেষ্টা করছি এমন সময় আবুল আসফিয়া মুখ খুললেন।

তাঁর সনাতন অভ্যাস অনুযায়ী তিনি আমাদের আলোচনা শুনে যাচ্ছিলেন। ভালো মন্দ কিছুই বলেন নি। আমরা যখন স্থির করলুম, আমরা ট্রিপটা নেব না তখন তিনি বললেন, 'এর চেয়ে সস্তাতেও হয়।'

আমরা একসঙ্গে চেঁচিয়ে শুধালুম, 'কি করে? কি করে?'

বললেন, 'সে কথা পরে হবে।'

তার পর আপন চেয়ার ছেড়ে খানা-কামরার দিকে চলে গেলেন।

॥ ১০ ॥

পল আর পার্সিকে এখন আর বড় একটা দেখতে পাই নে। ওরা আবুল আসফিয়ার কোটের উপর ডাকটিকিটের মত সেঁটে বসেছে—ছিনে জোঁকের মতো লেগে আছে বললে কমিয়ে বলা হয়, কারণ রক্ত শোষা শেষ হলে তবু ছিনে জোঁক কামড় ছাড়ে—এরা খামের উপর ডাকটিকিটের মতো, যেখানেই আবুল আসফিয়া সেখানেই তারা। মুখে এক বুলি, এক প্রশ্ন—কি করে সস্তায় কাইরো গিয়ে সেখান থেকে সস্তাতেই ফের সঈদ বন্দরে জাহাজ ধরা যায়? আবুল আসফিয়া বলেন, 'হবে, হবে, সময় এলে সবই হবে।'

শেষটায় জাহাজ যেদিন সুয়েজ বন্দরে পেঁছিবে তার আগের দিন তিনি

রহস্যটি সমাধান করলেন। অতি সরল মীমাংসা। আমাদের মাথায় খেলে নি।

আবুল আসফিয়া বললেন, 'কুক কোম্পানির লোক টুরিস্‌ট্ সায়েব-সুবোদের নিয়ে যাবে গাড়িতে ফার্স্ট ক্লাসে করে—সুয়েজ থেকে কাইরো, এবং কাইরো থেকে সঈদ বন্দর। কাইরোতে যে রাত্রি-বাস করতে হবে তার ব্যবস্থাও হবে অতিশয় খানদানী, অতএব মাগগী হোটেলে। আমরা যাব থার্ডে, এবং উঠব একটা সস্তা হোটেলে। তা হলেই হল।'

প্রথমটায় আমরা অবাক হয়ে গিয়েছিলুম। সম্বিতে ফেরা মাত্র আমার মনে আরেকটি কঠিন সমস্যার উদয় হল। যদি কোনো জায়গায় আমরা ট্রেন মিস করি কিংবা অন্য কোনো দুর্ঘটনার মুখে পড়ে যাই আর শেষটায় সঈদ বন্দরে ঠিক সময়ে পেঁছে জাহাজ না ধরতে পারি তবে যে আমাদের চক্ষু চড়ক গাছ। বরঞ্চ চা খেতে প্ল্যাটফর্মে নেমেছি, আর গাড়ি মাল-পত্র নিয়ে চলে গেল সে সমস্যারও সমাধান আছে কিন্তু জাহাজ চলে গেলে কত দিন সঈদ বন্দরে পড়ে থাকতে হবে, তার কি খরচা, নূতন জাহাজে নূতন টিকিটের জন্য কি গচ্ছা এসব তো কিছুই জানি নে। কুকের লোক এ সব বিপদ-আপদের জন্য জিম্মেদার, কিন্তু আবুল আসফিয়াকে জিম্মেদার করে তো আর আমাদের চারখানা হাত গজাবে না? তাঁকে তো আর বলতে পারব না, 'মশাই, আপনার পাল্লায় পড়ে এত টাকার গচ্ছা হল—আপনি সেটা ঢালুন।'

শেষের কথাটা বাদ দিয়ে আমার সমস্যাটা নিবেদন করাতে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে চলে গেলেন। যাবার সময় মাত্র একটি বাক্য বললেন, 'নো রিস্‌ক্, নো গেন'—সোজা বাঙলায়, 'খেলেন দই রমাকান্ত আর বিকারের বেলা গোবদ্দন' সে হয় না। তুমি যদি দই খেতে চাও তবে বিকারটা হবে তোমারই। মাগুর মাছ ধরতে হলে গর্তে হাত দিতে হবে তোমাকেই। কিছুটা ঝুঁকি নিতে রাজী না হলে কোনো প্রকারের লাভও হয় না।

আবুল আসফিয়ার 'নো রিস্‌ক্, নো গেন' এই চারটি কথা—চাট্টিখানি কথ নয়—শুনে পল দুশ্চিন্তা-ভরা গলায় বললে, 'তাই তো!'

পার্সি মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে বললে, 'সেই তো।'

আমি বললুম, 'ঐ তো।'

পল বললে, 'কিংবা মনে করুন কাইরোতে পথ হারিয়ে ফেললুম। আবুল আসফিয়া কি কাইরোর ভাষা জানেন? সেখানকার লোকে কি বুলি বলে তার নামই তো জানি নে।'

পার্সি বললে, 'দেখো পল, তুমি কি জানি জানো না তার ফিরিস্তি বানাবার এই কি প্রশস্ততম সময়? তাতে আবার সময়ও তো লাগবে বিস্তর।'

আমি পার্সিকে ফাঁকা ধমক দিয়ে বললুম, 'আবার!' পলকে বললুম, 'আরবী। কিন্তু কিছু কিছু লোক নিশ্চয়ই ইংরিজী ফরাসী জানে। রাস্তা ফের খুঁজে পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই।'

পল বললে, 'যাবে নিশ্চয়ই। কিন্তু ততক্ষণে হয়তো জাহাজ বন্দর ছেড়ে

চলে গিয়েছে।'

আরো অনেক অসুবিধার কথা উঠল। তবে সোজা কথা এই দাঁড়াল, একটা দেশের ভাষার এক বর্ণ না জেনে, এতখানি কম সময় হাতে নিয়ে সে দেশে ঘোরাঘুরি করা কি সমীচীন? এতই যদি সোজা এবং সস্তা হবে তবে এতগুলো লোক কুকের ন্যাজ ধরে যাচ্ছে কেন? একা-একা কিংবা আপন-আপন দল পাকিয়ে গেলেই তো পারত। তাই দেখা যাচ্ছে আবুল আসফিয়ার 'নো রিস্ক্, নো গেন' প্রবাদে—অন্তত এক্ষেত্রে—'রিস্ক্' ন সিকে, গেন্ মেরে-কেটে চোদ্দ পয়সা। রবি ঠাকুর বলেছেন,

'আমার মতে জগৎটাতে ভালোটারই প্রাধান্য,—
মন্দ যদি তিন-চল্লিশ, ভালোর সংখ্যা সাতান্ন।'

যদি আমাদের রিস্কে সাতান্ন আর গেন্ তিন-চল্লিশ হত তা হলেও আমরা কানাইলালের মতো সোল্লাসে 'ইয়াল্লা' বলে ঝুলে পড়তুম—যাচ্ছি তো মুসলমান দেশে।

তখন স্থির হল, আবুল আসফিয়াকে পাকড়াও করে আরেক দফা সবিস্তর সওয়াল জবাব না করে কোনো কিছু পাকাপাকি মনস্থির করা যাবে না।

ধুয়া-ভুয়া করে করে, বিস্তর খোঁজাখুঁজির পর আমরা আবুল আসফিয়াকে পেলুম উপরের ডেকের এক কোণে, আপন মনে গুনগুনিয়ে গান গাইছেন। আমাদের দেখে, আমাদের কিছু বলার পূর্বেই বেশ একটু চড়া গলায় বললেন, "আমি কোনো কথা শুনতে চাই নে। আমি কোনো উত্তর দিতে পারব না। আমি কাইরো যাব। তোমরা আসতে চাও ভালো, না আসতে চাও আরো ভালো।'

সঙ্গে সঙ্গে যেন আরো একটা শব্দ শুনতে পেলুম—শব্দটা ফার্সী, 'বুজ-দিল'—অর্থাৎ বকরির কলিজা, অর্থাৎ 'ভীতুরা সব'।

এই শান্তপ্রকৃতির সদাশিব লোকটির কাছ থেকে আমরা এ-আচরণ প্রত্যাশা করি নি। এ যেন সেনাপতির আদেশ, 'আমি তা হলে একাকী শত্রু-সৈন্য আক্রমণ করব, তোমরা আসো আর নাই আসো।' ত্রিমূর্তি লগুড়াহত সারমেয়বৎ নিম্নপুচ্ছ হয়ে স্ব-স্ব আসনে ফিরে এলুম। কারো মুখে কথা নেই। নিঃশব্দে আহারাদি করে যে যার কেবিনে শুয়ে পড়লুম।

'সিংহের ন্যাজে মোচড় দিতে নেই' কথাটি অতি খাঁটি, কিন্তু আবুল আসফিয়া সিংহ না মর্কট সেটা তো এখনো কিছু বোঝা গেল না। তাঁর আচরণ তেজীয়ান না লেজীয়ানের লক্ষণ তার তো কোনো হদিস পাওয়া গেল না।

॥ ১১ ॥

পরদিন নিদ্রাভঙ্গে কেবিন ছেড়ে উপরে আসতেই দেখি হৈ-হৈ রৈ-রৈ কাণ্ড! এক দল লোক আবুল আসফিয়াকে ঘিরে নানা রকমের প্রশ্ন শুধোচ্ছে। কুক

কোম্পানি কাইরো দেখবার জন্য চায় একশ টাকা আর আপনি বলেন, পঞ্চাশ টাকাতেই হয়, সেটা কি প্রকারে সম্ভব? আরেক দল বলে, তারাও আসতে রাজী কিন্তু যদিস্যাৎ কোনো প্রকারের গড়বড়-সড়বড় হয়ে যায় আর তারা জাহাজ না ধরতে পারে তখন যে ভয়ংকর বিপদ উপস্থিত হবে তার কি সমাধান?

অর্থাৎ ইতিমধ্যে আমাদেরই মত আমাদের গরিব সহযাত্রীরা জেনে গিয়েছে সস্তাতেও কাইরো এবং পিরামিড দেখা যায়। কাজেই এখন আর পল, পার্সি, আমি এই ত্রিমূর্তি, এবং আবুল আসফিয়াকে নিলে চতুর্মুখ—এখন আর তা নয়, এখন সমস্যাটা সহস্রনয়না হয়ে গিয়েছে, জনগণমন সাড়া দিয়েছে।

আবুল আসফিয়া কেবল মাঝে মাঝে বলেন, 'হো জায়গা, সব কুছ হো জায়গা।'

হিন্দুস্তানী বলছেন কেন? তিনি তো ইংরিজী জানেন। তখন লক্ষ্য করলুম, যে সব দল তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে তাদের ভিতর রয়েছে ফরাসী, জর্মন, স্পেনিশ, রুশ আরো কত কি। এরা সবাই বোঝে, এমন কোনো ভাষা ইহ-সংসারে নেই। তাই তিনি নিশ্চিন্ত মনে মাতৃভাষায় কথা বলে যাচ্ছেন। ইংরিজি বললে যা, হিন্দুস্তানী বললেও তা। ফল একই।

এমন সময় আমাদের দলের সব চেয়ে সুন্দরী মহিলা মধুর এবং দরদভরা গলায় বললেন, 'মসিয়ো আবুল, যদি কোনো কারণে আমরা জাহাজ মিস্ করি তখন যে আমরা মহা বিপদে পড়ব। আপনি তো আমাদের কাউকে তার অনিচ্ছায় জোর করে নিয়ে যাচ্ছেন না যে আপনাকে তখন জিম্মাদার হতে বলব?'

ক্লোদেৎ শেনিয়ের যা বললেন, তার মোটামুটি অর্থ, 'আপনি যে আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন তার জিম্মাদারি আপনার নয়, কিন্তু যদি কোনো রকমের বিপর্যয় উপস্থিত হয় তবে তার গুরুত্বটা আপনি ভালো করে বিবেচনা করে দেখলে হয় না কি?'

উপস্থিত সকলের মনোভাব মহিলাটি যেন অতি ললিত ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন। সবাই চিৎকার করে সায় দিলে আপন আপন ভাষায়।

ফরাসী দল—উই উই,
জর্মন দল—ইয়া ইয়া,
ইতালীয় দল—সি সি,
একটি রাশান—দা দা,
গুটি কয়েক ভারতীয়—ঠিক হৈ ঠিক হৈ,
পল পার্সি—ইয়েস ইয়েস,
আমি নিজে কিছু বলি নি,—কিন্তু সে কথা যাক।

আবুল আসফিয়া উত্তরে ঘাড় নিচু করে বললেন, 'মৈ জিম্মেদার হুঁ।'

তাঁকে যদিও কেউ জিম্মেদার হবার শর্ত চায় নি তবু তিনি জিম্মাদার, এটা সম্পূর্ণ তাঁরই দায়িত্ব!

চাকরির সন্ধানে গিয়ে এক বাঙালী বড় সাহেব ইংরেজকে খুশী করার জন্য বলেছিল, 'হুজুর আপনার বাঙলোতে আসবার জন্য ভয়ের চোটে পা আর ওঠে না। যদি এক পা এগোই তো তিন কদম পিছিয়ে যাই।' বড় সায়েব মাত্রই যে গাধা হয় তা নয়,—এ সায়েবের বুদ্ধি ছিল। বাবুর কথা শেষ হতে না হতেই শুধাল, 'তা হলে এখানে পেঁছিলে কি করে?' সায়েব যে বাবুর বিনয় বচন এতখানি শব্দার্থে নেবেন বেচারী সেটা অনুমান করতে পারে নি। প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিল বটে কিন্তু চাকরির ফিকিরে বাঙালীর কাছে কোনো কসরত কোনো কৌশলই অজানা নেই। একটিমাত্র শুকনো ঢোক না গিলেই বললে, 'হুজুর, তাই আমি আপন বাড়ির দিকে মুখ করে চলতে আরম্ভ করলুম আর এই দেখুন দিব্য হুজুরের বাঙালোতে পেঁছে গিয়েছি।'

গল্পের বাকিটা আমার মনে নেই, তবে আবুল আসফিয়ার কাইরো ভ্রমণ প্রস্তাবে উমেদাররা যদি এক পা এগোন তবে তিন পা পিছিয়ে যান। পল, পার্সি আর আমি ছাড়া কেউই পাকাপাকি কথা দেন না, আমাদের পার্টিতে আসছেন কি না। অথচ ঘড়িঘড়ি তরো-বেতরো প্রশ্ন। গাড়ি যদি মিস্ করি, কাইরোতে হোটেলে যদি জায়গা না মেলে, যদি রাত্রিবেলা হয় আর আকাশে চাঁদ না থাকে তবে পিরামিড দেখব কি ক'রে, আরো কত কি বিদঘুটে সব প্রশ্ন। ওদিকে আবুল আসফিয়া আপন কেবিনে খিল দিয়ে শুয়ে আছেন। প্রশ্নের ঠেলা সামলাতে হচ্ছে আমাদেরই—আমরা যেন ইংলণ্ডের রাজা পঞ্চম ভারতীয় ভাইসরয়! শেষটায় আমরাও গা-ঢাকা দিতে আরম্ভ করলুম।

সন্ধ্যার ঝোঁকে জাহাজ সুয়েজ বন্দরে পেঁছিল। সুয়েজ খালের মুখে এসে জাহাজ নোঙর ফেলতেই ডাঙা থেকে একটা স্টীম-লঞ্চ এসে জাহাজের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। তখন জানা গেল আবুল আসফিয়ার দলে সবসুদ্ধ আমরা নজন যাচ্ছি। তাঁকে নিয়ে দশ জন।

কুকের গাইড স্টীম-লঞ্চে করে ডাঙা থেকে জাহাজে এসেছিল। দেখলুম, তার দলে বারো জন যাত্রী। তা হলে আমাদের দশ জন এমন মন্দ কি!

গাইড চড়চড় করে সিঁড়ি বেয়ে লঞ্চে নামল—পিছনে পিছনে তার দলের বারো জন নামল পাণ্ডা-গরুর ন্যাজ ধরে পাপী যে রকম ধারা বৈতরণী পেরোয়। আমাদের আবুল আসফিয়াও চচ্চড় করে নামলেন যেন কত যুগের ঝানু গাইড!

কুকের গাইড এ রকম ব্যাপার আগে কখনো দেখে নি। তার তদ্বির জিম্মেদারী উপেক্ষা করে এক পাল লোক চলেছে আপন গোঠ বেঁধে—এতখানি রিস্ক্ নিয়ে—এ ব্যাপার তার কাছে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। আবুল আসফিয়ার দিকে যে ধরনে তাকালে তাতে সে দুর্বাসা হলে তিনি নিশ্চয়ই পুড়ে খাক হয়ে যেতেন—উনিই তো তার মক্কেল মেরেছেন।

তখন ভালো করে দেখলুম আবুল আসফিয়ার নবীন বেশভুষা। সেই

ঝুলে-পড়া আঠারো-পকেটি কোট, মাটি-ছোঁয়া চোঙা-পানা পাতলুন তিনি বর্জন করে পরেছেন, একদম ফার্স্ট ক্লাস নেভি ব্লু সুট—কোট, পাতলুন ওয়েস্ট কোট সমেত—সোনালি বেনারসি সিল্কের টাই, তদুপরি ডাইমণ্ড টাই-পিন, পায়ে পেটেণ্ট লেদারের মোলায়েম জুতো, তদুপরি ফন্ রঙের স্প্যাট, মাথায় উচ্চাঙ্গের ফেলট্ হ্যাট, গরম বলে বাঁ হাতে ধরে রেখেছেন নেবু রঙের কিড্ গ্লাভস্ ডান হাতে চামড়ার একটি পোর্টফোলিয়ো।

বিবেচনা করলুম, এই সুটে আঠারোটা পকেট নেই বলে তিনি পোর্ট-ফোলিয়োতে টফি চক্‌লেট, সিগরেট্ ভর্তি করেছেন।

সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ঘন নীলাকাশ কেমন যেন সূর্যের লাল আপন নীলে মিলে বেগ্‌নি রঙ ধরতে আরম্ভ করলে। তারই আভাতে লাল দরিয়ার আনীল জলে ফিকে বেগ্‌নি রঙ ধরে নিচ্ছে। ভূমধ্যসাগর থেকে, একশ মাইল পেরিয়ে আসছে মন্দমধুর ঠাণ্ডা হাওয়া। সে হাওয়া লাল দরিয়ার এই শেষ প্রান্তে তুলেছে ছোট ছোট তরঙ্গ। তার-ই উপর দিয়ে দুলে দুলে আসছে আমাদের স্টীমলঞ্চ। তার রঙ আসলে সাদা কিন্তু এই নীল লাল বেগ্‌নির পাল্লায় পড়ে তারো রঙ যেন বেগ্‌নি হতে আরম্ভ করলে।

স্টীমলঞ্চটি শুভ্রপুচ্ছ রাজহংসবৎ। রাজহাঁস সাঁতার কেটে যাবার সময় যে রকম শুভ্র বীচিতরঙ্গ জাগিয়ে তোলে, এ তরণীটিও তেমনি প্রপেলারের তাড়নায় জাগিয়ে তুলছে শুভ্র ফেননিভ ক্ষুদ্র ক্ষদ্রে অসংখ্য চক্রাবর্ত। বড় জাহাজের বিরাট প্রপেলার যখন এ রকম আবর্ত জাগায় তখন সেদিকে তাকাতে ভয় করে, মনে হয় ঐ দয়ে পড়লে আর রক্ষে নেই কিন্তু ক্ষুদে লঞ্চের ছোট্ট ছোট্ট দয়ের একটি সরল মাধুর্য আছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থাকা যায়।

সূর্য অস্ত গেল মিশর মরুভূমির পিছনে। পদ্মার সূর্যাস্ত, সমুদ্রের সূর্যাস্ত যেমন আপন আপন বৈশিষ্ট ধরে ঠিক তেমনি মরুভূমির সূর্যাস্তও এক দর্শনীয় সৌন্দর্য। সোনালী বালিতে সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত হয়ে সেটা আকাশের বুকে হানা দেয় এবং ক্ষণে ক্ষণে সেখানকার রঙ বদলাতে থাকে। তার একটা রঙ ঠিক চেনা কোন জিনিসের রঙ সেটা বুঝতে না বুঝতে সে রঙ বদলে গিয়ে অন্য জিনিসের রঙ ধরে ফেলে। আমাদের কথা বাদ দাও, পাকা আর্টিস্টরা পর্যন্ত এই রঙের খেলা দেখে আপন রঙের পেলেটের দিকে তাকাতে চান না।

সুয়েজ বন্দরে ইংরেজ সৈন্যদের একটা ঘাঁটি আছে। তাই রবি ঠাকুরের ভাষায় 'বড় সায়েবের বিবিগুলো নাইতে নেমেছে।' কেউ আবার ছোট্ট ছোট্ট নৌকো করে এখানে ওখানে ঘোরাঘুরি করছে। নৌকোগুলি হালফ্যাশনের ক্যাম্বিসে তৈরী। নৌকোর পাঁজর ভেনেস্তা কাঠের দড় শলা দিয়ে বানিয়ে তার উপর ক্যাম্বিস মুড়ে দেওয়া হয়েছে। এ জাতীয় নৌকো কলাপ্‌সিবল্-পোর্টেবল্ অর্থাৎ নৌ-ভ্রমণের পর ভেনেস্তার পাঁজর আর ক্যাম্বিসের চামড়া আলাদা আলাদা করে নিয়ে, ব্যাগের ভিতর প্যাক্ করে বাড়ি নিয়ে যাওয়া যায়। ওজন দশ সেরের চেয়েও কম। পরিপাটি ব্যবস্থা। অবশ্য নৌকো-গুলো খুবই ছোট। দুজন মুখোমুখি হয়ে কায়ক্লেশে বসতে পারে।

মাঝখানে সামান্য একটু ফাঁকা জায়গা সেখানে জল বাঁচিয়ে টুকিটাকি জিনিস রাখার ব্যবস্থা আছে। একজোড়া গুণী দেখি সেখানে একটা পোর্টেবলের উপর রেকর্ড লাগিয়েছে ব্লু ডানয়ুবের।

ঐ তো মানুষের স্বভাব, কিংবা বলব বজ্জাতি। যেখানে আছে সেখানে থাকতে চায় না। যে জোড়া ব্লু ডানয়ুব বাজাচ্ছে তাদের যদি এক্ষুনি ডানয়ুব নদীর উপরে ভাসিয়ে দাও তবে তারা গাইতে শুরু করবে, 'মাই হার্ট ইজ ইন্ দি হাইল্যাণ্ড ; মাই হার্ট ইজ নট্ হিয়ার' !

তাকে যদি তখন তুমি স্কটল্যাণ্ডের হাইল্যাণ্ডে নিয়ে যাও তবে সে গাইতে আরম্ভ করবে, 'ইম্ রোজেন-গার্তেন ফন্ সাঁসুসী' অর্থাৎ 'সাঁসুসীর গোলাপ-বাগানে'—সাঁসুসী পৎসদামে, বার্লিনের কাছে। তখন যদি তুমি তাকে বার্লিন নিয়ে যাও তবে সে গাইতে আরম্ভ করবে ভারতবর্ষের গান। জর্মানির বড় কবি কি গেয়েছেন শোনো,

গঙ্গার পার—মধুর গন্ধ ত্রিভুবন আলো ভরা—
কত না বিরাট বনস্পতিরে ধরে
পুরুষ রমণী সুন্দর আর শান্ত প্রকৃতি-ধরা
নতজানু হয়ে শতদলে পূজা করে।

আম্ গাঙ্গেস্ ডুফ্টেট্স্ লয়েস্টট্স্
উন্ট্ রীসেন্বয়মে ব্ল্যয়েন,
উন্ট্ শ্যোনে স্টিলে মেনশেন
ফর্ লটসব্লুমেন ক্লিয়েন।

এবং সেখানেও যখন মন ওঠে না তখন গেয়ে ওঠেন স্বপ্নপুরীর গান, যে পুরী কেউ কখনো দেখে নি, যার সঙ্গে আমাদের মত সাধারণ জনের কোনই পরিচয় নেই, কবিরাই শুধু যাকে মর্ত্যলোকে নামিয়ে আনার চেষ্টা করেন—

কোথা হায় সেই আনন্দনিকেতন ?
স্বপ্নেই শুধু দেখি সে ভুবন আমি,
রবিকর এল, কেটে গেছে হায়, যামী
ফেনার মতন মিলে গেল এ স্বপন।

আখ, ইয়েনেস লান্ট ডের্ ভনে,
ডাস্ জে ইষ্ অফ্ট্ ইম্ ট্রাউম ;
ডখ্ কম্ট্ ডী মর্গেন্জনে,
ফেরফ্লীস্ট্স্ ভী আইটেল্শাউম।

আমি কিন্তু যেখানে আছি সেখানে থাকতেই ভালোবাসি। নিতান্ত বিপদে না পড়লে আমি আপন গাঁ ছেড়ে বেরতে রাজী হই নে। দেশভ্রমণ আমার দু চোখের দুশমন। তাই যখন রবিঠাকুর আপন ভূমির গান গেয়ে ওঠেন তখন আমি উদ্বাহু হয়ে নৃত্য আরম্ভ করি। শোনো—

তোমরা বল, স্বর্গ ভালো
সেথায় আলো
রঙে রঙে আকাশ রাঙায়
সারা বেলা
ফুলের খেলা
পারুলডাঙায় !
হক না ভালো যত ইচ্ছে—
কেড়ে নিচ্ছে
কেই বা তাকে বলো, কাকী ?
যেমন আছি
তোমার কাছেই
তেমনি থাকি !
ঐ আমাদের গোলাবাড়ি
গোরুর গাড়ি
পড়ে আছে চাকা ভাঙা,
গাবের ডালে
পাতার লালে
আকাশ রাঙা।
সন্ধ্যেবেলায় গল্প বলে
রাখো কোলে
মিটমিটিয়ে জ্বলে বাতি।
চালতা-শাখে
পেঁচা ডাকে
বাড়ে রাতি।
স্বর্গে যাওয়া দেব ফাঁকি
বলছি, কাকী,
দেখব আমায় কে কী করে।
চিরকালই
রইব খালি।
তোমার ঘরে।

এ ছেলে তার কাকীমার কোলে বসে গলা জড়িয়ে যা বলেছে সে-ই আমার প্রাণের গান, তাতে আমার সর্ব দেহ-মন সাড়া দেয়। বিস্তর দেশভ্রমণের পর আমি তাই এই ধরণের একটি কবিতা লিখেছিলুম। কত না ঝুলোঝুলি, তারো বেশী ধন্না দেবার পর যখন কোনো সম্পাদক সেটা ছাপতে রাজী হন নি—'বসুমতী'র সম্পাদকও তাঁদেরই একজন—তখন তোমাদের ঘাড়ে আজ আর সেটা চাপাই কোন অধর্ম বুদ্ধিতে ?

দুম করে ধাক্কা লাগতে সংবিতে ফিরে এলুম। লঞ্চ পাড়ে লেগেছে। কিন্তু

এরকম ধাক্কা লাগায় কেন? আমাদের গোয়ালন্দ চাঁদপুরে তো এরকম বেয়াদবী ধাক্কা দিয়ে জাহাজ পাড়ে ভিড়ে না!

আবার!

'সেই পূর্ণিমা-সন্ধ্যায়,
দেশ পানে মন ধায়।'

॥ ১৩ ॥

সুয়েজ বন্দর কিছু ফেলনা বন্দর নয়। বন্দরটার 'সামরিক' গুরুত্ব—স্ট্রাটেজিক ইম্পর্টেনস্—আছে বলে ইংরাজকে তার নৌবহরের একটা অংশ এখানে রাখতে হয়। যে সব গোরাদের ক্যাম্বিসের নৌকোয় করে জলকেলি করতে দেখেছিলুম তারাই এই সব নৌবহরের তদারকি করে। ফলে তাদের জন্য এখানে দিব্য একটা কলোনি গড়ে উঠেছে।

কিন্তু কিছুই নয়, কিছুই নয়, পূর্বের তুলনায় আজ সুয়েজ বন্দরের কি আর জমক জৌলুস! কেপ অব গুড হোপের পথ না বেরনো পর্যন্ত, এমন কি তার পরও ভারতবর্ষ, বর্মা, মালয়, যবদ্বীপ, চীন থেকে যে-সব জিনিস রপ্তানি হত তার অধিকাংশই সমুদ্রপথে এসে নামত সুয়েজ বন্দরে—এবং ভুললে চলবে না, তখনকার দিনে প্রাচ্যই রপ্তানি করত বেশী। এখান থেকেই ফিনিশিয়ানরা, তার পরে গ্রীক, তার পর রোমান, তারপর আরবরা ভারতের দিকে রওয়ানা হত। ভারত থেকে মাল এনে সুয়েজে নামানো হত। সুয়েজ থেকে একটা খালে করে এসব মাল যেত কাইরোতে এবং সেখান থেকে নীল নদ বয়ে সে মাল পৌঁছত আলেক-জেন্দ্রিয়ার—আরবীতে যাকে বলে ইস্কন্দরিয়া। সেখান থেকে ভেনিসের মাধ্যমে তাবৎ ইয়োরোপ।

এই সব মাল কেনা-কাটা আমদানি রপ্তানিতে ভারতবর্ষের প্রচুর সদাগর-শ্রেষ্ঠী, মাঝি-মাল্লার বিরাট অংশ ছিল। যে যুগে ভাস্কো-দা-গামা এ পথকে নাকচ করে দেবার জন্য আফ্রিকা ঘুরে ভারতে আসার পথ বের করলেন সে যুগে পূর্বপ্রাচ্যের তাবৎ ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল ভারতীয় এবং সুয়েজ অঞ্চলের মিশরীয়দের হাতে।

এক দিকে ভারতীয় এবং মিশরীয়; অন্য দিকে ভাস্কো-দা-গামার বংশধর পর্তুগীজ দল।

জাত তুলে কথা কইতে নেই, তাই ইশারা-ইঙ্গিতে কই। এই যে পর্তুগীজ গুণ্ডারা গোয়া নিয়ে আজ দাবড়াদাবড়ি করছে এ-কিছু নূতন নয়। ওদের স্বভাব ঐ। এক কালে তারা জলের বোম্বেটে ছিল, এখন তারা ডাঙার গুণ্ডা। 'বোম্বেটে' শব্দের মূল আর অর্থ অনুসন্ধান করলেই কথাটা সপ্রমাণ হবে। 'বোম্বেটে' কিছু বাঙালীদের উর্বর মস্তিষ্ক থেকে বানানো আজগুবি কথা নয়। 'বোম্বেটে' শব্দ এসেছে ঐ পর্তুগীজদের ভাষা থেকেই—bombardeiro, অর্থাৎ যারা না-বলে না-কয়ে যত্র-তত্র bomba—বোমা ফেলে। হয়তো বলবে, আমাদের

কলকাতাতেই কেউ কেউ এরকম বোমা ফেলে থাকে,—কিন্তু তাদের সংখ্যা এতই নগণ্য এবং ঘৃণ্য যে আজ তাবৎ কলকাতাবাসীকে কেউ বোম্বেটে নাম দেয় নি। কিন্তু তাবৎ পর্তুগীজরাই এই অপকর্ম করত বলে তাদের নাম হয়ে গেল 'বোম্বেটে'।

ওদের দ্বিতীয় নাম—আমাদের বাঙলা ভাষাতেই—'হারমদ'। সেটাও পর্তুগীজ কথা 'armada' থেকে এসেছে। বিখ্যাত কোষকার স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস তাঁর সুবিখ্যাত অভিধানে এ শব্দের অর্থ করতে গিয়ে বলেছেন, 'পর্তুগীজ জলদস্যুরা যখন বাঙলা দেশের সুন্দরবন অঞ্চলে প্রথম হানা দেয় তখন তাদের অসহ্য অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বাঙালীরা সুন্দরবন অঞ্চল ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। আমাদের ঘরোয়া কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে আছে,—

> 'ফিরিঙ্গির দেশখান বাহে কর্ণধারে।
> রাত্রিতে বহিয়া যায় হারমদের ডরে॥'

অর্থাৎ এই সব 'হারমদ'—'armada,' 'বোম্বেটে' 'bombardeiro'-দের ডরে তখন দক্ষিণ-বাঙলার লোক নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতে পারত না।

এস্থলে যদিও অবান্তর, তবু প্রশ্ন, বাঙালীরা এত ভয় পেয়ে পালাল কেন?

উত্তরে বলি, যে-কোনো বন্দরে, জাহাজ থেকে নেমে, এক পাল লোক সেটাকে লুট-তরাজ করতে পারে। এটা আদপেই কোনো কঠিন কর্ম নয়, যদি,—

এইখানেই এক বিরাট 'যদি'—

যদি সে রাজা তার সমদ্র-কূল রক্ষার জন্য নৌবহর মোতায়েন না করেন। জনপদ রক্ষা করার জন্য যে রকম পুলিস-সেপাই রাজাকেই রাখতে হয়, ঠিক তেমনি সমুদ্র-কূলবাসীদের হেপাজতির জন্য রাজাকেই নৌবহর রাখতে হয়।

কিন্তু হায়, তখন বাঙলা দেশ হুমায়ুন, আকবর মোগল বাদশাহের হুকুমে চলে। মোগলরা এদেশে এসেছে মধ্য এশিরার মরুভূমি থেকে। তারা শক্ত মাটির উপরে খাড়া পদাতিক, অশ্ববাহিনী, হস্তিযূথ, উষ্ট্রবাহিনী চতুরঙ্গ সৈন্য-সামন্তের কি প্রয়োজন সে-তত্ত্ব বিলক্ষণ বোঝে, কিন্তু নৌবহর রাখার গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন। বাঙলা, উড়িষ্যা, গুজরাত থেকে তাদের কাছে অনেক করুণ আবেদন নিবেদন গেল—'হুজুরেরা দয়া করে একটা নৌবহরের ব্যবস্থা করুন; না হলে আমরা ধনে-প্রাণে মানে-ইজ্জতে গেলুম।'

কথাগুলো একদম শব্দার্থে খাঁটি। 'ধন' গেল, কারণ, পর্তুগীজ বোম্বেটে-দের অত্যাচারে ব্যবসা-বাণিজ্য আমদানী-রপ্তানি বন্ধ। 'প্রাণ' যায়, কারণ তারা বন্দরে বন্দরে লুঠ-তরাজের সময় যে-সব খুন-খারাবি করে তারই ফলে বন্দরগুলো উজাড় হতে চলল। মান-ইজ্জত? ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে পর্তুগালের হাটবাজারে গোলাম-বাঁদী, দাসদাসীরূপে বিক্রয় করছে।

কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা! মোগল বাদশারা বসে আছেন পশ্চিম পানে, খাইবার-পাসের দিকে তাকিয়ে। ঐ থেকেই তাঁরা এসেছেন স্বয়ং, তাঁদের পূর্বে এসেছে পাঠান শক্-হূন্-সিথিয়ান্-এরিয়ান। তাই তাঁরা তৈরী করেছেন

চতুরঙ্গ। ওদের ঠেকাবার জন্য। নৌবহর চুলোয় যাক গে। ভারতবর্ষ তো কখনো সমুদ্রপথে পরাজিত এবং অধিকৃত হয় নি। তার জন্য বৃথা দুশ্চিন্তা এবং অযথা অর্থক্ষয় অতিশয় অপ্রয়োজনীয়।

ফলে কি হল? পর্তুগীজদের তাড়িয়ে দিয়ে ইংরেজ সমুদ্রপথেই মোগলদের মুণ্ডু কেটে এদেশে রাজ্যবিস্তার করল।

সেকথা পরের কথা। উপস্থিত আমরা আলোচনা করছি, ভারতীয় উপকূলবাসীরা পর্তুগীজদের সঙ্গে যে লড়াই দিয়েছিল তাই নিয়ে। এরা তো মোগল-দের কাছ থেকে কোনো সাহায্যই পেল না, উলটে যারা লড়ছিল, তাদের সঙ্গে আরম্ভ করলেন শত্রুতা।

গুজরাতের রাজা বাহাদুর শাহ্ বাদশাহ তখন লড়ছিলেন পর্তুগীজ বোম্বেটের সঙ্গে। তার প্রধান কারণ, গুজরাতের সুরট, ব্রউচ (ভৃগু), খম্বাত (Cambay, স্তম্ভপুরী) ভিতর দিয়ে উত্তর-ভারতের যাবতীয় পণ্যবস্তু ইউরোপ যেত। সে ব্যবসা তখন পর্তুগীজ বোম্বেটেদের অত্যাচারে মর-মর। বাহাদুর শাহ্ বাদশার তখন দুই শত্রু। একদিকে সমুদ্রপথে পর্তুগীজ, অন্যদিকে স্থলপথে রাজপুত। প্রথম রাজপুতদের হারিয়ে দিয়ে পর্তুগীজদের খতম করার প্ল্যান করে তিনি পর্তুগীজদের সঙ্গে করলেন—আর্মিস্টিস্—সমরকালীন সন্ধি। তারপর হানা দিলেন রাজপুতানায়।

দিল্লীতে তখন রাজত্ব করেন বাদশা হুমায়ুন। ইতিহাসে নিশ্চয়ই পড়েছ, তখন এক রাজপুতানী শাহ-ইন্-শাহ্ দিল্লীশ্বর জগদীশ্বরকে পাঠালেন রাখী। সেই রাখীর সম্মানার্থে হুমায়ুন ছুটলেন রাজপুতানার দিকে। বুঝলেন না, বাহাদুর শাহ্ হেরে গেলে পর্তুগীজদের আর ঠেকাতে পারবেন না। পূর্বেই বলেছি, নৌবহর নৌসাম্রাজ্য বলতে কি বুঝায়, মোগলরা সে কথা আদপেই বুঝত না।

হুমায়ুন রাজপুতানায় পেঁছিলেন দেরিতে। বাহাদুর শাহ্ বাদশাহ তখন রাজপুতানা জয় করে ফেলেছেন। রাজপুতানীরা জৌহরব্রতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। হুমায়ুন তখন আক্রমণ করলেন বাহাদুর শাহকে। বাহাদুর তখন পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিলেন চম্পানির দুর্গে। সেখানে কি করে হুমায়ুন দুর্গ জয় করলেন, সে কাহিনী অবশ্য ইতিহাসে পড়েছ। ইতিমধ্যে বাহাদুর দুর্গ ত্যাগ করে পালিয়েছেন গুজরাতে আপন রাজধানী আহমদাবাদের দিকে। হুমায়ুন সেদিকে তাড়া লাগাতে তিনি পালালেন সৌরাষ্ট্র অর্থাৎ কঠিওয়াড়ার দিকে। সেখানকার কোনো কোনো উপকূলে তখন পর্তুগীজরা বেশ পা জমিয়ে বসেছে।

ইতিমধ্যে হুমায়ুন খবর পেলেন, বিহারের রাজা শের শাহ দিল্লী জয় করার উদ্দেশ্যে সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। তদ্দণ্ডেই তিনি বাহাদুরকে ছেড়ে দিয়ে ছুটে চললেন দিল্লীর দিকে। সেখানে শের শাহের কাছে মার খেয়ে তিনি পালালেন কাবুলে। তারপর শের শাহ ব্যস্ত হয়ে রইলেন, উত্তর ভারতে আপন প্রতিষ্ঠা কায়েম করতে বাহাদুরকে তাড়া দেবার ফুরসত তাঁর নেই।

বাহাদুর হাঁফ ছেড়ে বেঁচে বললেন, 'এইবারে তবে পর্তুগীজ বদমায়েশদের ঠাণ্ডা করি। পর্তুগীজরা ততদিনে বুঝতে পেরেছে, বাহাদুরের পিছনে তখন আর শত্রু নেই। তাই তারা আরম্ভ করলে তাদের পুরনো বদমায়েশি। বাহাদুর শাহকে আমন্ত্রণ জানালে, তাদের জাহাজে এসে, ব্যবসা-বাণিজ্য সন্ধি-চুক্তি সম্বন্ধে যাবতীয় আলোচনা-পরামর্শ করার জন্য।

বাহাদুর আহাম্মুকের মত কেন গেলেন, সেই নিয়ে বিস্তর ঐতিহাসিক বহু আলোচনা-গবেষণা করেছেন। সে নিয়ে আজ আর আলোচনা করে কোনো লাভ নেই।

তা সে যাই হোক, একথা কিন্তু সত্য, বাহাদুর জাহাজে ওঠা মাত্রই বুঝতে পারলেন, তিনি ফাঁদে পা দিয়েছেন। পর্তুগীজদের বদ-মতলব তাঁকে খুন করার, তাঁর সঙ্গে সন্ধি-সুলেহ্ করার জন্য নয়। তক্ষুনি তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন জলে—সাঁতরে পারে ওঠার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে দশ-বিশটা পর্তুগীজও হাতে বৈঠা নিয়ে তাঁর পিছনে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেই সব বৈঠে দিয়ে গুজরাতের শাহ ইন্‌শাহ্ বাদ্‌শাহ্ বাহাদুর শাহের মাথা ফাটিয়ে দিলে।

পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের এই শেষ লড়াই।

* * *

কিন্তু আজ সুয়েজ বন্দরে ঢোকার সময় আমি দেশপানে ফিরে গিয়ে এসব কথা পাড়ছি কেন?

কারণ, এই সুয়েজের রাজাকেই বাহাদুর তখন ডেকেছিলেন তাঁর নৌবাহিনী নিয়ে এসে পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে তাঁকে নৌ-সমরে সাহায্য করতে। পূর্বেই বলেছি, সুয়েজও বেশ জানত, পর্তুগীজদের বোম্বেটেগিরি তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য কতখানি মারাত্মক। শুধু বাহাদুর নয়, তাঁর পূর্বপুরুষগণও বার বার এঁদের ডেকেছেন, দুয়ে মিলে পর্তুগীজদের একাধিকবার ঝিঙে-পোস্ত চন্দন-বাটা করেছেন!

তারা তখন যেসব কামান এনেছিল সেগুলো ফেরত নিয়ে যায় নি। গুজরাতের বাদশা যখন বললেন, 'এগুলো রেখে যাচ্ছেন কেন?' তখন তারা বলেছিল, 'এই সব পর্তুগীজ বদমায়েশরা আবার কখন হানা দেবে তার ঠিক-ঠিকানা কি? আবার তখন কামান নিয়ে আসার হাঙ্গামা-হুজ্জোত ঠেলবার কি প্রয়োজন?'

এ ঘটনার দশ বৎসর পর আকবর গুজরাত জয় করেন। তিনি কামান-গুলো দেখে তাদের পূর্ববর্তী ইতিহাস জেনেও নৌ-বাহিনী নৌ-সমরের মূল্য বুঝতে পারেন নি। তাই পর্তুগীজরা জিতল। তাদের হারিয়ে দিয়ে ইংরেজ জিতল। ক্রমে ক্রমে মাদ্রাজ কলকাতা হয়ে তাবৎ ভারতবর্ষে আপন রাজ্য বিস্তার করল।

* * *

আজ সুয়েজে ঢুকে সেই কথাই স্মরণে এল, এই সুয়েজের লোকই একদিন আমাদের সঙ্গে একজোট হয়ে পর্তুগীজ বর্বরতার বিরুদ্ধে কী লড়াই-ই না দিয়েছিল!

॥ ১৪ ॥

সম্বিতে ফিরে এলুম। দেখি, বখেড়া লেগে গিয়েছে। বন্দরে নেমে যে দপ্তরের ভিতর দিয়ে যেতে হয় সেখানে আমাদের—অর্থাৎ আবুল আসফিয়ার দলকে আটকে দিয়েছেন বন্দরের কর্তারা। কেন, কি ব্যাপার? আমাদের হেল্‌থ সার্টিফিকেট কই? সে আবার কি জ্বালা? দিব্য তো বাবা লণ্ড থেকে নেমে পায়ে হেঁটে এখানে এলুম, স্ট্রেচারে চেপে কিংবা মড়ার খাটিয়ায় শুয়ে আসে নি; তবে আমাদের হেল্‌থ সম্বন্ধে এত সন্দ কেন? 'উঁহুঁ', কর্তারা বলছেন, আমরা যে ভিতরে ভিতরে বসন্ত, প্লেগ, কলেরা, ৎসেৎসে জ্বর (সে আবার কি মশাই?) স্পটেড ফীভার (ততোধিক সমস্যা; আলপনা-কাটা জ্বর?) ইত্যাদি যাবতীয় মারাত্মক রোগে ভুগছি না তার সার্টিফিকেট কই। আমরা যে এসব পাপিষ্ঠ রোগ তাঁদের সোনার দেশ মিশরে ছড়াব না, তার কি জিম্মাদারি?

শুনে পার্সি বলছে, 'স্যর, এসব মারাত্মক রোগেই যদি ভুগব, তবে বাপ-মার সেবাশুশ্রূষা ছেড়ে, পাদ্রীসাহেবের শেষ ধর্মবচন না শুনে এখানে আসব কেন?'

দ্যাশের লোক প্রতুল সেন বলছে, 'মিশরের সঙ্গে এরকম ধারা দুশমনি আমরা করতে যাব কেন?'

তার বউ রমা বলছে, 'পিরামিড তোমাদের গৌরবের বস্তু; আমাদের যে-রকম তাজমহল। তার কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ সে বিচারের সুযোগ না দিয়ে আপনারা আপন দেশের প্রতি কি অবিচার করছেন, বুঝতে পারছেন কি?'

আমি কানে কানে রমাকে শুধালুম, 'তবে কুকের সঙ্গে যে সব লোক এসেছিল তারা পেরুল কি করে?'

রমা বললে, 'চুপ করুন; ওরা যে ঐ সব হলদে হলদে কাগজ দেখালে। আমাদেরও আছে। জাহাজে ফেলে এসেছি। আমরা তো জানতুম না এখানে ওসব রাবিশের দরকার হবে। কুকের লোক জানত, ওরা তাই সার্টিফিকেট এনেছিল।'

ওঃ! তখন মনে পড়ল, পাসপোর্ট নেবার সময় ভ্যাক্‌সিনেশন ইনকুলেশন করিয়েছিলুম বটে এবং ফলে একখানা হলদে রঙের সার্টিফিকেটও পেয়েছিলুম বটে। সেইটে নেই বলেই এখানে এ গর্দিশ।

কিন্তু এ শিরঃপীড়া তো আমাদের নয়। আবুল আসফিয়া যখন আমাদের দলের নেতা তখন তাঁরই তো বোঝা উচিত ছিল যে ঐ ম্যাটমেটে হলদে রঙের কাগজটা আমাদের সঙ্গে নিয়ে আসা অতিশয় প্রয়োজনীয়। এই সামান্য কাণ্ড-জ্ঞান যার নেই—

চিন্তাধারায় বাধা পড়ল। দেখি, পল আমার হাত টানছে, আর কানে কানে বলছে, 'চলুন, জাহাজে ফিরে যাই।'

কিন্তু আবুল আসফিয়া কোথায়?

তিনি দেখি নিশ্চিন্ত মনে, একে সিগরেট দিচ্ছেন, ওকে টফি খাওয়াচ্ছেন, তাকে চকলেট গেলাচ্ছেন। কোলে আবার একটা বাচ্চা! খোদায় মালুম কার?

লোকটা তাহলে বদ্ধ পাগল! পাগলের সংস্পর্শ ত্যাগ করাই ধর্মাদেশ।

পলের হাত ধরে পোর্ট-আপিস ছেড়ে সমুদ্রের কিনারায় পেঁছিলুম। তখন দেখি আমাদের জাহাজ ভোঁ-ভোঁ করে ভোঁ-ভোঁ।

॥ ১৫ ॥

দেশভ্রমণ আমি বিস্তর করেছি। সামান্য কিছু ঘটতে না ঘটতেই আমি বিচলিত হয়ে পড়ি নে। রিফ্রেশমেণ্ট রুমে চা খেতে গিয়েছি, ওদিকে গাড়ি আমার বাক্স-তোরঙ্গ বিছানা-বালিশ নিয়ে চলে গিয়েছে, বিদেশে-বিভুঁইয়ে মনি-ব্যাগ চুরি যাওয়াতে আমি কপর্দকহীন, ইতালির এক রেস্তোরাঁয় দুই দলে ছোরা-ছুরি হচ্ছে—আমি নিরীহ বাঙালী এক কোণে দেয়ালের চুনকামের মতো হয়ে গিয়ে আত্ম-গোপন করার চেষ্টা করছি—এ সব ঘটনা আমার জীবনে একাধিকবার ঘটেছে কিন্তু এবার সুয়েজ বন্দরে, আবুল আসফিয়ার পাল্লায় পড়ে যে বিপদে পড়লুম তার সঙ্গে অন্য কোনো গর্দিশের তুলনা হয় না।

আমাদের জাহাজ তার আপন পথে চলে গিয়েছে। আমরা এখানে আটকা পড়েছি হেল্থ সার্টিফিকেট নেই বলে। তা হলে এখানকার কোনো হোটেলে উঠতে হয় এবং প্রতি জাহাজে ধন্না দিতে হয়, আমাদের জায়গা দেবে কি না। খুব সম্ভব দেবে না। কারণ সেই পোড়ারমুখো হেল্থ সার্টিফিকেট না থাকলে জাহাজেও উঠতে দেয় না। এস্থলে 'জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ' নয়, এখানে 'জলে সাপ, ডাঙায়ও সাপ।'

জাপানী আক্রমণের সময় একটা গাইয়া গান শুনেছিলুম,

> সা রে গা মা পা ধা নি
> বোমা পড়ে জাপানী
> বোমা-ভরা কালো সাপ
> ব্রিটিশে কয় 'বাপ রে, বাপ!'

তাই মনে হল, জাপানীরা যেন জলে ডাঙায়, উভয়ত হেল্থ সার্টিফিকেটের সাপ ফেলে গেছে।

আর ডাঙার হোটেলে থাকতে দেবেই বা কদিন? আমাদের ট্যাঁকে যা কড়ি তার খবর হোটেলওয়ালা ঠিক ঠিক ঠাহর করতে পেরে নিশ্চয়ই আমাদের 'দুদ্দুর' করে তাড়িয়ে দেবে। তখন যাব কোথায়, খাব কি? তখন অবস্থা হবে সুয়েজ বন্দরের ধনী-গরিব সক্কলের কাছে ভিখ-মাঙবার। কিন্তু কেউ কিছু দেবে কি? রেল-ইস্টিশানে যখন কেউ এসে বলে, 'মশাই, মনিব্যাগ চুরি গিয়েছে; চার গণ্ডা পয়সা দিন, বাড়ির ইস্টিশানে যেতে পারব,' তখন কি কেউ শোনা মাত্রই পয়সা ঢালে?

ইয়া আল্লা, এ কোথায় ফেললে, বাবা ? এ যেন অকুল সমুদ্রের মাঝখানে দ্বীপবাস।

মানুষ যখন ভেবে ভেবে কোনো কিছুর কূল-কিনারা করতে পারে না তখন অন্যের উপর নির্ভর করার চেষ্টা করে। পল-পার্সিকে নিয়ে ফিরে গেলুম আবুল অসফিয়ার কাছে।

তিনি দেখি ঠিক সেই মুহূর্তেই পোর্ট অফিসারকে শুধাচ্ছেন, তা হলে হেল্‌থ সার্টিফিকেট কোথায় পাওয়া যায় ?'

এ যেন পাগলের প্রশ্ন ! হেল্‌থ সার্টিফিকেট তো পাওয়া যাও আপন দেশে ; এখানে পাব কি করে ?

তাই আপন কানকে বিশ্বাস করতে পারলুম না যখন অফিসার বললেন, 'কেন, ঐ তো পাশের দফ্‌তরে।'

তাহলে এতক্ষণ ধরে এ-সব টানা-হ্যাঁচড়ার কি ছিল প্রয়োজন ? ভালো করে শোনার পূর্বেই আমরা সব কটা প্রাণী ছুট দিলুম সেই দফ্‌তরের দিকে। জলের সাপ, ডাঙার সাপ, সা-রে গা-মার জাপানী সাপ সব কটা তখন এক জোটে যেন আমাদের তাড়া লাগিয়েছে।

দফ্‌তরের দরওয়াজা খোলাই ছিল। দেখি, এক বিরাট-বপু ভদ্রলোক ছোট্ট একখানা চেয়ার তাঁর বিশাল কলেবর গুঁজে-পুরে টেবিলের উপর পা দুখানি তুলে ঘুমুচ্ছেন। আমরা অট্টরোল করে না ঢুকলে নিশ্চয়ই তাঁর নাকের ফরফরানি শুনতে পেতুম। আমাদের, 'হেল্‌থ সার্টিফিকেট,' 'হেল্‌থ সার্টিফিকেট, 'প্লীজ' 'প্লীজ' এই উৎকট সমবেত সঙ্গীতে—অবশ্য ইয়োরোপীয় সঙ্গীত, যার এক সপ্তকে বাজে তোড়ী অন্য সপ্তকে পূরবী—ভদ্রলোক চেয়ার-সুদ্ধ লাফ মেরে উঠলেন।

শতকরা নিরানব্বুই জন যাত্রী হেল্‌থ সার্টিফিকেট নিয়ে বন্দরে নামে। সুতরাং এ ভদ্রলোকের শতকরা নিরানব্বুই ঘণ্টাই কাটে আধো ঘুমে, আধো জাগরণে। তাই আমরা কি বেদনায় কাতর হয়ে তাঁর কাছে এসেছি, সেটা বুঝতে তাঁর বেশ একটু সময় লাগল।

তাঁর ভাষা আমরা বুঝি নে, তিনি আমাদের ভাষা বোঝেন না। তৎসত্ত্বেও যে মারাত্মক দুঃসংবাদ তিনি দিলেন তার সরল প্রাঞ্জল অর্থ, যে-ডাক্তার আমাদের পরীক্ষা করে সার্টিফিকেট দেবেন তিনি বাড়ি চলে গেছেন।

গোটা সাতেক ভাষায় তখন যে আর্তরব উঠলো তাকে বাঙলায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায়,—

ঐ যুঃ-যা !

ফরাসীরা বলেছিল, 'ম' দিয়ো, ম' দিয়ো !'

জর্মনরা বলেছিল, 'হের গট্‌, হের গট্‌ !'

ইরাণীরা বলেছিল, 'ইয়াল্লা, ইয়া খুদা।'

আর কে কি বলেছিল, মনে নেই।

কিন্তু সৃষ্টিকর্তার অসীম করুণা, আল্লাতালার বেহদ্দ্‌ মেহেরবানি, রাখে কেষ্ট মারে কে, ধন্যবাদ ধন্যবাদ, শুনি অপিসার বলছেন, 'কিন্তু আপনারা যখন

বহাল তবিয়তে, দিব্য ঘোরাফেরা করছেন, তখন আপনারা নিশ্চয়ই স্বাস্থ্যবান। সার্টিফিকেট আমিই দেব। এই নিন ফর্ম। ফিল্ অপ্ করুন।' বলেই এক-তাড়া বিশ্রী নোংরা বাদামী ফরম আমাদের দিকে এগিয়ে দিলেন। কিন্তু আমার মনে হল, আহা কী সুন্দর! যেন ইস্কুলের প্রোগ্রেস-রিপোর্ট, আর সব ক-টাতে লেখা আছে আমি ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছি।

শকুনির পাল যে রকম মড়ার উপর পড়ে, আমরা সবাই ঝাঁপিয়ে পড়লুম সেই 'গাজী মিয়ার বস্তানির' উপর। উহুঁ, ভুল উপমা হল, বীভৎস রসের উপমা দিতে আলংকারিকরা বারণ করেছেন। তাহলে বলি, ফাঁসির হুকুম নাকচ করে দেবার অধিকার পেলে মা যে রকম নাকচের ফর্মের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

উৎসাহে, উত্তেজনায় আমাদের সব্বাইকার মাথা তখন ঘুলিয়ে গিয়েছে। ফর্মে প্রশ্ন, 'কোন সালে তোমার জন্ম?' কিছুতেই মনে পড়ছে না, ১৮০৪— না ১৭০৪? প্রশ্ন, 'কোন বন্দরে জাহাজ ধরেছ?' বেবাক ভুলে গিয়েছি, হংকং না তিব্বত! প্রশ্ন, 'যাবে কোথায়?' হায়, হায়, টাকের বাকি আড়াই গাছা চুল ছিঁড়ে ফেললুম, তবু কিছুতেই মনে পড়ছে না, শনিগ্রহে না ধ্রুবতারায়!

তা সে যাক্ গে, আমরা কি লিখেছিলুম তাই নিয়ে উৎকণ্ঠিত হওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। পরে জানলুম, সেই সহৃদয় অপিসারটি ইংরিজি পড়তে পারেন না।

ঝপাঝপ বেগনি স্ট্যাম্প মেরে তিনি আমাদের গণ্ডা আড়াই সার্টিফিকেট ঝেড়ে দিলেন। আমরা সেগুলো বসরাই গোলাপের মতো বুকে গুঁজে খোলা-খোঁয়াড়ের গরুর মতো বন্দরের অপিস থেকে সুড়সুড় করে স্বাধীনতার মুক্ত বাতাসে বেরিয়ে এলুম। এখন আমরা ইচ্ছে করলে কেপ্ কমরিন যেতে পারি, ইচ্ছে না করলে কোথাও যাবো না।

পল বললে, 'স্যর, কি লিখতে কি লিখেছি, কিচ্ছুটি জানি নে।'

আমি বললুম, 'কিচ্ছু পরোয়া কোরো না, ভাই! আম্মো তদবৎ!'

ফরাসী রমণী হেসে বললেন, 'মসিয়ো পল, আমাকে যদি জিজ্ঞেস করত, তুমি বকরী না মানুষ? তা হলে আমি প্রথম খানিকটে ব্যা ব্যা করে নিতুম, তার পর আপন মনে খানিকটে ফরাসী বলে নিয়ে দেখতুম কোন্‌টা ভালো শোনাচ্ছে এবং সেই হিসেবে লিখে দিতুম বক্‌রী না মানুষ।'

তারপর খানিকটে ভেবে নিয়ে বললেন, 'অবশ্য বকরীর সম্ভাবনাই ছিল বেশী।'

আমার বুকে বড্ড বাজল। নিজের প্রতি এ যে অতিশয় অহেতুক অশ্রদ্ধা। বললুম, 'মাদ্‌মোয়াজেল, বরঞ্চ 'কোকিল' লিখলে আমি আপত্তি জানাতুম না। আপনার মধুর কণ্ঠ—'

'ব্যস, ব্যস, হয়েছে, হয়েছে; থ্যাংকয়্যু!'

ততক্ষণে রেল-স্টেশনের কাছে এসে পৌঁছেচি। দূর থেকে দেখি, ট্রেন দাঁড়িয়ে। আমরা পা চালালুম। কিন্তু গেটের কাছে আসতে না আসতেই ট্রেন-খানা 'ধ্যাৎ, ধ্যাৎ' করে যেন আমাদের ঠাট্টা করে প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে গেল।

এবং একটা লোক—চেনা-চেনা মনে হল—আমাদের দিকে হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে বিদায় জানালে, তার পর যেন কত না বিরহবেদনাতুর সেই ভাবে দু-হাতের উল্টো দিক দিয়ে অদৃশ্য অশ্রু মুছলে।

এ মস্করার অর্থ কি?

শুনলুম, আজ সন্ধ্যায় কাইরো যাবার শেষ ট্রেন এই চলে গেল। কাল সকালের ট্রেন ধরলে কাইরো মাথায় থাকুন সঈদ বন্দরে পেঁছিতে পারব না, অর্থাৎ নির্ঘাত জাহাজ মিস করব। এই শেষ ট্রেন ছিল আমাদের শেষ ভরসা।

এ দুঃসংবাদ শুনে আমি তো মাথায় হাত দিয়ে মাটিতে বসে পড়লুম।

কিন্তু ভগবান মানুষকে নিয়ে এ রকম লীলা-খেলা করেন কেন? সেই যদি সুয়েজ বন্দরে আটক হতে হল, সেই যদি বোট্ মিস করতে হল, তবে ঐ হেল্থ সার্টিফিকেটের প্রথম খোঁয়াড়ে আটকা পড়লেই তো হত। সে ফাঁড়া কাটিয়ে এসে এখানে আবার কানমলা খাবার কি প্রয়োজন ছিল?

শুনেছি, কোনো কোনো জেলার ফাঁসির আসামীকে নাকি গারদের দরজা সামান্য খুলে রেখে জেল থেকে পালাবার সুযোগ দেয়। আসামী ভাবে, জেলার বেখেয়ালে দরজা খুলে রেখে গিয়েছে। তার পর অনেক গা-ঢাকা দিয়ে, একে এড়িয়ে, ওকে বাঁচিয়ে যখন সে জেলের সামনে মুক্ত বাতাসে এসে ভাবে সে বেঁচে গেছে, ঠিক তখনই তাকে জাবড়ে ধরে দুই পাহারাওয়ালা—সঙ্গে জেলার। জেলার তাকে চুমো খেয়ে বলে, 'ভাই, জীবন কত দুঃখে ভরা। তার থেকে তুমি নিষ্কৃতি পাবে, কাল ভোরে। আহাম্মুখের মতো সে-নিষ্কৃতি থেকে এই হেয় নিষ্কৃতির চেষ্টা তুমি কেন করছিলে, সখা?'

পরদিন তার ফাঁসি হয়।

আমার মনে হয়, ফাঁসির চেয়েও ঐ যে জেলের বাইরে ধরা-পড়া সেটা অনেক কঠোর, কঠিন, নির্মম।

কারণ, মৃত্যু, সে তো কিছু কঠিন কঠোর অভিজ্ঞতা নয়। ডাক্তাররাও বলেন, রোগে মানুষ কষ্ট পায়, কিন্তু ঠিক প্রাণত্যাগ করার সময় মানুষ কোনো বেদনা অনুভব করে না।

তাই গুরুদেব বলছেন,—

"কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়
জয় অজানার জয়!"

ঠিক সেই রকমই এক মহাপুরুষ—হিটলারের নৃশংসতার বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত ছিলেন বলে এঁর ফাঁসি হয়—জেলে বসে কবিতা লিখেছিলেন,

ডু কান্সট্ উন্স্ ডুর্ষ্ ডেস টডেস ট্যারেন্
ট্রয়েমেন্ড্ ফ্যুরেন্
উন্ট্ মাখস্ট্ উন্স্ আউফ আইনমাল্ ফ্রাই।

তুমি আমাদের মৃত্যুর দ্বার দিয়ে হাতে ধরে নিয়ে চল।
--আমরা যেন স্বপ্নে চলেছি—
হঠাৎ দেখি, আমরা স্বাধীন।

এই বই ছোটদের জন্য লেখা। তারা হয়তো শুধবে, মৃত্যুর কথা তাদের শোনাচ্ছি কেন? আমার মনে হয়, শোনানো উচিত। সাধারণত বড়রা ছোটদের যত আহাম্মুখ মনে করেন আমি বুড়ো হয়েও সে রকম ভাবি নে।

আমার যখন বয়স তেরো, তখন আমার সব চেয়ে ছোট ভাই বছর দুয়েক বয়সে মারা যায়। ভারী সুন্দর ছেলে সে। আমার কোলে বসতে বড্ড ভালোবাসত। ঐ দু বছর বয়সে সে আমার সাইকেলের রডে বসে হ্যাণ্ডেল আঁকড়ে ধরে থাকত আর আমি বাড়ির লনে পাক লাগাতুম। মাঝে মাঝে সে খল-খল করে হেসে উঠত আর মা বারন্দায় দাঁড়িয়ে খুশী হয়ে আমাদের দিকে তাকাতেন কিন্তু মাঝে মাঝে বলতেন, 'থাক, হয়েছে। এখন ওকে তুই নামিয়ে দে।'

এক দিন সে চলে গেল।

আমি বড্ড কষ্ট পেয়েছিলুম।

তখন আমায় কেউ বুঝিয়ে বলে নি, মৃত্যু কাকে বলে? তার অর্থ যদি আমাকে তখন কেউ বুঝিয়ে বলত তবে বেদনা লাঘব হত।

বড়রা ভাবেন, ছোটদের বেদনাবোধ কম। সম্পূর্ণ ভুল ধারণা।

তোমরা যারা আমার বই পড়ছ, তোমাদের কেউই কি ভাইবোন হারাও নি? সে বুঝবে।

কবিগুরুর ছোট ভাই-বোন ছিলেন না। তাই বিস্ময় মানি, তিনি কি করে লিখলেন,—

কাকা বলেন, সময় হলে
সবাই চলে
যায় কোথা সেই স্বর্গপারে।
বল্ তো কাকী
সত্যি তা কি একেবারে?
তিনি বলেন, যাবার আগে
তন্দ্রা লাগে
ঘণ্টা কখন ওঠে বাজি,
দ্বারের পাশে
তখন আসে
ঘাটের মাঝি।
বাবা গেছেন এমনি করে
কখন ভোরে
তখন আমি বিছানাতে।

তেমনি মাখন
গেল কখন
অনেক রাতে ।*

এই কাকাটি সত্যই ছোট ছেলের বেদনা বুঝতেন ।

কিন্তু মূল কথা থেকে কত দূরে এসে পড়েছি । তাই মৃত্যু সম্বন্ধে শেষ কথা বলে মূল কথায় ফিরে যাই । ভগবানে আমার অবিচল বিশ্বাস । তাই আমি জানি, আমি যখন মরণের সিংহদ্বার পার হব তখন দেখব, বাবা, ঠাকুরদা, তাঁর বাবা, তাঁর বাবা আরো কত শত ঊর্ধ্ব-পুরুষ সৌম্যবদনে এগিয়ে আসছেন, আমাকে তাঁদের মাঝখানে বরণ করে নেবার জন্য । এবং জানি, জানি, নিশ্চয় জানি, তাঁদের সকলের সামনে দাঁড়িয়ে, আমার মা আমার ছোট ভাইকে হাসিমুখে কোলে নিয়ে । তার চেয়েও আশ্চর্য বোধ হয়, যখন মনের চোখে ছবি দেখি, আমার এই ছোট ভাই, একদা টলটলায়মান পায়ে আমার মায়ের দিকে এগিয়ে এসেছিল, তাঁকে আপনজনের মধ্যে নিয়ে যাবার জন্য, তাঁর কোলে ওঠার জন্য । সে তো ও-লোকে গিয়েছিল মায়ের বহু পূর্বে ।

আমি যখন সে-লোকে যাব তখন ভগবান শুধাবেন, 'তুমি কি চাও ?' আমি তৎক্ষণাৎ বলব, 'একখানা বাইসিকেল ।' পাওয়া মাত্রই তাতে ভাইকে রডে চড়িয়ে স্বর্গের লনে চক্কর লাগাব । সে খল-খল করে হাসবে । মা দেখবে, কিন্তু কক্‌খনো বলবে না, 'থাক, হয়েছে । এখন ওকে তুই নামিয়ে দে ।'

*   *   *   *

অতএব সব বিপদ থেকেই নিষ্কৃতি আছে । গাড়ি গেছে তো গেছে তাতে ভয় পাবার অত কি ?

দেখি, আবুল আসফিয়া নেই ।

আমাদের এই অকূল সমুদ্র আর অন্তহীন মরুভূমির মাঝখানে ফেলে দিয়ে লোকটা পালাল নাকি ?

স্টেশনের বাইরে তাঁর খোঁজ করতে এসে দেখি, তিনি এক জরাজীর্ণ মোটর গাড়ির ড্রাইভারের সঙ্গে রসালাপ আরম্ভ করেছেন । অনুমান করলুম তিনি ট্যাক্‌সি-যোগে কাইরো পৌঁছবার চেষ্টাতে আছেন ।

কিন্তু ট্যাক্‌সিওলারা আমাদের মজ্জমান অবস্থা বিলক্ষণ বুঝে গিয়েছে এবং যা দর হাঁকছে তা দিয়ে দুখানি নূতন ট্যাক্‌সি কেনা যায় ।

আবুল আসফিয়া তাকে বহুতর ধর্মের কাহিনী শোনাবার চেষ্টা করলেন, ততোধিক ভারত-মিশরীয় মৈত্রীর অকুণ্ঠ প্রশংসা করলেন এবং সর্বশেষে তিনি মুসলমান সেও মুসলমান, সে-সত্যের দোহাই-কসম খেলেন কিন্তু ট্যাক্‌সিওলাটি ধর্মে মুসলমান হলেও কর্মে খাঁটি দুর্যোধন । বিনা যুদ্ধে সে সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমি এগোবে না ।

আবুল আসফিয়ার চোখে-মুখে কিন্তু কোনো উষ্মার লক্ষণ নেই । ভুগ্-

---

* শিশু ভোলানাথ, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, ১০৮ পৃঃ ।

পদাহত তিতিক্ষু শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় তিনি তখন চললেন হেল্‌থ আপিসের দিকে। আমিও পিছু নিলুম।

সেই বিরাট-বপু ভদ্রলোক, যিনি আমাদের সার্টিফিকেট দিয়ে প্রথম ফাঁড়া থেকে উদ্ধার করেছিলেন তিনি ততক্ষণে আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন। এবারে তাঁকে জাগাতে গিয়ে আবুল আসফিয়াকে রীতিমত বেগ পেতে হল।

তাঁকে তখন তিনি যা বললেন, তার সরল অর্থ, তিনি ডাকাতকে ডরান না, ডাকাত বন্দুক উঁচালে তিনিও বন্দুক তুলতে জানেন, কিন্তু এরকম বন্দুকহীন ডাকাতির বিরুদ্ধে লড়বার মতো হাতিয়ার তো তাঁর নেই। অবশ্য তিনি ঘাবড়ান নি, কিছু না কিছু একটা ব্যবস্থা করবেনই; তবে কি না আফিসারটি যদি একটু সাহায্য করেন তবে আমাদের উপকার হয়, তাঁরও পুণ্য হয়।

অফিসার বললেন, 'চলুন।'

তিনি ট্যাক্‌সিওলাদের সঙ্গে দু-চারটি কথা বলেই আমাদের জানালেন কত দিতে হবে। হিসেব করে দেখা গেল, গাড়িতে ফার্স্ট ক্লাসে যা লাগত, ট্যাক্‌সিতে তাই লাগবে। আমরা তাতেই খুশী। কাইরো তো পেঁছিব, পোর্টসঈদে তো জাহাজ ধরতে পারব, তবে আর ভাবনা কি?

আমরা হুড়মুড় করে দুখানা ট্যাক্‌সিতে কাঁঠাল বোঝাই হয়ে গেলুম।

আমি অফিসারকে ধন্যবাদ দিয়ে ওঠার সময় বললুম, 'আপনি আমাদের জন্য এতখানি করলেন। সত্যই আপনার দয়ার শরীর।'

তিনি ভাঙা-ভাঙা ইংরিজীতে যা বললেন, তা শুনে আমি অবাক। তার অর্থ, তাঁর শরীর আদপেই দয়ার শরীর নয়। তিনি কিছুমাত্র পরোপকার করেন নি। আমরা এক পাল ভিখিরী যদি সুয়েজ বন্দরে আটকা পড়ে যাই তবে শেষ পর্যন্ত তাঁদেরই ঘাড়ে পড়ব। আমাদের তাড়াতে পেরে তিনি বেঁচে গেছেন—ইত্যাদি।

আমি আপত্তি জানিয়ে মোটরে বসে ভদ্রলোকের কথাগুলো ভাবতে লাগলুম।

হঠাৎ বুঝতে পারলুম ব্যাপারটা কি—বহু দিন পূর্বেকার একটা ঘটনা মনে পড়ে যাওয়াতে।

রবীন্দ্রনাথের গানের ভাণ্ডারী ছিলেন তাঁর দাদার নাতি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। আমার এক চিত্রকর বন্ধু, বিনোদবিহারী একদিন তাঁর দূরবীনটি ধার নিলে—বেচারী চোখে দেখতে পেত কম। কয়েক দিন পরে সেটা ফেরত দিতে গেলে দিনুবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কি রকম দেখলে?'

'আজ্ঞে, চমৎকার!' বিনোদ এত দূরের জিনিস এর আগে কখনো দেখতে পায় নি।

'তবে ওটা তোমার কাছেই রেখে দাও। লোকে বড্ড জ্বালাতন করে। আজ এটা এ চায়, কাল ওটা ও চায়, পরশু ওটা সে চায়। আমি পেরে উঠি নে। তোমার কাছেই ওটা থাক।'

বিনোদ একাধিকবার চেষ্টা করেও সে দূরবীন ফেরত দিতে পারে নি।

এই হল খানদানী লোকের পরোপকার করার পদ্ধতি। সে দেখায়, যেন সে আদপেই পরোপকার করে নি। নিতান্ত নিজের মঙ্গলের জন্য, আগাগোড়া সে স্বার্থপরের মতো কাজ করেছে।

বুঝলুম, এ অফিসারটিও দিনুবাবুর সগোত্র। ইচ্ছে করেই 'সগোত্র' শব্দটি ব্যবহার করলুম ; আমার বিশ্বাস,ইহ-সংসারের যাবতীয় ভদ্রলোক একই গোত্রের —তা তাঁরা ব্রাহ্মণ হন আর চণ্ডাল হন, হিন্দু হন আর মুসলমান হন,কাফ্রী হন আর নর্ডিক হন।

ততক্ষণে আমরা বন্দর ছেড়ে মরুভূমিতে ঢুকে গিয়েছি। পিছনে তাকিয়ে দেখি, শহরের বিজলি বাতি ক্রমেই নিষ্প্রভ হয়ে আসছে—বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরনো স্মৃতি যে রকম আবছায়া-আবছায়া হতে থাকে।

॥ ১৬ ॥

মরুভূমির উপর চন্দ্রালোক! সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! সে দৃশ্য বাঙলাদেশের সবুজ শ্যামলিমার মাঝখানে দেখা যায় না। তবে যদি কখনো পদ্মার বিরাট বালুচড়ায় পূর্ণিমা-রাতে বেড়াতে যাও—রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই যেতেন এবং 'নিশীথে' গল্প তারি পটভূমিতে লেখা—তাহলে তার খানিকটে আস্বাদ পাবে।

সমস্ত ব্যাপারটা কেমন যেন ভুতুড়ে বলে মনে হয়। চোখ চলে যাচ্ছে দূর দিগন্তে, অথচ হঠাৎ যেন ঝাপসা আবছায়া পর্দায় ধাক্কা খেয়ে থেমে যায়। মনে হয়, যেন দেখতে পাচ্ছি, তবু ঠিক ঠিক দেখতে পারছি নে, চিনতে পারছি তবু ঠিক ঠিক চিনতে পারছি নে। চতুর্দিকে ফটফটে জ্যোৎস্নার আলো যেন উপচে পড়ে ; মনে হয় এ-আলোতে অক্লেশে খবরের কাগজ পড়া যায়, অথচ এ আলোতে লাল কালোর তফাত যেন ঘুচতে চায় না। মেঘলা দিনে এর চেয়ে অনেক ক্ষীণালোকে রঙের পার্থক্য অনেক বেশী ধরা পড়ে।

তাই,

মনে হল পাখি, মনে হল মেঘ, মনে হল কিশলয়,
ভালো করে যেই দেখিবারে যাই মনে হল কিছু নয়।
দুই ধারে একি প্রাসাদের সারি, অথবা তরুর মূল
অথবা এ শুধু আকাশ জুড়িয়া আমারই মনের ভুল?

মাঝে মাঝে আবার হঠাৎ মোটরের দু-মাথা উঁচুতে ফুটে ওঠে, জ্বল-জ্বল দুটি ছোট সবুজ আলো ; ওগুলো কি? ভুতের চোখ নাকি? শুনেছি ভুতের চোখই সবুজ রঙের হয়। নাঃ! কাছে আসতে দেখি উটের ক্যারাভান —এদেশের ভাষাতে যাকে বলে 'কাফেলা' (কবি নজরুল ইসলাম এ শব্দটি বাঙলায় ব্যবহার করেছেন)। উটের চোখের উপর মোটরের হেডলাইট পড়াতে চোখ দুটো সবুজ হয়ে আমাদের চোখে ধরা দিয়েছে। দেশে গরু-বলদের চোখে আলো পড়ে ঠিক এই রকমই হয়, কিন্তু বলদের চোখে যে লেভেলে দেখি উটের

চোখে তার অনেক উপরে দেখতে পেলুম বলে এতখানি ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম।

আর কেনই পাব না বল? জনমানবহীন মরুভূমির ভিতর দিয়ে চলেছি, রাত্রি বেলা—আবার বলছি, রাত্রিবেলা। মরুভূমি সম্বন্ধে কত গল্প, কত সত্য, কত মিথ্যে পড়েছি ছেলেবেলায়। তৃষ্ণায় সেখানে বেদুইন মারা যায়, মৃত্যু থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য বেদুইন তার পুত্রের চেয়ে প্রিয়তর উটের গলা কাটে, সেখান থেকে উটের জমানো জল খেয়ে প্রাণ বাঁচাবার জন্য, তৃষ্ণায় মতিচ্ছন্ন হয়ে গিয়ে সে হঠাৎ কাপড়-চোপড় ফেলে দিয়ে উলঙ্গ হয়ে সূর্যের দিকে জিভ দেখিয়ে নাচে আর শুষ্ককণ্ঠে বীভৎস গলায় গান জোড়ে,

তুই আমার কি করতে পারিস তুই ক্যা রে?
তুই —(অশ্লীলবাক্য)—তুই ক্যা রে?

এবং তার চেয়েও বদখদ বেতালা 'পদ্য'।

যদি মোটর ভেঙে যায়? যদি কাল সন্ধ্যে অবধি এ রাস্তা দিয়ে আর কোনো মোটর না আসে? পষ্ট দেখতে পেলুম এ গাড়ি রওনা হওয়ার পূর্বে পাঁচশ গ্যালন জল সঙ্গে তুলে নেয় নি; তখন কি হবে উপায়?

কিন্তু করুণাময়কে অসীম ধন্যবাদ, পল-পার্সি দেখলুম অন্য ধরনের ছেলে। তারা সেই জরাজীর্ণ মোটর গাড়ির কটকটাহি মরকট বিকট ভট কোটি কোটিন্হ ধাবহি (তুলসীদাস তাঁর রামায়ণে বানরদের কলরোলের বর্ণনা দিতে গিয়ে 'ট'-এর অনুপ্রাস ব্যবহার করেছেন) শব্দ ছাপিয়ে বিকটতর কটকট করছে। তাদের কী আনন্দ!

পল: 'সব-কিছু ভালো করে দেখে নে; মাকে যাবতীয় জিনিস যেন গুছিয়ে লিখতে পারি।'

পার্সি: 'তোর জীবনে এই তুই প্রথম একটা খাঁটি কথা কইলি। কোনো জিনিস যেন বাদ না পড়ে। ওঃ, মরুভূমির ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। জাহাজে চড়ার সময় কি কল্পনা করতে পেরেছিলুম, জাহাজে চড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফোকটে মরুভূমির ভিতর দিয়ে চড়ে যাব?'

পল: 'ঠিক বলেছিস্। আর মা-বাবা কী রকম আশ্চর্য হবেন, ভাব দিকিনি! কিন্তু, ভাই, ওনারা যদি তখন ধমক দেন, জাহাজ ছেড়ে তোমরা এ রকম বাউণ্ডুলিপনা করতে গিয়েছিলে কেন? তখন?'

পার্সি বললে: 'ঐ তো তোর দোষ! সমস্তক্ষণ ভয়ে মরিস। তখন কি আর একটা সদুত্তর খুঁজে পাব না? ঐ স্যার রয়েছেন। ওঁকে জিজ্ঞাসা কর না। উনি কি বলেন।'

আমি বললুম: 'দোষ দেবেন, তো তখন দেবেন। এখন সে আলোচনা করতে গিয়ে দেখবার জিনিস অবহেলা করবে নাকি? বিশেষত, যদি আমাদের অভিযান অন্যায় কর্মই হয়ে থাকে, সেটাকে যখন রদ করার শক্তি আমাদের হাতে নেই।'

পার্সি বললে: 'আর ফিরে গিয়েই বা কি লাভ? আমাদের জাহাজ তো অনেকক্ষণ হল ছেড়ে দিয়েছে।'

চালাক ছেলে সব দিকে খেয়াল রাখে।

মরুভূমিতে দিনের বেলা যে রকম প্রচণ্ড গরম, রাত্রেও ঠিক তেমনি বিকট শীত। বৈজ্ঞানিকেরা তার একটা অত্যুৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা দেন বটে, কিন্তু ধোপে সেটা কতখানি টেকে আমি যাচাই না করে বলতে পারব না। উপস্থিত শুধু এইটুকু বলতে পারি, জাহাজে দিনের পর দিন রাতের পর রাত দুঃসহ গরমে হাড়মাস যেন আচার হয়ে গিয়েছিল ; ঠাণ্ডা বাতাসের পরশ পেয়ে সর্বাঙ্গ যেন জলে-ভেজা জুঁই ফুলের মত ফুলে উঠল।

এ ধরনের অভিজ্ঞতা আমার জীবনে একাধিকবার হয়েছে। পেশাওয়ার, জালালাবাদের ১২০।১২২ ডিগ্রী সওয়ার পর আমি খাক্-ই জব্বারের ৬০ ডিগ্রীতে পেঁছিতে কী আরাম অনুভব করেছিলুম সে বর্ণনা অন্যত্র করেছি। কোথায় ? উঁহু, সেটি হচ্ছে না। বললেই বলবে, আমি সুযোগ পেয়ে আমার অন্য বইয়ের বিজ্ঞাপন এখানে নিখর্চায় চালিয়ে দিচ্ছি।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম মনে নেই। যখন মোটরের হঠাৎ একটুখানি জোর ঝাঁকুনিতে ঘুম ভাঙল তখন দেখি চোখের সামনে সারি সারি আলো। কাইরো পেঁছে গিয়েছি। গাড়ির আর সবাই তখনো ঘুমোচ্ছে। আমার সন্দেহ হল ড্রাইভারও বোধ করি ঘুমোচ্ছে। গাড়ি আপন মনে বাড়ির দিকে চলেছে ; সোয়ার ঘুমিয়ে পড়লেও ঘোড়া যে রকম আপন বাড়ি খুঁজে নেয়।

পার্সিকে ধাক্কা মেরে জাগিয়ে দিয়ে বললুম ঃ 'তবে না, বৎস, বলেছিলে, মরুভূমির সব টুকিটাকি পর্যন্ত মনের নোট বুকে টুকে নেবে ?' যেন আমি নিজে কতই না জেগে ছিলুম।

পার্সিও তালেবর ছেলে। তখখুনি দিলে পলের কানে ধরে একখানা আড়াই-গজী টান। আমি পার্সিকে যা বলেছিলুম সে পলকে তাই শুনিয়ে দিলে। পল বেচারী আর কি করে ? সে আস্তে আস্তে মাদমোয়াজেল শেনিয়েকে জাগিয়ে দিয়ে বললে, 'কাইরো পেঁছে গিয়েছি।'

বাঙলা দেশে কথায় কয়—পশ্চিম বাঙলায় বলে কি না জানি নে—'সায়েব বিবিকে মারলেন চড়, বিবি বাঁদীকে দিলেন ট্যাঙ্গা, বাঁদী বেরালকে মারলে লাথি, বেরাল খামছে দিলে নুনের ছালাটাকে।'

সংসারে এই রীতি।

এখানে অবশ্য প্রবাদ টায়টায় মিলল না। তাই পল অতি সবিনয়ে মেম-সাহেবকে জাগিয়ে দিলে।

মাদমোয়াজেল হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে পাউডার বের করে নাকে ঘষতে ঘষতে ফরাসীতে শুধালেন,—আমার বিশ্বাস ফরাসিনীরা ঘুমন্ত অবস্থায়ও ঠোঁটে লিপস্টিক লাগাতে পারেন এবং লাগান—'আমরা কোথায় পেঁছিলুম, মসিয়ো ?'

'ল্য ক্যার।'

পল বেশ খানিকটে ফরাসী জানত। আমাকে শুধালে ঃ 'ল্য ক্যার্' অর্থ হল 'দি কাইরো'। 'ল্য'টা আবার পুংলিঙ্গ। একটা শহরের আবার পুংলিঙ্গ

স্ত্রীলিঙ্গ কি করে হয় ?'

আমি বললুমঃ 'অত বিদ্যে আমার নেই, বাপু! তবে এইটুকু জানি এ-বাবদে ফরাসীই একমাত্র আসামী নয়। আমরা ব্রহ্মপুত্রকে বলি নদ, অর্থাৎ পুংলিঙ্গ এবং গঙ্গাকে বলি নদী, অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গ। কেন বলি জানি নে।'

পার্সি বললেঃ 'আমরা ইংরেজরাই বা জাহাজকে 'শী' অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গ দিয়েছি কেন ?'

আমি বললুমঃ 'উপস্থিত এ আলোচনা অক্সফোর্ডের জন্য মুলতুবী রেখে দাও—সেখানেই তো পড়তে যাচ্ছ—এবং নিশির কাইরোর সৌন্দর্যটি উপভোগ করে নাও।'

সত্যি, এরকম সৌন্দর্য সচরাচর চোখে পড়ে না। আমরা যখন চন্দননগর থেকে কলকাতা পেঁছিই তখন মাঝখানে ঘন বসতি আর বিস্তর জোরালো বাতি থাকে বলে কলকাতার রোশনাই ঠিকমত উপলব্ধি করতে পারি নে। এখানে মরুভূমি পেরিয়ে হঠাৎ শহর বলে একসঙ্গে সব কটা আলো চোখে পড়ে এক অদ্ভুত মরীচিকার সৃষ্টি করে।

ছ-তলা বাড়ির উপরে—অবশ্য বাড়িটা দেখা যাচ্ছে না—দেখি, লাল আলোতে জ্বালানো শেলাইয়ের কলের ছুঁচ ঘন ঘন উঠছে নামছে, আর সবুজ আলোর চাকা ঘুরেই যাচ্ছে ঘুরেই যাচ্ছে। নিচে এক বিলিতি কোম্পানির নাম। আমার মনে হল, হায়! কলটার নাম যদি 'উষা' হত। সেদিন আসবে যেদিন ভারতীয়—যাক গে।

আরো কত রকমের প্রজ্বলিত বিজ্ঞাপন। এ বিষয়ে কলকাতা কাইরোর বহু পিছনে।

করে করে শহরতলীতে ঢুকলুম। কলকাতার শহরতলী রাত এগারোটায় অঘোরে ঘুমোয়। কাইরোর সব চোখ খোলা—অর্থাৎ খোলা জানালা দিয়ে সারি সারি আলো দেখা যাচ্ছে। আর রাস্তার কথা বাদ দাও। এই শহর-তলীতেই কত না রেস্তোরাঁ, কত না 'কাফে' খোলা ; খদ্দেরে খদ্দেরে গিসগিস করছে। (আমাদের যে রকম চায়ের দোকান, মিশরীদের তেমনি 'কাফে' অর্থাৎ কফির দোকান। আমি প্রায়ই ভাবি কফির দোকান যদি 'কাফে' হতে পারে তবে চায়ের দোকান 'চাফে' হয় না কেন ? 'চলো, ভাই, চাফেতে যাই' বলতে কি দোষ ?)

আবার বলছি রাত তখন এগারোটা। আমি বিস্তর বড় বড় শহর দেখছি, কাইরোর মতো নিশাচর শহর কোথাও চোখে পড়ে নি।

কাইরোর রান্নার খুশবাইয়ে রাস্তা ম ম করছে। মাঝে মাঝে নাকে এসে এমন ধাক্কা লাগায় যে মনে হয় নেমে পড়ে এখানেই চাট্টি খেয়ে যাই। অবশ্য রেস্তোরাঁগুলো আমাদের পাড়ার চায়ের দোকানেরই মতো নোংরা। তাতে কি যায়-আসে ? কে যেন বলেছে, 'নোংরা রেস্তোরাঁতেই রান্না হয় ভালো ; কালো গাই কি সাদা দুধ দেয় না ?'

আমার খেতে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু ঐসব সায়েব-মেমরা যখন

রয়েছেন। তাঁরা 'ম' দিয়ো', 'হ্যার গট্' কি যে বলবেন তার তো ঠিকঠিকানা নেই।

আচম্বিতে দুখানা গাড়িই দাঁড়াল। বসে বসে সবাই অসাড় হয়ে গিয়েছি। সব্বাই নেমে পড়লুম। সক্কলেরই মনে এক কামনা। আড়ামোড়া দিয়ে নি, পা দুটো চালিয়ে নি, হাত দুখানা ঘুরিয়ে নি।

এমন সময় আবুল আসফিয়া আমাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, মাথা পিছনের দিকে ঈষৎ ঠেলে দিয়ে, হাত দুখানা সামনের দিকে সম্প্রসারিত করে, পোলিটিশিয়নদের কায়দায় শ্রদ্ধানন্দ-পার্কী লেকচার ঝাড়তে আরম্ভ করলেন, কিন্তু ভাঙা ভাঙা ফরাসীতে,—

'মেদাম, মেদ্‌মোয়াজেল, এ মেসিয়ো'—

(ভদ্রমহিলাগণ, ভদ্রকুমারীগণ এবং ভদ্রমহোদয়গণ)

আমরা সকলেই এক্ষণে তৃষ্ণার্ত এবং ক্ষুধাতুর। নগরী প্রবেশ করতঃ আমরা প্রথমেই উত্তম কিংবা মধ্যম শ্রেণীর ভোজনালয়ে আহারাদি সমাপন করব। কিন্তু প্রশ্ন, সেখানে খেতে দেবে কি? জাহাজে যা দেয় তা-ই। সেই বিস্বাদ সুপ, বিস্বাদতর স্টু, তদিতর পুডিং। অর্থাৎ সেই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কিংবা অ্যাংলো-ইজিপ্‌শিয়ন—যাই বলুন—রস-কষহীন খানা।

পক্ষান্তরে, 'এই শহরতলীতে যদি আমরা কিঞ্চিৎ আদিম এবং অকৃত্রিম মিশরীয় খাদ্য, মিশরীয় পদ্ধতীতে সুপক্ক খাদ্য, ভোজন করি তবে কি এক নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হবে না?'

আমরা কিছু বলার পূর্বেই তিনি হাত দুখানা গুটিয়ে নিয়ে বাঁ হাত দিয়ে ঘাড়ের ডান দিকটা চুলকোতে চুলকোতে বললেন: 'অতি অবশ্য, রেস্তোরাঁগুলো নোংরা। চেয়ার-টেবিল সাফ-সুৎরো নয়, কিন্তু মেদাম, মাদমোয়াজেল, মেসিয়ো, আমরা তো আর টেবিল-চেয়ার খেতে যাচ্ছি নে। আমরা খেতে যাচ্ছি খানা। জাহাজের রান্না যখন আমাদের খুন করতে পারে নি, তখন এ রান্নাই বা করবে কি করে? আপনারাই বলুন!'

কেউ কিছু বলার পূর্বেই পার্সি চেঁচিয়ে উঠলো: 'অফ্‌কোস্, অফ্‌কোস্—আলবত, আলবত, আমরা নিশ্চয়ই যাব। আমরা যখন মিশরীয় হাওয়াতেই শ্বাস নিচ্ছি, মিশরীয় জলই খাব, মিশরীয় খাদ্য খাব না কেন?'

মাদমোয়াজেল শোনিয়ে বললেন: 'যাঁরা খেতে চান না, তাঁরা খাবেন না। আমি যাচ্ছি।'

আর আমি বুঝলুম, ফরাসীদেশটা কতখানি স্বাধীনতার দেশ। স্বাধীনতা ফরাসীদের হাড়ে-হাড়ে মজ্জায়-মজ্জায়।

শোনিয়ে ছিলেন আমাদের মধ্যে সব চেয়ে ডেলিকেট প্রাণী। জাহাজের রান্না তাঁর পছন্দসই ছিল না বলে তিনি টোস্ট, দুধ, ডিম, মটর, কফি, আলুসেদ্ধ খেয়ে প্রাণ ধারণ করতেন। তিনি যখন রাজী তখন—?

আমার মনে হয়, আমরা যে তখনই সবাই নিকটতম রেস্তোরাঁয় হুড়মুড় করে ঢুকলুম তার একমাত্র কারণ এই নয় যে, মাদমোয়াজেল ঢুকতে প্রস্তুত, আমার

মনে হয়, আর সবাইও তখন মিশরী খানার এক্সপেরিমেণ্ট করবার জন্য তৈরী। এবং সর্বোত্তম কারণ সবাই তখন ক্ষুধায় কাতর। কোথায় কোন্ খানদানী রেস্তোরাঁয় কখন পেঁছিব তার কি ঠিক-ঠিকানা? এবং হয়তো ততক্ষণে সব মাল কাবার। খেতে হবে মাখন-রুটি, দিতে হবে মুর্গী-মটনের দর। তার চেয়ে ভরভর খুশবাইয়ের খাবারই প্রশস্ততর। হাতের কাছে যা পাচ্ছি তাই ভালো, সেই নিয়ে খুশী।

রবি ঠাকুর বলেছেন,

'কাছের সোহাগ ছাড়বে কেন
দূরের দুরাশাতে?'

ইরানী কবি ওমর খৈয়ামও বলেছেন,

Oh, take the Cash, and let the Credit go,
Nor heed the rumble of a distant Drum!

কান্তি ঘোষ তার বাঙলা অনুবাদ করেছেন,

'নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকির খাতায় শূন্য থাক,
দূরের বাদ্য লাভ কি শুনে, মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক!'

* * *

রেস্তোরাঁগুলো ছুটে এসে আমাদের আদর-কদর করে অভ্যর্থনা (ইসতিক্-বাল) জানালে। তার 'বয়-রা' বত্রিশখানা দাঁতের মুলো দেখিয়ে আকর্ণ হাসলে। তড়িঘড়ি তিনখানা ছোট ছোট টেবিল একজোড় করে, চেয়ার সাজিয়ে আমাদের বসবার ব্যবস্থা করা হল, রান্নাঘর থেকে স্বয়ং বাবুর্চী ছুটে এসে তোয়ালে কাঁধে বার বার ঝুঁকে ঝুঁকে সেলাম জানালে। বসতে গিয়ে দেখি, শ্যামবাজারের সেই লোহার চেয়ার। শীত-গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতেই বসতে গেলে ছ্যাঁকা দেয়।

আমি তখন আমার অভিজ্ঞতা গিলছি। অর্থাৎ দেখছি, বয়গুলোর কী সুন্দর দাঁত! এরকম দুধের মত সুন্দর দাঁত হয় কি করে? সে দাঁতের সামনে এরকম রক্তকরবীর মতো রাঙা ঠোঁট এরা পেল কোথা থেকে? এবং ঠোঁটের সীমান্ত থেকেই সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে কী অদ্ভুত এক নবীন রঙ! এ রঙ আমার দেশের শ্যামল নয়, এ যেন কি এক ব্রোঞ্জ রঙ! কী মসৃণ কী সুন্দর!

কিন্তু সর্বাধিক মনোরম বাবুর্চীর ভুঁড়িটা। ওঃ! কী বিশাল, কী বিপুল, কী জাঁদরেল!

তার থেকেই অনুমান করলুম আমরা ভালো রেস্তোরাঁতেই ঢুকেছি।

ইতিমধ্যে আবুল আসফিয়া এবং মাদমোয়াজেল শেনিয়ে বাবুর্চীকে নিয়ে খুদ রান্নাঘরে চলে গিয়েছেন, আহারাদির বাছাই-তদারক করতে এবং গোটা-চারেক ছোকরা এসে আমাদের চতুর্দিক ঘিরে চেঁচাচ্ছে, 'বুাৎ বালিশ, বুাৎ বালিশ!'

সে আবার কী যন্ত্রণা?!?!

বুঝতে বেশিক্ষণ সময় লাগল না ; কারণ এদের সকলের হাতে কাঠের বাক্স আর গোটা দুই করে বুরুশ। ততক্ষণে আবার মনে মনে ধ্বনিতত্ত্ব আলোচনা করে বুঝে নিয়েছি, আরবীতে 'ট' নেই বলে 'বুট' হয়ে গিয়েছে 'বুৎ' এবং 'প' নেই বলে 'পলিশ' হয়ে গিছে 'বালিশ'—একুনে দাঁড়াল 'বুৎ বালিশ'! তাই আরবরা পণ্ডিত জওয়াহরলালের নাম উচ্চারণ করে 'বাণ্দিৎ জওয়াহরলাল!' ভাগ্যিস আরবী ভাষায় 'ট' নেই। থাকলে নিরীহ 'পণ্ডিত' আরবিস্থানের 'ব্যাণ্ডিট' হয়ে যেতেন! আদন অঞ্চলের আরবীতে আবার 'গ' নেই, তাই তারা 'গান্ধী'র নাম উচ্চারণ করে 'জান্দী'। অবশ্য সেটা কিছু মন্দ নয়,—সত্যের জন্য 'জান দি' বলেই তো তিনি প্রাণ দান করে দেহত্যাগ করলেন।

বাঙালী তেড়ি কাটতে ব্যস্ত, ইংরেজ সমস্তক্ষণ টাইটা ঠিক গলার মাঝখানে আছে কিনা তার তদারকিতে ব্যস্ত, শিখেরা পাগড়ি বাঁধতে ঘণ্টাখানেক সময় নেয়, কাবুলীরা হামেহাল জুতোতে পেরেক ঠোকাতে ব্যতিব্যস্ত, আর কাইরো-বাসীরা দেখলুম, 'বুৎ বালিশের' নেশাতে মশগুল। তা না হলে রাত দুপুরে গণ্ডায় গণ্ডায় বুৎ-বালিশওয়ালারা কাফে রেস্তোরাঁয় ধন্না দিতে যাবে কেন?

তবে হ্যাঁ, পালিশ করতে জানে বটে। স্পিরিট দিয়ে পুরনো রঙ ছাড়ালে, সাবানজল দিয়ে অন্য সব ময়লা সাফ করলে, ক্রীম লাগালে, পালিশ ছোঁয়ালে, প্রথম হালকা ক্যাম্বিস পরে মোলায়েম সিল্ক দিয়ে জুতোর জৌলুস বাড়ালে। তখন জুতোর যা অবস্থা! তাতে তখন আয়নার মতো মুখ দেখা যায়। বুরুশের ব্যবহার তো প্রায় করলেই না—চামড়া নাকি তাতে জখম হয়ে যায়।

কিন্তু আশ্চর্য বোধ হল, সেই ঝাঁ চকচকে জুতোজোড়াকে সর্বশেষে কাপড় দিয়ে ঘষে অল্প—অতি অল্প—ম্যাটমেটে করে দিল কেন? এতখানি মেহন্নত চাকচিক্য জাগানোর পর সেটাকে ম্যাটমেটে করে দেবার কি অর্থ?

একটা গল্প মনে পড়ল :

এক সাহেব পেস্ট্রিওলাকে অর্ডার দিলেন একটা জন্মদিনের কেক বানাবার জন্যে। কেকের উপরে যেন সোনালী নীলে তাঁর নামের আদ্য অক্ষর পি. বি. ডাবলইউ লেখা থাকে। ডেলিভারি নেবার সময় দোকানদারকে বললেন, 'হুঁ' কেকটি দেখাচ্ছে উত্তম, কিন্তু হরফগুলো বানানো হয়েছে সোজা অক্ষরে। আমি চাই ট্যারচা ধরনে, ফ্লরাল ডিজাইনে।'

দোকানী খদ্দেরকে সন্তুষ্ট করতে চায়। বললে, 'এক্ষুনি করে দিচ্ছি। জন্ম-দিনের ব্যাপার—চাট্টিখানি কথা নয়।'

প্রচুর পরিশ্রম করে সে কেকের উপরটা চেঁচে নিলে। তারপর প্রচুরতম গলদঘর্ম হয়ে তার উপর হরফগুলো বাঁকা ধরনে আঁকলে, আরো মেলা ফুল ঝালর চতুর্দিকে সাজালে।

সায়েব বললেন, 'শাবাশ, উত্তম হয়েছে।'

দোকানী খুশী হয়ে শুধালে, 'প্যাক করে আপনাকে দেব, না, কোনো বিশেষ ঠিকানায় পাঠিয়ে দিতে হবে?'

সায়েব হেসে বললেন, 'কোনোটাই না। আমি ওটা নিজেই খাবো।'

বলেই ছুরি দিয়ে চাক্‌লা চাক্‌লা করে গব-গব করে আস্ত কেকটা গিললেন।

দোকানী তো থ। তাহলে অত-শত করার কি ছিল প্রয়োজন ?

বুৎ বালিশের বেলাও তাই।

বুৎ বালিশওলাকে শুধালুম, পালিশ কমিয়ে দেওয়ার কারণটা কি ?

একটুখানি হকচকিয়ে সামলে নিয়ে বললে, 'গাঁইয়ারাই শুধু অত্যধিক চাকচিক্য পছন্দ করে। শহরের ভদ্রলোক সব জিনিসেরই মেকদার মেনে চলেন।'

অ—অ—অ—!

তখন মনে পড়ল, অবন ঠাকুরও বলেছেন, ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা আগের দিনে সোনার গয়না পরে পাল্কিতে বেরুবার সময় তার উপর মলমলের পট্টি বেঁধে নিতেন। বড্ড বেশী চাকচিক্য নাকি গ্রাম্যজনসুলভ বর্বরতা !

॥ ১৭ ॥

আমরা তেতো, নোনা, ঝাল, টক, মিষ্টি এই পাঁচ রস দিয়ে ভোজন সমাপন করি। ইংরেজ খায় মিষ্টি আর নোনা ; ঝাল অতি সামান্য, টক তার চেয়েও কম এবং তেতো জিনিস যে খাওয়া যায়, ইংরেজের সেটা জানা নেই। তাই ইংরিজী রান্না আমাদের কাছে ভোঁতা এবং বিস্বাদ বলে মনে হয়। অবশ্য ইংরেজ ভালো কেক-পেসট্রি-পুডিং বানাতে জানে—তাও সে শিখেছে ইতালিয়ানদের কাছ থেকে এবং এ-কথাও বলবো আমাদের সন্দেশ রসগোল্লার তুলনায় এ-সব জিনিস এমন কী, যে নাম শুনে মূর্ছা যাব ?

মিশরীয় রান্না ভারতীয় রান্নার মামাতো বোন—অবশ্য ভারতীয় মোগলাই রান্নার। আমি প্রমাণ করতে পারব না, কিন্তু বহু দেশে বহু রান্না খেয়ে আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে, মোগলরা এ-দেশে যে মোগলাই রান্নার তাজমহল বানালেন (এবং ভুললে চলবে না, সে রান্না তাঁরা আপন দেশে নির্মাণ করতে পারেন নি, কারণ ওঁদের মাতৃভূমি তুর্কীস্থানে গরম মশলা গজায় না) তারই অনুকরণে আফগানিস্থান, ইরান, আরবীস্থান, মিশর—ইস্তেক স্পেন অবধি আপন আপন ক্ষুদে ক্ষুদে রান্নার তাজমহল বানাতে চেষ্টা করেছে। এ রান্নার প্রভাব পূর্ব ইয়োরোপের গ্রীস, হাঙ্গেরি, রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, আলবেনিয়া, ইতালি পর্যন্ত পেঁছেছে।

এ সব তত্ত্ব আমার বহুদিনকার পরের আবিষ্কার। উপস্থিত আবুল আসফিয়া আর ক্লোদেৎ নিয়ে এলেন বারকোশে হরেক রকম খাবারের নমুনা। তাতে দেখলুম, রয়েছে মুর্গী মুসল্লম, শিক কাবাব, শামী কাবাব আর গোটা পাঁচ-ছয় অজানা জিনিস। জানা জিনিসগুলো যে ঠিক ঠিক কলকাত্তাই খুশবাই নিয়ে এল তা নয়, কিন্তু তাতেই বা কি ? জাহাজের আইরিশ স্টু আর ইটালিয়ান মাকারনি খেয়ে খেয়ে পেটে তো চড়া পড়ে গিয়েছে ; এখন

এ-সব জিনিসই অমৃত। আমার প্রাণ অবশ্য তখন কাঁদছিল চারটি আতপ চাল, উচ্ছেভাজা, সোনামুগের ডাল, পটলভাজা আর মাছের ঝোলের জন্য— অত-শত বলি কেন, শুধু ঝোল-ভাতের জন্য—কিন্তু ওসব জিনিস তো আর বাঙলা দেশের বাইরে পাওয়া যায় না, কাজেই শোক করে কি লাভ ?

তাই দেখিয়ে দিলুম, আমার কোন্ কোন্ জিনিসের প্রয়োজন সেই বারকোশ থেকেই।

পাশের টেবিলে দেখি, একটা লোক তার প্লেটে দুটি শশা নিয়ে খেতে বসেছে। দুটি শশা—তা সে যত তিন ডবল সাইজই হোক না—কি করে মানুষের সম্পূর্ণ ডিনার হতে পারে, বহু চিন্তা করেও তার সমাধান করতে পারলুম না। তাও আবার দোকানে ঢুকে, টেবিল-চেয়ার নিয়ে, সস্-চাটনি সাজিয়ে! আর ইংলণ্ডের মতো 'খানদানী' দেশেও তো মানুষ রাস্তায় দুটো আপেল কিনে চিবোয়—রেস্তোরাঁয় ঢুকে সস্-চাটনি নিয়ে সেগুলো খেতে বসে না। তবে কি এদেশ ইংলণ্ডের চেয়েও খানদানীতর ? এদেশে কি এমন সব সর্বনেশে আইন-কানুন আছে যে রাস্তায় শশা বিক্রি বারণ, যে-রকম শিবঠাকুরের আপন দেশে,

'কেউ যদি পা পিছলে পড়ে,
প্যায়দা এসে পাকড়ে ধরে,
কাজীর কাছে হয় বিচার
একুশ টাকা দণ্ড তার
সেথায় সন্ধ্যে ছটার আগে,
হাঁচতে হলে টিকিট লাগে ;
হাঁচলে পরে বিনা টিকিটে—
দমদমাদম্ লাগায় পিঠে,
কোটাল এসে নস্যি ঝাড়ে—
একুশ দকা হাঁচিয়ে মারে।[১]

কি জানি কি ব্যাপার !

এমন সময় দেখি, সেই লোকটা শশা চিবুতে আরম্ভ না করে তার মাঝখানে দিলে দু হাতে চাপ। অমনি হড়হড় করে বেরিয়ে এল পোলাও-জাতীয় কী যেন বস্তু, এবং তাতেও আবার কি যেন মেশানো। আমি তো অবাক ! হোটেল-ওয়ালাকে গিয়ে বললুম, 'যা আছে কুলকপালে, আমি ঐ শশাই খাব।'

এল দুখানা শশা।[২] কাঁটা দিয়ে একটুখানি চাপ দিতেই বেরিয়ে এল পোলাও। সে পোলাওয়ের ভিতর আবার অতি ছোট ছোট মাংসের টুকরো (এদেশে যাকে বলা হয় 'কিমা'), টমাটোর কুচি এবং গুঁড়নো পনীর। বুঝলুম এ-সব জিনিস পুরেছে সেদ্ধ শশার ভিতর এবং সেই শশাটা সর্বশেষে ঘিয়ে

১ সুকুমার রায়, আবোল-তাবোল, পৃঃ ৩২, তৃতীয় সিগনেট সংস্করণ

২ আসলে শশা নয়, এক রকমের ছোট লাউ।

ভেজে নিয়েছে। যেন মাছ-পটলের দোল্‌মা—শুধু মাছের বদলে এখানকার শশায় পোলাও, মাংস, টমাটো এবং চীজ! তার-ই ফলে অপূর্ব এই চীজ।

শশাকে চাক্তি করে পোলাওয়ের সঙ্গে মুখে দিয়ে বুঝলুম, একই গ্রাসে একই সঙ্গে ভাত, মাংস, সব্জী, ফল এবং 'সেভরি' খাওয়া হয়ে গেল।

আর সে কী সোয়াদ! মুখে দেওয়া মাত্র মাখনের মতো গলে যায়।

এ রকম পাচেক্কে পাঁচ পদ আমি পৃথিবীতে আর কোথাও খাই নি।

আরেকটা জিনিস খেলুম সে-ও অতুলনীয়। মিশরি সিম-বীচি। 'আলীবাবা' বায়স্কোপে যে সব বিরাট বিরাট উঁচু তেলের জালা দেখেছ, তারই গোটা দু-তিন সিমেতে ভর্তি করে সমস্ত রাত ধরে চালায় সিদ্ধকর্ম। সেই সিমে অলিভঅয়েল আর এক রকমের মশলা মিশিয়ে খেতে দেয় সকাল বেলা থেকে। আমরা খেলুম রাত্তিরে। তার যা সোয়াদ!—এখনো জিভে লেগে আছে। আমাদের সিমবীচি তার কাছে কিছুই না। পল-পার্সিও মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করলে চীন দেশের সোয়াবীনও এর সামনে কেন, পিছনেও দাঁড়াতে পারে না।

শুনলুম এই সিম-বীচি গরিব থেকে আরম্ভ করে মিশরের রাজা দু-সন্ধ্যা খেয়ে থাকেন। হোটেলওয়ালা বললে, পিরামিড-নির্মাতা এক ফারাও-মহারাজা নাকি এই বীন খেতে এত ভালবাসতেন যে, প্রজাদের বারণ করে দিয়েছিলেন তারা কেউ যেন বীন না খায়! সাধে কি আর লোকে ফারাওদের খামখেয়ালি বলত?

শুনলুম এই বীনের আরবী শব্দ 'ফুল'।

পরের দিন সকাল বেলাকার ঘটনা। কিন্তু এর সঙ্গে যোগ আছে বলে এই সুবাদেই বলে নি।

কাইরোতে ফরাসী, গ্রীক, ইতালী, ইংরেজ বসবাস করে বলে এবং জাত-বেজাতের বিস্তর টুরিস্ট আসে বলে কাইরোর বহু দোকানী তরো-বেতরো ভাষায় সাইন-বোর্ড সাজায়। পরদিন সকাল বেলা আমরা যখন শহরের আনাচে কানাচে ঘুরচি তখন দেখি, এক সাইন-বোর্ডে লেখা—

FOOL'S RESTAURANT

পল, পার্সি আমি একসঙ্গেই বোর্ডটা দেখেছিলাম। একসঙ্গেই থ মেরে দাঁড়িয়ে গেলুম। একসঙ্গেই অট্টহাস্য করে উঠলুম।

"আহাম্মুকদের রেস্তোরাঁ।"

বলে কি?

তখন হঠাৎ ঝাঁ করে আমার মনে পড়ল Fool শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে 'ফুল' অর্থাৎ 'বীন' অর্থাৎ 'সিমের বীচি' অর্থে। "আহাম্মুক" অর্থে নয়। অর্থাৎ এ দোকানী উত্তম 'সিম-বীচি' বেচে। তার পর দোকানের সামনে আমরা ত্রিমূর্তি উঁকিঝুঁকি মেরে দেখি, যে কটি খদ্দের সেখানে বসে আছে তাদের সক্কলেরই সামনে শুধু সিম-বীচি—'ফুল'—'Fool'।

* * * *

হাসলে তো?

আমিও হেসেছিলুম।

কিন্তু তার পর কলকাতা ফিরে—বহু বৎসর পরে—দেখি, এক দোকানের সাইন-বোর্ডে লেখা।

"কপির শিঙাড়া"

অর্থাৎ ফুলকপির-পুর-দেওয়া শিঙাড়া। এই তো?

আমি কিন্তু 'কপি' শব্দের অর্থ নিলুম 'বাঁদর'। অর্থাৎ বাঁদরদের শিঙাড়া। তা হলে অর্থ দাঁড়াল, ও-দোকানে যারা শিঙাড়া খেতে যায় তারা বাঁদর। অর্থাৎ Fool's Restaurant তে যে রকম আহাম্মুকরা যায়!

যেমন মনে করো, যখন সাইন-বোর্ডে লেখা থাকে,—

"টাকের ঔষধ"

তখন কি তার অর্থ, 'টাকা' দিয়ে এ ঔষধ তৈরী করা হয়েছে? তার অর্থ এ ঔষধ টেকোদের জন্য। অতএব 'কপির শিঙাড়া'র অর্থ ফুলকপি দিয়ে বানানো শিঙাড়া নয়, 'কপি'—বাঁদরদের জন্য এ শিঙাড়া!

বিজ্ঞাপনে মানুষ জানা-অজানাতে—অজানাতেই বেশী—কত যে রসিকতার সৃষ্টি করে তার একটা সচিত্র কলেকশন করেছিল আমার এক ভাইপো। 'ছবি'টা মন্দ নয়। তার মধ্যে একটা ছিল;—

বিসুদ্দ ব্রাম্ভনের হাটিয়াল।
মচ্ছ—চার আনা
মাঙ্গশ—আট আনা
নিড়ামিস—ছয় আনা

যাক্ গে এসব কথা। আবার কাইরো ফিরে যাই। আহারাদি সমাপ্ত করে আমরা ফের গাড়িতে উঠলুম। আবুল আসফিয়া দেখলুম ড্রাইভারদের নিজের পয়সায় খাওয়ালেন। তার পর গাড়িতে উঠে বললেন, 'কাইরোতে ট্যাক্সি চালাবার অনুমতি তোমাদের নেই। অথচ আমরা তোমাদের বাইরে থেকে নিয়ে এসেছি। আমাদের যেখানে খুশি নিয়ে গিয়ে দু'পয়সা কামাতে পারো।'

তারা তো প্রাঞ্জল প্রস্তাবখানা শুনে আলহ্লাদে আটখানা। কিন্তু আবুল আসফিয়া যে দর হাঁকলেন তা শুনে তাদের পেটের 'ফুল' পর্যন্ত আচমকা লাফ মেরে গলা পর্যন্ত পৌঁছে গেল।

ব্যাপারটা হয়েছে কি, আবুল আসফিয়া ইতিমধ্যে কাইরোতে ট্যাক্সি ফি মাইলে কত নেয় তার খবরটা জেনে নিয়েছেন এবং হাঁকছেন তার চেয়ে অনেক কম। এবার তিনি ওদের বাগে পেয়েছেন। ওরা বেশী কিছু আপত্তি জানালেই তিনি অভিমানভরা কণ্ঠে বলেন, 'তা ভাই, তোমরা যদি না যেতে চাও তবে যাবে না। আমি তো আর তোমাদের বাধ্য করতে পারি নে। তোমাদের যদি, ভাই, বড্ড বেশী পয়সা হয়ে যাওয়ায় আর কামাতে না চাও, তা হলে আমি আর কি করতে পারি বলো? আল্লা তালাও তো কুরান শরীফে বলেছেন, 'সন্তুষ্টি সদ্‌গুণ'।

তার পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'তবে, ভাইরা, আমরা, তা হলে অন্য ট্যাক্সি নি। তোমরা সুয়েজ ফিরে যাও। আল্লা তোমাদের সঙ্গে থাকুন; রসুল তোমাদের আশীর্বাদ করুন। কিন্তু ভাই, এ ক-ঘণ্টা তোমাদের সঙ্গে কেটেছিল বড় আনন্দে।'

কেটেছিল আনন্দে না কচু! পারলে আবুল আসফিয়া ওদের গলা কাটতেন।

কিন্তু আশ্চর্য হলুম লোকটার 'ভণ্ডামি' দেখে। গুটিকয়েক টাকা বাঁচাবার জন্য কি অভিনয়ই না লোকটা করলে!

আর পায়রার মতো বক্‌বকানি! এবং এ সেই লোক যে জাহাজে যে-ভাবে মুখ বন্ধ করে থাকত তাতে মনে হত কথা বলা রেশন্‌ড হয়ে গিয়েছে।

ঠিক আবুল আসফিয়ার দরে নয়, তার চেয়ে সামান্য একটু বেশী রেটে তারা শেষটায় রাজী হল।

আবুল আসফিয়া মোগলাই কণ্ঠে বললেন, 'পিরামিড'। ততক্ষণে আমরা কাইরো শহরের ঠিক মাঝখানে ঢুকে গিয়েছি।

কোথায় লাগে কলকাতা রাত বারোটার সময় কাইরোর কাছে। গণ্ডায় গণ্ডায় রেস্তোরাঁ, হোটেল, সিনেমা, ডান্‌স-হল, কাবারে। খন্দেরে খন্দেরে তামাম শহরটা আব্‌জাব্‌ করছে।

আর কত জাত-বেজাতের লোক।

ঐ দেখ, অতি খানদানী নিগ্রো। ভেড়ার লোমের মতো কোঁকড়া কালো চুল, লাল লাল পুরু দুখানা ঠোঁট, বোঁচা নাক, ঝিনুকের মতো দাঁত আর কালো চামড়ার কী অসীম সৌন্দর্য! আমি জানি এরা তেল মাখে না, কিন্তু আহা, ওদের সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন তেল ঝরছে। এদের চামড়া এতই সুচিক্কণ সুমসৃণ যে আমার মনে হয়, এদের শরীরে মশা-মাছি বসতে পারে না—পিছ'ল পড়ে মশার পা ছখানা কম্পাউণ্ড ফ্রেকচর হয়ে যায়, ছ মাস পট্টি বেঁধে হাসপাতালে থাকতে হয়।

ঐ দেখো, সুদানবাসী। সবাই প্রায় ছ ফুট লম্বা। আর লম্বা আলখাল্লা পরেছে বলে মনে হয় দৈর্ঘ্য ছ ফুটের চেয়েও বেশী। এদের রঙ ব্রোঞ্জের মতো। এদের ঠোঁট নিগ্রোদের মতো পুরু নয়, টক্‌টকে লালও নয়। কিন্তু সবচেয়ে দেখবার মতো জিনিস ওদের দুখানি বাহু একেবারে শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে আজানুলম্বিত—অর্থাৎ জানুর শেষ পর্যন্ত যেখানে হাঁটুর হাড্ডি অর্থাৎ 'নী ক্যাপ' সেই অবধি।

শ্রীরামচন্দ্রের বাহু ছিল আজানুলম্বিত এবং তাঁর রঙ ছিল নবজলধরশ্যাম, কিংবা নবদূর্বাদলশ্যাম। তবে কি শ্যামবর্ণ কিংবা ব্রোঞ্জ-বর্ণ না হলে বাহু এতখানি লম্বা হয় না? তবে কি ফর্সাদের হাত বেঁটে, শ্যামলিয়াদের হাত লম্বা? কে জানে! সুযোগ পেলে কোনো এক নৃতাত্ত্বিককে জিজ্ঞেস করতে হবে।

হঠাৎ দেখি, সম্মুখে হৈ-হৈ-রৈ-রৈ কাণ্ড! লোকে লোকারণ্য?

সমস্ত রাস্তা জুড়ে এত ভিড় যে দুখানা গাড়িকেই বাধ্য হয়ে দাঁড়াতে হল। আমি বারণ করার পূর্বেই পল পার্সি দুজনাই লাফ দিয়ে উঠে গেল হুডের উপর। ওরা দেখতে চায়, ভিড়ের মাঝখানের ব্যাপারটা কি। আমার ওসব জিনিস দেখবার বয়স গেছে। মাদমোয়াজেল ক্লবেৎ শেনিয়ে পর্যন্ত উঠি উঠি করছিলেন; আমি তাঁকে বাইরে যেতে বারণ করলুম।

ইতিমধ্যে ঘোড় সওয়ার পুলিস এসে রাস্তা খানিকটে সাফ করে দেওয়াতে আমাদের গাড়ি এগিয়ে চললো। পল-পার্সি হুড্ থেকে নেমে এসে আমার দু পাশে বসেছে।

আমাকে কিচ্ছুটি জিজ্ঞেস করতে হল না, ব্যাপার কি। ওরা উত্তেজনায় তিড়িং-বিড়িং করে লাফাচ্ছে। একসঙ্গে কথা বলছে। শেষটায় পলকে বাধা দিয়ে আমি বললুম, 'পার্সি', তুমিই বলো কি হয়েছিল?'

'ঐ যে আপনি দেখলেন সুদানবাসীদের, তাদেরই এক জন একটা ইংরেজ-সেপাইয়ের গলা ধরেছে বাঁহাত দিয়ে আর ঠাস্-ঠাস্ করে করে চড় মারছে ডান হাত দিয়ে। গোরা কিছুই করতে পারছে না, কারণ সুদানীর হাত লম্বা বলে গোরাকে এমনই দূরে রেখেছে যে, গোরা তার গাল নাগাল পাচ্ছে না। এ রকম তো চলল মিনিট দু-তিন। তার পর পুলিশ এসে গোরাকে ধরে নিয়ে চলে গেল।'

আমি আশ্চর্য হয়ে শুধালুম, 'সুদানীই তো ঠ্যাঙাচ্ছিল, তাকে ধরে নিয়ে গেল না? যে মার খেল তাকে ধরে নিয়ে গেল, যে মার দিলে তাকে ধরে নিয়ে গেল না, এটা কি করে হয়?'

পল-পার্সি সমস্বরে বললে, 'সেই তো মজার কথা, স্যর! সাংহাই-টাংহাই কোনো জায়গাতে কেউ যদি গোরাকে ঠ্যাঙায়, তবে তাকেই ঠ্যাঙাতে-ঠ্যাঙাতে পুলিশ থানায় নিয়ে যায়। কেউ একবারের তরেও প্রশ্ন করে না দোষটা কার?'

আমি তখন ড্রাইভারকে রহস্য সমাধান করার জন্য অনুরোধ জানালুম।

ড্রাইভার বললে, 'দারোয়ানীর কাজ এ-দেশে করে সুদানীরা। তাদের উপর কাইরোবাসীদের অসীম বিশ্বাস। কোনো সুদানী কখনো কোনো প্রকারের বিশ্বাসঘাতকতা করে নি, এ কথা আমি বলতে পারব না, কিন্তু আমার কানে কখনও পৌঁছয় নি। এরা বড়ই ধর্মপ্রাণ। পাঁচ ওক্‌ৎ নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, হজ যায়, তসবী জপে। আর বসে বসে বাড়ি আগলায়। এই যে সুদানী গোরাকে মার দিচ্ছিল, সে এক রেস্তোরাঁর দারোয়ান। গোরা রেস্তোরাঁয় খেয়ে-দেয়ে পয়সা না দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল বলে হোটেলওলা তাকে চ্যালেঞ্জ করে খেল ঘুষি। তখন সুদানী দারোয়ান তার যা কর্তব্য তাই করেছে। পুলিশ একবার জিজ্ঞেস করেও বিশ্বাস করেছে সুদানীকে, আর ধরে নিয়ে গিয়েছে গোরাকে। সবাই জানে, সুদানীরা বড় শান্ত স্বভাব, তারা মারপিটের ধার ধারে না।'

যাক্, সব বোঝা গেল। কিন্তু একটা কথা স্বীকার করব; একা একা কারো সাহায্য না নিয়ে, পল্টনের গোরাকে ঠ্যাঙাতে পারে সুদানীই। পাঠান পারে কি না জানি নে। পারলে পারতেও পারে, কিন্তু তার বাহু আজানুলম্বিত নয়

বলে সেও নিশ্চয় দু-চার ঘা খাবে।

কাইরোতে বৃষ্টি হয় অতি দৈবাৎ। তা-ও দু-এক ইঞ্চির বেশী নয়। তাই লোকজন সব বসেছে হোটেল-কাফের বারান্দায় কিংবা চাতালে। শুনলুম, এখানকার বায়স্কোপও বেশীর ভাগ হয় খোলামেলাতে।

বাঙলা দেশে আমরাও চায়ের দোকানে বসে গালগল্প করে সময় কাটাই। কেউ কেউ হয়তো রোজ একই দোকানে গিয়ে ঘণ্টা দুয়েক কাটায়, কিন্তু কাফেতে বসে দিনের বেশীর ভাগ সময় কাটানোর রেওয়াজ আরম্ভ হয় ফ্রন্টিয়ার থেকে। কাবুলে দেখবে, চার বন্ধু চলেছেন বরফ ভেঙে চা-খানায় গিয়ে গল্পগুজোব করবেন বলে—যেন বাড়িতে বসে ও-কর্মটি করা যায় না। ওদের জিজ্ঞেস করলে তারা বলে, 'বাড়িতে মুরুব্বীরা রয়েছেন, কখন এসে কাকে ধমক লাগান তার ঠিক নেই। কিংবা হয়তো বলবেন, দেখ বাছা, ফিরোজ বখৎ, যাও দিকিনি মামার বাড়িতে—(আড়াই মাইলের ধাক্কা) সেখানে গিয়ে মামাকে বলো, আমার নাকের ফুসকুড়িটা একটু সেরেছে, তিনি যেন চিন্তা না করেন। আর দেখো, আসবার সময় ধোপানীকে একটু শুধিয়ে এসো—(সে আরো দেড় মাইলের চক্কর)—আমার নীল জোব্বা,—ইত্যাদি।

'এবং সব চেয়ে বড় কারণ, বাড়িতে মা-জ্যাঠাইমা ওরকম জালা জালা চা দিতে রাজী হন না। ওনারা যে কঞ্জুস তা নয়। আমি যদি একটুখানি বলি, জ্যাঠাইমা, আমার বন্ধুরা এসেছে, ওরা বলেছে, পিসিমার বিয়ের দিনে আপনি যে দুম্বা-মুসল্লম করেছিলেন তারা সেইটে খাবে। কিন্তু ওদের বায়নাক্কা, দুম্বার ভিতর যেন কোফতা পোলাও আর মুর্গী থাকে, মুর্গীর ভিতর যেন কিমা পোলাও আর আণ্ডা থাকে এবং আণ্ডার ভিতর যেন পোনা মাছের পুর থাকে,—জ্যাঠাইমা তদ্দণ্ডেই লেগে যাবেন ঐ বিরাট রান্না করতে। তাতে দশ-বিশ টাকা যা লাগে লাগুক।

'অথচ আমাদের চায়ের খরচা এক সন্ধ্যায় কতটুকুন? দু আনা চার আনা, মেরেকেটে আট আনা। উহুঁ, সেটি হচ্ছে না। ঘন ঘন চা খেলে নাকি ক্ষিদে মরে যায়, আহারের রুচি একদম কমে লোপ পেয়ে যায়।

'তাই ভাই, চায়ের দোকানই প্রশস্ততর। সেখানে এক বার ঢুকতে পারলে বাবা-চাচার তম্বিতম্বার ভয় নেই, মামা-বাড়িতে গিয়ে বাবার নাকের ফুসকুড়িটার লেটেস্ট বুলেটিন ঝাড়তে হয় না, জালা-জালা চা পাওয়া যায়, অন্য দু-চার জন ইয়ার দোস্তের সঙ্গে মোলাকাতও হয়, তাস-দাবা যা খুশি খেলাও যায়—সেখানে যাব না তো, যাব কোথায়?'

প্রথম বারেই প্রথম কাবুলী ভদ্রসন্তান যে আমাকে এই সব কারণ এক নিশ্বাসে বুঝিয়ে বলেছিল তা নয়, একাধিক লোককে জিজ্ঞেস করে ক্রমে ক্রমে চায়ের দোকানে যাবার যাবতীয় কারণ আমি জানতে পেরেছিলুম।

আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই, এঁরা সত্য কথাই বলেছিলেন, এবং এঁরা যে ঘর ছেড়ে চায়ের দোকানে যান তাতে আপত্তি করবার কিছুই নেই।

কিন্তু প্রশ্ন, বাঙালীদের বেলাও তো এই সব আপত্তি-ওজুহাত টেকে। আমাদের মা-পিসিরাও চান না আমরা যেন বড্ড বেশী চা গিলি, বাবা-কাকাও ফাই-ফরমায়েস দেওয়াতে অতিশয় তৎপর; তবে আমরা চায়ের দোকানকে বাড়ির ড্রইংরুম করে তুলি নে কেন?

এর সদুত্তর আমি এযাবৎ পাই নি। তা সে যাই হোক, এটা বেশ লক্ষ্য করলুম, রাত বারোটা-একটা অবধি কাফেতে বসে সময় কাটানোতে কাইরোবাসী সবচেয়ে বড় ওস্তাদ; বন্ধুর বাড়িতে জমানো আড্ডা দশটা-এগারটার ভিতর ভেঙে যায়, কারণ বাড়িসুদ্ধ লোক তাড়া লাগায় খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়ার জন্যে। এখানে সে ভয় নেই। উঠি-উঠি করে কেউই ওঠে না। বাড়ির লোকেরও অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। তারা আর একটা ব্যবস্থা করে নিয়েছে। শুনেছি, এখানকার কোনো কোনো কাফে খোলে রাত বারোটায়!

মোটর গাড়ি বড্ড তাড়াতাড়ি চলে বলে ভালো করে সব-কিছু দেখতে পেলুম না। কিন্তু এইবারে চোখের সামনে ভেসে উঠল অতিরমণীয় এক দৃশ্য! নাইল, নীল নদ।

আমি পূব বাংলার ছেলে। যা-তা নদী আমাকে বোকা বানাতে পারে না। আমি যে গাঙে সাঁতার কাটতে শিখেছি সেই ছোট্ট মনু নদ থেকে আরম্ভ করে আমি বিস্তর মেঘনা-পদ্মা, গঙ্গা-যমুনা এবং পরবর্তী যুগে গোদাবরী-কৃষ্ণা-কাবেরী-তাপ্তী-নর্মদা-সিন্ধু, ইয়োরোপে রাইন-ডানয়্যুব-মোজেল-রোন দেখেছি। নদী দেখলে আর পাঁচ জন বাঙালের মতো আমিও গামছা খুঁজতে আরম্ভ করি—ঐ নদীতে কটা লোক গত সাতশ বছরে ডুবে মরেছিল তার স্টাটিস্‌টিক্‌সের সন্ধান না নিয়ে—একটা ডিঙি কি কৌশলে চুরি করা যায় তার সন্ধানে মাথায় গামছা বেঁধে নি, পাটনিকে কি প্রকারে ফাঁকি দিয়ে খেয়া নৌকো থেকে নামতে হয় সেটা এক মুহূর্তেই আবিষ্কার করে ফেলি।

এই যে পৃথিবীর সবচেয়ে মধুর ভাটিয়ালী গীত! সৃষ্টিকর্তা যদি তাঁর পূব-বাঙলার লীলাঙ্গনে শত শত নদীর আলপনা না আঁকতেন তবে কি কখনো ভাটিয়ালী গানের সৃষ্টি হত? আর এ কথাও ভাবি তিনি রচেছেন মোহনিয়া প্রবাহিনী আর আমরা তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রচেছি ভাটিয়ালী। অবশ্য তাঁরই কাছ থেকে ধার করে! আমরা যখন ও—ও—ও—বলে ভাটিয়ালীর লম্বা সুর ধরি, মাঝে মাঝে কাঁপন জাগাই তখন কি স্পষ্ট শুনতে পাও না, দেখতে পাও না, 'ও—'র লম্বা টানে যেন নদী শান্ত হয়ে এগিয়ে চলছে, যখন কাঁপন লাগাই তখন মনে হয় না, নদী যেন হঠাৎ থমকে গিয়ে দ'য়ের সৃষ্টি করেছে?

প্যারিস-ভিয়েনার রসিকজনের সম্মুখে আমি আমার হাজারোটা নদী কাঁধে বয়ে নিয়ে হাজির করতে পারব না, কিন্তু ভাটিয়ালীর একখানা উত্তম রেকর্ড শুনিয়ে দিতে পারি।

আমি বে-আক্কেল তাই একবার করেছিলুম। তার কি জরিমানা দিয়েছিলুম শোনো।

ভিয়েনাতে পাশের ঘরে থাকত এক রাশান। সে এসেছিল সেখানে

কন্টিনেন্টাল সঙ্গীত শিখতে। ভিয়েনা শহর বেটোফেন্ মোৎসার্টের কর্মভূমি—আমাদের যে রকম তানসেন্, ত্যাগরাজ, বাঙালীর যে রকম রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইস্লাম।

ভিয়েনা ডানয়ুবে নদীর পারে। 'ব্লু ডানয়ুব' তোমাদের কেউ কেউ হয়তো শুনেছ।

একদিন সেই রাশান বলল, 'ডানয়ুব ফানয়ুব সব আজে-বাজে নদী। এই সব নদী থেকে আর কি গান বেরিয়েছে যে পাল্লা দেবে আমার রাশার ভল্গা নদী থেকে আর ভল্গার মাঝির গান উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে? তুমি 'গড্'-'ফড' কি সব মানো, না? আমি মানি নে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি প্রকৃতিকে। তারই অন্যতম মধুর প্রকাশ নদীতে। সেই নদীকে আমরা মাধুর্যে হার মানাই ভল্গা মাঝির গান দিয়ে।'[৩]

বাড়ি ফেরা মাত্রই সে ভল্গা-মাঝির রেকর্ড শোনালো। আমি মুগ্ধ হয়ে বললুম, 'চমৎকার!'

কিন্তু ততক্ষণে আমার বাঙাল রক্ত গরম হয়ে উঠেছে। বাঙালরা অবশ্য জানে, তার অর্থ কি? 'ঘটি' অর্থাৎ পশ্চিম-বাঙলার লোক তাই নিয়ে হাসাহাসি করে করুক। আমার তাতে কোনো খেদ নেই। ওরা তো আমাদের ভাটিয়ালী ভালোবাসে, আমরা তো ওদের 'বাউল' শুনে 'বাউলে' হয়ে যাই।

আমার গরম রক্ত তখন টগবগ করে বলছে, 'বাঙলা দেশ শত শত নদীর দেশ। রাশাতে আর ক-টা নদী আছে? তারই একটা, ভল্গা। সে নদী হারিয়ে দেবে বাঙলা দেশের তাবৎ নদীকে? দাঁড়াও, দেখাচ্ছি।'

ভাগ্যিস, আব্বাসউদ্দিনের 'রঙিলা নায়ের মাঝি' আমার কাছে ছিল। সেইটে চড়িয়ে দিলুম রাশানের গ্রামোফোনে।

সে চোখ বন্ধ করে শুনলে। তার পর বললে—যা বললে তার অর্থ—'ধাপ্পা'।

আমি বললুম 'মানে?'

সে বললে, 'সুরটি অতি উচ্চ শ্রেণীর এবং তার চেয়েও বেশী কানে ধরা পড়ে ওর অভিনবত্ব। আমি করজোড়ে স্বীকার করছি, এ রকম গীত আমি পূর্বে কখনো শুনি নি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলবো, এ গীত লোক-গীত নয়। কারণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনো ভূমিতেই গ্রাম্য গীতে এতগুলো 'নোট' লাগে না। তাই বলছিলুম তুমি ধাপ্পা দিচ্ছো।'

আমি বললুম, 'বাছা, ঐ হল ভাটিয়ালির বৈশিষ্ট্য। ও যতখানি ওঠা-নামা করে পৃথিবীর আর কোনো লোক-গীত তা করে না।'

কিছুতেই স্বীকার করে না ওটা লোক-গীত। তার ধারণা ওটা লোক-গীত এবং শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মাঝখানে উপস্থিত ঝুলছে, আর কয়েক বৎসর যেতে না

৩ রবীন্দ্রনাথও এই 'দম্ভ' করেছেন তাঁর 'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল' গানে। রেকর্ডে গেয়েছেন, শ্রীযুক্তা রাজেশ্বরী বাসুদেব।

যেতেই কোনো গুণী সেটাকে 'উচ্চাঙ্গ' শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে বরণ করে তুলে নেবেন।

তার পর এক দিন সে স্বীকার করলে। বি বি সি-র কল্যাণে। বি বি সি পৃথিবীর লোক-গীত শোনাতে শোনাতে ভাটিয়ালী শুনিয়ে বললে এটা পূব বাঙলার লোক-গীত।

আমি লড়াই জিতলুম কিন্তু তখন থেকেই শুরু হল আমার জরিমানা। আশ্চর্য লাগছে না, যে জিতলে সে দেবে জরিমানা? হয়, প্রায়ই হয়। মার্কিনিংরেজ জর্মনি জয় করে বহু বৎসর ধরে সেখানে ঢেলেছে এবং এখনো ঢালছে বিস্তর টাকা। সে কথা যাক, জরিমানাটা কি ভাবে দিতে হল বুঝিয়ে বলি।

এর পর যখনই সে আমাকে সাজা দিতে চাইত তখনই তার বেয়ালাতে বাজাতে আরম্ভ করত ভাটিয়ালির সুর।

বোঝ অবস্থাটা! বিদেশ-বিভুঁইয়ে একেই দেশের জন্য মন আঁকুপাঁকু করে তার উপর ভাটিয়ালির করুণ টান!

রবীন্দ্রনাথের শ্রীকণ্ঠবাবুর মতো[৪] আমি কাতর রোদনে তাঁকে বেয়ালা বন্ধ করতে অনুনয়-বিনয় করতুম।

কিন্তু আজও বলি, লোকটা যা বেয়ালাতে ভাটিয়ালি চড়াতে পারত তার তুলনা হয় না।

কত দেশ ঘুরলুম, কত লোক দেখলুম, কত অজানা জনের প্রীতি পেলুম, কত জানা জনের দুর্ব্যবহার, হিটলারের মতো বিরাট পুরুষের উত্থান-পতন দেখলুম, সে সব বড় বড় জিনিস প্রায় ভুলে গিয়েছি, কিছু এই সব ছোটখাটো জিনিস কিছুতেই ভুলতে পারি নে। মনে হয় যেন আজ সকালের ঘটনা।

চাঁদের আলোতে দেখছি, নীলের উপর দিয়ে চলেছে মাঝারি ধরনের খোলা মহাজনী নৌকা—হাওয়াতে কাত হয়ে তেকোণা পাল পেটুক ছেলের মত পেট ফুলিয়ে দিয়ে। হাওয়া বইছে সামান্যই, কিন্তু এই পেটুক পাল এর ওর সবার হাওয়াই খাবার যেন কেড়ে নিয়ে পেটটাকে ঢাকের মতো ফুলিয়ে তুলেছে। ভয় হয়, আর সামান্য একটুখানি জোর হাওয়া বইলেই, হয় পালটা এক ঝটকায় চৌচির হয়ে যাবে, নয় নৌকোটা পেছনের ধাক্কা খেয়ে গোটা আড়াই ডিগবাজি খেয়ে নীলের অতলে তলিয়ে যাবে।

এই নীলের জল দিয়ে এ দেশের চাষ হয়। এই নীল তাঁর বুকে ধরে সে চাষের ফসল মিশরের সর্বত্র পৌঁছিয়ে দেন। তাই এ দেশের কবি গেয়েছেন:

> ওগো নীলনদপ্লাবিতা ধরণী আমি ভালোবাসি তোরে,
> ঐ ভালোবাসা ধর্ম আমার কর্ম আমার ওরে।

---

৪ রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড, ২১৫ পৃঃ।

পিরামিড ! পিরামিড !! পিরামিড !!!

কোনো প্রকারের আশ্চর্য প্রকাশ করতে হলে আমরা তিনটে আশ্চর্যবোধক চিহ্ন—!!!—দিই। তাই কি চোখের সামনে দাঁড়িয়ে তিনটে পিরামিড ? কিংবা উল্টোটা ? তিনটে পিরামিড ছিল বলে আমরা তিনবার আশ্চর্য হই ?

এই পিরামিডগুলো সম্বন্ধে বিশ্বজুড়ে যা গাদা গাদা বই লেখা হয়ে গিয়েছে তার ফিরিস্তি দিতে গেলেই একখানা আস্ত জলে-ডাঙায় লিখতে হয়। কারণ এই তিনটে পিরামিড পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো কীর্তিস্তম্ভ—যুগ যুগ ধরে মানুষ এদের সামনে দাঁড়িয়ে বিস্তর জল্পনা-কল্পনা করেছে, দেয়ালে-খোদাই এদের লিপি উদ্ধার করে এদের সম্বন্ধে পাকা খবর সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছে, জান তো, পিরামিডের ঠিক মাঝখানে একটা কুটুরিতে বিস্তর ধনদৌলত জড়ো করা আছে—তারই পথ অনুসন্ধান করছে পাকা সাড়ে ছ হাজার বছর ধরে। ইরানী, গ্রীক, রোমান, আরব, তুর্কী, ফরাসী, ইংরেজ, পর পর সবাই এদেশ জয় করার পর প্রথমেই চেষ্টা করেছে পিরামিডের হাজার হাজার মণ পাথর ভেঙে মাঝখানের কুটুরিতে ঢুকে তার ধনদৌলত লুট করার। কিন্তু আশ্চর্য, যিনি শেষ পর্যন্ত ঢুকতে পারলেন তিনি ধন লুটের মতলবে ঢোকেন নি। তিনি ঢুকেছিলেন নিছক ঐতিহাসিক জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য। ফারাওয়ের রাজমিস্ত্রীরা কুটুরি বানানো শেষ করার পরে বেরোবার সময় এমন-ই মস্ত পাথর দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে বাইরের দেয়ালে পালিশ পলস্তরা লাগিয়ে দেয় যে, পৃথিবীর মানুষের সাড়ে ছ হাজার বছর লাগল ভিতরে যাবার রাস্তা বের করতে !

মিশরের ভিতরে-বাইরে আরও পিরামিড আছে, কিন্তু গিজে অঞ্চলের যে তিনটে পিরামিডের সামনে আমরা দাঁড়িয়ে, সেগুলোই ভুবন-বিখ্যাত, পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম।

রাজা	নির্মাণের সময়	ভূমিতে দৈর্ঘ্য	উচ্চতা
খুফু	৪৭০০ খৃীঃ পূঃ	৭৫৫ ফুট	৪৮১ ফুট
খাফ্রা	৪৬০০ „ „	৭০৬ „	৪৭১ „
সেনকাওরা	৪৫৫০ „ „	৩৪৬ „	২১০ „

প্রায় পাঁচশো ফুট উঁচু বললে, না দেখে চট করে পিরামিডের উচ্চতা সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায় না। এমন কি চোখের সামনে দেখেও ধারণা করা যায় না, এরা ঠিক কতখানি উঁচু। চ্যাপ্টা আকারের একটা বিরাট জিনিস আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে পাঁচশো ফুট উঁচু না হয়ে যদি চোঙার মতো একই সাইজ রেখে উঁচু হত, তবে স্পষ্ট বোঝা যেত পাঁচশো ফুটের উচ্চতা কতখানি উঁচু !

বোঝা যায়, দূরে চলে গেলে। গিজে এবং কাইরো ছেড়ে বহু দূরে চলে যাওয়ার পরও হঠাৎ চোখে পড়ে তিনটে পিরামিড, সব কিছু ছাড়িয়ে, মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। আর পিরামিড ছেড়ে যদি সোজা মরুভূমির ভিতর দিয়ে চলে যাও, তবে মনে হবে সাহারার শেষ প্রান্তে পেঁৗছে যাওয়ার পরও বুঝি পিরামিড দেখা যাবে !

তাই বোঝা যায়, এ বস্তু তৈরি করতে কেন তেইশ লক্ষ টুকরো পাথরের প্রয়োজন হয়েছিল। 'টুকরো' বলতে একটু কমিয়ে বলা হল, কারণ এর চার-পাঁচ টুকরো একত্রে করলে একখানা ছোটখাটো এঞ্জিনের সাইজ এবং ওজন হয়। কিংবা বলতে পারো, ছ ফুট উঁচু এবং তিন ফুট চওড়া করে এ পাথর নিয়ে একটা দেয়াল বানালে সে দেয়াল লম্বায় ছ'শ পঞ্চাশ মাইল হবে। অর্থাৎ সে দেয়াল কলকাতা থেকে দার্জিলিং গিয়ে আবার ফিরে আসতে পারবে!

সবচেয়ে বড় পিরামিডটা বানাতে নাকি এক লক্ষ লোকের বিশ বৎসর লেগেছিল।

ভেবে কূল-কিনারা পাওয়া যায় না, সে সম্রাটের কতখানি ঐশ্বর্য আর প্রতাপ ছিল, যিনি আপন রাজধানীর পাশে এক লক্ষ লোককে বিশ বচ্ছর খাওয়াতে-পরাতে পেরেছিলেন। অন্য খরচের কথা বাদ দাও, এই এক লক্ষ লোকের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য যে বিরাট প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন সেটা গড়ে তোলা এবং তাকে বিশ বচ্ছর ধরে চালু রাখা তারাই করতে পারে, যারা সভ্যতার খুব একটা উঁচু স্তরে উঠে গিয়েছে।

এইবারে আমরা পিরামিড নির্মাণের কারণের কাছে পেঁছে গিয়েছি।

প্রথম কারণ সকলেরই জানা। ফারাওরা (সম্রাটরা) বিশ্বাস করতেন, তাঁদের শরীর যদি মৃত্যুর পর পচে যায় কিংবা কোনো প্রকারের আঘাতে ক্ষত হয়, তবে তাঁরা পরলোকে অনন্ত জীবন পাবেন না। তাই মৃত্যুর পর তাঁদের দেহকে 'মামি' বানিয়ে সেটাকে এমন একটা শক্ত পিরামিডের ভিতর রাখা হত যে, তার ভিতরে ঢুকে কেউ যেন 'মামি'কে ছুঁতে পর্যন্ত না পারে। কিন্তু হায়, তাঁদের এ-বাসনা পূর্ণ হয় নি। পূর্বেই বলেছি, হাজার হাজার বছর চেষ্টা করে দুষ্ট (অর্থাৎ ডাকাতরা) এবং শিষ্টেরা (অর্থাৎ পণ্ডিতেরা) শেষ পর্যন্ত তাদের গোপন কবরে ঢুকতে পেরেছেন। তাই করে অবশ্য গৌণত কোনো কোনো ফারাওয়ের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে—পণ্ডিতেরা তাদের মামি সযত্নে জাদুঘরে সাজিয়ে রেখেছেন। সেখানে তাঁরা অক্ষত দেহে মহাপ্রলয়ের দিন গুনছেন, যেদিন তাঁরা নব দেহ নবযৌবন ফিরে পেয়ে অমৃতলোকে অনন্ত জীবন আরম্ভ করবেন।

কিন্তু যদি ইতিমধ্যে আরেকটা বিশ্বযুদ্ধ লেগে যায়? ফলে গুটিকয়েক অ্যাটম বম পড়ে? তবে?

আমার মনে ভরসা, এঁরা যখন চোর-ডাকু ধনিক-পণ্ডিতের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে এত হাজার বৎসর অক্ষত দেহে আছেন তখন মহাপ্রলয় পর্যন্ত পেঁছে যাবেন-ই যাবেন। এ্যাটম বম্ পড়ার উপক্রম হলে আমি বরঞ্চ তারই একটার গা ঘেঁষে গিয়ে বসব। মামিটা রক্ষাকবচের মতো হয়ে তার দেহকে তো বাঁচাবেই, সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও বাঁচিয়ে দেবে। চাই কি, গোটা শহরটাই হয়তো বেঁচে যাবে!

পিরামিড নির্মাণের দ্বিতীয় কারণ,—এই কারণের উল্লেখ করেই আমি এ অনুচ্ছেদ আরম্ভ করেছি—

ফারাওরা বলতে চেয়েছিলেন, সভ্যতার যে স্তরে আমরা এসে পৌঁচেছি, আমরা যে প্রতাপশালী রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছি, সেগুলো যেন এই পিরামিডের মতো অজর অমর এবং বিশেষ করে অপরিবর্তনীয় হয়ে থাকে। 'পরিবর্তন যেন না হয়', 'যা আছে তাই থাকবে', এই ছিল পিরামিড গড়ার দ্বিতীয় কারণ। পিরামিড জগদ্দল পাথর হয়ে—অতি শব্দার্থে জগদ্দল পাথরই বটে—যুগ যুগ ধরে আমাদের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য, রাজবংশ, ধর্মনীতি, সব কিছু অপরিবর্তনীয় করে চেপে ধরে রাখবে।

তাই পিরামিড দেখে মানুষের মনে জাগে ভয়। আজ যদি সেই ফারাওরা বেঁচে থাকতেন, তবে তার প্রতি জাগত ভীতি। এই পিরামিড যে তৈরী করতে পেরেছে, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবার কল্পনাও তো মানুষ করতে পারে না।

তাজমহলের গীতিরস কঠিন মানুষের পাষাণ হৃদয়কেও গলিয়ে দেয়, কুতুবমিনারের ঋজু দেহ উন্নতশির দুর্বলজনকে সবল হয়ে দাঁড়াতে শেখায় এই দুই রস কাব্যের, সঙ্গীতের প্রাণ। তাজমহল নিয়ে তাজমহলের মতো কবিতা রচনা করা যায়, কিন্তু পিরামিড নিয়ে কবিতা হয়েছে বলে শুনি নি। বরঞ্চ পিরামিডের দোহাই দিয়ে বেঙ্গল অর্ডিনান্সের অনুকরণে আজ এক নূতন ইজিপসিয়ান অর্ডিনান্স তৈরী করা যায়।

কিন্তু হায়, ফারাওরা 'অপরিবর্তনে'র যে অর্ডিনান্স জারি করে বিরাট পিরামিড গড়েছিলেন, সেটা টিকল না। ফারাও বংশ ধ্বংস হল, দূর ইরানের রাজারা মিশর লণ্ডভণ্ড করে দিল, তারপর গ্রীক, রোমান এবং শেষটায় সারা মিশরের লোক ইসলাম গ্রহণ করে সম্পূর্ণ নূতন পথে চলল। মুসলমানরা দেহ এবং আত্মার পার্থক্য চেনে। অনন্ত জীবন পাওয়ার জন্য দেহটাকে যে মামি করে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই, সে কথা তারা বোঝে।

কিন্তু ফারাওদের দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই। প্রায় সব দেশেই মানুষ উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে বলেছে, 'এই ঠিক জায়গায় এসে পৌঁচেছি, আর এগিয়ে যাবার প্রয়োজন নেই। যা সঞ্চয় করেছি তাই বেঁচে থাকুক, সেইটেই অপরিবর্তনীয় হয়ে থাক।' ফলে হয়েছে পতন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন এই বিষয় নিয়ে 'তাজমহলের' মতো কবিতা লিখেছেন তখন আমার আর বাক্যব্যয় করার কি প্রয়োজন?

॥ ১৯ ॥

চাঁদের আলোতে বিশ্বজন তাজমহল দেখবার জন্য জড়ো হয়।

পিরামিডের বেলাও তাই।

চতুর্দিকে লোকজন গিসগিস করছে। এদেশের মেলাতেও বোধ করি এত ভিড় হয় না।

অবশ্য তার কারণও আছে। নিতান্ত শীতকাল ছাড়া গরমের দেশে দিনের

বেলা কোনো জিনিস অনেকক্ষণ ধরে রসিয়ে রসিয়ে দেখা যায় না। বিশেষ করে যেখানে কোন সূক্ষ্ম কারুকার্য দেখবার বালাই নেই সেখানে তো আরো ভালো। তাজের মিহি কাজ চাঁদের আলোতে চোখে পড়ে না, তবু সবসুদ্ধ মিলিয়ে তার যে অপূর্ব সামঞ্জস্য চাঁদের আলোতে ধরা দেয় দিনের কড়া আলোতে সেটা দর্শককে ফাঁকি দেয় বলে মানুষ চাঁদের আলোতে তাজ দেখে। পিরামিডে সে রকম কোনো নৈপুণ্য নেই, তদুপরি পিরামিডের চতুর্দিকে মরুভূমি বলে সেখানে দিনের বেলাকার গরম পীড়াদয়ক, কাজেই নিতান্ত শীতকাল ছাড়া দিনের বেলা কম লোকই পিরামিড দেখতে যায়।

পক্ষান্তরে শীতের দেশে ব্যবস্থা অন্যরকম। আমি ফুটফুটে চাঁদের আলোতে কলোন্ গির্জার পাশ দিয়ে শীতের রাতে হি-হি করে বহুবার বাড়ি ফিরেছি। কাক-কোকিল দেখতে পাই নি।

পল পার্সি আর আমাদের দলের আরো কয়েকজন পিরামিডের মাঝখানকার কবর-গৃহ দেখতে গেছেন। আমি যাই নি।

আমি বসে বসে শুনছি, জাত-বেজাতের কিচিরমিচির, স্যাণ্ডউইচ খোলার সময় কাগজের মড়মড়, সোডা-লেমনেড খোলার ফটাফট। ইয়োরোপীয়েরা খাবার ব্যবস্থা সঙ্গে না নিয়ে তিন পা চলতে পারে না। পিরামিড হোক আর নিমতলাই হোক, মোকামে পেঁছনো মাত্রই বলবে, 'টম, বাস্কেটটা এই দিকে দাও তো। ডিক্ তুমি ফ্লাস্ক থেকে চা ঢালো' আর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে 'ডার্লিং, আপেলগুলো ভুলে যাও নি তো?' ইতিমধ্যে হ্যারি হয়তো গ্রামোফোনের জাঁতা চালিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য যদি দলে মেয়েরা ভারী হন তবে কোনো কিছুই শুনতে পাওয়া যায় না। 'লাভলি', 'গ্র্যাণ্ড', 'সবলাইম' ইত্যাদি শব্দে তখন যে ঘ্যাঁট তৈরী হয় তার কোনটা কি, ঠিক ঠাহর করা যায় না।

কোনো কোনো ট্যুরিস্ট আমাকে বলেছেন, নায়াগ্রার গম্ভীর জল-নির্ঘোষ শুনতে হলে নাকি মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে যেতে নেই। যে ধ্বনি তাদের ভিতর ওঠে তাতে নাকি নায়াগ্রার—থাক, মেয়েরা আমার উপর এমনিতেই চটে আছেন। কিন্তু আমার উপর চটে আর লাভ কি? ওঁয়াদের খাস-পেয়ারা কবি রবি ঠাকুরই এ-বাবদে কি বলেছেন?—

> 'ছেলেরা ধরিল পাঠ, বুড়োরা তামুক,
> এক দণ্ডে খুলে গেল রমণীর মুখ।'

পল-পার্সি ফিরে এসেছে। আমি শুধালুম, 'কি দেখলে, বাছারা?' তারপর নোটবুক খুলে বললুম, 'গুছিয়ে বলো, সব কিছু টুকে নেব; আমি তো বে-আক্কেলের মতো এইখানে বসে বসে সময় কাটালুম।'

পার্সি করুণ কণ্ঠে বললে, 'আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেবেন না, স্যর। দেখেছি কচু পোড়া। মশালের আলোতে হাতের তেলো চোখে পড়ে না। তারই জোরে বিস্তর সুড়ঙ্গ পেরিয়ে একটা চৌকো ঘরে শেষটায় পেঁছলুম। বেবাক ভোঁ ভোঁ। এক কোণে একখানা ভাঙা ঝাঁটা পর্যন্ত নেই। গাইড বললে, "ব্যস্ ফিরে চলুন।" আপনি তখনই বারণ করলেন না কেন?'

আমি বললুম, 'বারণ করলে কি শুনতে? বাকী জীবন মনটা খুঁতখুঁত করতো না, ফারাওয়ের শেষ শোওয়ার ঘর দেখা হল না? এ হল দিল্লীর লাড্ডু।'

শুধালে, 'সে আবার কি?'

আমি বুঝিয়ে বললুম।

পল বললে, 'গাইড বলছিল, পিরামিডের যে বিরাট বিরাট পাথর সেগুলো নাকি টেনে টেনে নদীর ওপার থেকে এখানে আনা হয়েছিল। আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না—ওর যা ইংরেজী!'

আমি বললুম 'ঠিকই বলেছে। নীলের এপারে পাথর পাওয়া যায় না। তাই ওপার থেকে পাথর কেটে ভেলায় করে এপারে নিয়ে আসা হত। আর সে যুগে মানুষ চাকা কি করে বানাতে হয় জানত না বলে সেই পাথরগুলো ধাক্কা দিয়ে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেত। কাঠ বাঁশ দিয়ে পথ তৈরী করা হত পিছলে নিয়ে যাবার সুবিধের জন্য। এবং শুনেছি, সে পথে নাকি ঘড়া ঘড়া তেল ঢালা হত, সেটাকে পিছলে করার জন্যে। আশ্চর্য নয়! এর ছটা পাথরে যখন একটা এঞ্জিনের আকার ধরতে পারে, এবং স্পষ্ট দেখেছি, এঞ্জিন রেল লাইন থেকে কাত হয়ে পড়ে গেলে তাকে খাড়া করবার জন্য আজকের দিনের কপিকল পর্যন্ত কি রকম হিমশিম খায়, তখন তো তেল-ঘি ঢালার কথা আর অবিশ্বাস করা যায় না।'

তখন আলোচনা আরম্ভ হল চাকা আবিষ্কার নিয়ে। আগুন যে রকম মানুষকে সভ্যতার পথ দেখিয়ে দিল, চাকাও মানুষকে ঠিক তেমনি বাকি পথটুকু অক্লেশে চলতে শেখালে। শুনেছি, ভারতের মোন্-জো-দড়োতে প্রথম চাকা আবিষ্কার হয় এবং ক্রমে ক্রমে সেটা সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।

আমরা এখনো যখন পালকি চড়ি তখন বোধ হয় সেই আদিম যুগে ফিরে যাই, যখন মানুষ চাকা আবিষ্কার করতে শেখে নি। ছজন বেয়ারা একটি মেয়েকে বইতে গিয়ে ঘেমে নেয়ে যায়, ঘড়ি ঘড়ি জিরোয় আর গামছা ঘুরিয়ে হাওয়া খায়; ওদিকে একজন রিক্সাওলা দুটো লাশকে দিব্য টেনে নিয়ে যায়—সবই চাকার কল্যাণে।

আবুল আসফিয়া বললেন, 'চাকা এরা আবিষ্কার করতে পারে নি সত্যি, কিন্তু হাতের নৈপুণ্যে এরা আর সবাইকে হার মানিয়েছে। এই যে হাজার হাজার টনী লক্ষ লক্ষ পাথর একটার গায়ে আরেকটা জোড়া দিয়েছে, সেখানে এক ইঞ্চির হাজার ভাগের এক ভাগের কাজ। আজকের দিনের জহুরীরা, চশমা বানানেওলারাও এত সূক্ষ্ম কাজ করতে পারে কি না সন্দেহ আর জহুরীদের কাজ তো এক ইঞ্চি আধ ইঞ্চি মাল নিয়ে। এরা সামলেছে লক্ষ লক্ষ ইঞ্চি।'

আমরা শুধালুম, 'তা হলে তারা সে নৈপুণ্য কোনো সূক্ষ্ম কলা নির্মাণে, কোনো সৌন্দর্যসৃষ্টিতে প্রয়োগ করল না কেন?'

আবুল আসফিয়া বললেন, 'সেটা দেখতে পাওয়া যায় তাদের মন্দিরগাত্রে, তাদের প্রস্তরমূর্তিতে।'

হায়, সেগুলো এখন দেখবার উপায় নেই।

পার্সি ততক্ষণে বালু জড়ো করে বালিশ বানিয়ে তারই উপর মাথা দিয়ে শুয়ে পড়েছে। তত্ত্বালোচনার প্রতি তার একটা বিধিদত্ত আজন্মলব্ধ নিরংকুশ বৈরাগ্য আছে। স্বতই ভক্তিভরে মাথা নত হয়ে আসে।

আবুল আসফিয়া বললেন, 'অনেক রাত হয়েছে। শহরে ফেরা যাক।'

পল অনেকক্ষণ ধরে গম্ভীর হয়ে কি যেন ভাবছিল। মোটরের দিকে যেতে যেতে বললে,'আমার কিন্তু সমস্ত জিনিসটা একটা হিউজ ওয়েস্ট বলে মনে হয়।' আমরা সবাই চুপ করে শুনলুম।

আমাদের দলের মধ্যে একটি প্রৌঢ়া মহিলা ছিলেন। তিনি বললেন, 'না, মসিয়ো পল। পিরামিডের একটা গুণ আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন। এর সামনে দাঁড়ালে, বয়সের দিক দিয়ে দেখতে গেলে, আমাকেও তরুণী বলে মনে হয়।'

একটা কথার মতো বটে।

আমি বললুম, 'শাবাশ!'

॥ ২০ ॥

মানুষের চেহারা জাগ্রত অবস্থায় এক রকম, ঘুমন্ত অবস্থায় অন্য রকম। শহরের বেলাতেও তাই। জাগ্রত অবস্থায় কোনো মানুষকে বেশ চালাক-চতুর বলে মনে হয়, কিন্তু ঘুমন্ত অবস্থায় তাকেই দেখায় আস্ত হাবা গঙ্গারামের মতো। দুপুর বেলা লালদিঘি গমগম করে, রাত্রে সেখানে গা ছমছম করে। আমাদের পাড়া পার্ক সার্কাসের ট্রাম ডিপো অঞ্চল দুপুরবেলা ঘুমিয়ে পড়ে, সন্ধ্যায় হোটেলগুলো যেন কোরাস গান গেয়ে ওঠে।

রসের ক্ষেত্রে আমি ছেলে-বুড়োতে তফাত করি নে। আট বছরের ছেলে মহাভারত পড়ে সুখ পায়, আশী বছরের বুড়োও আনন্দ পায়। আবার আট বছরের ছেলে দিব্য কীর্তন গেয়ে শুনিয়ে দিলে, ষাট বছরের সুরকানা পণ্ডিত ধরতে পারলে না, সেটা কীর্তন না বাউল! অর্থাৎ রসবোধের ক্ষমতা বয়সের উপর নির্ভর করে না।

কিন্তু কোনো কোনো ছোটখাটো রস বয়সের উপর নির্ভর করে। আট বছরে সিগরেট খেয়ে কোনো লাভ নেই, আঠারোতেই রাস্তায় মার্বেল খেলার রস শুকিয়ে যায়। ঠিক তেমনি রাতের শহর ছোটদের জন্য নয়। তুলনা দিয়ে বলি; সকাল আটটায় আট বছরের ছেলেকে আটখানা ট্যাকসি ডাকতে পাঠাতে পারি, কিন্তু রাত দশটায় দশ বছরের ছেলেকে দশ জায়গায় পাঠাতে পারি নে।

কিন্তু যে-সব দুঁদে ছেলেরা—যেমন পল পার্সি—রাত দুটোর সময় জেগে আছে, তাদের নিয়ে কি করা যায়? আবুল আসফিয়া অভয় জানিয়ে বললেন,

কাইরোতে এমন সব নাচের জায়গা আছে, যেখানে বাপ্-মা আপন ছেলেমেয়েকে সঙ্গে নিয়ে আনন্দ করতে যান!

তারই একটা 'কাবারে'-তে যাওয়া হল।

খোলাতে। উপরে মুক্ত আকাশ। চতুর্দিকে জাপানী ফানুসে ঢাকা রঙ-বেরঙের আলোর জ্যোতি ক্ষীণ বলে উপরের দিকে খানিকক্ষণ তাকালে গম্ভীর আকাশের গায়ে চটুল তারার মিটমিটে নাচ দেখা যায়।

শ'খানেক ছোট ছোট টেবিল। এক প্রান্তে স্টেজ। ডাইনে বাঁয়ে উইঙও নেই, পিছনে শুধু হুবহু শুক্তির এক পাটির মতো কিংবা বলতে পারো, সাপের ফণার মতো উঁচু হয়ে ডগার কাছে নিচের থেকে বেঁকে আছে স্টেজের বিরাট ব্যাকগ্রাউণ্ড। শুক্তিতে আবার ঢেউ-খেলানো—এ রকম ছোট্ট সাইজের ঝিনুক সমুদ্রপাড়ে কুড়িয়ে পাওয়া যায়—দেখতে ভারি চমৎকার। ব্যাকগ্রাউণ্ডের পিছনে এরই আড়ালে গ্রীনরুম নাকি, না মাটির নিচে সুড়ঙ্গ করে?

হঠাৎ সব কিছু অন্ধকার হয়ে গেল। ভাবছি ব্যাপার কি। পল পার্সিকে কানে কানে বললুম, 'মনিব্যাগ চেপে ধরো। বলা তো যায় না, বিদেশ-বিভুঁই জায়গা।'

নাঃ, আলো জ্বলতে দেখি, শুক্তির সামনে এক স্ফিনক্স। পিরামিডের পাশে আমরা স্ফিনক্সের পাথরের মূর্তি দেখেছি—অবশ্য এর চাইতে পাঁচশো গুণে বড়। স্ফিনক্স মিশরের সম্রাট ফারাওয়ের প্রতিমূর্তি। মুখটা রাজারই মতো, শুধু শক্তি আর প্রতাপ বোঝানোর জন্য শরীরটা সিংহের।

পিছন থেকে বেরিয়ে এল ছটি মেয়ে। গলা থেকে পা অবধি ধবধবে সাদা শেমিজের মতো লম্বা জামা পরা। রাস্তায় মিশরী মেয়েদের এ রকম জামা পরতে দেখেছি। তবে অন্য রঙের।

আস্তে আস্তে তারা স্ফিনক্সের চারদিকে ঘুরে ঘুরে নাচতে আরম্ভ করল। বড় মৃদু পদক্ষেপ। পায়রা যে-রকম নিঃশব্দ পদসঞ্চারণে হাঁটে। চাঁদ যে রকম আকাশের উপর দিয়ে তারার ফুলকে না মাড়িয়ে আকাশের এপার-ওপার হয়।

পায়ে ঘুঙুর নেই, হাতে কাঁকন নেই। শুধু থেকে থেকে সমের একটু আগে তেহাইয়ের সময় থেকে বাঁশি, খঞ্জনী আর ঢোলের সামান্য একটুখানি সঙ্গীত। বড় করুণ, অতি বিষাদে ভরা। নীলনদের এপার থেকে মা যেন ওপারের ছেলেকে সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফেরার জন্য ডাকছে। এ ডাক আমি জীবনে বহুবার শুনেছি। যে মা-ই ডাকুক না কেন, আমি যেন সে ডাকে আমার মায়ের গলা শুনতে পাই।

সে ডাক বদলে গেল। এবারে শুনতে পাচ্ছি অন্য স্বর। এ যেন মা ছেলেকে ঘুম থেকে জাগাবার চেষ্টা করছে। এ গলায় গোড়ার দিকে ছিল অনুনয়-বিনয়। তার পর আরম্ভ হল আশা-উদ্দীপনার বাণী। সঙ্গীত জোরালো হয়ে আসছে। পদক্ষেপ দ্রুততর হয়েছে। ছটি নয় এখন মনে হচ্ছে যেন ষাটটি মেয়ে দ্রুত হতে দ্রুততর লয়ে নৃত্যাঙ্গন অপূর্ব আলিম্পনে পরিপূর্ণ করে

দিয়েছে ! আর পদক্ষেপের কণামাত্র স্থান নেই ।

স্বপ্নে অজানা লিপি,অচেনা বাণী মানুষ যেমন হঠাৎ কোনো এক ইন্দ্রজালের প্রভাবে বুঝে ফেলে, আমি ঠিক তেমনি হঠাৎ বুঝে গেলুম নাচের অর্থটা কি। এ শুধু অর্থবিহীন পদক্ষেপ নয়, ব্যঞ্জনাহীন হস্ত-বিন্যাস নয়। নর্তকীরা নব মিশরের প্রতীক। এরা প্রাচীন মিশরের প্রতীক স্ফিনকসকে তার যুগ-যুগান্ত-ব্যাপী নিদ্রা থেকে জাগরিত করতে চাইছে। সে তার লুপ্ত গৌরব নিয়ে সুপ্তিজাল ছিন্নভিন্ন করে আবার মিশরে সুপ্রতিষ্ঠিত হোক, বিদেশী স্বৈরতন্ত্রের কুহেলিকা উদঘাটন করে সেই প্রাচীন সবিতার নবীন মূর্তি দ্যুলোক ভুলোক উদ্ভাসিত করুক।

তবে কি আমারই মনের ভুল ? দেখি, স্ফিনকস মূর্তির মুখে যেন হাসি ফুটে উঠেছে। এ কি জাদুকরের ভানুমতী, না সৃষ্টিকর্তার অলৌকিক আশীর্বাদ ?

আবার অন্ধকার হয়ে গেল।

নিদ্রিতের চোখে যে রকম পড়ে, আমার চোখে ঠিক তেমনি এসে পড়ল পশ্চিমাকাশ থেকে চন্দ্রাস্তের রক্তছটা আর পূর্বাকাশ থেকে নব অরুণোদয়ের পূর্বাভাস।

জয় মিশরভূমির জয়।

॥ ২১ ॥

ইংরেজীতে কি যেন একটা প্রবাদ আছে,—

Early to bed and early to rise

তার পর কি যেন সব হয় ? হ্যাঁ বাঙলাটা মনে পড়েছে ; —

সকাল সকাল শুতে যাওয়া সকাল বেলা ওঠা,
স্বাস্থ্য পাবে বিদ্যে হবে, টাকাও হয় মোটা।

গ্রামের তুলনায় শহরে টাকা বেশী, রাস্তায় রাস্তায় বিদ্যের ভাণ্ডার ইস্কুল-কলেজ, আর শহরবাসীকে অজর অমর করে রাখবার জন্য কত ডাক্তার-কবিরাজ-হেকিম না খেয়ে মরছে তার হিসেব রাখে কে ? তাই বোধ হয় শহরের লোক সকাল সকাল শুতে যাওয়ার আর সকাল বেলা ওঠার প্রয়োজন বোধ করে না। গ্রামের লোক তাই এখনো ভোরবেলা ওঠে। কাইরো শহর তাই এখনো ঘুমুচ্ছে—অবশ্য নাক ডাকিয়ে নয়।

আবুল আসফিয়া বললেন, 'তা ঠিক, কিন্তু মুসলমানদের প্রথম নমাজ পড়তে হয় কাক-কোকিল ডাকার পয়লা। এদেশে তাদের বড় বড় মসজিদ-মাদ্রাসা আজহর পাড়ায়। সেখানেই যাওয়া যাক। তারা নিশ্চয়ই ঘুম থেকে উঠেছে।'

উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু মসজিদের নমাজীদের দেখবার জন্য এই সুদূর কাইরো শহরে আসা কেন ? আপন কলকাতায় জাকারিয়া স্ট্রীটে গেলেই হয় !

উঁহু, সেইটেই নাকি কাইরোর প্রবীণ অঞ্চল। অবশ্য পিরামিডের তুলনায় অতিকায় নবীন—বয়স মাত্র এক হাজার বৎসর, কিঞ্চিৎ এদিক-ওদিক। প্রাচ্যের রোমাণ্টিক নগরী কাইরো বলতে জগজ্জনের মনে আরবিস্থানের যে রঙীন ছবির ফুটে ওঠে সে বস্তু নাকি এখনো ঐ অঞ্চলেই পাওয়া যায়।

ট্রাম কিন্তু তখনই চলতে আরম্ভ করেছে। কলকাতার ট্রামের তুলনায় অতিশয় লজঝড় এবং ছুটির দিনে ইস্কুল-কলেজের মতো ফাঁকা।

পয়লা ট্রাম দেখা মাত্রই আবুল আসফিয়া তড়িঘড়ি ট্যাক্সিওলাদের পাওনা পয়সা বুঝিয়ে দিয়ে বিদেয় করে দিয়েছেন। পয়সা বাঁচাবার এ ফিকির সবাই জানে কিন্তু বিদেশ-বিভুঁইয়ে কে জানে কোন ট্রাম কোথায় যায়? আপন কলকাতাতেই যখন ট্রামের গুবলেটে নিত্যি নিত্যি কালীঘাট যেতে গিয়ে পেঁছে যাই মৌলা আলী, কিংবা বলতে পারো মর মর অবস্থায় মেডিকেল কলেজে না পেঁছে ট্রাম ভিড়ল নিমতলায়! 'বল্ হরি, হরি বল!'

আবুল আসফিয়া বললেন, 'আল্লা আছেন, ভাবনা কি।'

'তব সাথী হয়ে দগ্ধ মরুতে
পথ ভুলে তবু মরি
তোমারে ত্যজিয়া মসজিদে গিয়া
কি হবে মন্ত্র স্মরি!'

তবু খুব ভরসা পেলুম না। হরিই বলো আর আল্লাই বলো, তাঁরা সবক-জনা এই কটা বাউণ্ডুলের জন্য অন্য সব কিছু ছেড়ে দিয়ে এই অবেলায় ঠিক ট্রাম ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় পাঠাবার তদারকিতে বসে আছেন—এ ভরসা করতে হলে যতখানি বিশ্বাসী হতে হয় আমি ঠিক ততখানি নই। তা হই আর না-ই হই, আর পাঁচ জনের সঙ্গে সঙ্গে ট্রামেই উঠতে হল।

রাস্তা ক্রমেই সরু হয়ে আসছে। পৃথিবীর সর্বত্র যা হয়—খোলা-মেলার নূতন শহর থেকে নোংরা ঘিঞ্জি পুরানো শহরে ঢোকবার সময়।

রাস্তার দুদিকে দোকান-পাট এখনো বন্ধ। দু-একটা কফির দোকান খুলিখুলি করছে। ফুটপাথের উপর লোহার চেয়ারের উপর পদ্মাসনে বসে দু-চারটি সুদানী দারোয়ান তসবী টপকাচ্ছে, খবরের কাগজওলার দোকানের সামনে অল্প একটু ভিড়, চাকরবাকররা হনহন করে চলেছে বড় সায়েবদের বাড়ি পেঁছতে দেরি হয়ে গিয়েছে বলে।

তরল অন্ধকার সরল আলোর জন্যে ক্রমেই জায়গা করে দিচ্ছে। কালো চুলের মাঝখানে সাদা সিঁথি ফুটে উঠেছে। তার উপর দেখা যাচ্ছে লাল সিঁদুরের পোঁছ। আকাশ বাতাসের এই লীলা-খেলাতে সব কিছু পষ্টাপষ্টি দেখা গেল তা নয়, কিন্তু ট্রামের জানালার উপর মাথা রেখে আধো ঘুমে আধো জাগরণে জড়ানো জড়ানো হয়ে সব কিছুই যেন কিছু কিছু দেখা হল। স্বপ্নে ঘুমে জাগরণে মেশানো অভিজ্ঞতা ভাষাতে প্রকাশ করা কঠিন। ছবিতে এ জিনিস ফোটানো যায় অনেক অক্লেশে। তাই বোধ হয় চিত্রকরদের সূর্যোদয়ের ছবি, সাহিত্যের সূর্যোদয়কে প্রায়ই হার মানায়।

সবচেয়ে সুন্দর দেখাচ্ছিল মসজিদের চুড়ো (মিনার)-গুলোকে। কুৎবু-মিনার যারা দেখেছে তারাই জানে তার সৌন্দর্য কি। মনে হয় সে যেন পৃথিবীর ধুলো-মাটির প্রাণী নয়। সে যেন কোনো রাজাধিরাজের উষ্ণীষ—দেশের আপামর জনসাধারণের বহু ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে ভগবানের আপন হাতের অভিষেক আশীর্বাদের পরশ পাচ্ছে।

তবু কুৎবের পা মাটিতে ঠেকেছে। এদের বহু মিনার দাঁড়িয়ে আছে আল্লার নামাজের ঘর মসজিদের উপর। কিন্তু এরা জানে উপরের দিকে আল্লার কাছে যাওয়ার অর্থ কি। সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যতই উপরের দিকে যাচ্ছে ততই ভয়ে জড়সড় হয়ে সরু হয়ে যাচ্ছে—ক্লাসের গাব্দা-গোব্দা ছেলেও যে-রকম হেড মাস্টারের সামনে শরকাঠিটি হয়ে যায়। কিন্তু দ্যুলোক আর সবিতা যেন ওদের অভয় দিচ্ছেন। আকাশ যেন তাঁর আপন নীলাম্বরী তাদের পরিয়ে দিতে এসেছেন—পিছনের দিকটা পরা হয়ে গিয়েছে, আর সবিতা যেন অরুণালোকের লম্বা লম্বা দড়ির ফাঁস লাগিয়ে তাদের খাড়া রাখবার চেষ্টা করছেন। তাই দেখে ওমর খৈয়াম বললেন,

And lo ! the Hunter of the East has caught
The Sultan's turret in a noose of light.

(Fitzgerald)

কান্তি ঘোষের ইংরিজী অনুবাদ সচরাচর উত্তম কিন্তু এস্থলে আমি একটু আপত্তি জানাই। তাঁর অনুবাদে আছে,—

পূব-গগনের দেব শিকারীর স্বর্ণ-উজল কিরণ তীর
পড়ল এসে রাজপ্রাসাদের মিনার যেথা উচ্চ শির ! (কান্তি ঘোষ)।

আসলে কিন্তু সূর্যালোক তীরের মতো মিনারের উপর আঘাত দিতে পারে আবার 'নুস্'—ফাঁসের মতোও তাকে জড়িয়ে ধরতে পারে। তফাত বিশেষ কিছু নেই আর 'পাগলা' কবিরা কত যে উদ্ভট উপমা দেয় তার কি ইয়ত্তা আছে? তবে কি না অনুবাদের বেলা মূলের যত কাছে থাকা যায় ততই মঙ্গল।[১]

প্রকৃতির গড়া নীল, আর মানুষের গড়া পিরামিডের পরেই মিশরের মসজিদ ভুবন-বিখ্যাত এবং সৌন্দর্যে অতুলনীয়। পৃথিবীর বহু সমঝদার শুদ্ধমাত্র এই মসজিদগুলোকেই প্রাণভরে দেখবার জন্য সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে কাইরোতে আসেন। পিরামিড যারা বানিয়েছিল তাদের বংশধররাই এ-সব মসজিদ তৈরী করেছে কিন্তু এদের গায়ে ইতিমধ্যে কিঞ্চিৎ ইরানী, গ্রীক, রোমান এবং পরবর্তী যুগে বিস্তর আরব-রক্ত ঢুকে পড়েছিল বলে এরা মসজিদগুলো বানিয়েছে ভিন্ন শৈলীতে। বিশেষত—পূর্বেই বলেছি—পিরামিড তার লক্ষ লক্ষ মণ ওজন নিয়ে মাটির উপর ভারিক্কি চালে বসে আছে, তার রাজা যে ভাবে প্রজাদের বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মতো বসতেন তারই অনুকরণ করে। পরবর্তী যুগের

১ স্বর্গীয় কান্তি ঘোষ আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। আর বহু গুণীজনের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে এ-অধমও তাঁর অনুবাদে উচ্ছ্বসিত।

মসজিদ যারা বানিয়েছিল তারা মুসলমান। তারা রাজার রাজা সৃষ্টিকর্তাকে দেয় সর্বোচ্চ স্থান। তাই তাদের মসজিদের মিনারগুলো উপরের দিকে ধেয়ে চলেছে দ্যুলোকেশ্বরের সন্ধানে। কিংবা বলতে পারো তারা দাঁড়িয়ে আছে, মুসলমান নমাজ পড়ার সময় যে রকম প্রতিদিন পাঁচ বার সোজা হয়ে আল্লার সামনে দাঁড়ায়। তাই পিরামিডে ভীতিরস, মসজিদে গীতিরস।

পল পার্সি দেখলুম এ রসে ঈষৎ বঞ্চিত। আমরা পুরনো কাইরোর মাঝখানে পৌঁছতেই ট্রাম ছেড়ে একটা মসজিদের অদৃষ্টপূর্ব সৌন্দর্য দেখতে আরম্ভ করেছি; ওরা দেখি, মা-মাসীর তম্বিতে গিয়ে শীতের গঙ্গাস্নানের সময় আমরা যা করি তাই করছে। গঙ্গা যে সুন্দর সেটা স্বীকার করছে কিন্তু তাতে নিমজ্জিত হওয়ার আনন্দ সম্বন্ধে সন্দিহান।

পার্সি একটু ঠোঁটকাটা। হক কথা—অর্থাৎ যেটাকে সে হক ভাবে, সেটা টক হলেও ক্যাট ক্যাট করে বলতে পারে। পলের ভাবটা একটু আলাদা। অশ্বত্থামা যদি পিটুলি-গোলা খেয়ে সানন্দে তাণ্ডব নৃত্য জোড়ে তবে পার্সি তাকে তন্মুহূর্তে বলে দেবে যে দুধের বদলে তাকে ঘোল দিয়ে ফাঁকি দেওয়া হয়েছে, আর পল ভাববে, কি হবে ওর ভুল ভাঙিয়ে তার আনন্দটি নষ্ট করতে, ও যে আনন্দ পাচ্ছে তাতে তো কারো কোনো লোকসান হচ্ছে না।

পার্সি বললে, 'হুঃ! যত সব! পিরামিড? হ্যাঁ বুঝি। মোক্ষম ব্যাপার। চারটিখানি কথা নয়। পারি ও রকম একটা বানাতে? মানলুম, এ মসজিদটা সুন্দর কিন্তু এটা বানানো আর তেমন কি?'

পার্সিও মসজিদ দেখে বে-এক্তেয়ার হয় নি। সে কথা পূর্বেই বলেছি। কিন্তু এ যুক্তিটা তারও মনঃপূত হল না। শুধালে, 'পারো তুমি বানাতে?'

'আলবত।'

আমি বললুম, 'সন্দেহের কিঞ্চিৎ অবকাশ আছে। আজকের দিনে যে সব কল-কব্জা দিয়ে নানা রকম অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস তৈরী করা যায় তাই দিয়ে পিরামিড তৈরী করা অসম্ভব নয়। কিন্তু এ মসজিদে যে নিপুণ মোলায়েম কারুকার্য আছে সে রকম করবার মতো হাত আজকের দিনে আর কারো নাই। আর থাকলেই বা কি? সেটা তো হবে নকল। তুমি যদি একটা বিরাট দীঘি খোঁড়ো তবে এ কথা কেউ বলবে না, এটা অমুক দীঘির নকল। তুমি যদি একটা পিরামিড বানাও তবে কেউ বলবে না এটা পিরামিডের নকল, কারণ সব পিরামিডই হুবহু একই প্রকারের, কোনোটা বেশী বড় কোনোটা কম বড়। কিন্তু তুমি যদি 'হ্যামলেট'-খানা নকল করে মাসিক পত্রিকায় পাঠাও তবে তারা ছাপবে না, বলবে নকল। তুলনাটা মনঃপূত হল না? তবে বলি, তুমি যদি মোনালিজার ছবি পর্যন্ত হুবহু এঁকে ফেলো তবে সবাই বলবে, নকল, তবে ওস্তাদের হাত বটে, 'বাঃ।' কেউ বলবে না, 'আঃ'।'

পল শুধালে, 'বাঃ' আর 'আঃ'-এর তফাতটা কি?'

আমি বললুম, 'যেখানে শুদ্ধমাত্র হাতের ওস্তাদী কিংবা ঐ জাতীয় কিছু একটা, যেমন মনে করো মাটির থেকে একশ হাত উপরে একটা দড়ির উপর হেঁটে

চলে যাওয়া, কিংবা মনে করো সিঙ্গিটার মুখের ভিতর আপন মুণ্ডুটা ঢুকিয়ে দেওয়া, এক কথায় সার্কাসের তাবৎ কসরত দেখে আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বলি, 'বাঃ!' পিরামিডের বেলাও তাই, বলি 'বাঃ।' কিন্তু অমিতাভের উত্তম প্রতিকৃতিতে তাঁর শান্ত প্রশান্ত মুখচ্ছবি কিংবা মাদন্নার মুখে বিগলিত মাতৃরস দেখে আমরা রসের সায়রে ডুবতে ডুবতে বলি, 'আঃ! কি আরাম! কি সৌন্দর্য!' 'বাঃ'-এর কেরদানি যতই কঠিন, যতই রোমাঞ্চকর হক না কেন তার শেষ মূল্য 'আঃ-এর জিনিসের চেয়ে কম। এভারেস্টের চুড়োয় ওঠা যত কঠিনই হোক না, তার মূল্য তিয়াসী পথিককে এক পাত্র জল দেওয়ার চেয়ে অনেক কম। এই যে পার্সি বললে, সে পিরামিড বানানোর মতো কঠিন কর্ম করতে পারে না, সেইটেই সব কিছু যাচাই করার শেষ কষ্টিপাথর নয়। শেক্সপীয়র খুব সম্ভব দড়ির উপরে ধেই ধেই করে নৃত্য করতে পারতেন না। তাই বলে ঐ কর্ম তার 'হ্যামলেটের' চেয়ে মূল্যবান এ রায় কে দেবে? আসলে দুটো আলাদা জিনিস। তুলনা করাই ভুল। পিরামিডে আছে ইঞ্জিনিয়ারিং হুনোর-হেমকৎ (স্কিল) আর মসজিদে আছে রসসৃষ্টি (আর্টিস্টিক ক্রিয়েশন)।

ইতিমধ্যে দেখি একটি মিশরীয় জাব্বা-জোব্বা-পরা ছাত্র আজহর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মসজিদ থেকে বেরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে এগিয়ে আসছে। চেহারা দেখে ভারতীয় বলেই মনে হল।

॥ ২২ ॥

আজহর বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স পুরো-পাক্কা এক হাজার বৎসর। অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, প্যারিস, বার্লিন এর চেয়ে কয়েক'শ বছরের ছোট। তবু আজ যে সব গুণীজ্ঞানীর নাম পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে এঁরা ঐ-সব ইয়োরোপীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র। আজহর থেকে যাঁরা বেরোন তাঁদের নাম তো শুনতে পাই নে। হ্যাঁ, মনে পড়ল, মিশরের গাঁধী বলতে যাঁকে বোঝায় সেই সা'দ জগলুল পাশা ছিলেন আজহরের ছাত্র। কিন্তু আর কারো নাম শুনতে পাই নে কেন?

আশ্চর্য! মুসলমানরা যখন স্পেন দখল করল তখন তারা সেখানে আজহরের অনুকরণে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ল। প্যারিস য়ুনিভার্সিটির গোড়াপত্তন যাঁরা করেন, তাঁদের অনেকেই লেখা-পড়া শিখেছিলেন স্পেনের মুসলমান বিশ্ব-বিদ্যালয়ে। এবং প্রথম দিককার পাঠ্যপুস্তকগুলো পর্যন্ত আরবী বই থেকে লাতিনে অনুবাদ করা। আজ আর আজহরের নাম কেউ করে না, করে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের।

কিন্তু আশ্চর্য হই কেন? একদা এই ভারতবর্ষের জ্ঞান-বিজ্ঞান ভারতবর্ষের বাইরে ছড়িয়ে পড়েছিল। গ্রীকরা আমাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছিল। পরবর্তী যুগে ইয়োরোপীয়েরা আমাদের কাছ থেকে শূন্যের ব্যবহার শিখল (লক্ষ্য করেছ বোধ হয় রোমান হরফে যখন I, II, X, XII, C M, লেখ তখন শূন্যের

ব্যবহার আদপেই হয় না) এবং তারই ফলে তাদের গণিত-শাস্ত্র কী অসাধারণ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলল। আরবরা চরক সুশ্রুতের অনুবাদ করলে, আরো কত কী। একাদশ শতকে ভারত আক্রমণকারী সুলতান মাহমুদের সভাপণ্ডিত অল-বীরুনী সংস্কৃত শিখে ভারতবর্ষের জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে বই লেখেন তা পড়ে সে যুগের মুসলিম জগৎ অবাক হয়ে ভারতবর্ষের গুণগান করেছিল। তারও পরবর্তী যুগে সম্রাট আওরঙ্গজেবের বড় ভাই দারা শীকুর উপনিষদ সম্বন্ধে ফার্সী বই লাতিনে তর্জমা হয়ে যখন ইয়োরোপে বেরলো তখন সে-বই নিয়ে ইয়োরোপে কী তোলপাড়ই না হয়েছিল। সে যুগের সেরা দার্শনিক শোপেন-হাওয়ার তখন বলেছিলেন, 'এ-বই আমার জীবনের শেষ কটা দিন শান্তিতে ভরে দেবে।' ঐ সময়েই বিশ্বকবি গ্যোটে শকুন্তলার অনুবাদ পড়ে ঘন ঘন 'সাধু, সাধু' বলেছিলেন।

এখনো ভারতবর্ষের, আজহরের পুরনো সম্পদের সম্মান ইয়োরোপীয়রা করে কিন্তু আজকের দিনে যাঁরা শুধু সংস্কৃত কিংবা মিশরে আরবীর চর্চা নিয়ে পড়ে থাকেন তাঁদের নাম কেউ করে না। তাঁরা এমন কিছু সৃষ্টি করতে পারেন না কেন যা পড়ে বিশ্বজন বিমোহিত হয়ে পুনরায় 'সাধু, সাধু' রবে হুংকার তোলে ?

হায় এঁদের সৃজনী শক্তি ফুরিয়ে গিয়েছে। কেন ফুরলো ? তার একমাত্র কারণ, এক বিশেষ যুগে এসে এরা ভাবলেন এঁদের সব কিছু করা হয়ে গিয়েছে, নূতন আর কিছু করবার নেই, পুরনো পুঁজি ভাঙিয়ে খেলেই চলবে।

এবং তার চেয়েও মারাত্মক কথা, এরা অন্যের কাছ থেকে আর কিছু শিখতে চান না। এঁদের দম্ভ দেখে তাই স্তম্ভিত হতে হয়।

আজহরের ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলুম, 'তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিজিক্স্ কেমিস্ট্রি বটানি পড়ানো হয় ?'

সে শুধালে, 'এ-সব কি ?'

অনেক কষ্টে বোঝালুম।

সে বললে, 'ধর্মশাস্ত্রে যা নেই, তা জেনে আমার কি হবে ?'

আমি বললুম, 'অতিশয় হক্ কথা। ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো গতি নেই, কিন্তু ভ্রাতঃ, তোমার পা যদি আজ আছাড় খেয়ে ভেঙে যায় আর ডাক্তার বলে, এক্সরে করে দেখতে হবে কোন্ জায়গায় ভেঙেছে, তখন কি ধর্মশাস্ত্রে এক্সরে-র কল বানাবার সন্ধান পাবে ?'

উত্তরে কি বলেছিল মনে নেই। 'ধর্ম রক্ষা করবেন' এই জাতীয় কিছু একটা। কিন্তু ইতিমধ্যে দেখি, পল পার্সি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তত্ত্বালোচনা পার্সিকে বিকল করে সে-কথা পূর্বেই বলেছি, কিন্তু এস্থলে পল পর্যন্ত বিচল হয়ে পড়লো। আমি যখন একটু থেমেছি তখন দেখি তারা এক দোকানীর সঙ্গে দরদস্তুর করছে।

কি ব্যাপার ? মিশরের পিরামিডের ভিতর যে সব টুকি-টাকি জিনিস পাওয়া গিয়েছে তারই কিছু কিছু এখানে বিক্রি হচ্ছে। আমি বললুম, 'এ-সব

তো মহামূল্যবান জিনিস, ওগুলো কেনার কড়ি আমাদের কাছে আসবে কোত্থেকে, আর মিশরী সরকার সেগুলো যাদুঘরে সাজিয়ে না রেখে বাজারে বিক্রি করবার জন্য ছাড়বেই বা কেন ?'

দোকানী বললে, 'একই জিনিস এত অসংখ্য পিরামিডে এত বেশী পাওয়া গিয়েছে যে সেগুলো সরকার বাজারে ছেড়েছে—ভালোগুলো অবশ্য যাদুঘরে সাজানো আছে—এবং দামও তাই বেশী নয়।'

আমি কিনি কিনছি, কিনি কিনছি করছি, এমন সময় সেই আজহরের ছেলেটি আমার কানে কানে বললে, 'তাই যদি হবে, তবে ওর দোকানের পিছনের কারখানাতে কি সব তৈরী হচ্ছে ? চলুন না, কারখানাটা দেখে আসবেন।'

আমি বললুম, 'কি আর হবে দেখে ? জর্মনিতে তৈরী কাশ্মীরী শাল, জাপানে তৈরী 'খাঁটি' 'অতিশয় খাঁটি' ভারতীয় খদ্দর, কলকাতায় তৈরী জর্মন ওষুধ এসব তো বহু বার দেখা হয়ে গিয়েছে। ওর থেকে নূতন আর কি তত্ত্বলাভ হবে ?'

পল পার্সিকে বললুম, 'পাশের ছেলের খাতা থেকে টুকলি করা আর এই জাল মাল তৈরী করাতে কোনো তফাত নেই।'

পল বললে, 'মাস্টার ধরতে পারলে কান মলে দেন।'

আমি বললুম, 'সরকারও মাঝে মাঝে এদের কান মলে দেয়।'

তখন হঠাৎ খেয়াল হল, আজহরী ছেলেটি যে ফিস-ফিস করে কানে কানে কথা বলেছিল, সেটা বাঙলায়। তৎক্ষণাৎ তাঁকে শুধালুম, 'আপনি কি বাঙালী ?'

সে বললে, 'হাঁ।'

তার পর শুনলুম, বর্ধমানে বাড়ি, দশ বছর বয়সে এখানে সে এসেছে। বাঙলা প্রায় ভুলে গিয়েছে। আরো চার বছর অর্থাৎ সবসুদ্ধ বারো বছর এদেশে কাটিয়ে ফের বর্ধমানে ফিরে যাবে।

সেখানে ফিরে গিয়ে কি করবে ? এই আরবী বিদ্যের কদর তো ভারতবর্ষে নেই ? তাতে আশ্চর্য হবারই বা কি ? কাশী থেকে বারো বছর সংস্কৃত শিখে বর্ধমানে ফিরলে তার পাণ্ডিত্যেরই বা মূল্য দেয় কে ? তাকেও তো সেখানে উপোস করতে হয়। একেও তাই করতে হবে। আজ আর প্রাচীন শাস্ত্রের পাণ্ডিত্যকে কেউ সম্মান করে না।

কিন্তু ছেলেটির দেখলুম তাই নিয়ে কোনো দুর্ভাবনা নেই। বাপ ধার্মিক লোক ছেলেকে ধর্মশিক্ষা করতে পাঠিয়েছেন, তাই শিখে সে দেশে ফিরে যাবে, তার পর যা হবার তাই হবে।

দলের কেউ এ-দোকানের সামনে দাঁড়াচ্ছে, কেউ ও-দোকানের সামনে দাঁড়াচ্ছে। কেনাকাটা হচ্ছে অতি সামান্য। টুকি-টাকি নাড়াচাড়াতে আনন্দ অনেক বেশী—খরচাও তাতে নেই। এই করে করে আমরা সমস্ত দিন কাটিয়ে দিতে পারতুম, কিন্তু হঠাৎ দলের একজন স্মরণ করিয়ে দিলেন, আমাদের

পোর্ট-সঈদের ট্রেন ধরতে হবে আটটায়। আবুল আসফিয়াকে স্মরণ করিয়ে দিতে তিনি বললেন, 'চলুন।' কিন্তু তাঁর হাবভাবে কোনো তাড়া নেই।

অতি অনিচ্ছায় ট্রামে উঠতে হল। আজহরের ছেলেটি আমার সঙ্গে বাঙলা কথা কইতে পেয়ে আমার সঙ্গ ছাড়াতে চায় না। সেও চললো আমাদের সঙ্গে। আরবী ভাষা এখন তার জীবনের মূলমন্ত্র, কিন্তু তাই বলে কি মাতৃভাষা বাঙলার মায়া এত সহজে কাটানো যায়?

ঘ্যাচাঙ করে ট্রাম দাঁড়াল। কি ব্যাপার? আগের একটা ট্রাম মোড় নিতে গিয়ে লাইন থেকে ছিটকে পড়েছে। বাদবাকি সব ট্রাম তার পিছনে গড্ডালিকায় দাঁড়িয়ে। লোহার ডাণ্ডা দিয়ে জনকয়েক লোক ছিটকে-পড়া ট্রামটাকে লাইনে ফেরত নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। চেষ্টার চেয়ে চিৎকার চেঁচামেচি হচ্ছে বেশী। লম্বা লম্বা আলখাল্লা উড়িয়ে রাস্তার ছেলে বুড়ো ট্রামটার চতুর্দিকে ছুটোছুটি লাগিয়েছে। আর কত প্রকারেরই না উপদেশ, আদেশ অনবরত ট্রামের ভিতর বাহির দুদিক থেকেই উপছে পড়ছে! দেশের হরির লুঠ এর কাছে লাগে কোথায়?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজাটা রসিয়ে রসিয়ে দেখছি, এমন সময় দলের একজনের হুঁশ হল, আটটায় যে আমাদের ট্রেন ধরতে হবে। আমার দেহ-মন কিন্তু ঐ রণাঙ্গন থেকে তখন কিছুতেই সরছিল না। কারণ ইতিমধ্যে দেখি, ট্রামটা কি পদ্ধতিতে ফের লাইনে তোলা যায় তাই নিয়ে দুইটি দলের সৃষ্টি হয়েছে। যারা ডিপো থেকে এতক্ষণে এসে পৌঁছেচে তারা বাতলাচ্ছে এক প্রকারের রণকৌশল, আর সব কটা ট্রামের ড্রাইভার, কণ্ডাকটরের দল সে রণকৌশলের বিরুদ্ধে ঘোষণা করেছে অন্য জিহাদ। ব্যাপারটা তখন এমনি চরমে পৌঁছেচে যে উভয় পক্ষ তখন লোহার ডাণ্ডা হাতে করে মুখোমুখি হয়ে সদম্ভে সগর্বে সর্বপ্রকারের আস্ফালন কর্ম সুষ্ঠু পদ্ধতিতে শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে নিয়ে চলেছে। দুই দলের পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন ট্রামের যাত্রী এবং রাস্তার লোক। আর রাস্তার ছোঁড়ারা আলখাল্লা উড়িয়ে তাদের চতুর্দিকে পাঁই-পাঁই করে ঘুরছে, বোঁ করে মধ্যিখান দিয়ে ইস্পার-উস্পার হয়ে যাচ্ছে, ধরা পড়ে কখনো বা দু-একটা চড়-চাপড়ও খাচ্ছে।

একটা 'ফাস্টো কেলাস' লড়াইয়ের পূর্বরাগ কিংবা পূর্বাভাস!

কিন্তু হায় পৃথিবীর কত সৎকর্মই না অসম্পূর্ণ রেখে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হয়। এই যে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, নিধিরামকে একদিন মোকা-মাফিক আচ্ছাসে উত্তম-মধ্যম দেব, তার পূর্বেই তো ম্যাট্রিক পাস করে ইস্কুল ছাড়তে হল! আর নিধে রাস্কেলটা ফেল মেরে পড়ে রইল ইস্কুলে। কী অন্যায় অবিচার! নিধেটা লেখাপড়ায় একটা আস্ত বিদ্যেসাগর, সে কথা জানি, কিন্তু আরো কত খাটাশও তো ম্যাট্রিক পাশ করে। ও করলেই বা কোন্ মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত? আমিও তো দুটো কিল মারার সুযোগ পেতুম। এই সব অবিচার দেখে সংসারের প্রতি আমার তখন ঘেন্না ধরে গিয়েছিল।

আজও তাই হল। দলের লোকের তাড়ায়। তখন আর বেশী সময় হাতে

নেই। ট্যাক্সি নিতে হল।

বুকিং আপিসের সামনে যাত্রার দলের হনুমানের ন্যাজের মতো প্যাঁচ পাকানো কিউ Q। কেউ কেউ ওটাকে U বলে বলে W-ও বলে থাকেন, কারণ জায়গার অভাব থাকলে কিউ সচরাচর এই রকম শেপ-ই নিয়ে থাকে। অথচ গাড়ি ধরার সময় তখন মাত্র পাঁচ মিনিট। আবুল আসফিয়া কিউ-এতে দাঁড়ালেন। আমি তাঁকে বললুম, 'ট্রেন মিস্ নির্ঘাত।' তিনি বললেন, 'আপনারা স্টেশনে যান।'

স্টেশনে কখন কোন্ প্লাটফর্ম থেকে গাড়ি ছাড়বে তার খবর নিয়ে যখন সেই প্ল্যাটফর্মের মুখে দাঁড়ালুম, তখন গেট-চেকার ভাঙা-ভাঙা ইংরাজিতে শোধালে,—

'আপনারা যাবেন কোথায় ?'

'পোর্টসঈদ।' (সমবেত সঙ্গীতে)

'তবে ট্রেনে গিয়ে আসন নিচ্ছেন না কেন ?'

তাই শুনে পড়ি-মরি হয়ে এক দল দিল ছুট ট্রেনের দিকে, আরেক দল যাবে কি যাবে না এই ভাবে ন যযৌ ন তস্থৌ হয়ে রইল দাঁড়িয়ে, নড়লুম না আমরা তিন জন, পল, পার্সি আর আমি।

পল বললে, 'আমাদের টিকিট এখনো কাটা হয় নি।'

চেকার ছোঁকরা বললে, 'আপনারা যান।'

মনে হল ছোকরাটি বুদ্ধিমান। আমাদের চেহারা-ছবি দেখে এঁচেছে, আমরা ফাঁকি দিয়ে গাড়ি চড়ার তালে নই। আমরা যখন পয়সা দেবার জন্য তৈরী তখন আমাদের ঠেকিয়ে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই।

আমার মন তখন যাব-যাব করছে। তখন পলের কথাতে বুঝলুম, সে কতখানি ভদ্র ছেলে। আমাকে বললে, 'আবুল আসফিয়াকে ছেড়ে আমরা যাব না।'

সেই উৎকট সংকটের সময়ও আমার মনে পড়ল, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরও বিশেষ অবস্থায় স্বর্গে যেতে রাজী হন নি।

আমাদের চোখের সামনে স্টেশনের বিরাট ঘড়ি। সেটা তখন দেখাচ্ছে, ৭, ৫৯।

কলাপ্সিবল্ গেটের ভিতর দিয়ে দেখছি, আমাদের ট্রেনের গার্ড বীরোচিত ধীরপদে টহল দিচ্ছে, আর মাঝে মাঝে ট্যাঁকঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে।

মিশর তো প্রাচ্য দেশ, আরামের দেশ, অনপনকচুয়ালিটির দেশ। ওরা আবার সময়মতো গাড়ি ছাড়ার যবনিকা পদ্ধতি শিখল কোথা থেকে ? সংসারের অবিচারের প্রতি আবার আমার ঘেন্না ধরল। ট্রেন তো বাবা, সর্বত্রই নিত্যি নিত্যি লেট যায়। এই যে সোনার মুল্লুক ইংলণ্ড, যার প্রশংসায় এ পোড়ার দেশের সবাই পঞ্চমুখ দশানন, সেই দেশ সম্বন্ধেই শুনেছি, এক ডেলি প্যাসেঞ্জারের ট্রেন রোজ লেট যেত এবং বেচারী তাই নিয়ে অনেক আবেদন-ক্রন্দন করার পর একদিন সত্যি সত্যি কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময়ে ট্রেন স্টেশনে

এল। লোকটি উল্লাসভরে স্টেশন-মাস্টারকে কনগ্রাচুলেট করাতে মাস্টার বিমর্ষ বদনে বললে, 'এটা গতকালের ট্রেন ; ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা লেট।'

সেই পরানের দ্যাশ বিলেতেই যদি এই ব্যবস্থা তবে এই খানদানী গেরেম-ভারী মিশরে মানুষ কি শুধুমাত্র আমাদের দলকে ভ্যাংচাবার জন্যই কণ্টকে কণ্টকে ট্রেন ছাড়তে চায় ?

দেখি, গার্ড সাহেব দোদুল্যমান গতিতে আমাদের দিকে আসছে। চেকারকে কি যেন শুধালে তার পর উত্তর শুনে আমাকে বললে, 'আর তো সময় নেই, গাড়িতে উঠুন।'

লোকটির সৌজন্যে আমি সম্মোহিত হয়ে গেলুম। কে আমরা, আমাদের জন্য ওর অত দরদ কিসের ? স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, আমরা মার্কিন টুরিস্ট নই যে তাকে কাঁড়া-কাঁড়া সোনার মোহর টিপস দেব। মিশরের ট্রেন লোহা-লক্কড়ের বটে, কিন্তু মিশরীয় গার্ডের দিল মহব্বতের খুনে তৈরী।

আমি পাগল-পারা খুঁজছি সৌজন্য ভদ্রতার আরবী, তুর্কী, ফার্সী বাক্য, যা দিয়ে আমি তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি। ইংরিজীতে তো আছে শুধু ছাই, 'থ্যাঙ্কু' ফরাসীতে 'মের্সি' 'মের্সি', জর্মনেও নাকি 'ডাঙ্ক' না 'ডাঙ্কে' কি যেন একটা আছে কিন্তু ঐ সামান্য একটা দুটো শব্দ দিয়ে গার্ড-সায়েবের সৌজন্য-সমুদ্রে আমার হাল পানি পাবে কেন ?

তবুও তোরিয়া হয়ে বলে গেলুম, 'আনা উশকুরুকুম' 'চোক তশক্কুর এদ্‌রং এফেন্দং', খৈলি তশকুর মিদমহাতানু, কুরবানু' আরো কত কী, উল্টা-সুল্টা। তার মোদ্দা অর্থ, 'মহাশয় যে সৌজন্য দেখাইলেন, তাহা ভারতবর্ষের ইতিহাসে যুগ-যুগান্তব্যাপি অবিস্মরণীয় হইয়া থাকিবে কিন্তু হালফিল আমরা লৌহবর্ত্ম-শকটে আরোহণ করিতে অক্ষম যেহেতুক আমাদের পরমমিত্র চরমসখা শ্রীশ্রীমান আবুল আসফিয়া নূরউদ্দিন মুহম্মদ আব্দুল করীম সিদ্দীকীকে পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তর গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।'

সঙ্গে সঙ্গে আরবী, তুর্কী, ফার্সী তিন ভাষাতেই বিস্তর ক্ষমা ভিক্ষা করলুম।

আর মনে মনে মোক্ষম চটছি আবুল আসফিয়ার উপর। লোকটার কি কণামাত্র কাণ্ডজ্ঞান নেই ? দলের নেতা হয়ে কোনো রকম দায়িত্ব বোধ নেই ? সাধে কি ভারতবর্ষ স্বরাজ্য থেকে বঞ্চিত !

হঠাৎ পল-পার্সি দিল ছুট। তারা আবুল আসফিয়াকে দেখতে পেয়েছে। এবং আশ্চর্য, লোকটা তখনো নিশ্চিন্ত মনে রেলের এক কর্মচারীকে স্টেশনের বড় ঘড়িটা দেখিয়ে দেখিয়ে কি যেন বোঝাচ্ছে। বোঝাচ্ছে কচু ! নিশ্চয়ই বোঝাচ্ছে, ওদের ঘড়ি ফাস্ট যাচ্ছে। তা যাচ্ছে তো যাচ্ছে, সে কথা বুঝিয়ে কি তোমার টাকেতে চুল গজাবে—ওদিকে ট্রেন মিস করে ?

কথার মাঝখানেই পল আর পার্সি পিছন থেকে তাঁকে দু হাতে ধরে দিলে হ্যাঁচকা টান। তার পর দিল ছুট গাড়ির দিকে। আমিও পড়ি-মরি হয়ে সেদিকে। দলের যারা ট্রেনের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল তারাও জয়োল্লাসে হুংকার দিয়ে উঠেছে। আবুল আসফিয়া হাত ছাড়াবার চেষ্টা করছেন। স্টেশনের

আন্তর্জাতিক জনতা যে যার পথ ভুলে তাকিয়ে রয়েছে আমাদের দিকে। পুলিস দিয়েছে হুইস্‌ল্‌। তবে কি দিনে দুপুরে কিডন্যাপিং! কিন্তু এ তো,

'উল্টো বুঝলি রাম, ওরে উল্টো বুঝলি রাম,
কারে করলি ঘোড়া, আর কার মুখে লাগাম?'

এখানে তো বুড়ো-ধাড়িকে পাকড়ে নিয়ে চলেছে দুটো চ্যাংড়া!

গাড়ি ঠিক সময়ে ছেড়েছিল না লেটে, আবুল আসফিয়ার ঘড়ি ঠিক না রেলের ঘড়ি ঠিক এ সব সূক্ষ্ম প্রশ্নের সমাধান হল না। গার্ড সায়েব যে ভাবে পিছন থেকে পাকা হাতে আমাদের ধাক্কা দিয়ে দিয়ে গাড়িতে ওঠালে তার থেকে অনুমান করলুম, এ প্রকারের কর্ম করে করে তার হাত ঝানু হয়ে গিয়েছে।

আবুল আসফিয়া তখনো পলকে বোঝাবার চেষ্টা করছেন, তাঁর ঐ ঘড়িটাই সুইজারল্যাণ্ডের ক্রনোমিটার পরীক্ষায় পয়লা প্রাইজ পেয়েছিল। মিশরীয়দের সময়-জ্ঞান নেই। আমরাও অতিশয় সরল। চিলে কান নিয়ে গেল শুনেই—

॥ ২৩ ॥

আহা! সুন্দর দেশ!

খালে-নালায় ভর্তি। গাড়ি মিনিটে মিনিটে গম্, গড়ম্, গড়ড়ম্ করে সে সব নালার উপর দিয়ে পেরুচ্ছে। তারপর গাড়ি বলে 'বড়্‌ঠাকুরপো-ছোট্‌ঠাকুরপো', 'বড়্‌ঠাকুরপো-ছোট্‌ঠাকুরপো', তারপর ফের নালার উপর 'গম', 'গড়ম্', 'গড়ড়ড়ম'। আর গাড়ির শব্দ যে এত মিষ্টি কে জানত? এ ট্রেন মিস করলে আর দেখতে হত না!

খাল-নালা তো বললুম, কিন্তু এক-একটি নদ-নদী এমনই চওড়া যে বোধ করি সেগুলো নীলেরই শাখা-প্রশাখা। আর সেগুলোতে জলে-ডাঙার মাঝখানে ফাঁক প্রায় নেই। নিতান্ত বর্ষাকাল ছাড়া আমাদের নদীর জল যান তলিয়ে, আর পাড়গুলো থাকেন খাড়া হয়ে। সে জল অত নিচু থেকে উপরে তোলা যায় না বলে সে জল থেকেও নেই। চাষী তাই দিয়ে শীতকালে আরেকটা ফসল তুলতে পারে না। এদেশের লোক সৃষ্টির সেই আদিম প্রভাতে চাষবাস শেখার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের একমাত্র নদী নীলের গা থেকে এত হাজার হাজার খাল নালা কেটে রেখেছিল যে সে নদী গভীর হবার সুযোগ পায় নি এবং ফলে নীলের জল দেশটাকে বারো মাস টৈটম্বুর করে রাখে।

খেতভরা ধান গম কার্পাস! সবুজে সবুজে ছয়লাপ। মাঝে মাঝে খেজুর-গাছের সারি, আর কখনো বা এখানে একটা সেখানে একটা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্ষেতের পাহারা দিচ্ছে।

আর নদীর উপর দিয়ে চলেছে উঁচু উঁচু তেকোণা পাল তুলে দিয়ে লম্বা লম্বা নৌকো। এ দেশে বৃষ্টি প্রায় হয় না বলে নৌকোতে ছইয়ের ব্যবস্থা প্রায় নেই। জোর হাওয়ায় নৌকাগুলো চলেছে দ্রুতগতিতে। পালের দড়ি ছিঁড়ে

গেলে নৌকো যে ডুবে যাবে সে ডরভয় এদের নেই। তবে বোধ করি এদেশে দমকা হাওয়া হঠাৎ এসে নৌকোকে এলোপাতাড়ি ধাক্কা লাগায় না।

সবুজ খেত, নানারঙের পাল, ঘোর ঘন নীল আকাশ, চল্ চল্ ছল্ ছল্ জল মনটাকে গভীর শান্তি আর পরিপূর্ণ আনন্দে ভরে দেয়। গাড়ির জানালার উপরে মুখ রেখে আধ-বোজা চোখে সে সৌন্দর্যরস পান করছি, আর ভাবছি, এই সৌন্দর্য দেখার জন্যেই তো বহুলোক রেলগাড়ি চড়বে, আমি যদি এদেশে থাকবার সুযোগ পেতুম তবে প্রতি শনিবারে রেলে চড়ে যে দিকে খুশি চলে যেতুম! কিছু না, শুধু নৌকো, জল, খেত আর আকাশ দেখে দেখে দিনরাত কাটিয়ে দিতুম।

রাতের কথায় মনে পড়ল, চাঁদের আলোতে এ সৌন্দর্য নেবে অন্য এক ভিন্ন রূপ। সেটা দেখবার সুযোগ হল না—এখানটায়, এবারে।

মাঝে মাঝে নদী, নৌকো, খেজুরগাছ সব-কিছু ছাড়িয়ে দেখতে পাই সেই তিনটে বিরাট পিরামিড। কত দূরে চলে এসেছি তবু তারা মাঝে মাঝে মুখ দেখিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলেছে, আবার কাছের গাছের পিছনে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে, আবার মুখ দেখাচ্ছে। তখনই বুঝতে পারলুম, পিরামিডগুলো কত উঁচু। কাছের থেকে যেটা স্পষ্ট বুঝতে পারি নি।

কম্পার্টমেন্টের মাঝখান দিয়ে চলাফেরার পথ—কলকাতার ট্রামগাড়িতে যে রকম। সেই পথ দিয়ে যে কত রকমের ফেরিওয়ালা এল গেল তার হিসেব রাখা ভার। কমলালেবু, কলা, রুটি থেকে আরম্ভ করে নোটবুক, চিরুনি, মোজা, ঘড়ি, লটারির টিকিট হেন বস্তু নেই যা ফেরিওলা দু চার বার না দেখালে—মনে হল লোহার সিন্দুক এবং আস্ত মোটর গাড়ি মাত্র এই দুই বস্তুই বোধ করি ফেরি করা হল না।

এক কোণে দেখি জাব্বা-জোব্বা-পরা এক মৌলানা সায়েব হাত-পা নেড়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন আর তাঁকে ঘিরে বসেছে এক পাল ছোকরা—তারাও পরেছে জাব্বা-জোব্বা, তাদের মাথায় ও লাল ফেজ টুপিতে প্যাঁচানো পাগড়ি। দু-চার জন সাধারণ যাত্রীও দলে ভিড়ে বক্তৃতা শুনছে। পাশের এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলুম, ইনি আজহর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ছুটি-ছাটায় যখন গ্রামের বাড়ি যান তখন তাঁর প্রিয় শিষ্যেরা তাঁর সঙ্গে তাঁরই বাড়ি যায়। সমস্তক্ষণ চলে জ্ঞানচর্চা। ট্রেনের অন্য লোকও সে শাস্ত্রচর্চা কান পেতে শোনে।

উত্তম ব্যবস্থা! প্রাচীন যুগে গুরুগৃহে বাস এবং বর্তমান যুগের কলেজে গিয়ে পড়াশুনো করা দুটোর উত্তম সমন্বয়। মাঝখানে থার্ড ক্লাস গাড়ির প্যাসেঞ্জার, চাষাভুষোরাও এদের জ্ঞানের কিছুটা পেয়ে গেল। আমাদের দেশের চাষারা তো প্রফেসরদের জ্ঞানের একরত্তিও পায় না।

সঙ্গে সঙ্গে ফেরিওলার কাছ থেকে কলামুলো কিনে নিয়ে মৌলানা সায়েব খাচ্ছেন, ছেলেদেরও খাওয়াচ্ছেন। সেও পরিপাটি ব্যবস্থা।

হরেকরকম ফেরিওলাই তো গেল। এখন এলেন আরেক মূর্তি। মুখে এক গাল হাসি—আপন মনেই হাসছে—পরনে লজঝড় কোট-পাতলুন, নোংরা

শার্ট, টাইয়ের 'নট্'টা ট্যারচা হয়ে কলারের ভিতর ঢুকে গিয়েছে, আর হাতে এক তাড়া রঙিন ছবিতে ভর্তি, হ্যান্ডবিল-প্যামফ্লিট্।

কেন যে আমাকেই বেছে নিলে বলতে পারব না। বোধ হয় আমাকেই সব চেয়ে বেশী বোকা-বোকা দেখাচ্ছিল। ফেরিওলারা বোকাকেই সক্কলের পয়লা পাকড়াও করে এ তো জানা কথা।

এক গাল হাসির উপর আরেক পোঁচ মুচকি হাসি লেপটে দিয়ে শুধালে, 'কোথায় যাওয়া হচ্ছে, স্যর?'

ইয়োরোপীয় জাহাজ চড়ে মেজাজ খানিকটে বিলিতি রঙ ধরে ফেলেছে। বলতে যাচ্ছিলুম, তোমার তাতে কি? কিন্তু মনে পড়ল, মিশর প্রাচ্য দেশ, এ প্রশ্ন শুধনো অভদ্রতা কিংবা অনধিকার প্রবেশ নয়। বললুম, 'পোর্ট সঈদ।'

'তার পর?'

মোগলাই মেজাজ চেপে নিয়ে বাঙালী কণ্ঠে বললুম, 'ইয়োরোপ।'

'ওঃ, তাই বলুন। কিন্তু ইয়োরোপ তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না, তার আগে এই মিশরের পাশের দেশ প্যালেস্টাইনটা ঘুরে আসুন না।' আমি তো একেবারে থ। হরেকরকমের ফেরিওলা তো দেখলুম। কেউ বিক্রি করে ছ পয়সার জুতোর ফিতে, কেউ বিক্রি করে পাঁচশ টাকার সোনার ঘড়ি, কিন্তু একটা আস্ত দেশ বিক্রির জন্য তার আড়কাটি ট্রেনের ভিতর ঘোরাঘুরি করবে, এ-ও কি কখনো বিশ্বাস করা যায়? তবু ব্যাপারটা ভালো করে জেনে নেবার জন্য শুধালুম, 'আপনি বুঝি দেশ বিক্রি করেন?'

সে আমার কোনো কথার উত্তর না দিয়ে আরেক গাল হেসে তার হাতের তাড়ার ভিতর থেকে কি একটা খুঁজতে আরম্ভ করলে। ইতিমধ্যে আমার পাশের ভদ্রলোক তাকে জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন। সে ঝুপ করে বসে পড়ে তার হাতের ডাঁই থেকে বের করলে প্যালেস্টাইনের হরেকরকম ছবিওলা একখানা রঙচঙা প্যাম্‌ফ্লিট। তার উপর দেখি মোটা-মোটা অক্ষরে লেখা প্যালেস্টাইন 'Palestine, The Land of the Lord', 'প্রভুর জন্মভূমি' ইত্যাদি আরো কত কী! তারপর বললে, 'দেশ বিক্রি করি? হ্যাঁ, তাই বটে, তবে কি না আপনি যে ভাবে ধরেছেন, ঠিক সে ভাবে নয়। কিন্তু সে-কথা পরে হবে। উপস্থিত দেখুন তো, কী চমৎকার দেশে আপনাকে যেতে বলছি। যে-দেশে প্রভু জীজাস্ ক্রাইস্ট জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আপনি নিশ্চয় প্রভুর—'

আমার ভারি বিরক্তি বোধ হল। এসব লোক কি ভাবে? ভারতবর্ষের লোক যীশুর নাম শোনে নি? তেড়ে বললুম, 'The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Abraham begat'—ইত্যাদি ইত্যাদি,—চড়চড় করে মথি-লিখিত সুসমাচার থেকে মুখস্থ বলে যেতে লাগলুম, প্রভু যীশুর ঠিকুজি কুলজি। লোকটা কিন্তু একদম না দমে গিয়ে বললে, 'ঠিক, ঠিক। এই দেখুন, সেই জায়গা যেখানে প্রভু জন্ম নিলেন। একটা সরাইয়ের আস্তাবলে। মা মেরি আর তাঁর বর যোসেফ তখন প্যালেস্টাইন থেকে এই মিশরের দিকে আসছিলেন। বেৎলেহেম

গ্রামে সন্ধ্যা হল। সরাইয়ে জায়গা না পেয়ে মা-মেরি আশ্রয় নিলেন আস্তাবলে। এই দেখুন সেই আস্তাবলের ছবি। কত চিত্রকরই না এ ছবি এঁকেছেন। কত যুগ ধরে। তার পর দেখুন, নাজারেৎ গ্রামের ছবি। যোসেফ সেখানে ছুতোরের কাজ করতেন, আর মা-মেরি যেতেন জল আনতে। এই দেখুন—'

আমি বললুম, 'ব্যস, ব্যস, হয়েছে। কিন্তু আপনি আমার মুশকিলটা আদপেই বুঝতে পারেন নি। আমি যদি পোর্টসঈদ থেকে 'প্রভুর জন্মভূমি প্যালেস্টাইনে' চলে যাই তবে সেখানে ফিরে এসে ইয়োরোপে যাবার জন্য আমাকে নতুন করে জাহাজের টিকিট কাটতে হবে। তার পয়সা দেবে কে?—না হয় প্যালেস্টাইন তীর্থ-দর্শন-খর্চা আমি কোনো গতিকে, কেঁদে-কোকিয়ে সামলে নিলুম। এক জাহাজের টিকিট একই জায়গা যাবার জন্য দু-দুবার কাটবার মতো পয়সা কিন্তু আমার নেই।'

আড়কাঠি তো হেসেই কুটিকুটি। আমি বিরক্ত। নিজেকে সামলে নিয়ে সে বললে, 'জাহাজের ডবল ভাড়া লাগবে কেন? আপনি যে জাহাজে করে পোর্টসঈদে এসেছেন সেই কোম্পানিরই আরেকখানা জাহাজ পনেরো দিন পর সেখানে এসে ইয়োরোপ যাবে। আপনি সে জাহাজে গেলেন কিংবা এ জাহাজে গেলেন তাতে কোম্পানির কি ক্ষতিবৃদ্ধি? ডবল পয়সা নিতে যাবে কেন? আর ঐ পনেরো দিনে আপনি দেখে নেবেন প্যালেস্টাইন।'

আমি বললুম, 'হুঁ, হুঁ-উ-উ—কিন্তু সে জাহাজে যদি সীট না থাকে?'

লোকটার ধৈর্যও অসীম। সর্বমুখে বুদ্ধদেবের মতো করুণার হাসি হেসে বললে, 'কে বললে থাকবে না? এখন তো অফ্ সীজ্‌ন্, স্ল্যাক পিয়েরিয়েড, অর্থাৎ যাত্রীর ভিড় নেই। আপনি যে জাহাজে এলেন তার কি অর্ধেকখানা ফাঁকা ছিল না। আসছে জাহাজ গড়ের মাঠ।'

আমি অনেকক্ষণ চুপ করে রইলুম। চিন্তাশীল লোক বলে নয়। আসলে সব কিছু বুঝতেই আর পাঁচ জনের তুলনায় আমার একটু বেশী সময় লাগে। ব্রেন-বক্সে আল্লাতালা রিসিভিং সেট্‌টা দিয়েছেন অতিশয় নিকৃষ্ট পর্যায়ের। বাল্‌বগুলো গরম হতে লাগে মিনিট তিন। তার পরও চিঁক্তির। তিনটে স্টেশন গুবলেট পাকিয়ে দেয়। শুধু কড়া শিষ। কিছুই বুঝতে পারি নে।

হঠাৎ মাথায় একটা প্রশ্ন এল। জানো বোধ হয়, অগা বোকারা মাঝে মাঝে, অর্থাৎ বছরে দু-একবার, পাকা স্যানার মতো দু-একটা প্রশ্ন ওঠাতে পারে। তাই শুধালুম, 'কিন্তু আমি প্যালেস্টাইন গেলে তোমার টাকে কি চুল গজাবে? তোমার তাতে কি লাভ?'

লোকটা এইবারে একটু বিরক্ত হল। প্রশ্নটা মোক্ষম কঠিন বলে, না 'টাক টাক' করলুম বলে ঠিক বুঝতে পারলুম না। আমার মগজ তখন ঐ একটা কঠিন প্রশ্ন শুধবার ধকল কাটাতে গিয়ে হাঁপাতে আরম্ভ করছে।

বললে, 'আমার কি লাভ? আমার লাভ বিস্তর না হলেও অল্প। অর্থাৎ অল্প-বিস্তর। বুঝিয়ে বলি। আপনাকে নিয়ে যাবো কুকের আপিসে। তাদের

কাছ থেকে কাটবেন আপনার পয়লা গন্তব্যস্থল, প্যালেস্টাইনের রাজধানী জেরুজালেমের টিকিট। ন্যায্য ভাড়াই দেবেন। কিন্তু কুক্ আমাকে দেবে কমিশন—'

আমি শুধালুম, 'কুক্ তোমাকে কমিশন দিতে যাবে কেন?'

আমার বুদ্ধির 'প্রাখর্য' দেখে লোকটা প্রায় হতাশ হয়ে বললে, 'প্যালেস্টাইন সরকার কুক্কে পয়সা দেয়, তার দেশে টুরিস্ট্ নিয়ে যাবার জন্য তাতে করে সরকারের দু পয়সা লাভ হয়। তাই তারা কুক্কে দেয় কমিশন, কুক্ তার-ই খানিকটে দেয় আমাকে। তারা তো আর ট্রেনে ট্রেনে খদ্দেরের সন্ধানে টো-টো করতে পারে না। ঐ কর্মটি করি আমি। তাই আমার হয় কিঞ্চিৎ মুনাফা। বুঝলেন তো?'

পাছে লোকটা আমাকে ফের বোকা বানিয়ে দেয়, তাই তাড়াতাড়ি বললুম, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি, বুঝেছি, বিলক্ষণ বুঝেছি।' যদিও আমি ততখানি সংসারী বুদ্ধি ধরি নে বলে ঐ সব কমিশন-ফমিশনের মারপ্যাঁচ আদপেই ধরতে পারি নি।

কিন্তু লক্ষ্য করলুম, সে প্যাটপ্যাট করে আমার হ্যান্ড-ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে আছে। তার উপরে মোটা-মোটা হরফে লেখা ছিল ALI, লোকটা শুধলে, 'ব্যাগটা আপনার?'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ।'

'বাঃ। তা হলে তো আপনি মুসলমান। আর জেরুজালেম মুসলমানদের তীর্থভূমি— মক্কার পরেই তার স্থান। আল্লাতাল্লা মুহম্মদ সায়েবকে রাত্রে আরব থেকে জেরুজালেমে এনে সেখান থেকে স্বর্গদর্শনে নিয়ে যান। জেরুজালেমের সে জায়গাটার উপর এখন মস্‌জিদ্-উল্-আক্‌সা। বিরাট সে মসজিদ, অদ্ভুত তার গঠন। এই কিছুদিন হল আপনাদের দেশেরই রাজা হাইদ্রাবাদের নিজাম সেটাকে দশ লক্ষ টাকা খরচ করে মেরামত করে দিয়েছেন। দেখতে যাবেন না সেটা?'

তারপর বললে, 'আসলে কি জানেন? আসলে জেরুজালেম হল ধর্মের ত্রিবেণী। ইহুদি, খৃষ্টান আর মুসলমান ধর্ম এখানে এসে মিলেছে। এক ঢিলে তিন পাখি।'

তীর্থ দেখলে পুণ্য হয়, কি না হয়, সে কথা আমি কখনো ভালো করে ভেবে দেখি নি। কিন্তু হিন্দুদের কাশী, বৌদ্ধদের রাজগীর যখন দেখেছি, তখন এ তিনটেই বা বাদ যাবে কেন? বিশেষ কোনো ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব আমি আদপেই পছন্দ করি নে। তাকেই বলে কমুনালিজম। সৃষ্টিকর্তা যখন তাঁর অসীম করুণায় এতগুলো ধর্ম বানিয়েছেন তখন নিশ্চয়ই সব-কটাতেই কিছু-না-কিছু আছে। আর বিশেষ করে মা ভারি খুশি হবে, যখন শুনবে আমি বয়ৎ-উল্-মুকদ্দস্ ('পুণ্যভূমি অর্থাৎ জেরুজালেম) দর্শন করেছি। তাঁর বাবাও মক্কা অবধি পেঁছিতে পেরেছিলেন—বয়ৎ-উল্-মুকদ্দস্ দেখেন নি। সেখানে শুনেছি, অতি উত্তম তসবী (জপমালা) পাওয়া যায়। এক গাছা কিনে দিলে

মা যা-খুশী হবে। সাত রকৎ নমাজ পড়ার সময় (মুসলমানরা সচরাচর পড়ে পাঁচ রকৎ —মা পড়ে সাত) মা তসবী গুনবে, আর আমার উপর ভারি খুশি হবে।

*　　　*　　　*

পল আর পার্সি অবশ্য অত্যন্ত দুঃখিত হল। পার্সি বললে, 'আমাদের ফেলে আপনি চলে যাচ্ছেন প্যালেস্টাইন! আপনি না বলেছিলেন, ভূমধ্য-সাগরের নানা জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখাবেন, ইটালি আর সিসিলি, তার পর কর্সিকা আর সার্ডিনিয়ার ভিতর দিয়ে জাহাজ যাবার সময়, ভিসুভিয়স, আরো কত কী দেখাবেন?'

আমি স্বার্থপর, পাষণ্ড। পূর্ব প্রতিজ্ঞা ভুলে গেলুম। তবু হাতজোড় করে মাপ চাইলুম।

পল পার্সির দিকে তাকিয়ে বললে, 'ছি, পার্সি! স্যর ধর্মের জায়গা দেখতে ভারি ভালোবাসেন। এ সুযোগ ছাড়বেন কেন?'

তবু আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল।

এক দিকে বন্ধুজন, আরেক দিকে মায়ের তসবী।

সংসার কি শুধু দ্বন্দ্বেতেই ভরা?

পরিশিষ্ট

প্যালেস্টাইন ভ্রমণ যে এ পুস্তকের অংশ হতে পারত না তা নয়। কিন্তু পল আর পার্সি সঙ্গে না থাকলে সে বই তোমাদের বয়সী ছেলে-মেয়েদের কাছে ভালো লাগবে না বলে আমার বিশ্বাস। সে-বই হয়ে যাবে নিতান্তই বয়সীদের জন্য।

মানুষ বই লিখে বন্ধুজনকে উৎসর্গ করে। আমি প্যালেস্টাইন সম্বন্ধে না-লেখা ভ্রমণ-কাহিনী উৎসর্গ করলুম মিত্রদ্বয় পল এবং পার্সিকে।

ভবঘুরে ও অন্যান্য

শ্রীযুক্তা সরোজিনী হটীসিং-কে
শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান মেরামতির সময় অন্যতম আইন করলেন, যে সব শব্দ বাঙলায় অত্যধিক প্রচলিত হয়ে গিয়েছে সেগুলোকে বদলাবার প্রয়োজন নেই। তবে কি 'খৃষ্ট' এবং 'খৃষ্টাব্দ' যথেষ্ট প্রচলিত ছিল না যে ওগুলোকে খ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টাব্দ করা হল? এবং এই নূতন বানান কি খুব শুদ্ধ? প্রথমত, খ্রী-তে দীর্ঘ ঈকার কেন? আমার কান তো বলছে, আমি হ্রস্বই শুনেছি; দ্বিতীয়ত, গ্রীকরা তো 'ষ্ট' বলে না—বলে 'স্ত'। অতএব অতি বিশুদ্ধ যদি লিখতেই হয় তবে লেখা উচিত খ্রিস্ত। 'খৃষ্ট' লেখার স্বপক্ষে আমার অন্য যুক্তি, কথাটা সংস্কৃত 'ঘৃষ' ধাতু, 'ঘর্ষিত', 'মর্দিত' অর্থেই গ্রীকে ব্যবহৃত হয় (এনয়েনটেড)—অর্থাৎ 'স্নেহাসিক্ত'—'স্নেহঘর্ষিত'। ঘৃষ্ট এবং খৃষ্ট তাই হুবহু একই শব্দ (Thou anointest my head with oil; Psalms No 23, v5—এখনও পূব বাঙলার গ্রামাঞ্চলে বিয়েবাড়ীতে নিমন্ত্রিত রবাহূত রমণীদের মাথা তৈল 'ঘৃষ্ট' করা হয়; আমি কাষ্ঠরসিক নই, হলে মার্কিনী পদে তৈল-মর্দন করে যে পদোন্নতি হয়, সেদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতুম; ভাষায়ও to butter up কথাটা আছে)। 'খ্রী'-এর চেয়ে 'খৃ' লেখাতে ছাপাখানারও বোধ হয় সুবিধা বেশী এবং সর্বশেষ যুক্তি, খৃষ্টানরা যেরকম 'এক্স' অক্ষর ও ক্রুশ চিহ্ন প্রভু যীশুর সম্মানার্থে আলাদা করে রেখেছেন, আমরাও নাহয় 'খৃ'-টি তাঁরই জন্য রেখে দিলুম।

* * *

ধর্মের ইতিহাস পড়ার সময় আমার সব সময়ই আশ্চর্য বোধ হয়েছে যে, বুদ্ধ খৃষ্ট, মুহম্মদ (দ) যখন যুগ-পরিবর্তক মহান বাণী প্রচার করেছেন, তখন গুণী-জ্ঞানী যত না তাঁদের চতুর্দিকে সমবেত হয়েছেন, তার চেয়ে বেশী সমবেত হয়েছে সর্ব-হারার দল। হজরৎ মুহম্মদের প্রথম শিষ্যের বহুলাংশ ক্রীতদাস, দীনহীন; খৃষ্টের শিষ্যগণ জেলে (এবং জেলে যে চাষার চেয়েও গরীব হয়, সে-ও জানা কথা) এবং তিনি পাপী-তাপী, মদ্যবিক্রেতা এবং পাপিষ্ঠা রমণীকে (মেরি ম্যাগডলীন) সঙ্গ দিতে কুণ্ঠিত হতেন না বলে সে-যুগে নিন্দাভাজন হয়েছেন। এই মহাপুরুষদ্বয়ের বিনাশ কামনা করেছেন সে-যুগের পদস্থ ব্যক্তিরাই। বুদ্ধের শিষ্য মহামগ্‌গলায়ন ও সারিপুত্ত অসংখ্য দীনহীন পথের ভিখারীকে প্রব্রজ্যা দিয়ে যে শিষ্য করেছিলেন, সে-কথা জাতক পড়লেই জানা যায়। বুদ্ধকে রাষ্ট্রের বিপক্ষে দাঁড়াতে হয় নি বলে তিনি রাজসম্মান ও শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদের অর্থও পেয়েছিলেন, খৃষ্ট কাউকেই পান নি, এবং নবী মুহম্মদ আবু বকর ও ওমরের মত সামান্য দুএকটি আদর্শবাদী শিষ্য পেয়েছিলেন।

মার্কস ঠিক কি ভাষায় বলেছিলেন বলতে পারবো না, কিন্তু তাঁর অন্যতম মূল বক্তব্য ছিল যে, অর্থনৈতিক কারণ ভিন্ন কোনো বিরাট আন্দোলন পৃথিবীতে হয় না। বৌদ্ধ, জৈন, জরথুস্ত্রী, খ্রীষ্ট, ইসলাম—এই পাঁচটি পৃথিবীর বড় বড় আন্দোলন—হিন্দু এবং ইহুদী ধর্ম কোনো ব্যক্তিবিশেষের চতুর্দিকে গড়ে ওঠে

নি বলে এগুলো উপস্থিত বাদ দেওয়া যেতে পারে— ।[১] তাই মনে প্রশ্ন জাগে, এদের পিছনে অর্থনৈতিক কারণ ছিল, কি ছিল না ?

মার্কস এই পাঁচটি আন্দোলনকে তাঁর অর্থনৈতিক ছকে ফেলে বিচার করেছিলেন কি না জানি নে, কিংবা যে-যুগে তিনি তাঁর ছক নির্মাণ করেন, সে যুগে হয়তো এইসব ধর্মান্দোলনের ইতিহাস ব্যাপকভাবে ইয়োরোপীয় ভাষায় লিখিত তথা অনূদিত হয় নি বলে তাঁকে তার মাল-মশলা যোগাতে পারে নি ।

খৃষ্টের সময় অর্থনৈতিক কুব্যবস্থা চরমে পেঁাচেছে। শোষক সম্প্রদায় জেরুজালেমে জিহোভার মন্দির প্রায় ব্যাঙ্কিং হৌসে পরিবর্তিত করে ফেলেছে—যীশু সেখান থেকে তাদের তাড়িয়ে দিচ্ছেন (মার্ক ১১।১৫)—খাজনা-ট্যাক্সে মানুষ জর্জর। যীশু, মুহম্মদ, বুদ্ধ সকলেই আত্মা, অবিনশ্বর জীবন ও নির্বাণের গূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে বিচার করেছেন, সহজ সরল ভাষায় চরম সত্য প্রকাশ করেছেন, রোগশোকমুক্ত অনন্ত জীবনের সন্ধান দিয়েছেন নিশ্চয়ই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সকলেই নূতন ধন-বণ্টন-পদ্ধতি প্রচলিত করতে চেয়েছিলেন এবং তারই ফলে অসংখ্য দীনদুঃখী—এবং প্রধানত তারাই —তাঁদের চতুর্দিকে সমবেত হয়েছিল। খৃষ্ট যে কামিজ নিয়ে গেলে জোব্বা দিতে বলেছেন, সে কিছু মুখের কথা নয়। তার মহাপ্রস্থানের পর নবনির্মিত খৃষ্টসমাজের যে বর্ণনা পাই, তার থেকে মনে হয় মার্কস যে ভাবী আদর্শ সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন, তাই সফল হয়ে গিয়েছে, সবাই 'সই পেয়েছির দেশে'র তুল্যাধিকারী নাগরিক :

And all that believed were together, and had all things common ; and sold their possessions and goods and parted them to all men, as every man had need··· and the multitude of them that believed were of one heart and one soul :
neither said any of them that ought of the things which he possessed was his own ; but they had all things common······
···Neither was there any among them that lacked, for as many as were possessors of lands or houses sold them, and brought the prices of the things that were sold and laid them down at the apostle's feet ; aud distribution was made unto every man according as he had need. (Acts : 2 & 4).

হজরত মুহম্মদ মক্কাতে যতদিন একেশ্বরবাদ ও আল্লার মাহাত্ম্য প্রচার করেছিলেন, ততদিন মক্কাবাসী তাঁর উপর অসন্তুষ্ট ছিল না, কিন্তু তিনি যখন নবীন ধন-বণ্টন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চাইলেন, তখনই মক্কার পদস্থ জনেরা তাঁর প্রাণ-নাশের সংকল্প করল। পরবর্তী যুগের ইসলামে এই নবীন ধন-বণ্টন-পদ্ধতির প্রাধান্য ঐতিহাসিক মাত্রেরই জানা আছে। ইরানের এক

১ আমার মনে হয়, শংকর ও চৈতন্যের সময় বড় দুটো আন্দোলন হয়েছিল, কিন্তু এখানে দীর্ঘ আলোচনার স্থানাভাব ।

আরব গভর্নর তখন দুঃখ করে বলেছিলেন, এই যে আজ হাজার হাজার ইরানী মুসলমান হচ্ছে, সেটা ইসলামের জন্য নয়, আর্থিক সুবিধা পাচ্ছে বলে।[২]

জরথুস্ত্রের আমলে দ্বন্দ্ব বেধেছে—একদিকে কৃষি ও গো-পালন, অন্যদিকে যাযাবর বৃত্তি ও লুণ্ঠন। জরথুস্ত্র দেশের ধনবৃদ্ধির জন্য কৃষি-গো-পালনের রীতি প্রবর্তন করতে চাইলে শত্রুপক্ষের হস্তে প্রাণ হারান। তাঁর 'ধর্ম' কিন্তু জয়লাভ করলো।

বুদ্ধের সময় তপোবন প্রথা প্রায় উঠে গিয়েছে, বন-জঙ্গল সাফ করা হয়ে গিয়েছে—বিস্তর লোক ভিক্ষুকের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওদিকে ছোট ছোট অংসখ্য রাজ্য তাদের অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশের চরমে পেঁৗছে এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে রাজ্যে রাজ্যে শান্তিপূর্ণ সহযোগিতা না করলে আর সমস্ত দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয় না; অথচ জাতকে দেখতে পাই, কেউ আপন রাষ্ট্রের প্রত্যন্ত প্রদেশ ত্যাগ করে ভিন্ন রাজ্যে প্রবেশ করতে গেলেই তাকে মেরে ফেলা হচ্ছে। বুদ্ধ ঐসব নিরন্নদের সঙ্ঘের অন্নবস্ত্র দিয়ে পাঠালেন ভিন্ন রাজ্যে শান্তির বাণী প্রচার করতে—তাদের বিশেষ বেশ পরানো হল, যাতে করে সবাই তাদের সহজে চিনতে পারে। গোড়ার দিকে নিশ্চয়ই কিছু ভিক্ষু মারা গিয়েছিলেন; পরে এঁরা অক্লেশে রাজ্য থেকে রাজ্যান্তরে গেলেন। ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়লো, ঐক্য সৃষ্টি হল এবং তাই সর্ব-ভারতের মৌর্য রাজ্য সংস্থাপিত হল।

আমি একথা বলছি না যে, দেশের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি সাধন ও নবীন ধনবণ্টন পদ্ধতি প্রচলন করাই মহাপুরুষদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল; আমার বক্তব্য তাঁরা এগুলোকে অবহেলা তো করেনই নি, বরঞ্চ অত্যন্ত জোর দিয়েছিলেন বলেই 'হ্যাভনট' 'প্রলেটারিয়া' 'সর্বহারা'রা প্রথম এসে জুটেছিল। কয়েক শতাব্দী পর ফের দেখা দেয়, আবার সেই শোষকের দল, পাদ্রীপুরুৎ-মোল্লারূপে। এঁরা আর ধনবণ্টনের কথা তোলেন না—আচার অনুষ্ঠান, পূজা-প্রায়শ্চিত্তের কথাই বার বার বড় গলায় গান।

ধর্মের এই অর্থনৈতিক দিকটা নিয়ে এখনো কোনো ভালো চর্চা হয় নি॥

কই সে?

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাত্মবোধ, গ্যোটের ভূয়োদর্শন, শেক্‌স্‌পীয়রের মানব-চরিত্রজ্ঞতা সামান্য জনও কিছু না কিছু উপলব্ধি করতে পারে। সৃষ্টিকর্তা পৃথিবীকে দিয়েছেন মাত্র একটি হিমালয়; আমাদের মানসলোকে এই তিনজনই তিনটি হিমালয়। সাধারণ জন দূরে থেকেও এঁদের গাম্ভীর্য-মাধুর্য দেখে

২ তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে ইসলামের আদর্শবাদ এদের কেউই বুঝতে পারে নি। বস্তুতঃ ইসলামের সাম্যবাদ, একেশ্বরবাদ, হজরতের সরল জীবনাদর্শ বহু লোককে অভিভূত করে।

বিস্ময় বোধ করে—চূড়ান্তে অধিরোহন করেন অল্প মহাত্মাই। আরো হয়তো একাধিক হিমালয় এ-ভূমিতে, অন্যান্য ভূমিতে আছেন—ভাষা ও দূরত্বের কুহেলিকায় আজও তাঁরা লুক্কায়িত।

এছাড়া প্রত্যেক পাঠকেরই আপন-আপন অতি আপন প্রিয় কবি আছেন। তাঁদের কেউ কেউ হয়তো বিশ্বজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নি,—হয়তো তাঁদের সে মেধা নেই ; এ*দের স্বীকার করে নিয়েও আমরা এ*দের নাম বিশ্বকবিদের সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে বলি না।

আমি দুজন কবিকে বড় প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি। আমারই সৌভাগ্য, এ*দের একজন বাঙালী—চণ্ডীদাস, অন্য জন জর্মন, নাম হাইনে। প্রশ্ন উঠতে পারে, বড় বড় কবিদের ছেড়ে এ*দের প্রিয় বলে বরণ করেছি কেন? কারণটা তুলনা দিয়ে বোঝালে সরল হয়। রাজবাড়ির ঐশ্বর্য দেখে বিমোহিত হই, বিনোবাজীর ব্যক্তিত্ব দেখে বাক্যস্ফূর্তি হয় না, কিন্তু রাজবাড়িতে তথা বিনোবাজীর সাহচর্যে থাকবার মত কৌতূহল যদি বা দু'একদিনের জন্য হয়, তাঁদের সঙ্গে অহরহ বাস করতে হলে আমার মত সাধারণ জনের নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসবে।

চণ্ডীদাসকে নিয়ে ষোল, আর হাইনেকে নিয়ে সতের বছর বয়েস থেকে ঘর করছি। একদিনের তরে কোনো প্রকার অস্বস্তি বোধ করি নি। আমি জানি, এ-বিষয়টি আরো সরল করে বুঝিয়ে বলা যায়, কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। কারণ প্রত্যেকেরই আপন-আপন প্রাণপ্রিয় ঘরোয়া কবি আছেন—শেক্সপীয়র গ্যোটে নিয়ে ঘর করেন অল্প লোকই—তাঁরা এতক্ষণে আমার বক্তব্যটি পরিষ্কার বুঝে গিয়েছেন। নিজের পিঠ কখনো নিজে দেখি নি, কিন্তু সেটা যে আছে সে-কথা অন্য লোককে যুক্তিতর্ক দিয়ে সপ্রমাণ করতে হয় না।

চণ্ডীদাস ও হাইনের মত সরল ভাষাতে হৃদয়ের গভীরতম বেদনা কেউ বলতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ আর গ্যোটেও অতি সরল ভাষায় কথা বলতে জানতেন, কিন্তু তাঁরা সৃষ্টি-রহস্যের এমন সব কঠিন জিনিস নিয়ে আপন আপন কাব্য-লোক রচনা করেছেন যে সেখানে তাঁদের ভাষা বিষয়বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দুর্জ্ঞেয় হতে বাধ্য। চণ্ডীদাস, হাইনে তাঁদের, আমাদের হৃদয়-বেদনালোকের বাইরে কখনো যেতে চান নি। তাঁরা গান গেয়েছেন, আমাদের আঙিনায় তেঁতুলের ছায়ায় বসে—তারা-ঝরা-নির্ঝরের ছায়াপথ ধরে ধরে তাঁরা সপ্তর্ষির গগনাঙ্গন পেঁৗছে সেখানকার অমর্ত্য গান গান নি।

চণ্ডীদাসকে সব বাঙালীই চেনে, হাইনের পরিচয় দি।

আমাদের পরিচিত জনের মাধ্যমেই আরম্ভ করি।

যাঁরা গত শতাব্দীতে ইয়োরোপে সংস্কৃতচর্চা নিয়ে কিঞ্চিন্মাত্র আলোচনা করেছেন তাঁরাই আউগুস্টুস্ ভিল্‌হেল্‌ম্ ফন্ শ্লেগেলের সঙ্গে পরিচিত।

জর্মনির বন্ বিশ্ববিদ্যালয়েই সর্বপ্রথম সংস্কৃত চর্চার জন্য আসন প্রস্তুত করা হয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি এই আসনে অধ্যাপকরূপে বিরাজ করতেন। এক দিকে তিনি সংস্কৃতের নাট্যকাব্যের সঙ্গে পরিচিত, অন্য দিক দিয়ে তখন-

কার গৌরবভাস্কর ফরাসী সাহিত্যের বিপুল ঐশ্বর্য ভোগ করেছিলেন বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যসম্রাজ্ঞী মাদাম দ্য স্তালের সখা ও উপদেষ্টারূপে। তাই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ছাড়াও পড়াতেন নন্দনশাস্ত্র বা অলংকার। এক বৎসর যেতে না যেতে হাইনে বন্ এলেন আইন পড়তে। শ্লেগেলের বক্তৃতা শুনে তিনি এমনই অভিভূত হয়ে গেলেন যে আইনকে তিনি নির্বাসনে পাঠালেন।

শ্লেগেল অলংকার পড়াবার সময় নিজেকে গ্রীক লাতিন ফরাসী জর্মনের ভিতর সীমাবদ্ধ করে রাখতেন না। ঘন ঘন সংস্কৃত কাব্যোপবনে প্রবেশ করে গুচ্ছ গুচ্ছ গীতাঞ্জলির সঞ্চয়িতা তাঁর শিষ্যদের সামনে তুলে ধরতেন। হাইনের বয়স তখন একুশ-বাইশ। সেই সর্বজনমান্য প্রবীণ জ্ঞানবৃদ্ধ রসিকজননমস্য শ্লেগেলের কাছে হাইনে একদিন নিয়ে গেলেন তাঁর একগুচ্ছ সরল কবিতা।

'উত্তম, উত্তম কবিতা, কিন্তু তোমাকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে। বড্ড বেশী পুরনো অলংকারের ছড়াছড়ি, নিজের কথায় আড় কবিতাকে কৃত্রিম করে ফেলেছে।' দুরুদুরু বুকে হাইনে মৃদু আপত্তি জানালেন। শ্লেগেল নির্দয় সমালোচক। বললেন, 'বুঝেছি, বুঝেছি। কিন্তু তোমার কাব্যরাণী এখনো পরে আছেন জবরজঙ্গ জামাকাপড়, তাঁর মুখে বড্ড বেশী কালো তিল, তাঁর ক্ষীণ কটি আর কত ক্ষীণ করবে, তাঁর খোঁপা যে আকাশে উঠে গেছে। একে ভালোবাসার যুগ তোমার পেরিয়ে গিয়েছে।

কিন্তু বন্ধু, তোমার ভাস্কর কাব্যলক্ষ্মী ঘুমিয়ে আছেন কে জানে কোন্ ইন্দ্রজালের মোহাচ্ছন্ন মায়ায় উত্তর দেশে। নিভৃত নির্জনে। প্রেমাতুর, বিরহ-বেদনায় বিবর্ণ কত না তরুণ রাজপুত্র বেরিয়েছেন তাঁর সন্ধানে। হয়তো তুমিই, —তুমিই বন্ধু সেই ভানুমতী মন্ত্র পড়ে তাঁকে দীর্ঘ শর্বরীর দীর্ঘতর নিদ্রা থেকে জাগরিত করবে। ঘণ্টাধ্বনি বেজে উঠবে চতুর্দিকে, বনস্পতি গান গেয়ে উঠবে, প্রকৃতিও জেগে উঠবে আপন জড়নিদ্রা থেকে। জর্মন কাব্যলক্ষ্মীর চতুর্দিকের প্রাকার ধ্বংসাবশেষ রূপান্তরিত হবে স্বর্ণোজ্জ্বল রাজপ্রাসাদে। গ্রীসের সুরপুত্রগণ আবার এসে অবতীর্ণ হবেন তাঁদের চিরনবীন দেবসজ্জার মহিমায়......প্রার্থনা করি আপোল্লো দেব তোমার প্রতি পদক্ষেপের দিকে অবিচল দৃষ্টি রাখুন।'

হাইনের জীবনীকার বলেন, কোনো সুরাই তরুণ হাইনেকে এতখানি উত্তেজিত করতে পারে নি—সে যুগের আলংকারিক-শ্রেষ্ঠের কয়েকটি কথায় তাঁকে যতখানি সোমাচ্ছন্ন করেছিল। রসরাজ শ্লেগেল স্বহস্তে হাইনের মস্তকে কবির রাজমুকুট পরিয়ে দিয়েছেন!

এর কিছুদিন পরে,—হাইনে তখনো কলেজের ছাত্র,—বেরল তাঁর কবিতার বই, "বুখ ড্যার লীডার," "গানের বই," কিন্তু এর অনুবাদ "গীতাঞ্জলি" করলেই ঠিক হয়। আমরা "অঞ্জলি" বলতে যা বুঝি সেটা ইয়োরোপেও আছে, কিন্তু ঠিক শব্দটি নেই। গানের বইখানা পড়ার পর স্পষ্টই বোঝা যায়, 'অঞ্জলি' শব্দটি ইয়োরোপে থাকলে হাইনে অতি নিশ্চয় ঐটেই ব্যবহার করতেন—কারণ এর অনেকগুলিই তাঁর প্রথমা প্রিয়ার পদপংকজে অর্পিত প্রণয়প্রসূনাঞ্জলি।

সমস্ত জর্মনি সাত দিনের ভিতর এই কলেজের ছোকরার জয়ধ্বনি গেয়ে উঠল। হাইনে জর্মন কাব্যে আনলেন এক নূতন সুর। অথচ সত্য বলতে কি এই সুরে কিছুমাত্র নূতনত্ব নেই, কারণ গীতিগুলি সরলতম ভাষায় রচিত। সরল ভাষা ব্যবহার করা তো আর বিশ্বসাহিত্যে কিছু নূতন নয়। কিন্তু জর্মন কাব্যে ঐটেই হল এক সম্পূর্ণ নবীন সুর—কারণ জর্মনদের বিশ্বাস তাদের ঐতিহ্য তাদের সংস্কৃতি এমনই এক অবর্ণনীয় কুহেলিকাঘন আত্মোপলব্ধি-প্রচেষ্টা এবং অর্ধসফলতা-অর্ধনৈরাশ্যে আচ্ছাদিত যে সেটা সরল ভাষায় কিছুতেই প্রকাশ করা যায় না। হাইনে দেখিয়ে দিলেন সেটা যায়। যে রকম সবাই যখন বলেছিল, অসম্ভব, তখন মধুসূদন দেখিয়ে দিয়েছিলেন, অমিত্রাক্ষরে বাঙলা কাব্যসৃষ্টি করা যায়।

হাইনের কবিতা সরল। সকলেই জানেন সরল ভাষায় লেখা কঠিন। সেটাও আয়ত্ত করা যায়। আয়ত্ত করা যায় না—সরল কিন্তু অসাধারণ হওয়া। 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল'—সরল অথচ বিরল লেখা।

ইংরেজীতে হাউসমানের সঙ্গে হাইনের তুলনা করা হয়। শুনতে পাই হাউসমানের 'শ্রপ শা ল্যাডের' মত কোনো ইংরেজী কবিতার বই এত বেশী বিক্রয় হয় নি—প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে। সাধারণ জন পড়েছে বইখানা সরল বলে, গুণীরা কিনেছেন বিরল বলে। পাঠককে অনুরোধ করি, দুজনারই লেখা তলিয়ে পড়তে। হাইনে অনেক উঁচুতে।[১]

হাইনের কবিতা বাঙলায় অনুবাদ করেছেন প্রধানত সত্যেন্দ্র দত্ত। 'তীর্থ সলিল ও তীর্থ রেণু'তে—এবং হয়তো অন্যান্য পুস্তকেও কিছু কিছু আছে। আর করেছেন যতীন্দ্র মোহন বাগচী।[২]

এঁর বই যোগাড় করতে পারি নি, আমি ১৩১৭ সনের প্রবাসীতে পড়েছি।

১ Edmund Wilson মার্কিন সমালোচক। আমি যে তাঁকে শ্রদ্ধা করি তার প্রধান কারণ তিনি এলিয়েটকে অপ্রিয় সত্য বলতে জানেন। হাইনে হাউসমান সম্বন্ধে তিনি বলেন,

There is immediate emotional experience in Housman of the same kind that there is in Heine, whom he imitated and to whom he has been compared. But Heine, for all his misfortunes, moves at ease in a large world. There is in his work an exhilaration of advantures, in travel, in love etc. Doleful his accents may sometimes be, he always lets in air and light to the mind. But Housman is closed from the beginning. His world has no opening horizons etc. "The Triple Thinkers," p. 71

২ পরে জানতে পারি, বাঙলায় সর্বপ্রথম অনুবাদ করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনে।

'ডী রোজ, ডী লীলিয়ে, ডী টাউবে' দি রোজ, দি লিলি, দি ডাভের' অনুবাদ করেছেন:'

গোলাপ, কমল, কপোত, প্রভাত রবি—
ভালবাসিতাম কত যে এসবে আগে,
সে সব গিয়েছে, এখন কেবল তুমি,
তোমারি মূর্তি পরাণে কেবল জাগে!
নিখিল প্রেমের নির্ঝর—তুমি সে সবি—
তুমিই গোলাপ, কমল, কোপত, রবি।

(বাগচী, প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৭)

এবারে সত্যেন দত্তের একটি:

জাগিনু যখন ঊষা হাসে নাই,
শুধানু "সে আবিবে কি?"
চলে যায় সাঁঝ আর আশা নাই,
সে ত' আসিল না, হায়, সখি?

নিশীথে রাতে ক্ষুব্ধ হৃদয়ে
জাগিয়া লুটাই বিছানায়;
আপন রচন ব্যর্থ স্বপন
দুখ ভারে নুয়ে ডুবে যায়।

ভারতবর্ষের প্রভাব হাইনের কবিতায় খুব বেশী আছে বলা যায় না। তাঁর পূর্ববর্তী হিমালয় গ্যোটেই যখন হাইনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি—চণ্ডীদাসের উপর কার প্রভাব!—তখন সে আশা দুরাশা। তবু একটি কবিতার উল্লেখ করি—

গঙ্গার পার—মধুর গন্ধ ত্রিভুবন
আলো ভরা—
কত না বিরাট বনস্পতিরে ধরে
পুরুষ রমণী সুন্দর আর শান্ত প্রকৃতি-ধরা
নতজানু হয়ে শতদলে পূজা করে।

(লেখকের অনুবাদ)

এক দিক দিয়ে হাইনে গীতিকাব্য রচয়িতা, অন্য দিক দিয়ে তিনি সমস্ত জীবন লড়েছেন জর্মনির সাধারণ জনের ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্য। সেই 'দোষে' তাঁকে যৌবনেই নির্বাসন বরণ করতে হয়। জীবনের বেশীর ভাগ তিনি কাটান প্যারিসে। সেখান থেকে তিনি কী রাজার সম্মান পেয়েছিলেন, সে কথা লিখেছেন ভিক্টর হ্যুগোর গুরু ফরাসী সাহিত্যের তখনকার দিনের গ্র্যাণ্ড মাস্টার গোতিয়ের। আর হাইনের সখা ও সহচর ছিলেন সঙ্গীতের গ্র্যাণ্ড মাস্টার রসসীনি। যদিও পরের কথা, তবু এই সংবাদে একটি মধুর গল্প মনে পড়ল।

জীবনের শেষ আট বছর হাইনের কাটে ঐ প্যারিসেই, রোগশয্যায়, অবশ

অথর্ব হয়ে—অসহ্য যন্ত্রণায়। কার্ল মার্কস্ যখন তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে আসেন তখন হাইনের চোখের পাতা আঙুল দিয়ে তুলে ধরতে হয়েছিল—যাতে করে তিনি মার্কসকে দেখতে পান। এর কিছু দিন পর হাইনের বাড়িতে আগুন লাগে। বিরাট বপু দরওয়ান রোগজীর্ণ হাইনেকে কোলে করে নিয়ে গেল নিরাপদ জায়গায়। আগুন নেভানোর পর যখন তাঁকে দরওয়ান আবার কোলে তুলে নিয়ে এল তখন হাইনে মৃদু হাসি হেসে তাঁর এক সখাকে বললেন, 'হামবুর্গে মাকে লিখে দাও, প্যারিসের লোক আমাকে এত ভালোবাসে যে কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।'

সেই সরল দরওয়ান কথাটির গভীর অর্থ বুঝেছিল কি না জানি নে। শুনতে পেয়ে সে বলেছিল, 'হ্যাঁ, মসিয়ো, তাই লিখে দিন।'

ঘটনাটির ভিতর অনেকখানি বেদনা লুকনো আছে। নির্বাসিত হাইনে যতদিন পারেন মায়ের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন যে তিনি আর নড়া-চড়া করতে পারেন না।

পাশ্চাত্ত্য কবিরা মায়ের উদ্দেশে বা স্মরণে বড় একটা কবিতা লেখেন না। ইহুদি হাইনের গায়ে প্রাচ্য দেশীয় রক্ত ছিল বলে তিনি ব্যত্যয়। অল্প লোকই হাইনের মত মাকে ভালোবেসেছে। প্যারিসে থাকাকালীন মাত্র দু'বার তিনি গোপনে জর্মান যান। দু'বারই মাকে দেখবার জন্য। আমার নিজের মনে সন্দেহ আছে, পুলিস জানতে পেরেও বোধ হয় সাধারণের কবি হাইনেকে ধরিয়ে দেয় নি। পুলিস কবিতা না লিখতে পারে, কিন্তু পুলিসেরও তো মা থাকে।

মাতার উদ্দেশে লেখা হাইনের কবিতা অদ্বিতীয় বলার সাহস আমি না পেলেও বলবো অতুলনীয়। এবং আশ্চর্য, কবিতাটি করুণ এবং মধুর সুরে রচা নয়। ভাষা অবশ্য অত্যন্ত সরল, কিন্তু মূল সুরে আছে দার্ঢ্য এবং দম্ভ। কাইজারের সঙ্গে প্রজা-মিত্র হাইনের ছিল কলহ—আমার মনে প্রশ্ন জাগে হাইনের সখা রজকিনী-সাধক চণ্ডীদাসকে কি মুকুটহীন কাইজার ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হয় নি—এবং তাই তিনি কবিতা আরম্ভ করেছেন,

> উচ্চশির উচ্চে রাখা অভ্যাস আমার
> আমরা প্রকৃতি জেনো অতীব কঠোর
> রাজারো অবজ্ঞা-দৃষ্টি পারে না তো মোর
> দৃষ্টি কভু নত করে। কিন্তু মাগো—

আর তার পর কী আকুলি-বিকুলি! তোমার সামনে, মা, আপনার থেকে মাথা নিচু হয়ে আসে। স্মরণে আসে, কত না অপরাধ করেছি, কত কিছু না করে তোমার পুণ্য হৃদয়কে বেদনা দিয়েছি বার বার। তার স্মৃতি আমাকে যে কী পীড়া দেয়, জানো মা?

সত্যেন দত্তের অনুবাদ তুলে দিতে ইচ্ছে করছে না,—প্রত্যেক অনুতপ্ত জনের মত আমারও মন আঁকুবাঁকু করে, হাইনের মাতৃমন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমিও আমার মাতৃমন্ত্র উচ্চারণ করে যাই।

কবিতাটির দ্বিতীয় ভাগে অন্য সুর।

তোমাকে ছেড়ে মা, মূর্খের মত আমি গিয়েছি পৃথিবীর অন্য প্রান্তে—ভালোবাসার সন্ধানে। দোরে দোরে ভিখিরির মত ভালোবাসার জন্য করেছি করাঘাত। আর পেয়েছি শুধু নিদারুণ ঘৃণা। তারপর যখন ক্ষত-বিক্ষত শ্লথ চরণে বাড়ি ফিরেছি তখন দোরের সামনে তুমি মা এগিয়ে এসেছ আমার দিকে—

হার মানলুম। সত্যেন দত্তের অনুবাদটিই পড়ুন।

আশ্চর্য লাগে, এই হাইনে লোকটি সরল ভাষায় কি করে রুদ্র করুণ উভয় রসই তৈরী করতে জানতেন। আর আমার সব চেয়ে ভালো লাগে তাঁর হাসি-কান্নায় মেলানো লেখাগুলো। তারই হ্রস্ব একটি শোনাবার জন্য দীর্ঘ এই ভূমিকা। আমি নিরুপায়। হায়, আমার তো সে শক্তি নেই যার কৃপায় লেখক মহাত্মাজনকেও স্বল্পে প্রকাশ করতে পারে।

সম্রাট ম্যাক্সিমীলীয়নের কাহিনী বলতে গিয়ে হাইনে অনুতাপ করছেন, যে কাহিনীটি তাঁর ভালো করে মনে নেই—অনেককালের কথা কি না। আপসোস করে বলছেন, এ সব জিনিস মানুষ সহজেই ভুলে যায়,—বিশেষ করে যখন তাঁকে প্রতি মাসে প্রফেসারের রোক্কা মাইনে দেওয়া হয় না, আপন ক্লাস-লেকচারের নোটবই থেকে মাঝে-মধ্যে পড়ে নিয়ে স্মৃতিটা ঝালিয়ে নেবার জন্য।

ম্যাক্সিমীলীয়ন পাষাণ প্রাচীরের কঠিন কারাগারে। তাঁর আমীর-ওমরাহ, উজীর-নাজীর সবাই তাঁকে বর্জন করেছে। কেউ সামান্যতম চেষ্টা করছে না, তাঁর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনা করার। কী ঘেন্নায়ই না ম্যাক্সিমীলীয়ন তাঁর গৌরবদিনের সেই পা-চাটা দলের কথা মাঝে মাঝে স্মরণ করেছিলেন।

এমন সময় সর্বাঙ্গ কম্বলে ঢেকে এসে ঢুকলো কারাগারের নির্জন কক্ষে একটা লোক। কে এ? এক ঝটকায় কম্বল ছুঁড়ে ফেলে দিতেই সম্রাট দেখেন, এ যে রাজসভার ভাঁড়, সং, বিশ্বাসী কুন্‌ৎস্ ফন্ ড্যার রোজেন। আশার বাণী, আত্মবিশ্বাসের মন্ত্র নিয়ে এল শেষটায় রাজসভার মূর্খ—সং কুন্‌ৎস্!

'ওঠো, মহারাজ, তোমার শৃঙ্খল ভাঙবার দিন এল। কারামুক্তির সময় এসেছে। নব-জীবন আরম্ভ হল। অমানিশি অতীত—ঐ হেরো, বাইরে প্রথম ঊষার উদয়।'

'ওরে মূর্খ, ওরে আমার হাবা কুন্‌ৎস্! ভুল করেছিস, রে ভুল করেছিস। উজ্জ্বল খড়্গ দেখে তুই ভেবেছিস সূর্য, আর যেটাকে তুই ঊষার লালিমা মনে করেছিস সে রক্ত।'

'না, মহারাজ, ওটা সূর্যই বটে, যদিও অসম্ভব সম্ভব হয়েছে—ওটা উদয় হচ্ছে পশ্চিমাকাশে—ছ'হাজার বছর ধরে মানুষ ওটাকে পূব দিকেই উঠতে দেখেছে—এখনো কি ওর সময় হয় নি যে একবার রাস্তা বদলে পশ্চিম দিকে উঠে দেখে কি রকম লাগে!'

'কুন্‌ৎস্ ফন্ ড্যার রোজেন, বল্ দেখি তো হাবা আমার, তোর টুপিতে যে ছোট ছোট ঘুঙুর বাঁধা থাকতো সেগুলো গেল কোথায়?'

'দুঃখের কথা তোলেন কেন, মহারাজ ! আপনার দুর্দিনের কথা ভেবে ভেবে মাথা নাড়াতে নাড়াতে ঘুঙুরগুলো খসে গেল ; কিন্তু তাতে টুপির কোনো ক্ষতি হয় নি।'

'কুন্‌ৎস্ ফন্ ড্যার রোজেন, ওরে মূর্খ, বল্ তো, রে, বাইরে ও কিসের শব্দ ?'

'আজ্ঞে, মহারাজ। কামার কারাগারের দরজা ভাঙছে। শীঘ্রই আপনি আবার মুক্ত স্বাধীন হবেন—সম্রাট।'

'আমি কি সত্যই সম্রাট ? হায়, শুধু রাজসভার মূর্খের মুখেই আমি এ-কথা শুনলুম।'

'ও রকম করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলবেন না প্রভু ! কারাগারের বিষের হাওয়া আপনাকে নির্জীব করে ফেলেছে। আপনি যখন আবার সম্রাট হবেন তখন ধমনীতে ধমনীতে অনুভব করবেন সেই বীর রাজ-রক্ত, আপনি আবার হবেন গর্বিত সম্রাট, দম্ভী সম্রাট। আবার হবেন দাক্ষিণ্যময় এবং আবার করবেন অন্যায় অবিচার, হাসিমুখে, এবং আবার হবেন নেমকহারাম—রাজাবাদশাদের যা স্বভাব।'

'কুন্‌ৎস্ ফন্ ড্যার রোজেন, বল্ তো হাবা, আমি যখন আবার স্বাধীন হব, তখন তুই কি করবি ?'

'আমি আমার টুপিতে ফের ঘুঙুর সেলাই করবো।'

'আর তোর বিশ্বস্ততা প্রভুভক্তির বদলে তোকে কি প্রতিদান, কি পুরস্কার দেব ?'

'আঃ। আমার দিলের বাদশাকে কি বলবো ! দয়া করে আমার ফাঁসির হুকুমটা দেবেন না।'

এইখানে হাইনে তাঁর গল্পটি শেষ করেছেন।

আমরা বলি 'হা, হতোস্মি, হা হতোস্মি ! রাজসভার ভাঁড়ই হোক, আর সঙই হোক, সভা-মূর্খ হোক আর পুণ্যশ্লোক গর্দভই হোক, কুন্‌ৎস্ বিলক্ষণ জানতো, রাজারাজড়ার কৃতজ্ঞতাবোধ কতখানি !'

কিন্তু কাহিনীটির তাৎপর্য কি ?

হাইনে সেটি গল্পের মাঝখানেই বুনে দিয়েছেন। সে যুগের গল্পে দুটো ক্লাইমেক্‌স্ চলতো না বলে আমি সেটি শেষের-কবিতা রূপে রেখে দিয়েছি।

'হে পিতৃভূমি জর্মনি ! হে আমার প্রিয় জর্মন জনগণ ! আমি তোমাদের কুন্‌ৎস্ ফন্ রোজেন। তার একমাত্র ধর্ম ছিল আনন্দ, যার কর্ম ছিল তোমাদের মঙ্গলদিনে তোমাদের আনন্দবর্ধন করা, তোমাদের দুর্দিনে কারা-প্রাচীর উল্লংঘন করে তোমাদের জন্য অভয়বাণী নিয়ে আসা। এই দেখো, আমার দীর্ঘ আচ্ছাদনের ভিতর লুকিয়ে এনেছি তোমার সুদৃঢ় রাজদণ্ড, তোমার সুন্দর রাজমুকুট—আমাকে স্মরণ করতে পারছ না, তুমি মহারাজ ? আমি যদি তোমাকে মুক্ত নাও করতে পারি, সান্ত্বনা তো অন্তত দিতে পারব। অন্তত তো তোমার কাছে এমন একজন আপন-জন রইল যে তোমার সঙ্গে

তোমার দুঃখ-বেদনার কথা কইবে ; তোমাকে আশার বাণী শোনাবে ; যে তোমাকে ভালোবাসে ; যার সর্বশেষ রসের কথা সর্বশেষ রক্তবিন্দু তোমারই সেবার জন্য। হে আমার দেশবাসিগণ, তোমরাই তো প্রকৃত সম্রাট, তোমরাই তো দেশের প্রকৃত প্রভু। তোমাদের ইচ্ছা, এমন কি তোমাদের খেয়াল-খুশীই তো দেশের প্রকৃত শক্তি—এ শক্তি 'বিধি-দত্ত' 'রাজদণ্ডকে' অনায়াসে পদদলিত করে। হতে পারে আজ তোমরা পদশৃঙ্খলিত, কারাগারে নিক্ষিপ্ত—কিন্তু আর কত দিন ? ঐ হেরো, মুক্তির নব অরুণোদয় !'

*   *

হে বাঙালী, আজ তুমি দুর্দশার চরমে পেঁচেছো।

কোথায় তোমার কুন্‌ৎস্‌ ফন্‌ ড্যার রোজেন ? যে তোমাকে আশার বাণী শোনাবে ? ॥

খোশগল্প

যখন তখন লোকে বলে, 'গল্প বলো।'

এ বাবদে স্বর্গত ক্ষিতিমোহন সেনের একাধিক রসাল উত্তর আছে। তিনি বাঙাল উচ্চারণে তখন বলতেন, 'ঘর লেপ্যা মুছ্যা, আতুড় ঘর বানাইয়া, মা ষষ্ঠীর গেছে বাচ্যা বাচলেই তো আর বাচ্যা পয়দা হয় না। নয় মাস দশ দিন সময় লাগে।' অর্থাৎ গল্পের সময় এলে তবে গল্প বেরবে।

ইহুদিদের গল্প এর চেয়ে একটু ভালো। কেন, সে-কথা পরে বলছি।

এক ভালো কথক রাব্বী (ইহুদিদের পণ্ডিত পুরুৎ) অনেকখানি হাঁটার পর অতিথি হয়ে উঠেছেন এক পরিচিত চাষার বাড়িতে। চাষা-বৌ জানতো, রাব্বী গল্প করতে ভারি ওস্তাদ। পাদ্য-অর্ঘ্য না দিয়েই আরম্ভ করেছে, 'গল্প বলুন, গল্প বলুন।' ইতিমধ্যে চাষা ভিন গাঁয়ের মেলা থেকে ফিরেছে একটা ছাগী কিনে। চাষা-বৌ সঙ্গে সঙ্গেই গল্পের বায়না বন্ধ করে দুইতে গেছে ছাগীকে—ইহুদি তো ! এক ফোঁটা দুধ বেরল না দেখে চাষা-বৌ বেজার মুখে স্বামীকে শুধালো, 'এ কি ছাগী আনলে গো ?' বিচক্ষণ চাষা হেসে বললে, 'ওটা হেঁটে হেঁটে হয়রান হয়ে গিয়েছে। দানাপানি দাও—দুধ ঠিকই দেবে।' রাব্বী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'সেই কথাই তো হচ্ছে। দানা-পানি না পেলে আমিই বা গল্প বলি কি করে ?'

ক্ষিতিমোহনবাবু ইহুদি ছিলেন না বলে, নিজের সুবিধেটা উত্তরের মারফতে গুছিয়ে নিতে পারেন নি—ইহুদি পারে।

এ গল্পটা মনে রাখবেন। কাজে লাগবে। অন্তত চা-টা পাঁপড়ভাজাটা আসবে নিশ্চয়ই।

সঙ্গে সঙ্গে ইহুদি, স্কটম্যান সাইক্‌ল্‌ চালাতে আরম্ভ করে দেবেন। সে আবার কি ? এসোসিয়েশন অফ আইডিয়াজ, অর্থাৎ এক চিন্তার খেই ধরে অন্য চিন্তা,

সেটা থেকে আবার অন্য চিন্তা, এই রকম করে করে মোকামে পেঁৗছে যাবেন। এখনো বুঝতে পারলেন না ? তবে একটা গল্প দিয়েই বোঝাই।

সেই যে বাঁদর ছেলে কিছুতেই শটকে শিখবে না, এ ছেলে তেমনি পেটুক—যা- কিছু শিখতে দেওয়া হয়, পেঁৗছে যাবেই যাবে মিষ্টি-সন্দেশে। তাকে একং দশং শিখতে দেওয়া হয়েছে। বলছে,

'একং, দশং, শতং, সহস্র, অযুত, লক্ষ্মী, সরস্বতী—'

(মন্তব্য : 'লক্ষ' না বলে বলে ফেলেছে 'লক্ষ্মী' এবং তিনি যখন দেবী তখন তাঁর এসোসিয়েশন অব আইডিয়াজ থেকে চলে গেছে আরেক দেবী সরস্বতীতে ; তার পর বলছে,)

'লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, কার্তিক, অগ্রহায়ণ—'

(মন্তব্য : 'কার্তিক' মাসও বটে, তাই এসোসিয়েশন অব আইডিয়াজে চলে গেল অগ্রহায়ণ পোষে)

অগ্রহায়ণ, পোষ, মাগ, ছেলে-পিলে—'

(মন্তব্য : 'মাঘ'কে আমরা 'মাগ'ই উচ্চারণ করে থাকি। তার থেকে 'ছেলে-পিলে')

'পিলে, জ্বর, শর্দী, কাশী—'

(মন্তব্য : তার থেকে যাবতীয় তীর্থ !—)

'কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, গয়া, পুরী—'

'পুরী, সন্দেশ, রসগোল্লা, মিহিদানা, বোঁদে, খাজা, লেডিকিনি—'

ব্যাস ! পুরী তো খাদ্য, এবং ভালো খাদ্য। অতএব তার এসোসিয়েশনে বাদবাকি উত্তম উত্তম আহারাদি ! পেঁৗছে গেল মোকামে !

এই এসোসিয়েশন অব আইডিয়াজ থেকে গল্পের খেই ধরে নেওয়া যায়।

ইহুদির কথা যখন উঠেছে তখন ইহুদীর কঞ্জুসী, স্কটম্যানের কঞ্জুসী তাবৎ কঞ্জুসীর গল্প আরম্ভ করে দিতে পারেন।

এগুলোকে আবার সাইক্লও বলা হয়। এটা হল কঞ্জুসীর সাইক্ল—অর্থাৎ দুনিয়ার যত রকম হাড়কিপটেমির গল্প এই সাইক্লে ঢুকে যাবে। ঠিক সেই রকম আরো গণ্ডায় গণ্ডায় সাইক্ল আছে। স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর উপর অত্যাচার, স্ত্রীকে লুকিয়ে পরস্ত্রীর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি, ট্রেন লেটের সাইক্ল, ডেলি পেসেঞ্জারের সাইক্ল, চালাকির সাইক্ল—

চালাকির সাইক্ল এ দেশে গোপালভাঁড় সাইক্লই বলা হয়। অর্থাৎ চালাকির যে কোনো গল্প আপনি গোপালের নামে চালিয়ে যেতে পারেন, কেউ কিছু বলবে না। ইংরেজীতে এটাকে 'ব্ল্যাংকেট' 'অমনিবাস' গল্পগুষ্টিও বলা চলে।

গোপালের অপজিট নাম্বার অর্থাৎ তাঁরই মত চালাক ছোকরা প্রায় সব দেশেই আছে। প্রাচীন অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির রাজদরবারে ছিলেন মিকশ, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর অধিকাংশ গল্পই সমাজে কল্কে পায় না, ভিয়েনার ভাষায় গেজেলশাফ্টফেইষ নয় (সমাজে অচল)। সেদিক দিয়েও গোপালের সঙ্গে

তাঁর গলাগলি।

কিন্তু এ সংসারে বুদ্ধিমানের চেয়ে আহাম্মুখের সংখ্যাই বেশী, তাই আহাম্মুখীর সাইক্লই পাবেন দুনিয়ার সর্বত্র। অধুনা কেন্দ্রের এক প্রাক্তন মন্ত্রীকে কেন্দ্র করে একটি বিরাট সাইক্ল তৈরি হয়েছে এবং হচ্ছে। এঁর জুড়ি ভিয়েনাতে গ্রাফ ফন্ ববে, পশ্চিম ভারতে শেখ চিল্লি (আমার ঠিক মনে নেই, তবে বোধ করি শ্রীযুক্তা সীতা শান্তার হিন্দুস্থানী উপকথাতে এঁর গল্প আছে), এবং সুইটজারল্যান্ডে পল্ডি।

পল্ডির গল্প অফুরন্ত। আমি গত দশ বছর ধরে একখানা সুইস্ পত্রিকার গ্রাহক। প্রতি সপ্তাহে পল্ডি নিয়ে একটি ব্যঙ্গচিত্র থাকে। চলেছে তো চলেছে। এখনো তার শেষ নেই। কখনো যে হবে মনে হয় না।

কিছুমাত্র না ভেবে গোটা কয়েক বলি ঃ—

বন্ধু ঃ জানো পল্ডি অক্সিজেন ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। ১৭৭০-এ ওটা আবিষ্কৃত হয়।

পল্ডি ঃ তার আগে মানুষ বাঁচতো কি করে?

কিংবা

পল্ডি ঃ (আমেরিকান টুরিস্টকে এক কাস্ল্ দেখিয়ে) ঐ ওখানে আমার জন্ম হয়। আপনার জন্ম হয় কোন্খানে?

টুরিস্ট ঃ হাসপাতালে।

পল্ডি ঃ সর্বনাশ! কি হয়েছিল আপনার?

কিংবা

বাড়িউলী ঃ সে কি মিঃ পল্ডি? দশ টাকার মণিঅর্ডার, আর আপনি দিলেন পাঁচ টাকা বক্শিশ!

পল্ডি ঃ হেঁ, হেঁ, ঐ তো বোঝো না আর কিপ্টেমি করো। ঘন ঘন আসবে যে!

কিংবা

পল্ডি ঘোড়ার রেসে গিয়ে শুধোচ্ছেন ঃ ঘোড়াগুলো এরকম পাগল পারা ছুটছে কেন?

বন্ধু ঃ কি আশ্চর্য, পল্ডি তাও জানো না! যেটা ফার্স্ট হবে সেটা প্রাইজ পাবে যে।

পল্ডি ঃ তা হলে অন্যগুলো ছুটছে কেন?

এর থেকে আপনি রেসের গল্পের মাধ্যমে কুট্টি সাইক্লে অনায়াসে চলে যেতে পারেন। যেমন,

কুট্টি রেসে গিয়ে বেট্ করেছে এক অতি নিকৃষ্ট ঘোড়া। এসেছে সর্বশেষে। তার এক বন্ধু—আরেক কুট্টি—ঠাট্টা করে বললে, 'কি ঘোড়া (উচ্চারণ অবশ্য 'গোরা'—আমি বোঝার সুবিধের জন্য সেগুলো বাদ দিয়েই লিখছি) লাগাইলায় মিয়া! আইলো সক্কলের পিছনে?'

কুট্টি দমবার পাত্র নয়। বললে, 'কন্ কি কত্তা! দ্যাখলেন না, যেন বাঘের

বাচ্চা—বেবাকগুলিরে খ্যাদাইয়া লইয়া গেল !'

কুট্টি সম্প্রদায়ের সঙ্গে পূব-পশ্চিম উভয় বাঙলার রসিকমণ্ডলীই একদা সুপরিচিত ছিলেন। নবীনদের জানাই, এরা ঢাকা শহরের খানদানী গাড়োয়ান-গোষ্ঠী। মোগল সৈন্যবাহিনীর শেষ ঘোড়সওয়ার বা ক্যাভালরি। রিক্‌শার অভিসম্পাতে এরা অধুনা লুপ্তপ্রায়। বহুদেশ ভ্রমণ করার পর আমি নির্ভয়ে বলতে পারি, অশিক্ষিত জনের ভিতর এদের মত witty (হাজির-জবাব এবং সুরসিক বাক্-চতুর) নাগরিক আমি হিল্লী-দিল্লী কলোন-বুলোন কোথাও দেখি নি।

এই নিন একটি ছোট ঘটনা। প্রথম পশ্চিম বাঙলার 'সংস্করণ'টি দিচ্ছি। এক পয়সার তেল কিনে ঘরে এনে বুড়ী দেখে তাতে একটা মরা মাছি। দোকানীকে গিয়ে অনুযোগ জানাতে সে বললে, 'এক পয়সার তেলে কি তুমি মরা হাতি আশা করেছিলে !' এর রাশান সংস্করণটি আরো একটু কাঁচা। এক কপেকের (প্রায় এক পয়সা) রুটি কিনে এনে ছিঁড়ে দেখে এক বুড়ী তাতে এক টুকরো ন্যাকড়া। দোকানীকে অনুযোগ করাতে সে বললে, 'এক কপেকের রুটির ভিতর কি তুমি আস্ত একখানা হীরের টুকরো আশা করেছিলে ?' এর ইংরিজী 'সংস্করণে' আছে, এক ইংরেজ রমণী এক শিলিঙে এক জোড়া মোজা কিনে এনে বাড়িতে দেখেন তাতে একটি ল্যাডার (অর্থাৎ মই—মোজার একটি টানা সুতো ছিঁড়ে গেলে পড়েনের সুতো একটার পর একটা যেন মইয়ের এক একটা ধাপ-কাঠির মত দেখায় বলে ওর নাম ল্যাডার)। দোকানীকে অনুযোগ জানাতে সে বললে, 'এক শিলিঙের মোজাতে কি আপনি, ম্যাডাম, একখানা রাজকীয় মার্বেল স্টেয়ারকেস্ আশা করেছিলেন !'

এবারে সর্বশেষ শুনুন কুট্টি সংস্করণ। সে একখানা ঝুরঝুরে বাড়ি ভাড়া দিয়েছে পুলিসের এসাইকে। বর্ষাকালে কুট্টিকে ডেকে নিয়ে তিনি দেখাচ্ছেন, এখানে জল ঝরছে, ওখানে জল পড়ছে—জল জল সর্বত্র জল পড়ছে। পুলিসের লোক বলে কুট্টি সাহস করে কোনো মন্তব্য বা টিপ্পনী কাটতে পারছে না যদিও প্রতি মুহূর্তেই মাথায় খেলছে বিস্তর। শেষটায় না থাকতে পেরে বেরবার সময় বললে, 'ভাড়া তো দ্যান্ কুল্লে পাঁচটি টাকা। পানি পড়বে না তো কি শরবৎ পড়বে ?'

কুট্টি সম্বন্ধে আমি দীর্ঘতর আলোচনা অন্যত্র করেছি—পাঠক সেটি পড়ে দেখতে পারেন। আমার শোক-পরিতাপের অন্ত নেই যে, এ সম্প্রদায় প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে চললো। আমি জানি এদের উইট্, এদের রিপোর্ট লেখাতে ও ছাপাতে সঠিক প্রকাশ করা যায় না ; কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ-সম্প্রদায় সম্পূর্ণ লোপ পাওয়ার পূর্বে পূব বাঙলার কোনো দরদীজন যদি এদের গল্পগুলির একটি সংগ্রহ প্রকাশ করেন, তবে তিনি উভয় বাঙলার রসিকমণ্ডলীর ধন্যবাদার্হ হবেন।

* * *

পাঠক ভাববেন না, আমি মিষ্ট মিষ্ট গল্প বলার জন্য এ প্রবন্ধের অবতারণা

করেছি। আদপেই না। তাহলে আমি অনেক উত্তম উত্তম গল্প পেশ করতুম। এখানে গল্পের সাইক্‌ল্‌ ও এসোসিয়েশন অব আইডিয়াজ, কিংবা বলতে পারেন এসোসিয়েশন অব স্টরিজ বোঝাবার জন্য যে সব গল্পের প্রয়োজন আমি তারই কাঁচা পাকা সব কিছু মিশিয়ে কয়েকটি গল্প নিবেদন করেছি মাত্র। (এবং সত্য বলতে কি, আসলে কোনো গল্পই কাঁচা কিংবা পাকা, নিরেস কিংবা সরেস নয়। মোকা-মাফিক জুৎসই করে যদি তাগ-মাফিক গল্প বলতে পারেন, তবে অত্যন্ত কাঁচা গল্পও শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তহরণ করতে সমর্থ হবে, পক্ষান্তরে তথাকথিত শ্রেষ্ঠ গল্পও যদি হঠাৎ বেমক্কা বলে বসেন, তবে রসিকমণ্ডলী বিরক্ত হয়ে ভুরু কুঁচকাবেন।)

গল্প বলার আর্ট, গল্প লেখার আর্টেরই মত বিধিদত্ত প্রতিভা ও সাধনা সহযোগে শিখতে হয়—এবং দুই আর্টই ভিন্ন। অতি সামান্য, সাধারণ গল্পও পূজনীয় স্বর্গত ক্ষিতিমোহন অতি সুন্দর রূপ দিয়ে প্রকাশ করতে পারতেন—অথচ তাঁর লেখা রচনায় সে-জিনিসের কোনো আভাসই পাবেন না; পক্ষান্তরে শ্রদ্ধেয় স্বর্গত রাজশেখরবাবু লিখে গিয়েছেন বিশ্বসাহিত্যের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ হাসির গল্প, অথচ তিনি বৈঠক-মজলিসে ছিলেন রাশভারী প্রকৃতির। গল্প-বলার সময় কেউ কেউ অভিনয় যোগ করে থাকেন। সুলেখক অবধূত এ বাবদে একটি পয়লা নম্বরী ওস্তাদ। যদি কখনো তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা হয় তবে চন্দননগর চুঁচড়ো অঞ্চলের বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক কি ভাবে নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন তার বর্ণনা দিতে বলবেন। কিন্তু এ প্রবন্ধের গোড়াতে যে সাবধান বাণী দিয়ে আরম্ভ করেছি, সেটি ভুলবেন না। বেমক্কা যখন তখন অনুরোধ করেছেন, কি মরেছেন। অবধূত তেড়ে আসবে। অবধূত কেন, রসিকজন মাত্রই তেড়ে আসে। এই তো সেদিন অবধূত বলছিল, 'জানেন, মাস কয়েক পূর্বে ১১০ ডিগ্রীর গরমে যখন ঘণ্টাতিনেক আইঢাই করার পর সবে চোখে অল্প একটু তন্দ্রা লেগে আসছে এমন সময় পাড়া সচকিত করে টেলিগ্রাফ পিয়ন ঢঙের সজোরে কড়া নাড়া। দরজা খুলতে দেখি দুই অচেনা ভদ্রলোক। কড়া-রুদ্দুর, রাস্তার ধুলোমুলোয় জড়িয়ে চেহারা পর্যন্ত ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। কি ব্যাপার? 'আজ্ঞে, আদালতে শুনতে পেলুম, আমাদের মোকদ্দমা উঠতে এখনও ঘণ্টা-দুয়েক বাকি, তাই আপনার সঙ্গে দু'দণ্ড রসালাপ করতে এলুম।' আমি অবধূতকে শুধোলুম, 'আপনি কি করলেন?' অবধূত উদাস নয়নে ধানক্ষেতের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। আমি বেশি ঘ্যাঁটালুম না। কারণ মনে পড়ে গেল, মোটামুটি ঐ সময়ে চুঁচড়োর জোড়াঘাটের কাছে, সদর রাস্তার উপর দুটো লাশ পাওয়া যায়। খুনী ফেরার। এখনো ব্যাপারটা হিল্যে হয় নি।

ভালো করে গল্প বলতে হলে আরো মেলা জিনিস শিখতে হয়—এবং সেগুলো শেখানো যায় না। আমি স্বয়ং তো আদৌ কোনো প্রকারের গল্প বলতে পারি নে। প্লট ভুলে যাই, কি দিয়ে আরম্ভ করেছিলুম, কি দিয়ে শেষ করবো তার খেই হারিয়ে ফেলি, গল্প আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই খিল খিল করে হাসতে আরম্ভ করি, 'ঐয়্যা, কি বলছিলুম' প্রতি দু' সেকেণ্ড অন্তর অন্তর

আসে, ইতিমধ্যে কেউ হাই তুললে তাকে তেড়ে যাই, শেষটায় সভাস্থ কেউ দয়াপরবশ হয়ে গল্পটা শেষ করে দেন—কারণ যে গল্পটি আমি আরম্ভ করেছিলুম সেটি মজলিসে ইতিপূর্বে, আমারই মুখে, ছেঁড়া-ছেঁড়া ভাবে অন্তত পঞ্চাশ-বার শুনে, জোড়া-তাড়া দিয়ে খাড়া করতে পেরেছে। তদুপরি আমার জিভে ক্রনিক বাত, আমি তোৎলা এবং সামনের দুপাটিতে আটটি দাঁত নেই।

তাহলে শুধোবেন, তবে তুমি এ প্রবন্ধ লিখছ কেন? উত্তর অতি সরল। ফেল করা স্টুডেন্ট ভালো প্রাইভেট ট্যুটর হয়। আমি গল্প বলার আর্টটা শেখার বিস্তর কস্ত করে ফেল মেরেছি বলে এখন এর ট্যুটরি লাইনে আমিই সম্রাট।

* * *

কিন্তু এ আর্ট এখন মৃতপ্রায়; কারণটা বুঝিয়ে বলি।

পূর্বেই নিবেদন করেছি, গল্পের কাঁচা পাকা কিছুই নেই, মোকা-মাফিক বলতে পারা, এবং বলার ধরনের উপর ঐ জিনিস সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

এ তত্ত্বটি সব চেয়ে ভালো করে জানেন, বিশ্ব-গল্পকথক সম্প্রদায় (ওয়ার্ল্ড স্টরি-টেলারস্ ফেডারেশন)। মার্কিন মুল্লুকে প্রতি বৎসর এঁদের অধিবেশন হয় এবং পৃথিবীর সর্বকোণ থেকে ডাঙর ডাঙর সদস্যরা সেখানে জমায়েত হন। এঁরা বিলক্ষণ জানেন, গল্প মোকা-মাফিক এবং কায়দা-মাফিক বলতে হয়। চীনের ম্যান্ডারিন সদস্য যে গল্পটি বলতে যাচ্ছেন সেটি হয়তো সব চেয়ে ভালো বলতে পারেন বঙ্গো-ইন-কঙ্গোর লুসাবুবু। ওদিকে পৃথিবীর তাবৎ সরেস গল্পই এঁরা জানেন। কি হবে, চীনার কাঁচা ভাষায় পাকা দাড়িওয়ালা ঐ গল্প তিনশ তেষট্টি বারের মত শুনে। অতএব এঁরা একজোটে বসে পৃথিবীর সব কটি সুন্দর সুন্দর গল্প জড়ো করে তাতে নম্বর বসিয়ে দিয়েছেন। যেমন মনে করুন, কুট্টির সেই পানি পড়ার বদলে শরবৎ পড়ার গল্পটার নম্বর ১৯৮।

এখন সে অধিবেশনে গল্প বলার পরিস্থিতিটা কি রূপ?

যেমন মনে করুন, কথার কথা বলছি, সদস্যরা অধিবেশনের গুরু গুরু কর্মভার সমাধান করে ব্যানকুয়েট খেতে বসেছেন। 'ব্যানকুয়েট' বললুম বটে, আসলে অতি সস্তা লাঞ্চ—'লাঞ্ছনা'ও বলতে পারেন, একদম দা'ঠাকুরের পাইস হোটেল মেলের। এক মেম্বর ডালে পেলেন মরা মাছি। অমনি তাঁর মনে পড়ে গেল, সেই বুড়ীর এক পয়সার তেলে মরা মাছি, কিংবা 'পানি না পড়ে শরবৎ পড়বে নাকি' গল্প। তিনি তখন গল্পটি না বলে শুধু গম্ভীর কণ্ঠে বললেন নম্বর '১৯৮'!

সঙ্গে সঙ্গেই হো হো অট্টহাস্য। একজন হাসতে হাসতে কাৎ হয়ে পাশের জনের পাঁজরে খোঁচা দিয়ে বার বার বলছেন, 'শুনলে? শুনলে? কি রকম একখানা খাসগল্প ছাড়লে!' আরেকজনের পেটে খিল ধরে গিয়েছে—তাকে ম্যাসাজ করতে শুরু করেছেন আরেক সদস্য।

* * *

অতএব নিবেদন, এ সব গল্প শিখে আর লাভ কি? এদেশেও কালে বিশ্ব-গল্পকথক-সম্প্রদায়ের ব্রাঞ্চ-আপিস বসবে, সব গল্পের কপালে কপালে নম্বর

পড়বে, আপনি আমি কোনো-কিছু বলার পূর্বেই কেউ না কেউ নম্বর হেঁকে যাবে। তারপর নীলাম। ৯৮ নম্বর বলতে না বলতেই এসোসিয়েশন অব আইডিয়াজে কারো মনে পড়ে যাবে অন্য গল্প তিনি হাঁকবেন ২৭২। তারপর ৩১৮—আর সঙ্গে সঙ্গে হাসির হররা, রগড়ের গড়িয়াহাট—আপনি আমি তখন কোথায়?

হ্যাঁ, অবশ্য, যতদিন না ব্রাঞ্চ-আপিস কায়েম হয় ততদিন অবশ্য এইসব টুটা-ফুটা গল্প দিয়ে থ্রি-লেগেড রেস রান করতে পারেন। কিংবা দুষ্ট ছেলেকে শাসন করার জন্য গুরুমশাই যে রকম বলতেন, 'যতক্ষণ বেত না আসে ততক্ষণ কানমলা চলুক।'

বাই দি উয়ে—এ গল্পটাও কাজে লাগে। নেমন্তন্ন বাড়িতে চপ কাটলেট না আসা পর্যন্ত লুচি ছোলার ডাল খেতে খেতে বলতে পারেন, 'যতক্ষণ বেত না আসে ততক্ষণ কানমলা চলুক।'

শের্শে লা ফাম্

(Cherchez la femme)

খুন, রাহাজানি, চুরি, ডাকাতি যাই হোক না কেন, এক ফরাসী হাকিম বিচারের সময় অসহিষ্ণু হয়ে বার বার শুধোতেন, 'মেয়েটা কোথায়? শের্শে লা ফাম্—মেয়েটাকে খোঁজো!' তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, দুনিয়ার কুল্লে খুন-খারাবীর পিছনে কোনো না কোনো রমণী ঘাপটি মেরে বসে আছে। আসামী, ফরিয়াদী, সাক্ষী, কোনো না কোনো রূপে তাকে আদালতে সশরীরে উপস্থিত (হাবেয়াস কর্পুস) না করা পর্যন্ত মোকদ্দমার কোনো সুরাহা হবে না। অতএব শের্শে লা ফাম্—মেয়েটাকে খোঁজো! একবার ইনশিওরেন্স মোকদ্দমা ছিল কোনো চিমনি-পরিদর্শককে নিয়ে। একশ ফুট উঁচু থেকে সে পড়ে যায়। তার খেসারতি মঞ্জুর হয়ে গেলে উকিল শুধালেন, 'কই, হুজুর, এ মোকদ্দমায় আপনার শের্শে লা ফাম্ তো খাটলো না?' হুজুর দমবার পাত্র নয়। সোল্লাসে বললেন, 'খোঁজো, খোঁজো, পাবে।' হবি তো হ—তাই! তাল্লাশীতে বেরল, সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় সে হঠাৎ নিচের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়েছিল এক সুন্দরী রমণীর দিকে—পড়ে মরল পা হড়কে!

* * *

আকাশবাণী সম্বন্ধে নানাপ্রকারের ফরিয়াদ প্রায়ই শোনা যায়। আল্লার দুনিয়া সম্বন্ধেই যখন হামেহাল নালিশ লেগেই আছে তখন এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।

গুণীজ্ঞানীরা বলেন, প্রাচ্যের মানুষ অন্তর্মুখী—প্রতীচ্যের বহির্মুখী। এত বড় তত্ত্বকথার পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো কথা বলার হক্ক আমার নেই। তবে একটা জিনিস আমি স্বচক্ষে লক্ষ্য করেছি—গরমের দেশের লোক বারান্দা রক

তেঁতুলতলায় দিন কাটায় আর পশ্চিমের লোক বাড়ির ভিতর।

আমরা আপিস-আদালত কলেজ-কারখানা থেকে বেরিয়েই একটুখানি হাওয়া খেয়ে গা-টা জুড়িয়ে নিতে চাই। 'ঈভনিং ওয়ক' 'মর্নিং ওয়ক' সমাসগুলো ইংরিজী ভাষাতে সত্যিই চালু আছে কিনা, কিংবা ইংরেজ এদেশে এসে নির্মাণ করেছে, জানি নে, কিন্তু ও দুটোর রেওয়াজ শীতের দেশে যে বেশী নেই সে-কথা বিলক্ষণ জানি। আমরা তাই ময়দানে, গঙ্গার পারে হাওয়া-টাওয়া খেয়ে বাড়ি ফিরি। নিতান্ত শীতকালের কয়েকটি দিন ছাড়া কখনো ঘরের ভিতর ঢুকতে চাই নে। রকে বসে রাস্তায় লোকজনের আনাগোনা দেখি। পক্ষান্তরে শীতের দেশের লোক ছুটি পাওয়া মাত্রই ছুট দেয় বাড়ির দিকে। আপিসে-দপ্তরে আগুনের ব্যবস্থা উত্তম নয়—ওদিকে গৃহিণী বসবার ঘরে গনগনে আগুন জ্বালিয়ে রেখেছেন। পড়িমরি হয়ে বাড়ি পেঁছেই সে পা দুটি আগুনের দিকে বাড়িয়ে বসে যায় আরাম চেয়ারে, খুলে দেয় রেডিয়ো। আমাদের রকে রেডিয়ো থাকে না, বৈঠকখানাতেও কমই—কারণ বাড়ির মেয়েছেলেরা ওটা নিয়ে হরবকতই নাড়াচাড়া করে। তাই ওটা থাকে অন্দরমহলেই।

আমাদের যাত্রাগান, কবির লড়াই সবই খোলামেলায়। এ যুগের প্রধান আমোদ ফুটবল ও ক্রিকেট খেলাতে। নিতান্ত সিনেমাটা ঘরের ভিতর। কিন্তু সিনেমাও চেষ্টা করে সেটা ভুলিয়ে দিতে। ঘড়ি ঘড়ি মাঠ-ময়দান, নদীপুকুর, পাহাড়-সমুদ্র দেখায় বলে খানিকক্ষণ পরেই ভুলে যাই যে ঘরের ভিতর বন্ধ রয়েছি। তবু পাছে অন্য কোনো খোলামেলার আমোদের সন্ধান পেয়ে আমরা পালিয়ে যাই তাই সিনেমাওলারা ওটাকে এ্যারকণ্ডিশন করে মাঠ-রক-বৈঠকখানার চেয়েও আরামদায়ক করে রাখে। কারণ ইয়োরোপে যে মুহূর্তে ঘরে বসে টেলিভিশনের সাহায্যে সিনেমায় আনন্দ পাওয়া গেল সঙ্গে সঙ্গে গাহকের অভাবে আট থেকে দশ আনা পরিমাণ সিনেমা উঠে গেল।

আমাদের দেশের মেয়েরা হুট্ করে রাস্তায় বেরতে পারে না, সিনেমা চায়ের দোকানে যেতে পারে না, তাই রেডিয়োটা ওদের কাছে এক বিধিদত্ত সওগাত। কর্তা-বাচ্চারা আপিস ইস্কুল চলে যাওয়ার পর তাঁরা নেয়ে খেয়ে চুল ঝুলিয়ে দিয়ে মুচড়ে দেন রেডিয়োর কানটা পাশের বাড়ির রেডিয়োটা যে গাঁক্‌গাঁক্ করে আপনার বিরক্তির উৎপাদন করে তার প্রধান কারণ ও-বাড়ির বৌমা এ-ঘর ও-ঘরে যেখানেই কাজ করুন না কেন সেটা যাতে করে সর্বত্রই শুনতে পান তার জন্য ওটাকে চড়া সুরে বেঁধে রেখেছেন),—মহিলা-মহল তো আছেই, তারপর সিংহল বেতারের বিস্তর ফিল্মী-গানা যেগুলো বউমা, দিদিমণি সিনেমাতে একবার শুনেছিলেন, এখন বার বার শুনে শুনে কণ্ঠস্থ করতে চান।

পুরুষরা এদেশে যদিও বা বেতার শোনে তবে সেটা খেয়েদেয়ে খবরটা শোনার জন্যে। এবং তার পরই আকাশবাণী আরম্ভ করে দেয় উচ্চাঙ্গ শাস্ত্রীয় কালোয়াতী সঙ্গীত। ওসবে কার, মশাই, ইনট্রেস্ট? কিংবা হয়তো তখন ইংরিজীতে টক শুনলেন, মন্ত্রী মশাই বক্তৃতা দিচ্ছেন, জাপানের ড্রাই-ফার্মিং কিংবা জানজিবারের কোপারেটিভ সিসটেম সম্বন্ধে।

মেয়েরাই যে আকাশবাণীর—অন্তত কলকাতা কেন্দ্রের—মালিক সে কথা যদি বিশ্বাস করতে রাজী না হন তবে আমি আর একটি মোক্ষম প্রমাণ কাগজে কলমে পেশ করতে পারি।

'বেতার-জগৎ' পাক্ষিক পত্রিকাখানির বিজ্ঞাপনগুলো মন দিয়ে পড়লে দেখতে পাবেন তাতে আছে, গয়না, প্রসাধন দ্রব্য, ভেজিটেবল ওয়েল, শাড়ি, কাপড়কাচা সাবান। টাইয়ের বিজ্ঞাপন একটি আছে—সেখানে এক তরুণী টাইটি পরিয়ে দিচ্ছেন তাঁর প্রিয়জনকে, অর্থাৎ বিজ্ঞাপনটি মেয়েদের জন্যই। কিন্তু সব চেয়ে মারাত্মক কথা – বইয়ের বিজ্ঞাপন প্রায় নেই। এবং এই 'দেশ' পত্রিকাতে সেই জিনিসেরই ছয়লাপ। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, 'বেতার জগৎ' মেয়েদের কাগজ, আর 'দেশ' প্রধানত পুরুষের কাগজ।

ইয়োরোপের উচ্চতম শিক্ষিত লোকেরা বেতার শোনেন এবং তাঁদেরই চাপে বিবিসিকে একটি 'হাইব্রাও'—উন্নাসিক—থার্ড প্রোগ্রাম আরম্ভ করতে হল। কলকাতা আকাশবাণীর সব চেয়ে পপুলার প্রোগ্রাম—ড্রামা। সে সময় বেতার-যন্ত্রের চতুর্দিকে কারা ভিড় জমায় পাঠক সেটি লক্ষ্য করে দেখবেন। আমার নিজের ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস 'আকাশবাণী কলকাতা' যদি প্রতিদিন এক ঘণ্টা ব্যাপী ড্রামা চালায় (এবং তাতে যথা পরিমিত রোদন, আক্রোশ, হুংকার এবং ন্যাকামি থাকে) তবে লাইসেন্সের সংখ্যা আরো বেড়ে যাবে।

এটা আমি কিছু মস্করা করে বলছি নে। আমার মূল বক্তব্য এই, যখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মেয়েরা কলকাতার রেডিয়ো-কেন্দ্র দখল করে নিয়েছেন (এবং তাঁরা মোটামুটি সন্তুষ্টই আছেন, কারণ খবরের কাগজে কোনো নিন্দাসূচক চিঠি তাঁদের তরফ থেকে আমি বড় একটা দেখি নি) আর পুরুষরা ঐ জিনিসটে অবহেলা করে যাচ্ছেন (যাঁরা ওস্তাদী গাওনা গান, তাঁদের চেলাচামুণ্ডা এবং শ্রোতৃসংখ্যা এতই কম যে 'অনুরোধের আসরে' ওস্তাদী গান গাইবার অনুরোধ আসে অতিশয়, সাতিশয়, কালেকস্মিনে) তখন কেন বৃথা হাবি-জাবি নানা প্রোগ্রাম দিয়ে 'রুচি মার্জিত করা,' অর্ধলুপ্ত ধামার ধ্রুপদ পুনর্জীবিত করার চেষ্টা, স্বরাজ লাভের পর জেলে কত গ্রেন কুইনিন দেওয়ার ফলে কত পার্সেণ্ট ম্যালেরিয়া রুগী কমলো সেইটি সাড়ম্বরে শোনানো, ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান—কম্যুনিটি প্রজেক্ট ড্রাইফার্মিং ইন জনুজিবার (কিংবা জাপানও হতে পারে, আমার মনে নেই) শোনানো ?

তাই বলে কি কলকাতা বেতার কেন্দ্র শুধু রান্নার রেসিপি আর স্যাঁৎসেতে নাটক শোনাবে ? আদপেই না। এবং সেইটে নিবেদন করার জন্যই আমি এতক্ষণ অবতরণিকা করছিলুম।

এদেশের মেয়েরা শিক্ষায় পুরুষদের বেমানানসই পিছনে। সাহিত্য সঙ্গীত নাট্যে তাঁদের রুচি সম্বন্ধে অনেকেই অনেক রকম অপ্রিয় মন্তব্য করে থাকেন—এমন কি মেয়েরাও। কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করবো না—মেয়েরা আত্মোন্নতি চায় না।

তাই আমার বক্তব্য, ঐ 'মহিলা মহল' ব্যাপারটি ব্যাপকতর করুন। বেলাদি

ইন্দিরাদি উত্তম ব্রডকাস্টার, কিন্তু প্ল্যান করুন, কি করে দেশের সব চেয়ে গুণী-জ্ঞানীকে—স্ত্রী এবং পুরুষ দুইই—এ কাজে লাগানো যায়। অবকাশরঞ্জন আনন্দদানকে আস্তে আস্তে উচ্চতর পর্যায়ে তোলা, শিক্ষার প্রসার, সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণ, বৃহত্তর জগতের সঙ্গে পরিচয় দান—ইত্যাদি তাবৎ ব্যাপার, অনেকখানি—সময় নিয়ে—এমন কি বেতারের বারো আনা সময় নিয়ে—ধীরে ধীরে উচ্চতর পর্যায়ে তুলুন, এবং সর্বক্ষণ ঐ মেয়েদের চোখের সামনে রেখে। পাঠক এবং শ্রোতা যোগাড় করা বড় কঠিন। এস্থলে যখন পেয়ে গেছেন তখন এই বেতারের মাধ্যমে দিন না একটা আপ্রাণ চেষ্টা এঁদের আরো আনন্দ দিতে—এঁদের নারীত্ব মনুষ্যত্ব সফলতর পূর্ণতম করতে। জাপানী চাষ শুনিয়ে পুরুষকে তো পাচ্ছেনই না, শেষটায় মেয়েদের হারাবেন। ইতো ভ্রষ্ট ততো নষ্ট।

পুরুষদের জন্য অন্য একটা চ্যানেল (ওয়েভ লেনথ্) নিয়ে নূতন একটা চেষ্টা দিতে পারেন। ফল অবশ্য কিছু হবে না। কারণটা গোড়াতেই নিবেদন করেছি।

লেডি চ্যাটারলি

নিমিত্ত মাত্র। আসলে প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে, সাহিত্যে শ্লীল অশ্লীলে কি কোনো পার্থক্য নেই? যদি থাকে তবে তার বিভাগ করবো কোন্ সংজ্ঞা দিয়ে? আর যদি করা যায় তবে পুলিসের সাহায্য নিয়ে অশ্লীল জিনিস বন্ধ করবো, না অন্য কোনো পন্থা আছে?

এ প্রশ্ন আজ এই প্রথম ওঠে নি সেকথা সবাই জানেন, এবং এ কথাও নিশ্চয়ই জানি যে, এ প্রশ্নের চূড়ান্ত সমাধান কোনো দিনই হবে না—যতদিন না মানুষ গল্প লিখবে, ছবি আঁকবে, একে অন্যের সঙ্গে কথা কইবে, এমন কি অঙ্গভঙ্গী করবে (অধুনা কলকাতার এক বিখ্যাত হোটেলে কোনো নর্তকীর নৃত্য দেখে পুলিস বলে, এগুলো অশ্লীল, নর্তকী ও ম্যানেজার বলেন, ওগুলো উচ্চাঙ্গের নৃত্যকলা, আদালত বলেন, মহিলাটির নৃত্যের পিছনে বহু বৎসরের একনিষ্ঠ কঠোর সাধনা রয়েছে এবং সে নৃত্য কলাসৃষ্টি)।

লেডি চ্যাটারলি খালাস পেলে পর বিলেতে এ নিয়ে প্রচুর তোলপাড় হয়—অবশ্য স্মরণ রাখা ভালো যে, মার্কিন আদালতে লেডি চ্যাটারলির লয়ার ('লাভার' না লিখে আমেরিকা 'লয়ার'—'উকিল' লিখেছিল) পূর্বেই জিতে গিয়েছিলেন, এবং গত ত্রিশ বৎসর বইখানা কন্টিনেন্টের সর্বত্রই ইংরিজীতেও অনুবাদে পাওয়া যেত। আরো মনে রাখা ভালো যে, এসব বাবদে ইংরেজ সব চেয়ে পর্দা পিসি মার্কা, অর্থাৎ গোঁড়া। একটা উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে। লেঁও ব্লুম্ যখন ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী তখন তিনি একখানা বই বের করেন, নাম 'মারিয়াজ'—বিবাহ! ভুদেববাবুর 'পারিবারিক প্রবন্ধ' গোছের বই—যদিও

ব্লুমের মূল বক্তব্য ভূদেববাবুর ঠিক উল্টো। নানা কথার ভিতর তাঁর অন্যতম মূল বক্তব্য ছিল, যুবক-যুবতীরা বিয়ের পূর্বে পরিপূর্ণ যৌন অভিজ্ঞতা করে নিয়ে বিয়ে করলেই ভালো—তা হলে একে অন্যকে বোঝার সুবিধে হয়, বিবাহবিচ্ছেদের আশংকা কমে যায় (!)। ইংরেজ সমালোচক তখন বলেছিলেন যে, ইংলণ্ডের কোনো প্রধানমন্ত্রী যদি আপন নামে এরকম একখানা বই প্রকাশ করতেন তবে পরের দিনই তাঁকে মন্ত্রিত্বে ইস্তফা দিতে হত।

তাই চ্যাটারলি জিতে যাওয়ার পর একাধিক প্রাচীনপন্থী বললেন,

(১) এ বইয়ে যে 'নৈতিক আদর্শ'' প্রচারিত হয়েছে সেটা ইংরেজের যুগ যুগ সঞ্চিত নৈতিক ঐতিহ্যকে চ্যালেঞ্জ করেছে ও লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ নরনারী এতে করে মর্মাহত হবেন।

(২) এ বইয়ের অনুকরণে যদি বিলাতের যুবক-যুবতীরা তাদের যৌন আদর্শ নির্মাণ করে তবে দেশের সর্বনাশ হবে।

(৩) এ বই আইনে জিতে যাওয়ায় এর অনুকরণে—লাই পেয়ে—অশ্লীল তর ও জঘন্যতর বই বাজার ছেয়ে ফেলবে।

(৪) এই বই জিতে যাওয়ায় সাহিত্যিক তথা সাধারণ নাগরিক আইন-রাজ্যে অনেকখানি এগিয়ে গেল বটে, কিন্তু নীতির রাজ্যে সে পিছিয়ে গেল। দা-কাটা বাঙলায় ;—আইনের জয়, ধর্মের পরাজয়।

নবীনরা বললেন,

(১) স্ত্রী-পুরুষের যে সম্পর্ক গোঁড়া ইংলণ্ড বড় জোর বরদাস্ত করে নিত, লরেন্স যার সত্য মূল্য দেখিয়ে (কোনো কোনো সমালোচক 'স্পিরিচুয়াল' পর্যন্ত বলেছেন) সমাজের অশেষ কল্যাণ করেছেন তারই জয় হয়েছে।

(২) বাজারে যখন ভূরি ভূরি অশ্লীল, পাপ, পৈশাচিক উত্তেজনাদায়ক বই অবাধে বিক্রি হচ্ছে তখন লরেন্সের এই উত্তম সাহিত্য নির্বাসিত করা শুধু যে আহাম্মুকী তা নয়, অন্যায়ও বটে।

(৩) শক্তিশালী সত্যোন্মোচনকারী লেখকদের এখন আর পুলিসের ভয়ে বিশেষ বিশেষ বিষয় বর্জন করতে হবে না।

(৪) অশ্লীল কদর্য পুস্তক কামকে কর্দমের স্তরে টেনে নামিয়ে আনে। লরেন্সের বই তাকে সম্মানের উচ্চাসনে বসিয়েছে।

সংস্কৃত অলংকারে শ্লীল অশ্লীল নিয়ে কিছুটা আলোচনা আছে। কিন্তু আইন করে কোনো বই বন্ধ করে দেবার প্রস্তাব কেউ করেছেন বলে শুনি নি। হয়তো তার প্রধান কারণ এই যে, বুদ্ধের আমলেই সংস্কৃত সাধারণ জনের পক্ষে কঠিন ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে ; সে ভাষা আয়ত্ত করতে করতে মানুষের এতখানি বয়েস হয়ে যেত যে, তখন কি পড়ছে না পড়ছে তার দায়িত্ব তারই হাতে ছেড়ে দেওয়া যেত।

কিন্তু আরবীতে লেখা আরব্যোপন্যাস? সে তো অল্প আরবী শেখার পরেই পড়া যায়। বাজারে যে আরব্যরজনী ইংরিজী বা বাঙলাতে পাওয়া যায় সেগুলোর কথা হচ্ছে না ; তথাকথিত 'আপত্তিজনক' অংশগুলো সেগুলোতে

নির্মমভাবে কেটে দেওয়া হয়। বারো না আট ভলুমে বার্টনের যে ইংরিজী অনুবাদ আছে তাতেও তিনি হিমসিম খেয়ে 'আনট্রেন্সলেটেবল' বলে বেশ কিছু বাদ দিয়েছেন। এমন কি বাইরুতে ক্যাথলিক পাদ্রীদের দ্বারা প্রকাশিত আরবী আরব্যরজনীতেও বিস্তর জিনিস বাদ পড়েছে। এবং আরবভূমিতে ছেলেবুড়ো সবাই পড়ে সেই সম্পূর্ণ সংস্করণ—কেউ কিছু বলে না।

ফার্সীতে লেখা জালালউদ্দীন রুমীর মস্নবী গ্রন্থের উল্লেখ করতে পেলে আমি বড় আনন্দ বোধ করি। এ বই ইরানের গীতা এবং এতে হেন পাপাচার নাই যার বিশদ বিবরণ নেওয়া হয় নি। ইংরিজীতে অনুবাদ করার সময় অনুবাদক সেসব অংশ লাতিনে অনুবাদ করেছেন। (সংস্কৃত শিখতে শিখতে মানুষ যে রকম হয়ে যায় এবং ধরে নেওয়া হয় তার শাস্ত্রাধিকার হয়েছে—লাতিনের বেলাও তাই।) অথচ ইরান ভূমিতে আট বছরের ছেলেও যদি মস্নবী নিয়ে বসে, পিতা এবং গুরু তাতে আনন্দিত হন।

বাংলা গদ্য আরম্ভ হয় 'পরিষ্কার হাত' নিয়ে এবং উনিশ শতকের শেষের দিকে দেখতে পাই, ভারতচন্দ্র অশ্লীল আখ্যা পাচ্ছেন। ভিক্টোরিয় যুগের ছুঁৎবাই তখন আমাদের পেয়ে বসেছে। এরই মাঝখানে রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ 'চৌর-পঞ্চাশিকা' গীতিকাব্যের উদ্দেশে গেয়ে উঠলেন,

'ওগো সুন্দর চোর
বিদ্যা তোমার কোন্ সন্ধ্যার
কনক-চাঁপার ডোর।' (১৩০৪ সন) কল্পনা।

ভারতচন্দ্র 'বিদ্যাসুন্দর' রচেছেন এই চৌরপঞ্চাশিকার প্লট নিয়েই এবং এ কাব্যের বাংলা অনুবাদও করেছেন। এরকম অনবদ্য খণ্ডকাব্য সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল।

শ্লীল অশ্লীলে নিশ্চয়ই পার্থক্য আছে। সৎসঙ্গ অসৎসঙ্গে নিশ্চয়ই পার্থক্য আছে। এমন কি কাব্য অশ্লীল না হয়েও অনুচিত হতে পারে। অনেকে মনে করেন, স্বয়ং কালিদাস এ পার্থক্য জানতেন না। কুমারসম্ভবের অষ্টম সর্গ সম্বন্ধে কবিরাজ রাজেন্দ্রভূষণ বলেছেন, 'জগন্মাতা ও জগৎপিতার এই সম্ভোগ একটা বিরাট ব্যাপার হইলেও, পড়িতে লজ্জা জন্মে। তাই আলঙ্কারিকগণ এই অষ্টম সর্গের উপর "অত্যন্তমনুচিতম্" বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন। তবে চিত্রের জন্য যেমন চিত্র দেখা, তেমনই এই হরপার্বতীর বিহার পাঠ, ইহাতে দেখিবার ও শিখিবার বস্তু প্রচুর। কবির এই আলেখ্য দেখিয়া চমকাইলে, মহামায়ার "বিপরীতরতাতুরাম্" এই ধ্যানাংশেরও পরিহাস করিতে হয় এবং আদিকবি বাল্মীকি-কৃত গঙ্গাস্তবের "তুঙ্গস্তনাস্ফালিতম্" প্রভৃতি অংশ বাদ দিতে হয়। কাব্য কাব্য, তাহা উপনিষদের চক্ষে দেখিতে যাঁহারা চান বা দেখেন, তাঁহাদের উহা না পড়াই ভালো।'*

* পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, কালিদাসের গ্রন্থাবলী, ২য় ভাগ, বসুমতী, পৃঃ ১৫৫ পাদটীকা।

কালিদাসের তুলনায় বামন লরেন্স্ নাকি কামকে স্বর্গীয় (স্পিরিচুয়াল) স্তরে তুলতে চেয়েছিলেন ! তা তিনি চেয়েছিলেন কিনা, পেরেছিলেন কিনা সে কথা আমি জানি না,—তবে আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস, কালিদাস চেয়েছিলেন এবং তাই জগন্মাতা ও জগৎপিতার দাম্পত্যপ্রেম বর্ণনা করেছিলেন। কারণ কামকে যদি সত্যই পূতপবিত্র করতে হয়, তবে সর্ব দেশকালপাত্রে পূজ্য পিতামাতা এবং তাঁদেরও পূজ্য জগন্মাতা ও জগৎপিতার দাম্পত্য প্রেমের চেয়েও উচ্চতর লোক তো আর কোথাও নেই।

স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, কোনো কোনো আলঙ্কারিকের মতে তিনি সক্ষম হন নি, কারণ তাঁরা বলেছেন, কালিদাস 'অত্যন্ত অনুচিত' কর্ম করেছেন। পড়ার সময় 'লজ্জাবোধ' সত্ত্বেও বিদ্যাভূষণ কিন্তু তাঁর নিন্দা করেন নি। পড়ার সময় আমার সংকোচ বোধ হয় নি, কারণ প্রতি ছত্রে আমি পতীক্ষায় ছিলাম, কালিদাস আমাকে তাঁর অতুলনীয় কাব্যসৃষ্টি প্রসাদাৎ সর্বশেষে আমাকে এমন দ্যোলোকে উড্ডীয়মান করে দেবেন যেখানে কামের পার্থিব মলিনতার কথা আমার স্মরণেই থাকবে না। হয়তো আমি অক্ষম, কিংবা কালিদাসের সে শক্তি ছিল না। ব্যাসের যে সে শক্তি ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কাম সম্বন্ধে ব্যাসের মনে কোন দ্বন্দ্ব ছিল না বলে তিনি নির্লিপ্ত ভাবে তার বর্ণনা দিয়েছেন।

রচনা দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। সংক্ষেপে নিবেদন,

ইয়োরোপের অনুকরণে যদি আমরা অত্যধিক শুচিবায়ুগ্রস্ত হয়ে কামকে সাহিত্য থেকে তাড়িয়ে দিই তবে নিছক নির্জলা অশ্লীল রচনা উত্তরোত্তর বেড়েই যাবে। আর্টের কাজ তাকে আর পাঁচটা বিষয়বস্তুর মত আপন কাব্যলোকে রসস্বরূপে প্রকাশ করা। কালিদাস করেছেন, চণ্ড় কবি করেছেন, বিদ্যাপতি ভারতচন্দ্র করেছেন।

অশ্লীল সাহিত্য তাড়াবার জন্য পুলিস সেন্সর বোর্ড বিশেষ কিছু করতে পারবে না। মার্কিন মুল্লুকে তারা আপন হার মেনে নিয়েছে। বিশেষত সাহিত্যিকরাই যখন শ্লীল অশ্লীলে ঠিক কোথায় পার্থক্য সে জিনিসটা সংজ্ঞা এবং বর্ণনা দিয়ে ভালো করে বুঝিয়ে বলতে পারেন নি।

সংস্কৃত আরবী ফার্সীতে নিছক অশ্লীল রচনা অতি অল্প। তার কারণ গুণীজ্ঞানীর রুচিবোধ ও সাধারণ জনের শুভবুদ্ধি ও কাণ্ডজ্ঞান-বোধ (কমন সেন্স)। নির্ভর করতে হবে প্রধানত এই দুটি জিনিসের উপর।

পাঠক হয়তো শুধোবেন, চ্যাটার্লি বইখানা আমি পড়েছি কিনা ? পড়েছি। যৌবনে প্যারিসে কাফেতে বসে পড়েছি। ভালো লাগে নি। লরেন্স্ যা প্রমাণ করতে চেয়েছেন সে অতি সাধারণ জিনিস। এবং ঐ অতি সাধারণ স্বতঃসিদ্ধ জিনিস প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি দেগেছেন বিরাট বিরাট কামান। এবং কামানগুলো পরিষ্কার নয়।

হুঁসিয়ার

আমরা মফঃস্বলের লোক। কলকাতা শহরে কি হয়, না হয়, আমাদের পক্ষে খবর রাখা সম্ভবপর নয়। বয়েসও হয়েছে; ছেলেছোকরাদের মতিগতি, কর্ম-কারবারের সঠিক খবরও কানে এসে পেঁছোয় না।

মাস কয়েক পূর্বে পূর্ব-পাকিস্তানে বেড়াতে গিয়েছিলুম। সেখানকার এক কাগজে পড়লুম ইউনেস্কো নাকি কিছুদিন পূর্বে পৃথিবীর বড় বড় শহরে মদ্যপান কোন্ বছরে বাড়ছে, তার একটা জরিপ নেন এবং ফলে একটি মারাত্মক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। সেটি এই ঃ—পৃথিবীর বড় বড় শহরের যে কটাতে মদ্যপান ভয়ংকররূপে (ইন এ্যান এলামিং ডিগ্রী) বেড়ে যাচ্ছে, কলকাতা তার মধ্যে প্রধান স্থান ধরেন !

বাঙালী সব দিক দিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু অন্তত একটা দিকে এগিয়ে যাচ্ছে শুনে আমার উল্লাস বোধ করা উচিত ছিল, কিন্তু বহু চেষ্টা করেও পারলুম না। ঢাকার এক আমওলাকে যখন বলেছিলুম যে তার আম বড় 'ছোডো' 'ছোডো', তখন সে এক গাল হেসে দেমাক করে বলেছিল, 'কিন্তু, কত্তা, আডি (আঁঠি) গুলাইন্ বরো আছে !'[১] সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে যাবার আম ছোট, আর মদ্যপানের 'আডিডা' 'মোডা' এ-চিন্তাটা রসাল নয়—কোনো অর্থেই !

ফেরার মুখে কলকাতাতে ডেকে পাঠালুম দ্বিজেনকে। কলেজের ছোকরা —অর্থাৎ কলেজ যাওয়ার নাম করে কফি হৌস যায়—বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ; শুনেছি এদের মাথায় পেরেক পুঁতলে ইস্ক্রু হয়ে বেরোয়—মগজে এ্যাসন প্যাঁচ; তদুপরি আমার শাগরেদ্ !

তাকে আমার অধুনালব্ধ মাদকীয় জ্ঞানটুকু জানিয়ে বললুম, 'আমি তো জানতুম, ইণ্ডিয়া শনৈঃ শনৈঃ ড্রাই হয়ে যাচ্ছে—এ আবার কি নূতন কথা শুনি ?'

গুরুকে জ্ঞানদান করতে পারলে শিষ্য মাত্রই পুলকানুভব করে—কাবেল, নাবালক যাই হোক না কেন। ক্ষণতরেও চিন্তা না করে বললে, 'মদ্যপান কলকাতাতে কারা বাড়াচ্ছে জানি নে, তবে একটা কথা ঠিক ঠিক বলতে পারি, কলেজের ছোকরাদের ভিতর ও জিনিসটা ভয়ংকর বেড়ে যাচ্ছে; সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 'ভয়ংকর' 'ভীষণ' 'দারুণ' কথাগুলো আমরা না ভেবেই

১ এর একটি ইংরিজী পাঠান্তর আছে। বিখ্যাত 'রম্য-রচনা (বেল্‌লেৎর্) লেখক চার্লস ল্যাম্ (এদেশে প্রধানত 'শেক্সপিয়ারের গল্প' প্রণেতা রূপে পরিচিত) প্রায়ই দফতরে দেরিতে পেঁছতেন। একদা বড়বাবু তাঁকে হাতে-নাতে ধরে ফেলে বললেন, 'মিঃ ল্যাম্, আমার কাছে খবর পেঁচেছে, আপনি আপিসে দেরিতে আসেন।' ল্যাম্ নাকি ঢাকার আমওলার মতই এক গাল হেসে বলেছিলেন, 'কিন্তু এ খবর কি পেঁচেছে যে, আমি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাই ?'

বলে থাকি, কিন্তু ইউনেস্কো যখন 'এলার্মিং' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, তখন সঠিক 'ভয়ঙ্করই' বলতে চেয়েছেন। দ্বিজেন সেটা কনফার্ম করলে। (কলেজের ছোকরারা আমার উপর সদয় থাকুন ; এটা আমার মত নয়, দ্বিজেনের।')[২]

বললে, 'এবারে যে মধুপুরে আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারি নি, তার কারণ আমি আদপেই মধুপুর যাই নি—যখন শুনলুম, ইয়াররা যাচ্ছেন বিয়ার পার্টি করতে সেখানে। ওদের চাপ ঠেকানো আমার পক্ষে অসম্ভব হত —এদিকে মায়ের পা ছুঁয়ে কিরে কেটেছি মদ খাব না।'

শ্রাদ্ধ তাহলে অনেকখানি গড়িয়েছে।

সে সন্ধ্যায় আমাদের বাড়িতে দেখি, মেলাই কলেজের ছেলেমেয়ে এসেছে। আমার ভাতিজীর ইয়ারী-বক্সিনী, বন্ধুবান্ধব। মাঝে-মধ্যে ওদের সঙ্গে বসলে ওরা খুশীই হয়।

ইচ্ছে করেই ফুর্তি-ফার্তির দিকে কথার নল চালালুম। চোর ধরা পড়লো। অর্থাৎ মদ্যপানের কথা উঠল।

সেদিন আমার বিস্তর জ্ঞান সঞ্চয় হয়েছিল। একের অজ্ঞতা যে অন্যের জ্ঞান সঞ্চয়ের হেতু হতে পারে, সে-কথা এতদিন জানতুম না।

এক 'গুণী' হঠাৎ বলে উঠলো, বিয়ারে আবার নেশা হয়!'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'বলিস্ কি রে? ইয়োরোপের শতকরা ৮৫ জন লোক যখন নেশা করতে চায়, তখন তো বিয়ারই খায়। ওয়াইন খায় কটা লোক, স্পিরিট—'

বাধা দিয়ে বললে, 'বিয়ারও তো ওয়াইন।'

আমি আরো আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'তওবা, তওবা! শুনলে গুনাহ হয়। ওয়াইনে কত পার্সেন্টেজ এলকহল, আর বিয়ারে কত পার্সেন্ট, স্পিরিটে—'

'এলকহল?'

'বাই উয়েইট অথবা ভলুম। দিশীটা—মানে ভদ্‌কার খুড়তুতো ভাই—তার হিসেব আন্ডার প্রুফ, অভার প্রুফে। লিক্যোর—'

'মানে লিকার?'

আমি প্রায় বাক্যহারা। 'লিক্যোর তো আবিষ্কার করেছে প্রধানতঃ ক্যাথলিক সাধুসন্ন্যাসীরা (মঙ্ক)। বেনিডিক্‌টিন—'

'সাধুসন্তরা আবিষ্কার করলেন মদ!'

পূর্বেই বলেছি, সেদিন আমার বিস্তর জ্ঞানার্জন হয়েছিল। ওদের অজ্ঞতা থেকে।

তারো পূর্বে বলা উচিত ছিল যে, আমি মদ্যপানবিরোধী। তবে সরকার যে পদ্ধতিতে এগোচ্ছেন, তার সঙ্গে আমার মতের মিল হল না। সে কথা আরেকদিন হবে।

ঔষধার্থে ডাক্তাররা কখনো কখনো মদ দিয়ে থাকেন। ব্র্যাণ্ডির চেয়েও শ্যাম্পেন গিলিয়ে দিলে ভিরমি কাটে তাড়াতাড়ি। কিন্তু ব্র্যাণ্ডির চেয়ে শ্যাম্পেনে খরচ বেশী পড়ে বলে কণ্টিনেণ্টের ভালো ভালো নার্সিং হোম ছাড়া অন্য কোথাও বড় একটা ব্যবহার করা হয় না। কৃত্রিম ক্ষুধা উদ্রেকের জন্যও শেরি বা পোর্ট ব্যবহৃত হয়। এ সব ব্যাপার সম্বন্ধে আমার হাঁ, না, কিছু বলার নেই। তবে শীতের দেশে ব্র্যাণ্ডি না খেয়ে গুড়ের সঙ্গে কালো কফি খেলেও শরীর গরম হয়—এবং প্রতিক্রিয়াও কম। বহু ধর্মপ্রাণ হিন্দু এবং মুসলমান কবরেজ-হেকিমের আদেশ সত্ত্বেও সুরাপান করেন নি—ভয়ংকর একটা কিছু ক্ষতি হতেও শুনি নি।

মোদ্দা কথায় ফেরা যাক।

বিয়ারে নেশা হয় না, এর মত মারাত্মক ভুল আর কিছুই নেই। পূর্বেই বলেছি, ইয়োরোপে শতকরা ৮৫ জন লোক বিয়ার খেয়েই নেশা করে মাতলামো করে।

'ওয়াইন' বলতে যদিও সাধারণতঃ মাদক দ্রব্য বোঝায়, তবু এর আসল অর্থ, আঙুর পচিয়ে যে সুরা প্রস্তুত হয়, তারই নাম ওয়াইন। 'দ্রাক্ষাসব'-এর শব্দে শব্দে অনুবাদ (অবশ্য বাজারে যে-সব তথাকথিত দ্রাক্ষাসব আছে, তার ভিতর কি বস্তু আছে আমার জানা নেই)।

বিয়ারে ৪ থেকে ৬ পারসেণ্ট এলকহল থাকে—বাদবাকি প্রায় সবটাই জল। নেশা হয় এই এলকহলেই। ওয়াইনের পার্সেণ্টেজ দশ থেকে পনেরো। তবু বিয়ার খেয়েই নেশা করে বেশী লোক। ওয়াইন খান গুণীরা—এবং ওয়াইন মানুষকে চিন্তাশীলও অপেক্ষাকৃত বিমর্ষ করে তোলে।

পৃথিবীতে সব চেয়ে ভালো ওয়াইন হয় ফ্রান্সে। বোর্দো (Bordeaux) অঞ্চলে তৈরী হাল্কা লাল রঙের এই ওয়াইনকে ইংরিজীতে বলা হয় ক্ল্যারেট। তাছাড়া আছে বার্গেণ্ডি এবং শ্যাম্পেন অঞ্চলের বিখ্যাত ওয়াইন। এসব ওয়াইন আঙুর পচিয়ে ফার্মেণ্ট করার সময় যদি কার্বন ডায়োক্সাইড বেরিয়ে না যেতে দেওয়া হয়, তবে সেটাকে 'সফেন' ওয়াইন (এফারভেসেণ্ট) বলা হয়। বোর্দো বার্গেণ্ডি বুজবুজ করে না—শ্যাম্পেন করে। শ্যাম্পেন খোলা মাত্রই তাই তার কর্ক লাফ দিয়ে ছাতে ওঠে, এবং তার বুদ্বুদ পেটের ইনটেস্টিনাল ওয়ালে খোঁচা মারে বলে নেশা হয় তাড়াতাড়ি (ভিরমি কাটে তড়িঘড়ি) এবং স্টিল (অর্থাৎ 'ফেনাহীন') ওয়াইনের মত কিছুটা বিমর্ষ-বিমর্ষ সে তো করেই না, উল্টে চিত্তাকাশে উড়ুক্কু উড়ুক্কু ভাবটা হয় তাড়াতাড়ি।

জর্মনির বিখ্যাত ওয়াইন রাইন (ইংরিজীতে হক্) ও মোজেল। রাইন ওয়াইনের শ্যাম্পেনও হয়, তবে তাকে বলা হয় জেক্ট। শ্যাম্পেনের তুলনায় জেক্ট্ নিকৃষ্ট। অথচ এই জেক্ট্ ফ্রান্সে বেচে হের ফন্ রিবেনট্রপ প্রচুর পয়সা কামান। হিটলার নিজে মদ খেতেন না, কিন্তু যখন শুনলেন রিবেনট্রপ শ্যাম্পেনের দেশে ওঁচা জেক্ট্ বিক্রি করতে পেরেছেন, তখন বিমোহিত হয়ে বললেন, 'যে ব্যক্তি জেক্টের মত রদ্দি মাল ফ্রান্সে বেচতে পারে, সে পয়লা নম্বরী সেলস্ম্যান। একে আমার চাই—এ আমার আইডিয়াজ ইংলণ্ডে বেচতে

পারবে।' সবাই জানেন, ইনি পরে হিটলারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী হয়েছিলেন ও সর্বশেষে ন্যুরনবের্গে ফাঁসীকাঠে ঝুলেছিলেন।

হাঙ্গেরির বিখ্যাত ওয়াইন টকাই ও ইতালির কিয়ান্তি।

কাশ্মীরের আঙুর দিয়ে ভালো ওয়াইন হওয়ার কথা। তাই তৈরী করে চীন, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকায় চালান দেওয়ার আমি পক্ষপাতী। অবশ্য ওরা যদি কখনো ড্রাই হতে চায়, তবে অন্য কথা।

আপেল ফার্মেণ্ট করে হয় সাইডার, মধু ফার্মেণ্ট করে হয় মীড (সংস্কৃত 'মধু' থেকে মধ্বী, গ্রীকে মেথু মানে মদ, জর্মনে মেট্—সব শব্দই সংস্কৃত মধু থেকে)। আমের রস ফার্মেণ্ট করে মদ খেতেন বিখ্যাত কবি গালিব। আনারস ও কালোজাম পচিয়েও নাকি ভালো ওয়াইন হয়। সাঁওতাল, আদিবাসী ও বিস্তর পার্বত্য জাতি ভাত পচিয়ে বিয়ার বানিয়ে খায়; কিন্তু ফার্মেণ্ট করার ভালো কায়দা জানে না বলে তিন সাড়ে তিনের চেয়ে বেশী এলকহল পচাইয়ে তুলতে পারে না। এদের সর্বস্ব, এদের জরু-গোরু এমন কি এদের সরল আত্মার পর্যন্ত সর্বনাশ করেছে ইংরেজ—চোলাই (ডেসটিলড্) 'ধান্যেশ্বরী' কালীমার্কা এদের মধ্যে চালু করে। এই 'ধান্যেশ্বরী' একেবারে সম্পূর্ণ বন্ধ না করা পর্যন্ত এদের উদ্ধার নেই। আমার কথা বিশ্বাস না হলে উড়িষ্যার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নবকৃষ্ণ চৌধুরীকে শুধোবেন। ইনি আদিবাসীদের জন্য বহু আত্মত্যাগ করেছেন এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত অনুগুল আশ্রমে আদিবাসীরাও শিক্ষালাভ করে। ইনিও আদিবাসীদের ড্রাই করতে চান; কিন্তু সরকার যেভাবে এগোচ্ছেন তার সঙ্গে তাঁর একদম মতের মিল হয় না।

জাপানীদের সাকে মদ ভাতেরই পচাই, চীনাদের পচাই, 'চু'-য়ে কিঞ্চিৎ ভুট্টা মেশানো থাকে।

ভারতবর্ষের তাড়ি (ফার্মেন্টেড খেজুর কিংবা তালের রস) বস্তুটিকে ওয়াইন পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে। পৃথিবীর তাবৎ মাদক দ্রব্যের ভিতর এই বস্তুটিই অনিষ্ট করে সব চেয়ে কম। একমাত্র এই জিনিসটাই সম্পূর্ণ বন্ধ করা উচিত কি না সে বিষয়ে আমার মনে কিঞ্চিৎ সন্দেহ আছে। তবে খাঁটি তাড়ি সচরাচর পাওয়া যায় না; লোভী শুঁড়িরা তাড়ির সঙ্গে দিশী চোলাই মদ (ধান্যেশ্বরী) মিশিয়ে তার এলকহল বাড়িয়ে বিক্রি করে। মাতালরাও সচরাচর নির্বোধ হয়।

* * *

এতক্ষণ পচাই অর্থাৎ ফার্মেণ্টেড বস্তু সম্বন্ধে বর্ণনা হচ্ছিল। এবারে ডেসটিলড বা চোলাই। চোলাই বস্তুর নাম স্পিরিটস্—যদিও শব্দটি সর্ব-প্রকার মাদক দ্রব্যের জন্যও ব্যবহার হয়।

আঙুর পচিয়ে ওয়াইন বানিয়ে সেটাকে বক যন্ত্র দিয়ে চোলাই করলে হয় ব্র্যাণ্ডি—অর্থাৎ ব্র্যাণ্ড করা বা পোড়ানো হয়েছে। একমাত্র ফরাসী দেশের ব্র্যাণ্ডিকেই (তাও সব ব্র্যাণ্ডি নয়) বলা হয় কন্যাক্ (Cognac)। মল্ট-বার্লিকে পচিয়ে হয় বিয়ার; সেটাকে চোলাই করলে হয় হুইস্কি। তাড়ি চোলাই করলে

হয় এরেক (শব্দটা আসলে 'আরক' কিন্তু আরক অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হয় বলেই এস্থলে 'এরেক' প্রয়োগ করা হল)। সেটাকে দুবার চোলাই করে খেতেন বদ্ধ মাতাল বাদশা জাহাঙ্গীর। এরেকে ষাট পার্সেন্ট এলকহল হয়—ডবল ডেসটিল করলে আশী পর্যন্ত ওঠার কথা। সেইটে খেতেন নির্জলা! আখের রস ফার্মেন্ট করার পর চোলাই করলে হয় 'রাম্'। সংস্কৃতে 'গৌড়ী'—গুড় থেকে হয় বলে। জামেকার রাম্ বিশ্ববিখ্যাত। কিন্তু ভারতীয় রাম্ যদি সযত্নে তৈরী করে চালান দেওয়া হয়, তবে জামেকাকে ঘায়েল করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। আমি ফরেন এক্সচেঞ্জ বাড়ানোর স্বপ্ন দেখি বলেই এই প্রস্তাবটি পাড়লুম। রামে এত লাভ যে তারই ফলে চিনির কারবারীরা চিনি সস্তা দরে দিতে পারে। জাভার চিনি একদা এই কারণেই সস্তা ছিল। জিন তৈরি হয় শস্য দিয়ে এবং পরে জেনিপার জামের সঙ্গে মেশানো হয়। খুশবাইটা ঐ জেনিপার থেকে আসে।

এসব চোলাই করা স্পিরিটসে ৩৫ থেকে আরম্ভ করে ৮০ ভাগ এলকহল থাকে। হুইস্কি ব্র্যাণ্ডির চেয়ে রামে এলকহল বেশী, তার চেয়ে বেশী ডবল-চোলাই এরেকে এবং সব চেয়ে বেশী আবস্যাঁতে! তাই ওটাকে 'সবুজ শয়তান' বলা হয়। শুনেছি, ও জিনিস বছর তিনেক নিয়মিত ভাবে খেলে মানুষ হয় পাগল হয়ে যায়, না হয় আত্মহত্যা করে, কিংবা ডেলিরিয়াম ট্রেমেনসে মারা যায়। ইয়োরোপের একাধিক দেশে এটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছে।[৩]

সচরাচর মানুষ এসব স্পিরিটস নির্জলা খায় না। হুইস্কিতে যে পরিমাণ সোডা বা জল মেশানো হয় তাতে করে তার এলকহল ডাইলুটেড হয়ে শক্তি কমে যায়। ফলে এক গেলাস হুইস্কি-সোডাতে যতখানি নেশা হয়, দু গেলাস বিয়ারে তাই হয়। অবশ্য নির্জলা হুইস্কি যতখানি খেয়ে স্বাস্থ্যের সর্বনাশ করা যায়, বিয়ারে প্রচুর জল আছে বলে ততখানি পেটে ধরে না বলে খাওয়া যায় না। তবে অবশ্য কেউ যদি অতি ধীরে ধীরে হুইস্কি খায় এবং অন্যজন সাততাড়াতাড়ি বিয়ার খায় তবে দ্বিতীয় জনেরই নেশা হবে আগে।

অতএব বিয়ারে নেশা হয় না, এ বড় মারাত্মক ভুল ধারণা। ভুবনবিখ্যাত মুনিক-বিয়ারে তো আছে কুল্লে তিন, সাড়ে তিন পারসেন্ট এলকহল। যারা রাস্তায় মাতলামো করে, তারা তো ঐ খেয়েই করে[৪]

এদেশে আরেকটা বিপদ আছে। আঙুর সহজে পাওয়া যায় না বলে আমাদের অনেক ব্র্যাণ্ডিতেই আছে ডাইলুটেড এলকহল এবং তার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে ব্র্যাণ্ডির সিনথেটিক সেন্ট—অর্থাৎ আঙুরের রস এতে নেই। অনেক সরল লোক ফ্লু-সর্দি সারাবার জন্যে, কিংবা দুর্বল রোগীর ক্ষুধা বাড়াবার জন্য

---

৩ আবস্যাঁতের শোচনীয় পরিণাম সম্বন্ধে একটি ফরাসী গল্পের অনুবাদ করেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরে, নাম 'সবুজ শয়তান'। বসুমতী গ্রন্থাবলী।

৪ আশ্চর্যের বিষয়, ইয়োরোপের সব শহরের মধ্যে মুনিকই সব চেয়ে বেশী দুধ খায়। আমাদের গডাডরের মত।

এই 'ব্র্যান্ডি' খাইয়ে রোগীর ইষ্টের পরিবর্তে অনিষ্ট ডেকে আনেন। এ-বিষয়ে সকলেরই সাবধান হওয়া উচিত—বিশেষ করে যে সব লোক নিজে নিজের বা আত্মীয়জনের ডাক্তারী করেন।

ফ্রান্সে অত্যধিক মদ্যপান এমনি সমস্যাতে এসে দাঁড়িয়েছে যে, তার একটা প্রতিবিধান করা বড়ই প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। কিন্তু কেউই সাহস করে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতেপারছেন না। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মাঁদেজ-ফ্রাঁস চেষ্টা করেছিলেন ; অনেকে বলেন প্রধানমন্ত্রিত্ব হারান তিনি প্রধানত এবং গুহ্যত এই কারণে। আমেরিকা ও নরওয়েও চেষ্টা করেছিল, সফল হয় নি। রাজা যদিও আইনের বাইরে তবু নরওয়ের রাজা একদিন দুঃখ করে বলেছিলেন, 'দেখা যাচ্ছে, মদ না-খাওয়ার আইন একমাত্র আমিই মানি—আর সবাই তো শুনি বে-আইনি খেয়ে যাচ্ছে।'

বৈদিক, বৌদ্ধ ও গুপ্ত যুগে মাদকদ্রব্য সেবন করা হত ও জুয়াখেলার রেওয়াজ ছিল। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস শঙ্করাচার্য যে নব হিন্দু ধর্ম প্রচার করলেন সেই সময় থেকেই জনসাধারণে মদ্যপান ও জুয়াখেলা প্রায় বন্ধ হয়ে যায় (অবশ্য মুনিঋষিরা মাদক দ্রব্য ও ব্যসন বারণ করেছিলেন খৃষ্টের পূর্বেই) এবং পাঠান-মোগল যুগে রাজা রাজড়া এবং উজীর-বাদশারাই প্রধানত মাদক দ্রব্য সেবন করেছেন। 'চরমে চরম মিশে' বলেই বোধ হয় অনুন্নত সম্প্রদায় ও আদি-বাসীরাও খেয়েছে। ভারতবর্ষ কোন্ অবিশ্বাস্য অলৌকিক পদ্ধতিতে এদেশে একদা মদ জুয়া প্রায় নির্মূল করতে সক্ষম হয়েছিল সেটা আমি আবিষ্কার করতে পারি নি। পারলে আজ কাজে লাগানো যেত। ইংরেজ আমলে মদ্য-পানের কিছুটা প্রচার হয়—মাইকেল ও শিশির ভাদুড়ী নীলকণ্ঠ হতে পারলে ভালো হত। ঐ সময় ব্রাহ্মসমাজ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গাঁধী যে জীবন ও আদর্শ সামনে ধরেন তার ফলে মদ্যপান প্রসার লাভ করতে পারে নি। শুনলুম, এখন নাকি কোনো কোনো তরুণ 'র‍্যাঁবো-র‍্যাঁবো ভেরেরেন-ভেরেরেন' করে এবং ওদের মত উত্তম (?) কবিতা না লিখে অন্য জিনিসটার সাধনায় সুখ পায় বেশী। ইতিমধ্যে কলকারখানা হওয়ার দরুন চা-বাগানে জুট মিলে মদ ভয়ংকর-মূর্তিতে দেখা দিল। মাঝিমাল্লারা অর্থাৎ সেলাররা মাতলামোর জন্য বিখ্যাত—কিন্তু আশ্চর্য, ভারতীয় ও পাকিস্তানী খালাসীরা মদ খায় না। আমাদের সৈন্যবাহিনীতে যেটুকু মদ্যপান হয় তাও তুচ্ছ। কলকাতার শিখেদের দেখে কেউ যেন না ভাবেন যে, দিল্লী-অমৃতসরের সম্ভ্রান্ত শিখরা মদ খান। ধর্মপ্রাণ শিখ মদ্যপানকে মুসলমানের চেয়েও বেশী ঘৃণা করেন ও বলেন, ইংরেজ শিখকে পল্টনে ঢুকিয়ে মদ খেতে শেখায়।

হিন্দু বৌদ্ধ জৈন ধর্ম ও ইসলামে মদ্যপান নিন্দিত—ইহুদী খৃষ্টান ও জরথুস্ত্রী ধর্মে পরিমিত মদ্যপানকে বরদাস্ত করা হয়েছে। এবং ঐ সব ধর্মের বহু প্রগতিশীল গুণী-জ্ঞানীরা অধুনা মদ্যপানবিরোধী।

মদ্যপান এখনো এদেশে কালমূর্তিতে দেখা দেয় নি, কিন্তু আগের থেকে সাবধান হওয়া ভালো। কিন্তু—পূর্বেই বলেছি—সরকার যে ভাবে এগোচ্ছেন

তার সঙ্গে আমার মত মেলে না। একটা উদাহরণ দি। কয়েক বৎসর পূর্বে দিল্লী শহরে পাব্লিক ড্রিংকিং অর্থাৎ বার রেস্তোরাঁতে মদ খাওয়া বন্ধ করে দেওয়া হল। হুকুম হল, যারা খাবে তারা মদের দোকান থেকে পুরো বোতল কিনে নিয়ে অন্যত্র খাবে। অন্যত্র মানে কোথায়? স্পষ্টতঃ বোঝা গেল বাড়িতে। কারণ পার্কে বা গাছতলায় বসে খাওয়াও বারণ। আমার প্রশ্ন, এটা কি ভালো হল? একদম বন্ধ করে দাও, সে কথা বুঝি; কিন্তু যে দেশে মদ খাওয়াটা নিন্দনীয় বলে ধরা হয়—বিশেষত মা-বোনেরা এর পাপস্পর্শের চিন্তাতেও শিউরে উঠেন—সেখানে ঐ জিনিস বাড়ির ভিতর প্রবর্তন কি উত্তম প্রস্তাব? শুনেছি দিল্লীতে একাধিক পরিবারে এই নিয়ে দাম্পত্য কলহ হয়েছে। খুবই স্বাভাবিক। এতদিন স্বামী বাইরে বাইরে খেয়ে বাড়ি ফিরতেন। ছেলেমেয়েরা অধিকাংশ স্থলেই কিছু জানতো না। এখন দাঁড়ালো অন্য পরিস্থিতি। ওদিকে ব্যাচেলারদের বৈঠকখানাতে যে হট্টগোল আরম্ভ হল তার প্রতিবাদ করতে প্রতিবাসীরা সাহস পেলেন অল্পই—মাতালকে ঘ্যাঁটানো চাট্টিখানি কথা নয়।

দ্বিতীয়ত, যে ব্যক্তি বারে ঢুকে সামান্য একটু খেয়ে ক্লান্তি দূর করে বাড়িতে এসে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়তো, তাকে এখন কিনতে হল পুরো বোতল। প্রলোভনে পড়ে তার মাত্রা বেড়ে গিয়ে শেষটায় তার পক্ষে উচ্ছৃংখল হয়ে যাওয়াটা অসম্ভব নয়।

তৃতীয়ত—এবং এইটেই সব চেয়ে মারাত্মক—বাড়িতে বাপের মদ্যপান ছেলে-মেয়েরা দেখবেই। অনুকরণটাও অস্বাভাবিক নয়। অর্থাৎ নূতন কনভার্ট করার ব্যবস্থা করলুম।

শুনলুম, হালে নাকি কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের উপর চাপ দিয়েছেন যে পাবলিক ড্রিংকিং বন্ধ করো। উত্তরে নাকি পশ্চিমবঙ্গ সরকার উপরের কয়েকটি যুক্তি ব্যবহার করে আপত্তি জানিয়েছেন। ফলে হবে বলে মনে হয় না, কারণ পূর্বেই বলেছি, কেন্দ্রীয় সরকারকে একাধিকবার এ-সব যুক্তি শোনানো হয়েছে।

* * *

মোদ্দা কথা এই ঃ—

যে দেশে মদ্যপান নিন্দনীয়, যে দেশে মদ্যপান জনসাধারণে ব্যাপকভাবে প্রচলিত নয়, সেখানে মদ্যপান একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে, যদি—

যদি নূতন কনভার্ট না হয়, অর্থাৎ তরুণদের যদি মদ্যপানের কোনো সুযোগ, কুযোগ কোনো যোগাযোগ না দেওয়া হয়।

আমাদের সর্বপ্রচেষ্টা ঐ দিকে নিয়োজিত করা উচিত।

পৌষ মেলা

হয়তো মেলাতে বসেই আপনি এ-লেখাটি পড়ছেন। না-হলে মেলাতে আসার সময় এখনো আছে। মোটরে আসতে পারেন, অবশ্য যদি পণ্ডিতজী দুর্গাপুর থেকে শান্তিনিকেতন মোটরে এসে থাকেন। তাঁর আসার সঙ্গে আপনার মোটরে আসার একটা অদৃশ্য সূক্ষ্ম কার্যকারণ সম্পর্ক আছে। তিনি মোটরে এলে অজয় নদের উপরে কজওয়েটি তৈরী হবে, বিকল্পে তিনি যদি হেলিকপ্টারে আসেন—এখানকার ফাপোঁ কালোর দোকানে সেই গুজোরব—তবে উড়িষ্যা ভাষায় 'আপনারো কপালো ভাঙিলো।' সাধে কি আর মাইকেল গেয়েছেন, 'রাজেন্দ্রসঙ্গমে দীন যথা দূর তীর্থ দরশনে'—সে ব্যবস্থার পরিবর্তন এখনো হয় নি।

এসে কিন্তু কোনো লাভ নেই। কারণ 'জেলা বীরভূমের অন্তঃপাতী ডিস্ট্রিক্ট রেজেস্টারী বীরভূম সবরেজেস্টারী বোলপুর পরগণে সেনভূম তালুক সুপুরের অন্তর্গত হুদা বোলপুরে পত্তনীর ডৌল খারিজান মৌজে ভুবননগর ইস্তেক—' ভাববেন না, আমি সুকুমার রায়ের 'কাকালত নামা' থেকে চুরি করছি, ইটি পাবেন শান্তিনিকেতন ট্রস্টডীডের পয়লা পাতায়, সেকথা পরে হবে—সিকিটি ফেলবার জায়গা নেই। কারো না কারো মাথায় আটকে যাবে, কিংবা স্ত্রী-পুরুষের পদতাড়নে যে পুঞ্জীভূত ধূলিস্তর আকাশে-বাতাসে জমে উঠেছে, তারই একটিতে। অন্য মেলার তুলনায় এখানে মেয়েদের সংখ্যা কিছু নগণ্য নয়, অথচ ভাবতে অবাক লাগে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে আশ্রমের মাস্টারদের গৃহিণী-কন্যারা যখন মেলা দেখার প্রথম অনুমতি পেলেন—শ্রীসদনের কল্পনাও তখন কেউ করতে পারেন নি—তখন তাঁদের আনা হয়েছিল গোরুর গাড়িতে করে এবং তাঁরা মেলার প্রত্যন্ত প্রদেশ থেকে, গাড়িতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেলা দেখেছিলেন।

এই মেলাটি বিশ্বভারতীর চেয়ে বয়েসে বড়। এ কথা বলতে হল বিশেষ করে, তার কারণ, যে-বেদীর উপর বসে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উপাসনা করতেন, সে-বেদীর পাশ দিয়ে যাবার সময় গেল মেলার সময় শুনি, এক গুণী আরেক গুণীকে বুঝিয়ে বলছেন, এই বেদীর নিচে রবীন্দ্রনাথের পূত-অস্থি প্রোথিত আছে! আশ্চর্য চিহ্ন দিলুম এহেন তত্ত্ব নিতান্তই আমার কল্পনার বাইরে বলে, কিন্তু আসলে আমার আশ্চর্য হওয়া উচিত নয়। আমাদের কেন্দ্রের এক মন্ত্রী বোম্বাই না কোথায় যেন রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথি উপলক্ষে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেন, 'রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রথম ইংরিজীতে রচনা লিখে বুঝতে পারলেন, মাতৃভাষা বাংলাতেই ফিরে যাওয়া উচিত।' গীতাঞ্জলি অনুবাদ করার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ ইংরাজীতে বিশেষ কিছু লিখেছেন বলে জানতুম না, পরে চিন্তা করে বুঝলুম, মন্ত্রীবর মাইকেল এবং রবীন্দ্রনাথ গুবলেট করে ফেলেছেন! (এবারে আশ্চর্য চিহ্ন যে তাগ মাফিক লেগেছে সে-কথা হর ব্যাকরণবাগীশই কবুল করবেন।) 'শতবার্ষিকী' 'শত বার সিকি' ভেবে এঁরা যদি এখন পঁচিশ টাকা খর্চা করেন তবে আমি আর বিস্মিত হব না। 'পান্‌টা' আমার নয়—এটা স্বয়ং কবিগুরু করে গেছেন।

তা সে-কথা এখন থাক। যে গুণী শান্তিনিকেতন ছাতিমতলার অভিনব ব্যাখ্যা দিচ্ছিল তাকে শুধু মনে মনে বলেছিলুম, 'সাবধানে থাকিস, বাপু! তোকে না শেষটায় কেন্দ্রের মন্ত্রী বানিয়ে দেয়।'

অতএব অতি সংক্ষেপে মেলাটির ইতিহাস বলি। এতে কোনো গবেষণা নেই।

১২৬৮ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরবর্তী-যুগের বিখ্যাত লর্ড সিন্‌হা অব্ রায়পুর পরিবারে নিমন্ত্রিত হয়ে আসেন। রাইপুর জায়গাটি বোলপুর স্টেশনের কাছেই। মহর্ষিদেব একাধিকবার এই রাইপুরে আসা-যাওয়া করেন এবং গমনাগমনের সময় এ অঞ্চলের উঁচু-নিচু খোয়াই-ডাঙার দিগন্ত-বিস্তৃত অর্ধ-মরুভূমিসদৃশ নির্জন ভূমির গাম্ভীর্য তাঁকে আকৃষ্ট করে। আশ্রম স্থাপানর আদিযুগের ঐতিহাসিক ও প্রথম 'আশ্রমধারী' স্বর্গত অঘোর চট্টোপাধ্যায় বলেন,

'রায়পুর যাতায়াত করিবার সময় এই দিগন্ত প্রসারিত প্রান্তরের অপূর্ব গাম্ভীর্যে মহর্ষির চিত্ত আকৃষ্ট হয়। এই বিশাল প্রান্তরে দৃষ্টি অবারিত, অনন্ত আকাশ ব্যতীত দিগলয়ে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। অনন্তস্বরূপের এই উদাত্ত সৌন্দর্যে তাঁহার হৃদয়মন প্লাবিত হইল, উন্মুক্ত আকাশতলে এই নির্জন প্রান্তর তপস্যার একান্ত অনুকূল বলিয়া তাঁহার ধারণা হইল।' (শান্তিনিকেতন আশ্রম, ১৩৩৫-১৩৩৬, পৃ ১১)

চল্লিশ বৎসর পূর্বে আমি যখন এখানে আসি তখনও ঐ দৃশ্য ছিল। এখন এত বেশী গাছপালা বাড়িঘর বাঁধ-বন লাগানো হয়েছে যে সে-দৃশ্যের কল্পনা করা কঠিন। তবে 'হে ভৈরব হে রুদ্র বৈশাখ' ইত্যাদি কবিতায় ও গ্রীষ্ম-বর্ষার বহুশত গানে রবীন্দ্রনাথ সে যুগের শান্তিনিকেতনের বর্ণনা রেখে গেছেন। আর প্রাচীনতম যুগের বর্ণনা আছে 'জীবনস্মৃতি'তে।

১০ই ফাল্গুন, ১২৬৯ সনে মহর্ষি বর্তমানে যেখানে লাইব্রেরি, 'শান্তিনিকেতন বাড়ি,' মন্দির (গ্রাম্য লোকের কাছে এখনও এ-জায়গা 'কাঁচা বাংলা' নামে পরিচিত। এই জায়গাটি, মোট কুড়ি বিঘা জমি বার্ষিক পাঁচ টাকা খাজনায় (!) মৌরসী পাট্টা নেন। ধ্যান-ধারণার জন্য মহর্ষি সর্বপ্রথম এখানে যে বাড়িটি তৈরী করেন সেটি মন্দিরের মুখোমুখি এবং 'শান্তিনিকেতন বাড়ি' নামে পরিচিত।

১২৯০ সনের পর মহর্ষিদেব আর কখনও শান্তিনিকেতনে আসেন নি।

২৬শে ফাল্গুন, ১২৯৪ সনে মহর্ষি শান্তিনিকেতনের বাড়ি-বাগান জমিজমা ধর্মচর্চা, বিদ্যালয় স্থাপন ও বাৎসরিক মেলা প্রবর্তনের জন্য ট্রাস্টডীড করে সর্বসাধারণের উদ্দেশে উৎসর্গ করেন।

৬ঠা কার্তিক, শুক্রবার, ১২৯৫, অপরাহ্ণে আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর্ব সমাধান হয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও স্বর্গত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় আচার্যের কর্ম করেন।

৯ই কার্তিক ১২৯৫ বুধবারে এখনও প্রচলিত প্রতি বুধবারের প্রথম উপাসনা করেন প্রথম আশ্রমধারী অঘোর চট্টোপাধ্যায়।

২২শে অগ্রহায়ণ ১২৯৭ সনে 'মন্দিরে'র ভিত্তিস্থাপনা করেন মহর্ষিদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র দার্শনিকপ্রবর দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়। উপাসনা করেছিলেন তিনি, তাঁর মধ্যম ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ বক্তৃতা করেন এবং সঙ্গীত করেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ। একটি তাম্রফলকে তারিখ প্রভৃতি খোদিত ছিল। সেই ফলক, সেইদিনের 'স্টেটসম্যান' পত্রিকা, সেই মাসের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', পঞ্চরত্ন ও প্রচলিত মুদ্রা ভিত্তিমূলে প্রোথিত হয়। তাম্রফলকে ছিল,

'ওঁ তৎসৎ। ঠক্কুর বংশাবতংসেন পরমমহর্ষিণা শ্রীমতা দেবেন্দ্রনাথ শর্মণা ধর্মোপচয়ার্থং শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠাপিতমিদং ব্রহ্মমন্দিরং। শুভমস্তু ১৮১২ শক, ১৯৪৮ সম্বৎ, ৪৯৯১ কলাব্দ অগ্রহায়ণ ২২, রবিবাসর।' (পূর্বোল্লিখিত পুস্তকে জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পৃ ৯০)

৭ই পৌষ ১২৯৮ তারিখে দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠাপত্র পাঠ করে মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করেন।

তৃতীয় বার্ষিক উৎসবে দরিদ্রদের অন্নদান।

চতুর্থ বার্ষিক উৎসবে সর্বপ্রথম আতশবাজি পোড়ানো হয়।

পঞ্চম বার্ষিক উৎসবে সর্বপ্রথম মেলা ও যাত্রাগানের ব্যবস্থা হয়।

অতএব ১৩০৩ সালে পৌষ-মেলার আরম্ভ।

১৩০৯ সালে ব্রহ্মচর্যাশ্রম বা স্কুল স্থাপনা। ১৩২৫ সালে কলেজ বা বিশ্বভারতীর পত্তন। ১৩২৬ সালে গ্রীষ্মাবকাশের পর অধ্যাপনা আরম্ভ হয়। ১৩২৮/১৯২১-এ বিশ্বভারতীর (য়ুনিভার্সিটি রূপে) উদ্বোধন।

পূর্বে মহর্ষিদেবের যে ট্রাস্টডীডের উল্লেখ করেছি তাতে আছে ঃ—

'ধর্মভাব উদ্দীপনের জন্য ট্রস্টীগণ বর্ষে বর্ষে একটি মেলা বসাইবার উদ্যোগ করিবেন। এই মেলাতে সকল ধর্মসম্প্রদায়ের সাধুপুরুষেরা আসিয়া ধর্মবিচার ও ধর্মালাপ করিতে পারিবেন। এই মেলার উৎসবে কোন প্রকার পৌত্তলিক আরাধনা হইবে না ও কুৎসিত আমোদ-উল্লাস হইতে পারিবে না, মদ্য মাংস ব্যতীত এই মেলায় সর্বপ্রকার দ্রব্যাদি খরিদ-বিক্রয় হইতে পারিবে।'

আমার মনে হয় এই মেলার সময় যদি দেশ-বিদেশের সর্ব ধর্মের গুণী-জ্ঞানী সাধক-পণ্ডিত সম্প্রদায়কে আমন্ত্রণ করে তিনদিনব্যাপী ধর্মালোচনা ধর্মসভার পত্তন (কংগ্রেস অব অল ফেৎস) হয়, তবে আমরা যুগধর্ম অনুসরণ করে মহর্ষিদেবের শুভেচ্ছা সফলতর করতে পারব॥

পঞ্চতন্ত্র

মাভৈঃ!

বাঙালী সব দিক দিয়েই পিছিয়ে যাচ্ছে, এরকম একটা কথা প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। কথাটা ঠিক কিনা, হলপ খেয়ে বলা কঠিন, কারণ দেশ-বিভাগের ফলে তার যে খানিকটে শক্তিক্ষয় হয়েছে সে বিষয়ে তো কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না। পার্লামেণ্টে যদি আপনার সদস্য সংখ্যা কমে যায় তবে সব-কিছুই কাটতে হয় ধার দিয়ে—ভার দিয়ে কাটার সুযোগ আর মোটেই

জোটে না।

দিল্লীতে থাকাকালীন আমি একটি বিষয় নিয়ে কিঞ্চিৎ চিন্তা করেছিলুম। কেন্দ্রে অর্থাৎ ইউ পি এস সি-তে বাঙালী যথেষ্ট চাকরি পাচ্ছে কি না? ঐ অনুষ্ঠানের সদস্য না হয়েও যাঁরা এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাঁদের বিশ্বাস, বাঙালীর এতে যতখানি কৃতকার্য হওয়া উচিত ততখানি সে হচ্ছে না। একদা বিশেষজ্ঞ হিসেবে আমাকেও সেখানে ডাকা হয়েছিল; আমি তখন চোখকান খোলা এবং খাড়া রেখে ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করেছিলুম।

দিল্লীতে এখন যাঁরা বসবাস করেন তাঁরা বিলিতি কিংবা বিলিতি ঘ্যাঁষা পোশাক পরেন ছুরিকাঁটা দিয়ে খাওয়া প্রচুর বাড়িতে চালু হয়েছে, ইংরিজী আদব-কায়দা, বিশেষ করে ইংরিজী এটিকেট এঁদের কাছে আর সম্পূর্ণ অজানা নয়।

ইউ পি এস সি-র তাবৎ মেম্বারই সায়েবীয়ানা পছন্দ করেন, এ-কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু যেখানে যে-আবহাওয়া বিদ্যমান, মানুষ ইচ্ছা-অনিচ্ছায় তার থেকেই প্রাণবায়ু গ্রহণ করে। তাই যদি বাঙালী ছেলের পোশাক ছিমছাম না হয়, চেয়ার টেনে বসার সময় সে যদি শব্দ করে, মোকামাফিক পার্ডন, থ্যাংকু না বলতে পারে এবং সর্বক্ষণ ঘন ঘন পা দোলায় তবে সদস্যরা আপন অজান্তেই যে তার প্রতি কিঞ্চিৎ বিমুখ হয়ে ওঠেন সেটা কিছু আশ্চর্যজনক বস্তু নয়।

কিন্তু আসল বিপদ অন্যত্র। বাঙালী উমেদার ইংরিজীতে ভাব প্রকাশ করতে পারে না। পাঞ্জাবী, হিন্দীভাষী কিংবা মারাঠী যে ইংরিজী বলে সেটা কিছু 'আর্মারি' আর্মারি' করবার মত নয়,—বিশেষত পাঞ্জাবী, হিন্দীভাষী ও সিন্ধীদের ইংরিজীজ্ঞান 'শিলিং-শকার' ও 'পেনি-হরার' থেকেই আহরিত। তা হোক. কিন্তু ঐসব বুঝে-না-বুঝেই যারা বেশী পড়ে তাদের কথা বলার অভ্যাস হয়ে যায় বেশী, অন্তত 'থ্যাংকু' 'পার্ডন', 'আই এম অ্যাফ্রেড' তারা তাগমাফিক লাগিয়ে দিতে কসুর করে না।

এ স্থলে ইতিহাসের দিকে এক নজর তাকাতে হয়।

মুসলমান আগমনের পর থেকে ১৮৪০।৪২ পর্যন্ত বাঙলা দেশের ব্রাহ্মণ তথা বৈদ্য সম্প্রদায়ের বিস্তর লোক সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করেন, এবং মুসলমান ও কায়স্থরা ফার্সী (এবং কিঞ্চিৎ আরবীর), চর্চা করেন। এদেশের বড় বড় সরকারী চাকরি, যেমন সরকার (চীফ সেক্রেটারী), কানুনগো (লিগেল রিমেমব্রেনসার), বখশী (একাউণ্টেণ্ট জেনারেল—পে-মাস্টার) অর্থাৎ এডমিনস্ট্রেটিভ তাবৎ ডাঙর ডাঙর নোকরিই করেন কায়েস্থরা; ইংরেজের আদেশে এঁরাই কলকাতাতে প্রথম ইংরিজী শিখতে আরম্ভ করেন—বস্তুত ফার্সী তাঁদের মাতৃভাষা ছিল না বলে তাঁরা সেটা অনায়াসে ত্যাগ করে ইংরিজী আরম্ভ করে দিয়েছিলেন—এবং ফলে হাইকোর্টটি তাঁদের হাতে চলে যায়। ব্রাহ্মণরা আসেন পরে; তাই তাঁরা পেলেন বিশ্ববিদ্যালয়। মুসলমান আসেন সর্বশেষে, তাঁদের কপালে কিছুই জোটে নি।

তা সে যাই হোক্, আমরা বাঙালী প্রথমেই তাড়াতাড়ি ইংরিজী শিখে-ছিলুম বলে বেহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এস্তক সিন্ধুদেশ পর্যন্ত আমরা ছড়িয়ে পড়ি।

এর পর অন্যান্য প্রদেশেও বিস্তর লোক ইংরিজী শিখতে আরম্ভ করেন। ক্রমে ক্রমে আমাদের চাহিদা ও কদর কমতে লাগল, এসব কথা সকলেই জানেন, কিন্তু এর সঙ্গে আরেকটি তত্ত্ব বিশেষভাবে বিজড়িত এবং সেই তত্ত্বটির প্রতি আমি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

যে দুটি জাতীয় সঙ্গীত ভারতের সর্বত্র সম্মানিত সে দুটিই বাঙলা দেশেই রচিত হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রাম সর্বপ্রথম আরম্ভ হয় বাঙলা দেশেই। এটা কিছু আকস্মিক যোগাযোগ নয়। এর কারণ বাঙালী আপন দেশ ভালোবাসে এবং সে বিদ্রোহী[১]। দেশকে ভালোবাসলে মানুষ তার ভাষাকেও ভালোবাসতে শেখে।

আশ্চর্য, ইংরিজী ভালো করে আসন জমাবার পূর্বেই বাঙলা দেশে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। (ঠিক সেই রকম ফার্সী যখন একদা আসন জমাতে যায়, তখন কবি সৈয়দ সুলতান আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন,

'আল্লায় বলিছে "মুই যে-দেশে যে-ভাষ,
সে দেশে সে-ভাবে করলুম রসুল প্রকাশ।"
যারে যেই ভাষে প্রভু করিল সৃজন।
সেই ভাষা তাহার অমূল্য সেই ধন॥')

এবং আরো আশ্চর্যের বিষয়, সে বিদ্রোহের কাণ্ডারী ছিলেন সে যুগের সব-চেয়ে বড় ইংরিজী (ফরাসী, লাতিন, গ্রীক) ভাষার সুপণ্ডিত মাইকেল। কাজেই যদিও সে উইলসেন, কেশবসেন ও ইস্টিসেন এই তিন সেনের কাছে জাত দিয়ে ছুরি কাঁটা ধরতে শিখল (আজ যা দিল্লীতে বড়ই কদর পাচ্ছে) তবু সঙ্গে সঙ্গে ওর বিনাশের চারাকে জল দিয়ে বাঁচাতে আরম্ভ করলো। এটাকে বাঙালীর স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। এ সময় সে গাছেরও খেয়েছে, তলারও কুড়িয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ই চোখে পড়ল, বাঙালী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরিজী বইয়ের আমদানী বন্ধ হয়ে যাওয়ায় যে রকম কাতর হয়ে পড়েছিল এবারে সে সে-রকম হাঁসফাঁস করলো না। স্বরাজ লাভের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, বাঙালী ইংরিজী ভাষা, আচার-ব্যবহার, কায়দা-কেতা থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছে এবং ফলে দিল্লীতে আর কল্কে, সরি, সোর্ভিয়েট—পায় না।

১ 'বিদ্রোহী' আমি কথার কথারূপে বলছি না। বস্তুত বাঙালী যে বিদ্রোহী তার ইতিহাস এখনো লেখা হয় নি। (ক) দোয়ারের ব্রহ্মণ্যধর্ম তাকে অভিভূত করতে পারে নি, ফলে সে সংস্কৃত উচ্চারণ গ্রহণ করে নি, (খ) বৌদ্ধ জৈনের নিরামিষ সে গ্রহণ করে নি, (গ) মুসলমান আমলে বাঙলা দেশই সব চেয়ে বেশী লড়াই দিয়েছে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ইত্যাদি বিস্তর বিষয়-বস্তু নিয়ে সে ইতিহাস লিখতে হবে।

তর্ক করে, দলীল-দস্তাবেজ দিয়ে সপ্রমাণ করতে হলে ভূরি ভূরি লিখতে হবে। তা না হয় লিখলুম, কিন্তু পড়বে কে? তাই সংক্ষেপে বলি,

পৃথিবীর সভ্যাসভ্য কোনো দেশই বিদেশী ভাষা দিয়ে বেশী দিন কারবার চালায় না। আজকের দিনে তো নয়ই। ফার্সী এদেশে ছ'শ বছর ধরে রাষ্ট্র-ভাষা ছিল—আমরা একে চিরন্তনী ভাষা বলে গ্রহণ করি নি।

তাই হিন্দী, গুজরাতী মারাঠীওলারাও একদিন ইংরেজী বর্জন করে আপন আপন মাতৃভাষায় কাজকারবার করতে গিয়ে দেখবেন, আমরা বাঙালীরা অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছি, মেঘে মেঘে বেলা হয়ে গিয়েছে—কারণ আমরা অনেক পূর্বে আরম্ভ করেছিলুম। তখন যখন কেন্দ্রে আপন আপন মাতৃভাষায় পরীক্ষা দিতে হবে তখন আবার আমরা সেই যুগে ফিরে যাব, যখন একমাত্র বাঙালীই ইংরিজী জানত। হিন্দী কখনো ব্যাপকভাবে বাধ্যতামূলক হবে না, আর হলেও বাঙালীকে যেমন মাতৃভাষার উপর হিন্দীতে পরীক্ষা দিতে হবে, হিন্দীওলাকে হিন্দী ভিন্ন অন্য একটি ভাষায় পরীক্ষা দিতে হবে। অমাতৃভাষা অমাতৃভাষায় কাটাকুটি গিয়ে রইবে বাঙলা বনাম হিন্দী। তাই অবস্থা একই দাঁড়াবে—আমরা এগিয়ে যাব।

তাই মা ভৈঃ॥

দেহি দেহি

কিছুদিন পূর্বে আমার এক আত্মজন এসে, আমাকে শুধাল, 'আপনার কি অত্যন্ত অর্থাভাব হয়েছে?'

আমি ইহুদীদের মত পাল্টা প্রশ্ন শুধালুম, 'কেন, তোমার কি অর্থপ্রাচুর্য হয়েছে? ধার দেবে?' সে ধনী, আমি জানি।

বললে, 'সিনেমার কাগজে যে লিখেছেন!'

আমি বললুম, 'আমার যতদূর জানা আছে, একমাত্র এই বাঙলা দেশেই বহু সিনেমার কাগজ সাহিত্যিকদের কাছে লেখা চায়, এবং এমন কোনো শর্তও করে না যে সিনেমা সম্বন্ধেই লিখতে হবে। অন্যান্য দেশে সিনেমার কাগজ সাহিত্যের তোয়াক্কা তো করেই না, উল্টে ভালো ভালো সাহিত্যের কাগজ সিনেমা সম্বন্ধে লেখে। এ সম্মানটা আমাদের যতদিন দেখাচ্ছে ততদিন সেটা নেব না কেন?

দ্বিতীয়তঃ এই ধরো তোমার মনিহারী দোকানে আমরা পাঁচজন যাই, দর কষাকষি করি নে। ঐ সময়ে গাঁয়ের খদ্দেরও ভয়ে বেশী দরদস্তুর করে না। ফলে তোমার দোকানের টোন্ অন্য দোকানের চেয়ে ভালো হয় নি—বুকে হাত দিয়ে কও! অন্য দোকানে এখনো মেছোহাটার দরাদরি—ভুল বললুম—মেছো হাটেও এখন দর-কষাকষি বিস্তর কমে গেছে, যবে থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণী চাকর না পাঠিয়ে নিজেরা বাজার যেতে আরম্ভ করেছে। ভালো সাহিত্যিকরা—আমার কথা বাদ দাও—যতদিন 'জলসা'তে লিখবে ততদিন তো সে কুরুচির প্রশ্রয় দিতে পারবে না।

তৃতীয়তঃ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'কুন্তলীন' তেলের পুরস্কার পাবার জন্য সেখানে কম্পীট করেছিলেন। তেলের ব্যবসার দোকান ও ফিল্মের কাগজে তফাৎটা কি?'

বাকিটা বলার পূর্বেই বাবাজী শুধালেন, 'আপনি কি রবীন্দ্রনাথ?'

আমি তৈরী ছিলুম। বললুম, 'এর উত্তর আমি জানি, বাঙলা দেশ জানে—তুমি বুঝি জানো না—?'

সেই যে গল্প আছে;—দুই বন্ধু রাস্তা দিয়ে যাবার সময় কুকুরের ঘেউ ঘেউ শুনে একজন ভয় পাওয়াতে অন্যজন সাহস দিয়ে বললে, 'ইংরিজী প্রবাদ জানিস,—"বার্কিং ডগ ডাজ নট বাইট"—যে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে সে কামড়ায় না।' দ্বিতীয় জন বললে, 'প্রবাদটা তুই জানিস, আমিও জানি। কিন্তু কুকুরটা কি জানে?' আমি রবীন্দ্রনাথ নই সে কথা আমি জানি, আমার পাঠক সম্প্রদায়ও জানে—এখন প্রশ্ন তুমি জানো কি না?'

বাধা দিয়ে বললে, 'কিন্তু—?'

আমি বললুম, 'মেলা ঘেউঘেউ ক'রো না। শোনো।

চতুর্থতঃ তুমি ফিলিম দেখতে যাও, আর আমি ফিলিমের কাগজে লিখতে পারবো না?

পঞ্চমতঃ তুমি জানলে কি করে আমি 'জলসা'য় লিখেছি? লোকমুখে?'

ছেলেটি সত্যবাদী। বললে, 'না, নিজে পড়েছি।'

আমি বললুম, 'লাও! তুমি যে কাগজ পড় আমি সেটাতে লিখব না? তবে কি তুমি 'জলসা'তে অশ্লীল লেখার সন্ধানে গিয়ে আমার লেখা পড়ে হতাশ হয়েছ? তবে কি ফিল্মের কাগজে শ্লীল লেখা, তথাকথিত উচ্চাঙ্গ গবেষণা-মূলক (কিংবা মডার্ণ কবিতার উন্নাসিক) পত্রিকায় অশ্লীল লেখার চেয়ে ভালো?'

'আপনি তো প্যারাডক্সে ফেললেন। সেই যে সোক্রাতিসের গল্প—'

আমি বললুম, 'কোন্‌টা?'

এক গাল হেসে বললে, 'কেন? আপনারই কাছ থেকে শোনা। নিরপরাধ সোক্রাতিসকে যখন বিষ খাইয়ে মারার সরকারী হুকুম হল তখন তার স্ত্রী ক্ষান্থিপে কেঁদে বলেছিলেন, 'তুমি কোনো অপরাধ করো নি আর তোমার হল প্রাণদণ্ড।' সোক্রাতিস বললেন, 'তবে কি আমি অপরাধ করে মৃত্যুদণ্ড পেলে এর চেয়ে ভালো হত?'

(পাঠক সম্প্রদায় আমার সূক্ষ্ম হাত-সাফাইটি লক্ষ্য করলেন কি? ইদানীং আমার বদনাম হয়েছে যে, আমি একই কথা বার বার বলি। সেইটে পরের মুখে বলিয়ে অথচ নিজে শাবাশীটি কি কায়দায় নিলুম!)

তারপর বললুম, 'ষষ্ঠতঃ—থাক্ গে। প্রথম কারণটাই যথেষ্ট। ন্যায়শাস্ত্রও তাই বলে, 'প্রথম কারণ যথেষ্ট হলে অন্য কারণে যাবে না।' সেই ইরানী গল্পটি শোনো নি?

অনেক কালের কথা। ইরানে তখন ইংরেজের এমনই আধিপত্য যে, হুকুম ছিল ইরানের বৃহত্তর বন্দরেও যদি ইংরেজের ক্ষুদ্রতম মালজাহাজ পৌঁছয়

তবে তার সম্মানে কামান দাগতে হবে। এখন হয়েছে কি, ঘটনাক্রমে একটি ইরানী ছোকরা ফরাসী দেশে লেখাপড়া সেরে এসে আপন দেশে ছোট্ট একটি বন্দরে প্রধান আপিসারের কর্ম পেয়েছে। ফরাসী দেশে সে আবার শিখে ফেলেছে মেলা বড় বড় কথা, 'সাম্য' 'মৈত্রী' 'স্বাধীনতা', আরো বিস্তর যা তা। মাথা গরম।

প্রথম দিনেই সেই বন্দরে এসেছে এক বিরাট মানওয়ারী জাহাজ—ব্যাটল-শিপ না কি যেন কয়! ছোকরা কামান দাগলে না, পাড়ে গিয়ে জাহাজের অভ্যর্থনা জানালে না।

আধঘণ্টা যেতে না যেতেই তার দফতরে দুম দুম করে ঢুকলেন জাহাজের এ্যাডমিরাল না কি যেন চাঁই আপিসার। মুখ লাল, গোঁফ লাল, দাঁত পর্যন্ত লাল।

ইরানী ইয়াংম্যান্। অতএব অতিশয় ভদ্র। দাঁড়িয়ে উঠে বিস্তর 'বঁ জুর', ইত্যাদি জানালে। ইংরেজ শুধু চেঁচাচ্ছে "কামান দাগলে না কেন, ইউইউ—ইত্যাদি।"

ছোকরা বললে, "স্যার, ইয়োর অনার, একসেলেন্সি, শান্ত হয়ে বসুন। কামান না দাগার বাইশটি কারণ ছিল। না বসলে বলি কি করে?"

ইংরেজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের কামান দাগার মত চেঁচিয়ে বল্লে, "বলে যাও বাইশটা কারণ।"

ছোকরা বললে, "প্রথম কারণ: বারুদ ছিল না।"

ইংরেজ ঝুপ করে চেয়ারে বসে পড়ে বললে, "ব্যস্! আর একুশটা কারণ বলতে হবে না। একটাই যথেষ্ট। বারুদ ছিল না, কামান দাগবে কি করে!"

তারপর বললুম, 'গল্পটা মনে রেখো। কাজে লাগবে। বিশেষ করে যখন তোমার হাতে থাকবে মাত্র একটি কারণ—বাইশটে নেই। সদম্ভে গল্পটি বলে এমন ভাবে তাকাবে যেন তোমার হাতে আরো পঞ্চশত তর্কবাণ ছিল!'

বাবাজী গলায় এক ঢোক চা ফেলে এমন ভাবে কোঁৎ করে গিললে যে, মনে হল আমার উপদেশটি ট্যাবলেটের মত সঙ্গে সঙ্গে পেট-তল করলে। তারপর শুধালে, 'আপনি ফিল্মী কাগজে লেখেন অথচ ফিল্ম্ দেখতে যান না, তার কারণটা কি?'

আমি অনেকক্ষণ চুপ করে ভাবলুম। এ বিষয় নিয়ে এই যে আমি প্রথম ভাবলুম তা নয়। এবং এটা শুধুমাত্র একলা আমারই ভাবনা, তাও নয়।

বাবাজী ফের বললে, 'দিশী ফিলমের স্ট্যাণ্ডার্ড বিদেশীর মত নয় বলে?'

এটার উত্তর আমি জানি। বললুম, 'কে বললে তোমায় বিদেশী ছবির মান উঁচু? বিদেশী ছবির ভালোগুলো আসে এ দেশে। ওদেশের নিজের কনজম্পশনের ছবি তো তুমি দেখ নি। সেগুলো যে কী রদ্দি তা তো তুমি জানো না। আর ওরা ভাবে আমাদের সব ছবিই সত্যজিৎ রায়ের তৈরী।'

'তা হলে?'

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললুম, 'এ এক বিরাট সমস্যা। তার পুরো

ধাক্কা এদেশে এখনো এসে লাগে নি। ইয়োরোপ আমেরিকার গুণীজ্ঞানীরা রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়েছেন, পঁচিশ বৎসর পরের ঐতিহাসিকরা কি শেষটায় বলবে, সভ্য মানুষের পতন আরম্ভ হয়েছিল বিংশ শতাব্দীতে? এ যুগের সিনেমা, ট্র্যাশ নভেল, অশ্লীল সাহিত্য, বাচ্চাদের জন্য রগরগে খুন-ডাকাতির ছবির বই তো ছিলই—এখন এসে জুটেছে টেলিভিশন।'

'আইন করে বন্ধ করে দেয় না কেন?'

'আমেরিকাতে 'আমেরিকান সিভিল লিবার্টিস ইউনিয়ন' নামক একটি নাগরিক স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠান আছে। যখনই কোন অশ্লীল পুস্তক বা ঐ জাতীয় কোনো জিনিসের বিরুদ্ধে পুলিস মোকদ্দমা করে তখন ঐ প্রতিষ্ঠান এসে পুলিসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বলে, 'পুলিস সাহিত্যিকের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছে।' সরকার পক্ষের উকিল যখন প্রত্যুত্তরে বলেন, 'এসব রাবিশ সাহিত্য নামের উপযুক্ত নয়,' তখন অন্যপক্ষ বলে, 'সে হচ্ছে নিছক রুচির কথা।' বিপদ আরো এক জায়গায় রয়েছে। পুলিসপক্ষ এখনো এমন একটা সংজ্ঞা বের করতে পারে নি যা দিয়ে শ্লীল-অশ্লীলের পরিষ্কার পার্থক্য করা যায়। এ নিয়ে দুঃখ করে কি হবে! সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রেও এ নিয়ে বিস্তর আলোচনার পর গুণীরা এক মত হয়ে বলতে পারেন নি শ্লীল-অশ্লীলে পার্থক্য করা যায় কি প্রকারে—বলেছেন আমাদের বাঘা পণ্ডিত গোসাঁইজী। ইয়োরোপ আমেরিকায় আবার আরেক বিপদ। যাঁরা ডাহা অশ্লীল জিনিসের সামান্যতম প্রতিবাদ জানান তাঁদের বিরুদ্ধে অমনি 'মার মার কাট কাট' অট্টরব জেগে ওঠে—সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা গুটিকয়েক চোখাচোখা বাক্যবাণ শুনতে পান —'এরা প্রগতির শত্রু, এরা আর্টের শত্রু, স্বাধীনতার শত্রু।' এ পক্ষে যে সবাই স্বার্থপর নীচ লোক রয়েছে তা নয়। ভালো ভালো ডাক্তাররা বলেছেন, 'অশ্লীল সাহিত্য, খুনোখুনির ছবি ঐ সব জিনিস তৃষ্ণার্ত জনের নৈতিক স্বাস্থ্য উন্নতি হয় তো নাও করতে পারে কিন্তু ঐ সব দেখেশুনে তাদের নৈতিক ব্যালান্স্ অনেকটা রক্ষা পায়।' তখন প্রশ্ন উঠবে, 'কিন্তু যারা ওসব জিনিস সম্বন্ধে তৃষ্ণার্ত নয় তাদের হাতে পড়লে?' উত্তরে এঁরা বলেন 'তাদের যে কোনো ক্ষতি হয় সেটা তো কোনো সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কোনো কমিশন, কোনো তদন্ত করে সপ্রমাণ করতে পারেন নি।'

ফলে দাঁড়িয়েছে এই যে, আজ আমেরিকাতে অশ্লীল সাহিত্য বা ছবির বিরুদ্ধে কার্যত কোনো আইনই নেই। তাই সেদিন আমেরিকার এক বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন কয়েকটি অতি-আধুনিক ছাত্র (এদের বলা হয় 'পোস্ট্-হাইব্রাও') একখানি অশ্লীল মাসিক বের করলে—অবশ্য তাদের মতে নয়, ভাইস চ্যান্সেলারের মতে—তখন তিনি কিছু না করতে পেরে ডাক বিভাগের শরণাপন্ন হলেন; তাদের পুরোনো ঝাঁপিতে একটি অতিপ্রাচীন রক্ষাকবচ আছে—'ডাক বিভাগ যদি মনে করেন কোনো চিঠি বা প্যাকেটে অশ্লীল বস্তু আছে তবে তাঁরা সেটি গ্রহণ করবেন না।' এই করে অন্তত কাগজটার প্রসার ঠেকানো গেল,

প্রচার বন্ধ হল না।

'সর্বনাশ! তা হলে উপায়? এদেশেও তাই হবে নাকি?'

'তুমি ভবিষ্যতের ভয় পাচ্ছো, এদিকে অনেকেই যে মনে করেন আমাদের দিশী ছবি যথেষ্ট—অথবা যথা-অনিষ্ট - অশ্লীল হয়ে বসে আছে তাদের কথা ভাবছো না কেন? আমি আদপেই অস্বীকার করছি নে যে আমাদের অনেক ছবিতে অশ্লীলতার ইঙ্গিত থাকে। কিন্তু আমাদের মডার্ন কবিতায় কোনো কোনো কবি যে 'আর্টে'র নামে অশ্লীলতার চরমে পেঁছন তার বেলা কি? তোমার যদি মনে হয়, ফিলমে ভেবেচিন্তে বাঁদর গড়ছে, গড়ুক। তোমার দেখবার ইচ্ছে নেই, না দেখলেই হল। কিন্তু কবিরা যে শিব গড়তে বাঁদর গড়েছেন সেখানে তুমি শিব দর্শনে গিয়ে পেলে বাঁদর—তার কি? তার তো কোনো সেনসর বোর্ড নেই। অথচ এরা তো রবীন্দ্র, রাজশেখর, সুকুমার রায়কে হটিয়ে দিতে পারেন নি; 'মনমোহন সিরীজে'র বিক্রী বেশী, না তারাশংকরের বেশী? আসলে শ্লীল হক অশ্লীল হক, যে বস্তু সত্য রসের (আর্টে'র) পর্যায়ে ওঠে না সেটা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সংস্কৃত সাহিত্যে নিশ্চয়ই বিস্তর অশ্লীল বস্তু লেখা হয়েছিল—না হলে শ্লীল-অশ্লীল নিয়ে আলংকারিকেরা আলোচনা করলেন কেন? তাই আজ আশ্চর্য হই, সে সব অশ্লীল বই টিকে রইল না কেন?

তার অর্থ এই নয়, অশ্লীলতার বিরুদ্ধে আপত্তি করার কোনো প্রয়োজন নেই—অবশ্য তোমার যদি মনে হয় ফিলিমগুলোর অনেকটাই অশ্লীল। আমি অন্য কথাগুলো বললুম, যাতে করে তুমি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ না হও। গণতন্ত্র যখন বরেছ তখন 'গণ-কলচর', 'গণ-সাহিত্য', 'গণ-ফিলম' হবেই হবে। তার জন্য তৈরী থাকা উচিত। কিন্তু গণতন্ত্রের তুমি আমি দুজনেই যখন 'গণ', তখন আমারও আমাদের রুচি অনুযায়ী আমাদের যেখানে যেখানে বাধে সেখানে আপত্তি জানিয়ে যাব। আর সত্যজিৎ রায় তো আছেনই। তাঁর নীরব আপত্তিই তো সবচেয়ে জোরালো আপত্তি। আবার তিনিও যদি প্যুরিটানিজমের চূড়ান্তে পেঁছে শুচিবায়ুগ্রস্ত হয়ে মানুষের অন্যতম ক্ষুধা—যে ক্ষুধাকে কবিরা যুগ যুগ ধরে সুন্দর মধুর রূপে প্রকাশ করেছেন—উপেক্ষা করেন, তবে তিনিও উপেক্ষিত হবেন। তার কারণ মানুষ অশ্লীলতা চায়, সে নয়। তার কারণ, কোনো জিনিসের চরমে পেঁছলে সে জিনিস দিয়ে আর্ট হয় না।

তাই এক ফার্সী আলংকারিক আর্টের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অন্যান্য নানা মূল্যবান কথার ভিতর বলেছেন,—আর্ট = 'সনাখতন-ই-হদ্-ই-হর চীজ'। এর সব কটি কথাই বাঙলায় চলে। সনাখ্তন্ = সনাক্ত করা, চেনা, জানা, হদ্ = হদ্দ, সীমা; হর = প্রত্যেক, চীজ = বস্তু, চীজ। অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর সীমা কোন জায়গায় সেইটে বুঝে লেখাই আর্ট-সৃষ্টি করা।'

বাবাজী চলে যাওয়ার পর অলস কৌতূহলে একখানা ফরাসী মাসিক হাতে তুললুম। নাম 'প্রাভ' অর্থাৎ 'প্রমাণ'—বাঙলায় এ মাসিক বের করতে হলে নাম হবে 'প্রামাণিক'। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে ইয়োরোপে যে 'কংগ্রেস ফর দি লিবার্টি অব্ কালচার' 'সংস্কৃতি স্বাধীনতা সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়, তার দশম অধিবেশন হয় বার্লিনে, এই জুলাই মাসে। যে অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ দেন বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক, সমাজতত্ত্ববিদ্ দেনিস দ্য রুজমোঁ—'প্রাভে'র আগস্ট সংখ্যায় সেটি ছাপা হয়েছে। স্বাধীনতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ব্যাখ্যান দিতে গিয়ে দ্য রুজমোঁ বলেছেন ঃ

এই যে আমরা প্রত্যেক জিনিসের 'চরমতম' চূড়ান্তে পৌঁছে গিয়ে এক জিনিস থেকে অন্য জিনিস আহাম্মুখের মত আলাদা আলাদা করে রাখছি—একদিকে আর্টের সৌন্দর্যচর্চা অন্যদিকে দৈনন্দিন জীবনের শ্রীহীন আয়ুক্ষয়, একদিকে কঠিন পরিশ্রম অন্যদিকে গভীর মানসিক চর্চা, একদিকে বিমূর্ত সূক্ষ্ম জ্ঞানান্বেষণ অন্য দিকে টেকনিক্যাল ফলিত কর্ম,—এরা যে প্রতিদিন একে অন্যের দিকে তাকিয়ে বিকৃত মুখভঙ্গী করছে, এর অবসান হোক।

এর প্রয়োজন পশ্চিম মহাদেশেই বেশী। কিন্তু এখন সর্ব মহাদেশকে একত্র হয়ে তাদের আপন আপন সঞ্চয় বিশ্ববাসীর উপকারের জন্য তুলে ধরতে হবে ঃ—

ইয়োরোপের চিন্তাবৃত্তিজাত ফল (যার থেকে টেকনিক্যাল কর্মবুদ্ধি বেরিয়েছে),

আফ্রিকার প্রাণশক্তি (যা সে বাঁচিয়ে রেখেছে, আর সকলের চেয়ে ভালো, তার সঙ্গীত, নৃত্য, ছন্দ, অনুভূতির কল্যাণে),

ভারতের আত্মা—যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত তার ঐতিহ্যগত সম্পদ।

আমার মস্তকে বজ্রাঘাত! ওদিক ইয়োরোপ হাত পেতেছে আমাদের দিকে সর্বোত্তম সম্পদের জন্য—কে না জানে সর্বোত্তম সম্পদ আত্মার উপলব্ধি—আর এদিকে আমি মরছি আমেরিকার ভয়ে !!

নিরলঙ্কার

একটি লোকের কাছে আমি নানা দিক দিয়ে কৃতজ্ঞ ছিলুম। মাসাধিককাল আমি যখন টাইফয়েডে অজ্ঞান, সে তখন আমার সেবা করে বাঁচিয়ে তোলে। ভালো করেছে, কি মন্দ করেছে, সে অবশ্য অন্য কথা। আর শুধু আমিই না, আমাদের পার্ক সার্কাস পাড়ার বিস্তর লোক তার কাছে নানান দিক দিয়ে ঋণী। মাঝারি রকমের পাস-টাস দিয়েছে—পরীক্ষার ঠিক আগে তার জোর চাহিদা। বেশ দু' পয়সা কামায়—ধার চাইতে হলে ও-ই ফার্স্ট চইস। আর বললুম তো, রুগীর সেবায় ঝানু নার্সকে হার মানায়।

তার যে কেন হঠাৎ শখ গেল সাহিত্যিক হবার বোঝা কঠিন।

একটা ফার্স লিখেছে। তার বিষয়বস্তু ঃ ধনী ব্যবসায়ী তাঁর ম্যানেজারের উপর ভার দিয়েছেন, কলেজ-পাস মেয়ের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়ে ইণ্টারভ্যু নিয়ে বর বাছাই করতে। নাটকের আরম্ভ ইণ্টারভ্যু দিয়ে। কেউ কবি, কেউ গবিতা লিখে গবি, কেউ ফিলিম স্টার—আরো কত কি।

পড়ে আমার কান্না পেল। দুই কারণে। অত্যন্ত প্রিয়জনের নিষ্ফল প্রচেষ্টা দেখলে যে রকম কান্না পায়, এবং দ্বিতীয়ত ঐ কথাটি ওকে বলি কি প্রকারে? ওটা কিছুই হয় নি, ওকে বলতে গেলে আমার মাথা কাটা যাবে। শেষটায় মাথা নিচু করে, ঘাড় চুলকে বললুম, 'বুঝলে, মামা, আমি ফার্স-টার্স বিশেষ পড়ি নি, দেখি নি আদপেই অথচ এ-সব জিনিস স্টেজে দেখার এবং শোনার।'

মামা সদানন্দ পুরুষ। একগাল হেসে বললে, 'যা বলেছিস। আমিও ঠিক তাই ভাবছিলুম।'

সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেললুম।

ওমা, কোথায় কি। হঠাৎ পাড়ার চায়ের দোকানে শুনি মামার, ফার্স ট্যাংরা না বেনে-পুকুরে কোথায় যেন রিহার্সেল হচ্ছে। সর্বনাশ। বলি, 'ও চাটুয্যে, এখন উপায়?'

সোমেন যদিও নিকষ্যি, তবু কথা কয় কলকাতার খাস বাসিন্দা বনেদি সোনার বেনেদের মত। অর্থাৎ আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহারে 'হুতোম' 'আলাল'কে আড়াই লেন্‌থ পিছনে ফেলে। দাঁতের মাড়ি পর্যন্ত বের করে বললে, 'উপায় নদারদ্। দেখি নসিবে কি কি গর্দিশ আছে?'

তারপর মামা একদিন ঝড়ের মত ঘরে ঢুকে ফার্স-অভিনয়ের লগ্ন রাঁদেভু বাৎলে গেলেন। ট্যাংরা, গোবরায় নয়! রাজাবাজারের কোন এক গলির ভিতরে।

চাটুয্যের বাড়ি মসজিদ বাড়ি স্ট্রীটে। ওখানে কখনো যাই নি। ভাবলুম, সেদিন ওখানেই আশ্রয় নেব। মামা সময় পেলেও আমাকে খুঁজে পাবে না।

চাটুয্যে তো আমাকে দেখে অবাক। ব্যাপার শুনে বললে, 'তা আপনি চা পাঁপড় খান আমাকে তো যেতেই হবে।' চাটুয্যে চাণক্যের সেই আইডিয়াল বান্ধব—রাজদ্বারে শ্মশানে ইত্যাদি। আর এটা যে মামার ফ্যুনরেল সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দ ছিল না।

ঘণ্টা দুই দাঁত কিড়মিড়ি দিয়ে বার বার রাজাবাজারের দৃশ্যটা মনশ্চক্ষু থেকে তাড়াবার চেষ্টা করলুম। কিছুতেই কিছু হল না। কোথাকার কে এক কবি বলেছে, সদ্য লাঞ্ছিত জন যে রকম বার বার চেষ্টা করেও অপমানের কটুবাক্য মন থেকে সরাতে পারে না।

এমন সময় চাটুয্যে এক ঢাউস প্রাইভিট গাড়ি নিয়ে উপস্থিত। তার সর্বাঙ্গ থেকে উত্তেজনা ঠিকরে পড়ছে। মুখে শুধু 'এলাহি ব্যাপার, পেল্লায় কাণ্ড।' বুঝলুম, মামাকে উদ্ধারের সৎকার্যে, কিংবা নিমতলার সৎকারে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু চাটুয্যে ঢাউস গাড়ি পেল কোথায়—পায় তো কুল্লে পঞ্চাশ টাকা, খাদি প্রতিষ্ঠানে।

গলির বাইরে থেকে শ্নতে পেল্ম তুম্ল অট্টরব। ব্ঝল্ম, গর্দিশ পেল্লায়।

ওমা, এ কি? কোথায় না দেখব, মামা লিন্চ্‌ট্‌ হচ্ছে—দেখি, হাজার দ্ই লোক হেসে ল্টোপ্টি খাচ্ছে, হেথা হোথা কেউ কেউ পেটে খিল ধরেছে বলে ডান দিক চেপে ধরে কাতরাচ্ছে, আরেক দঙ্গল লোক হাসতে হাসতে ম্খ বিকৃত করে কাঁদছে। সে এক ম্যাস্‌ হিস্টিরিয়ার হাসির শেয়ার-বাজার কিংবা এবং রেসের মাঠ। হ্তেক চাটুয্যে হে'ড়ে গলায় চে'চাচ্ছে, 'চাক্ক্‌ মারছে, চাক্ক্‌ মাইরা দিছে।'

ইতিমধ্যে ফার্স শেষ হয়েছে। মামাকে স্টেজে দাঁড় করানো হয়েছে। মামা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'এ সম্মান সম্প্র্ণ আমার প্রাপ্য নয়। বস্তুত সবটাই পাবেন, স্সাহিত্যিক আকাদেমি কর্তৃক সম্মানিত শ্রীয্ত গজেন্দ্রশংকর সান্যাল। একমাত্র তাঁরই পরামর্শে আমি এটা স্টেজ করি। পাড়ার আর সবাই বলেছিল, এটা সাপ ব্যাঙ কিছ্ই হয় নি।'

ব্ঝতেই পারছেন, আমার নাম গজা সান্যাল। তখন আরেক ধ্ন্দ্মার। আমার গলা জিরাফের মত হলেও অত মালার স্থান হত না। নিতান্ত রঙ্গদর্শী গৌরকিশোর সেখানে সেদিন উপস্থিত ব্দ্ধি খাটিয়ে আমাকে সময়মত না সরালে, বঙ্গীয় পাঠক-মণ্ডলী উল্লিখিত 'কলকাতার কাছেই কবির মহাপ্রস্থান' বই থেকে বঞ্চিত হত।

বাড়ি ফেরার পরও আমার মাথা তাঙ্গিম মাঙ্গিম করছিল। নল ছেড়ে দিয়ে তলায় মাথা রেখে মনে মনে বলল্ম, 'অয়ি বাগেশ্বরী, তোমার স্ষ্টিরহস্য আমাকে একটু ব্ঝিয়ে বলো তো। মামার ঐ ফার্স পড়ে এ-পাড়ার সক্কলের তো কন্না পেয়েছিল। তবে কি পাড়ার মেধো ও-পাড়ার মধ্স্দন?'

বিস্তর অলংকারশাস্ত্র পড়ে আমার মনে একটা আত্মম্ভরিতা হয়েছিল, আমি বলতে পারি কোন্‌ রচনা রসোত্তীর্ণ হয়েছে, কোন্‌টা হয় নি। এখন দেখি ভুল। ভামহ, বামন, ক্রোচে, বের্গসোঁ, তাহা হোসেন, আব্ সঈদ আইয়্ব সবাইকে পরের দিন বস্তা বে'ধে শিশি-বোতলওলার বাড়িতে পাঠিয়ে দিল্ম।

আমি জানি, আমার পাঠকমণ্ডলী অসহিষ্ণ্ হয়ে বললেন, 'তোমার যেমন ব্দ্ধি! পার্ক সার্কাসের রদ্দি বই পেল রাজাবাজারের সম্মান। আর তুমি তাই করলে বামন ভামহকে প্রত্যাখান! জৈস্নকে তৈসন্‌ শ্ঁটকিসে বৈগন—যার সঙ্গে যার মেলে—শ্ঁটকির সঙ্গে বেগ্নই তো চলে। রাজাবাজার পার্ক সার্কাসে গলাগলি হবে না?"

কথাটা ঠিক। ফার্সীতেও বলে,

স্বজাতির সনে স্বজাতি উড়িবে মিলিত হয়ে
পায়রার সাথে পায়রা শিকরে শিকরে লয়ে!
The same with same shall take its flight,
The dove with dove and kite with kite.
কুনদ্‌ হম-জিন্স্‌ ব্‌ হম্‌-জিন্স্‌ পরওয়াজ
কব্তর্‌ ব্‌ কব্তর্‌ বাজ্‌ ব্‌ বাজ্‌।

এসব অতিশয় খাঁটি কথা। কিন্তু প্রশ্ন, শেকসপীয়র মলিয়েরের জনসাধারণের—রাজা-উজির গুণীজ্ঞানীর কথা হচ্ছে না—চিত্ত জয় করেছিলেন যে রস দিয়ে সেটি খুব উচ্চাঙ্গের রস? মাঝে মাঝে তো রীতিমত অশ্লীল। এবং শেকসপীয়র যে আজও খাতির পাচ্ছেন তার কারণ জনসাধারণ তিনশ বছর ওঁর নাটক দেখতে চেয়ে চেয়ে ওগুলোকে বাঁচিয়ে রেখেছিল বলে। শুধুমাত্র গুণীজ্ঞানীর কদর পেলে ওঁর নাট্য আজ পাওয়া যেত লাইব্রেরির টপ শেলফে—সেটা উচ্চাসন হলেও অপ্রয়োজনীয় বই-ই রাখা হয় সেখানে।

আরেকটা উদাহরণ দি: ওস্তাদ মরহুম ফৈয়াজ খানের শিষ্য শ্রীমান সন্তোষ রায়ের কাছে শোনা। রাস্তায় এক ভিখিরির গাঁইয়া গান শুনে ফৈয়াজ তাকে আদরযত্ন করে বাড়ি নিয়ে গিয়ে, তার সেই গাঁইয়া গানের এক অংশ শিখে নিয়ে, তাকে 'গুরুদক্ষিণা' দিয়ে বিদায় দিলেন। কয়েক দিন পরে সেই টুকরোটি তাঁর অতিশয় উচ্চাঙ্গ ওস্তাদী গানে বেমালুম জুড়ে দিয়ে বড় বড় ওস্তাদদের কাছে শাবাশী পেলেন—ওরকম ভয়ঙ্কর অরিজিনাল অলঙ্কার কেউ কখনো শোনে নি।

আরেকটি নিবেদন করি: মেজর জেনরল স্লীমান গেল শতাব্দীর গোড়ার দিকে এক রাত্রি কাটান দিল্লী থেকে মাইল দশেক দূরের এক গ্রামে। রাত্রে শোনেন ইঁদারা থেকে বলদ দিয়ে জল তোলার সময় এক চাষা অন্য চাষাকে মিষ্টি টানা সুরে 'হুঁশিয়ার', 'খবরদার,' 'সবুর' বলছে। পরদিন সেকথা এক ভারতীয় কর্মচারীর সামনে উল্লেখ করাতে সে বলল, 'তানসেন মাঝে মাঝে এখানে এসে এসব সুর শিখে নিয়ে আপন সৃষ্টিতে জুড়ে দিতেন।'

মামার ফার্সটা চেয়ে নিয়ে আবার নূতন করে পড়লুম। নাঃ! আমি ফৈয়াজ নই, তানসেনও নই। আর কোন বস্তুই আমার কোনো কাজে লাগে না। মামাকে দোষ দেওয়া বৃথা।

সমস্তটা ডাহা অনরিয়েল. কোনো প্রকারের বাস্তবতা নেই কোনোখানে।

তখন মনে পড়লো ওস্কার ওয়াইলডের একটি গল্প। তিনি সেটি তাঁর সখা এবং শিষ্য আঁদ্রে জিদকে বলেছিলেন। তিনি সেটি ওয়াইলড সম্বন্ধে লেখা তাঁর 'ইন মেমোরিয়াম (সুভনীর)' পুস্তকে উল্লেখ করেছেন। নিজের ভাষায় গল্পটা বলি—ও বই পাই কোথায়?

গ্রামের চাষাভূষোরা এক কবিকে খাওয়াতো পরাতো। কবির একমাত্র কাজ ছিল সন্ধ্যের পর আড্ডাতে বসে গল্প বলা। চাষারা শুধতো, 'কবি আজ কি দেখলে?' আর কবি সুন্দর সুন্দর গল্প শোনাতো। রোজ একই প্রশ্ন। একদিন যখন ঐ শুধোলে, তখন কবি বললে, 'আজ যা দেখেছি তা অপূর্ব। ঐ পাশের বনটাতে গিয়েছিলুম বেড়াতে। বেজায় গরম। গাছতলায় যখন জিরোচ্ছি তখন, ওমা, কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ দেখি, একটা গাছের ফোকর থেকে বেরিয়ে এল এক পরী। তারপর আরেকটি, তারপর আরেকটি, ক'রে ক'রে সাতটি। আর সর্বশেষে বেরুলেন রানী। মাথায় হীরের ফুলে তৈরী মুকুট, পাখনা দুটি চরকা-কাটা-বুড়ীর সুতো দিয়ে তৈরী। হাতে সোনার বাঁশী। সাতটি পরীর চক্করের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বাজাতে লাগল সেই সোনার বাঁশী।

তারপর নাচতে নাচতে তারা এগিয়ে চলল সাগরের দিকে। আমিও ঘাপটি মেরে পিছনে পিছনে। সেখানে গিয়ে এরা গান গেয়ে বাঁশী বাজিয়ে কাদের যেন ডাকলে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে এল সমুদ্রকন্যা। সবুজ তাদের চুল—তাই আঁচড়াচ্ছে সোনার চিরুনি দিয়ে। সন্ধ্যা অবধি, ভাই, তাদের গান শুনলুম, নাচ দেখলুম—তারপর তারা চাঁদের আলোয় মিলিয়ে গেল।'

সবাই বললে, 'তোফা খাসা, বেড়ে।

কবি রোজই এ রকম গল্প বলে।

একদিন হয়েছে কি, কবি গিয়েছে ঐ বনে, আর সত্য সত্যই একটা গাছের ফোকর থেকে বেরলো সাতটি পরী, তারা নাচতে নাচতে গেল সমুদ্রপারে, সেখানে জল থেকে বেরিয়ে এল সমুদ্রকন্যা। কবি একদৃষ্টে দেখলে।

সেদিন সন্ধ্যায় চাষারা নিত্যিকার মতো শুধোলে, 'কবি আজ কি দেখলে বলো।'

কবি গম্ভীর কণ্ঠে বললে, 'কিচ্ছু দেখি নি।'

অর্থ সরল। যে বস্তু মৃন্ময় রূপে চোখের সামনে ধরা দিল, সেটাকে নিয়ে কবি করবে কি? কবির ভুবন তো চিন্ময়, কল্পনার রাজ্য। বাস্তবে যে জিনিস দেখা হয়ে গেল তার ঠাঁই কল্পনা রাজ্যে, কাব্যের জগতে আর কোথায়। চার চক্ষু মিলনের পর বধূকে তো আর কল্পনা কল্পনায় তিলোত্তমা বানিয়ে বেহশ্তের হুরীপরীর শামিল করা যায় না।

প্রকৃতির বিরুদ্ধে ওয়াইল্ডের আরেকটি ফরিয়াদ, সৃষ্টিতে আছে শুধু এক-ঘেয়েমি। প্রকৃতি বিস্তর মেহন্নৎ করে যদি একটি ফুল ফোটায় (রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে/ধরণীর তলে/,ফুটিয়াছে এ মাধবী/,) তবে বার বার তারই পুনরাবৃত্তি করে, অপিচ কবির সৃষ্টি নিরঙ্কুশ একক, সৃষ্টিকর্তারই মত একমেবাদ্বিতীয়ম্, এক জিনিস সে দুবার করে না, অন্যের নকল তো করেই না, নিজেরও কার্বনকপি হতে চায় না।

ওয়াইল্ডের বহুপূর্বে জর্মন কবি শিলার বলেছিলেন, 'প্রকৃতি প্রবেশ করা মাত্র কবি অন্তর্ধান করেন।'

আর রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে কি বলেছেন, সেকথা অন্যত্র বলার সুযোগ আমার হয়েছে। পুনরাবৃত্তির ভয় বাধ্য হয়ে বর্জন করে বলছি, তিনি প্রকৃতির সওগাৎ কদম ফুল দেখে বলেছেন, ওটা ঋতুস্থায়ী, আর আমার সৃষ্টি অজরামর,

আজ এনে দিলে হয়তো দেবে না কাল
রিক্ত হবে যে তোমার ফুলের ডাল
এ গান আমার শ্রাবণে শ্রাবণে
তব বিস্মৃতি স্রোতের প্লাবনে
ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবে তরণী
বহি তব সম্মান।

এ আবার কি রকমের সম্মান হল!

প্রকৃতিকে সব কবি হেনস্তা করার বর্ণনা দেবার পর, আবার ক্ষণতরে ওয়াই-

লুডে ফিরে যাই।

আচ্ছা, মনে করুন, ওয়াইল্ডের সেই গ্রাম্য কবি যদি চাষাদের একদিন বলতো, 'আজ ভাই, আবার সেই বনে গিয়েছিলুম। দেখি, গাছতলায় বসে এক পথিক তার সঙ্গীকে বলছে, সে তার পুরনো চাকরকে নিয়ে তীর্থ করতে যায়, সেখানে চাকরটা মারা যায়; তাই নিয়ে সে বিস্তর আপসা-আপসি করছিল।'

চাষারা নিশ্চয়ই ঠোঁট বেঁকিয়ে বলতো, 'এতে আবার বলার মত কি আছে—এতো আকছারই হচ্ছে।'

কিন্তু মনে করুন তখন যদি কবি, 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতাটি আবৃত্তি করতো? বিষয়বস্তু উভয় ক্ষেত্রে একই।

কবিতাটিতে যে অতি উত্তম রসসৃষ্টি হয়েছে সে সম্বন্ধে এ-যাবৎ কেউ কখনো সন্দেহ করে নি।

অথচ ওয়াইল্ড বর্ণিত কবির 'পরী-সিন্ধুবালা' অবাস্তব, 'পুরাতন ভৃত্যে'র বিষয়বস্তু অতিশয় বাস্তব। 'পুরাতন ভৃত্য' মনে না ধরলে 'দেবতার গ্রাস' নিন। সেটা তো অতিশয় বাস্তব—আইন করে বন্ধ করতে হয়েছিল, পরীর নাচ বন্ধ করার জন্য আইন তৈরী হয় না।

তা হলে দাঁড়ালো এই, বাস্তব হোক, কাল্পনিক হোক—প্রাকৃত হোক, অতি-প্রাকৃত হোক—যে কোনো বিষয়বস্তু রসোত্তীর্ণ হতে পারে যদি—

এইখানেই আলঙ্কারিকদের ওয়াটারলু। কি সে জিনিস, কি সে যাদুর কাঠি, কি সে ভানুমতীর মন্ত্র যার পরশ পেয়ে পুরাতন ভৃত্য আর বনের পরী কাব্যরসাঙ্গনে একই তালে, একই লয়ে চটুল নৃত্যে আরম্ভ করে? কিংবা বাস্তবে না নেচেও কাব্যেতে নাচা হয়ে যায়? যথা—

জোন বললে,—'চ্যাটার্জি, এই আনন্দের দিনে তুমি অমন গ্লাম হয়ে বসে থেকো না, আমাদের নাচে যোগ দাও।'

বললুম,—'মাদার লক্ষ্মী, আমার কোমরে বাত। নাচতে কবিরাজের বারণ আছে।'

(শুনুন কথা! পৃথিবর উপরে—হাউ অন্ আর্থ—কবিরাজ কি করে কল্পনা করতে পারে যে, ষাট বছরের বুড়া গাঁইয়া চাটুয্যের বলড্যান্সের অভ্যাস আছে; আগে ভাগে বারণ করে দিতে হবে!)

'ভনুমতী' বলে ভালোই করেছি। ম্যাজিকের জোরেই শরৎকালে আম ফলানো যায়। দীপক গেয়ে আগুন ধরানো যায়, মল্লার গেয়ে বৃষ্টি নামানো যায়। কিন্তু সত্য সঙ্গীতজ্ঞ নাকি তাতে কণামাত্র বিচলিত না হয়ে বলেন, 'এর চেয়ে ঢের বেশী সার্থক হবে সঙ্গীত যদি সদ্য-বিধবাকে সান্ত্বনা দিতে পারে, স্বাধিকারপ্রমত্তকে শান্ত করতে পারে।'[১] এবং কিছু না করেও যে সার্থক সঙ্গীত হতে পারে সে তো জানা কথা।

১ ধর্মজগতেও এই ম্যাজিকের বড় সম্মান। সাধু সম্বন্ধে যদি গ্রামে রটে তিনি লোহাকে সোনা করতে পারেন, তবে এ বিষয়ে নির্লোভজনও তার

আর্টে এই ম্যাজিক জিনিসটির সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঃ—

গাহিছে কাশীনাথ নবীন যুবা
ধ্বনিতে সভাগৃহ ঢাকি,
কণ্ঠে খেলিতেছে সাতটি সুর
সাতটি যেন পোষা পাখি।
শাণিত তরবারি গলাটি যেন,
নাচিয়া ফিরে দশদিকে,
কখন কোথা যায় না পাই দিশা,
বিজুলি হেন ঝিকমিকে।
আপনি গড়ি তোলে বিপদজাল
আপনি কাটি দেয় তাহা।
সভার লোকে শুনে অবাক মানে,
সঘনে বলে, বাহা বাহা ।।

এখানে বিশেষ করে লক্ষ্য করবার জিনিস, সভার লোকে 'বাহা বাহা' বলছে, কেউ কিন্তু 'আহা আহা' বলে নি।

পার্থক্যটা কোথায় ?

দড়ির উপর নাচ দেখে বলি 'বাঃ', যাদুকর যখন চিরতনের টেক্কাকে ইস্কাপনের দুরি বানায় তখন বলি 'বা রে—'কাশীনাথ যখন গানের টেকনিক্যাল স্কিল (ম্যাজিক) দেখায় তখন বলি, 'বাঃ', কিন্তু যখন কবি গান,

'তোমার চরণে আমার পরানে,
লাগিল প্রেমের ফাঁসি—'

তখন মনে হয়, যেন আমারই বিরহতপস্যা শ্রান্ত ভালে প্রিয়া তাঁর আপন কণ্ঠের যুথীরমালে আমার সর্ব দহনদাহ ঘুচিয়ে দিলেন। চরম পরিতৃপ্তিতে হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে বেরিয়ে আসে, 'আ—আ—হ !'

আশ্চর্য হলে বলি 'বাঃ', পরিতৃপ্ত হলে বলি 'আহ্'। ম্যাজিক 'বাব্বা-

কাছে ধর্মোপদেশ চায়—যেন যে ম্যাজিক দেখায়, সে বুঝি ধর্মও বোঝে। রাজা রামমোহনের সঙ্গে খৃষ্টানদের ঐ নিয়ে বেধেছিল। তিনি খৃষ্টের অলৌকিক কর্মে (জলকে মদে পরিবর্তন করা ইত্যাদি) বিশ্বাস করতেন না। মুসলমানদের ভিতর দুই দল আছেন। একদল বলেন, হজরৎ মুহম্মদ অলৌকিক কর্ম দেখাতে রাজী হতেন না, বলতেন, 'আমি যা বলেছি সেইটা সত্য না মিথ্যা যাচাই করে নাও।' কোনো এক সাধু নাকি ত্রিশ বৎসর সাধনার পর পায়ে হেঁটে নদী পেরোতে পারতেন। তাই শুনে কবীর বলেছিলেন, 'এক পয়সা দিয়ে যখন খেয়া পার হওয়া যায়, তখন ঐ মুর্খের ত্রিশ বৎসরের সাধনার দাম তো এক পয়সা !'

রস বিচারেও বলা যেতে পারে, একটি কাঠি দিয়েই যখন সব কটা প্রদীপ জ্বালানো যায়, তখন ওর জন্যে সঙ্গীতে ত্রিশ বৎসর সাধনা করার কি প্রয়োজন?

বাব্বা', আর্টে 'আহাহা !'

'হাঁ'-কে 'না' করা, 'না'-কে 'হাঁ' করা কঠিন নয়, কিন্তু উভয়কে মধুরতর করাই আর্ট, সেইটে কঠিন, ঐটেই আলংকারিকদের ওয়াটারলু। এবং সব চেয়ে কঠিন, মধুরকে মধুরতর করা। ফুল তো সুন্দর, তাকে সুন্দরতর করা যায় কি করে ? স্বয়ং খৃষ্ট বলেছেন, লিলিফুলকে তুলি দিয়ে রঙ মাখায় কে ?'

অথচ জাপানী শ্রমণ রিয়োকোয়ান রচলেন—

কি মধুর দেখি রেশমের গাছে
ফুটিয়াছে ফুলগুলি
কোমল পেলব করিল তাদের
ভোরের কুয়াশা তুলি।

কি সে ভোরের কুয়াশা তুলি যা সব-কিছুকে মধুর মেদুর, কোমল পেলব করে দেয় ?

দৃষ্টান্ত দেই ঃ—

প্রাচ্য ভূখণ্ড হইতে পবন আসিয়া আমাকে দোদুল্যমান করাতে আমি মুগ্ধ হইয়া 'আ মরি, আ মরি' বলিতেছি—

কবির তুলির পরশ পেয়ে হয়ে যায়; 'পুব হাওয়াতে দেয় দোলা মরি মরি'—

আমি বললুম, সব বনে ছায়া ক্রমে ক্রমে ঘন হইতে ঘনতর হইতেছে—

কবির তুলি লাগাতে হল, 'ছায়া ঘনাইছে বনে বনে।'

কিংবা আমি বললুম, শুক্লপক্ষের পঞ্চদশী রাত্রে পথ দিয়া যাইবার সময় যখন চন্দ্রোদয় হইয়াছে, তখন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল ; তাহাকে কি শুভলগ্ন বলিব, জানি না।

'যেতে যেতে পথে পূর্ণিমা রাতে
চাঁদ উঠেছিল গগনে।
দেখা হয়েছিল তোমাতে আমাতে
কী জানি কী মহা লগনে।'

পাঠক হয় তো বলবেন, 'তুমি বলেছ গদ্যে,—সে যেন পায়ে চলা ; আর কবি বলেছেন ছন্দে—সে যেন নাচা।'

উত্তম প্রস্তাব। ছন্দে বলি,

পথিমধ্যে তোমার সঙ্গে
পূর্ণিমাতে দেখা
বলবো একে মহা লগন
ছিল ভালে লেখা।

কবিতা হল, কিন্তু রসসৃষ্টি হল না।

আর নিখুঁত, নিটোল ছন্দ মিল হলেই যদি কবিতা হয় তবে নিচের কবিতা-টির নোবেল প্রাইজ পাওয়ার কথা ঃ—

হর প্রতি প্রিয় ভাষে কন হৈমবতী
বৎসরের ফলাফল কহ পশুপতি।
কোন গ্রহ রাজা হৈল কেবা মন্ত্রিবর
প্রকাশ করিয়া তাহা কহ দিগম্বর !

অলঙ্কারের দিক দিয়ে কবিতাটি দিগম্বরই বটে।

এই যে তুলি সব-কিছু মধুময় করে তোলে, কি দিয়ে এ বস্তু তৈরী, কি করে এর ব্যবহার শিখতে হয় ? এ কি সম্পূর্ণ বিধিদত্ত না পরিশ্রম করে এর খানিকটে আয়ত্ত করা যায় ?

ঘটিতে টোল দেখলে চট করে টের পাই, কিন্তু নিটোল ঘটি বানাই কি করে ?

আর এই তো সেই তুলি সে যখন আপন মনে চলে তখন সে গীতিকাব্য—লিরিক—'মেঘদূত'। যখন ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত, চরিত্রের ক্রমবিকাশের উপর এর ছোঁয়া লাগে সে তখন কাব্য—'রঘুবংশ'। যখন ধর্মকে ছুঁয়ে যায় সে তখন 'গীতা', 'কুরান', 'বাইবেল'।

আচার্য তেজেশচন্দ্র সেন

রবীন্দ্রনাথ গত হলে বোম্বাইয়ে তাঁর স্মরণে সম্মিলিত এক শোকসভায় শুনতে পাই, 'আসুন আমরা রবীন্দ্রনাথের অকালমৃত্যুতে—'

সেই সর্বব্যাপী শোকের মাঝখানে ঐ 'অকালমৃত্যু' কথাটি শুনে কারো কারো অধরপ্রান্তে ম্লান হাসির সামান্যতম রেখাটি ফুটে উঠেছিল। সকলেই বোধ হয় ভেবেছিলেন, আশীতে পরলোকগমন ঠিক অকালমৃত্যু নয় !

আমি কিন্তু সচেতন হলুম—সত্যই তো, যদিও মহিলাটি হয়তো চিন্তা করে অকালমৃত্যু বাক্যটি ব্যবহার করেন নি, কথাটি অতিশয় সত্য। যে-কবি প্রতিদিন নিত্য নবীনের সন্ধানে তরুণের ন্যায় উদ্গ্রীব, তাকে নব নব রূপে-রসে পরিবেশন করার সময় যাঁর লেখনীতে নবীন অভিজ্ঞতা ও প্রাচীন প্রকাশ-দক্ষতা সমন্বিত হয়, চৈতন্যহীন হওয়ার কয়েক দণ্ড পূর্বেও যিনি অধ্যাত্মলোকে এক নবীন জ্যোতির সন্ধান পেয়ে সে-জ্যোতি কখনো ছন্দ মেনে, কখনো মিল না মেনে তারই উপযোগী ভাষায় প্রকাশ করার সময় কঠিন রোগপীড়ন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন, যিনি আরো দীর্ঘ সুদীর্ঘকাল অবধি আরো নবীন নবীন অভিজ্ঞতার জন্যে প্রস্তুত—আশী কেন দুই শতেও তাঁর লেখনী স্তব্ধ হলে সে মৃত্যু অকালমৃত্যু। পক্ষান্তরে সাহিত্যের ইতিহাসে এমন বহু কবির উল্লেখ পাই, যাঁদের সৃষ্টিসত্তার মৃত্যু হয়েছে চল্লিশে—দেহত্যাগ যদিও তাঁরা করেছেন নবদুইয়ে।

আচার্য তেজেশচন্দ্রের দেহত্যাগ একাত্তরে হয়েও সেটা অকাল দেহত্যাগ। তিনি রবীন্দ্রনাথের ন্যায় বিধিদত্ত অদ্ভুত অদ্ভুত ক্ষমতা নিয়ে জন্মান নি, কিন্তু

এ কথা কেউ অস্বীকার করবেন না, সৃষ্টিকর্তা এই সংসার রঙ্গমঞ্চে যে পার্টে তাঁকে পাঠিয়েছিলেন, সেটি তিনি প্রতিদিন অতিশয় নিষ্ঠার সঙ্গে উদ্‌যাপন করার পর প্রতি রাত্রে প্রস্তুত হতেন আগামী প্রাতে সেই অভিনয় সর্বাঙ্গসুন্দর করার জন্য।

তেজেশচন্দ্রের সহকর্মী মৌলানা জিয়াউদ্দিনের স্মরণে উভয়ের গুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,—

কারো কবিত্ব, কারো বীরত্ব,
কারো অর্থের খ্যাতি—
কেহ-বা প্রজার সুহৃদ্‌ সহায়
কেহ-বা রাজার জ্ঞাতি—

এবং তার পর সামান্য একটু পরিবর্তন করে কবির ভাষাতেই তেজেশচন্দ্রের উদ্দেশে বলি,—

তুমি আপনার শিষ্যজনের
প্রশ্নেতে দিতে সাড়া,
ফুরাতে ফুরাতে রবে তবু তাহা
সকল খ্যাতির বাড়া।

বাস্তবিক এই একটি লোক তেজেশচন্দ্র, যাঁকে স্বভাব-কবির মত স্বভাব-গুরু বা জন্ম-গুরু বলা যেতে পারে। সত্তরেও তাঁর মৃত্যু অকালমৃত্যু।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ষোল-সতের বৎসর বয়সে তিনি শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে আসেন। আশ্রম-স্থবিররা কেউই ঠিক বলতে পারেন না, তিনি এখানে গুরুরূপে না শিষ্যরূপে এসেছিলেন। তবে এ-কথা সত্য, অল্পদিনের ভিতরই তিনি শিক্ষকতা আরম্ভ করে দেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে, ষোল বৎসরের বালক জানেই বা কি—কটা পাস দিয়েছে, সেটা না-হয় বাদই দেওয়া গেল—পড়াবেই বা কি?

এ-প্রথা এদেশে অপ্রচলিত নয়। গুরুগৃহে বিদ্যাসঞ্চয় করার সময় কনিষ্ঠকে বিদ্যাদান করার প্রথা এদেশে আবহমানকাল থেকে চলে আসছে। গ্রামের পাঠশালাতে এখনো 'সর্দার পড়ুয়া' নিচের শ্রেণীতে পড়ায়।

তারপর তিনি দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করেছেন। এত দীর্ঘ-কাল ব্যাপী অধ্যাপনা নাকি পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

শুনেছি, শান্তিনিকেতন বিহঙ্গশাবক যখন একদিন পক্ষবিস্তার করে মহানগরীর আকাশের দিকে তাকালে—অর্থাৎ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে চাইলে—তখন তেজেশচন্দ্র নাকি কুণ্ঠিত স্বরে রবীন্দ্র-নাথকে বলেছিলেন, 'আমি তাহলে প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে পাসটাসগুলো করি।' রবীন্দ্রনাথ নাকি হেসে বলেছিলেন, 'ওসব তোমাকে করতে হবে না!'

কিন্তু এই পঞ্চাশ বৎসরের স্বাধ্যায়লব্ধ বিষয়বস্তু কি?

সঙ্গীতে তার বিধিদত্ত প্রতিভা ছিল। তিনি বেহালা বাজাতে পারতেন। ওদিকে শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথ বিলাতি বাদ্যযন্ত্র বর্জন করেছিলেন। একমাত্র

তেজেশচন্দ্রকেই দেখেছি রবীন্দ্রনাথের সামনে যখন দিনেন্দ্রনাথ বর্ষামঙ্গল বসন্তোৎসব ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের সমবেত সঙ্গীত পরিচালনা করতেন, তখন তেজেশচন্দ্র বেহালা বাজাতেন। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের স্বরলিপি, গায়নপদ্ধতি গায়কী ঘরানা নিয়ে কিছুদিন ধরে যে ভুতের নৃত্য আরম্ভ হয়েছে, তার ভিতরে তিনিই ছিলেন বিজ্ঞ রবীন্দ্র-সঙ্গীতসুরজ্ঞ। তাঁর নাম কেউ করেন নি—তিনিও তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বেঁচেছিলেন।

সাহিত্যে তাঁর প্রচুর রসবোধ ছিল। ১৯১৯/২০ সালে যখন শান্তিনিকেতনে ফরাসী ভাষা শিক্ষার সূত্রপাত হয় তখন তিনি অগ্রণী হয়ে, ফরাসী শিখে আনাতোল ফ্রাঁসের রচনা বাঙলার অনুবাদ করেন ও তখনকার 'শান্তিনিকেতন' মাসিক পত্রিকায় পর পর প্রবন্ধ লেখেন। সুদূর শ্রীহট্টে বসে সেগুলো পড়ে আমি বড়ই উপকৃত হই। এই তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম চিন্ময় এবং বাঙ্ময় পরিচয়।

শান্তিনিকেতন প্রধানত সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রকলার পীঠভূমি। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ্যে একাধিকবার ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন যে তিনি অর্থাভাবে এখানে সামান্যতম লেবরেটরি নির্মাণ করে বিজ্ঞান-চর্চার কোনো ব্যবস্থা করতে পারেন নি। তাঁর সে শোক কথঞ্চিৎ প্রশমিত করেছিলেন, জগদানন্দ রায় ও তেজেশচন্দ্র সেন। বিজ্ঞানাগার ছাড়াও কোনো কোনো বিজ্ঞান অন্তত কিছুটা শেখা যায়। উদ্ভিদবিদ্যা ও বিহঙ্গজ্ঞান। আরও একাধিক সম্পূর্ণ বিজ্ঞান তিনি আয়ত্ত করেছিলেন, কিন্তু ঐসব বিষয়ে আমার কণামাত্র সঞ্চয় নেই বলে, তেজেশ-চন্দ্রের প্রতি অবিচার করার ভয়ে নিরস্ত হতে হল।

এই সব জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করার সময় তেজেশচন্দ্রের সম্মুখে অহরহ থাকতো তাঁর ছাত্রসমাজ। সাধক মাত্রই চারুসর্বাঙ্গ অমূর্ত জ্ঞানের সন্ধান করেন—তেজেশচন্দ্রও তাই করতেন—কিন্তু তিনি বার বার সেই ছাত্রসমাজকে স্মরণ করে তাদের যা দরকার, তার বাইরে সহজে যেতে চাইতেন না। তিনি তাঁর জীবনসাধনা দিয়ে প্রমাণ করেছেন, মানুষের শক্তি অসীম নয়, ছাত্রসেবাই যদি করতে হয়, তবে তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে অন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করবে।

তাঁর বহু শিষ্যই জানতো, তিনি বিজ্ঞানের গভীর থেকে মুক্তা আহরণ করে তাদের সামনে ধরেছেন—পরবর্তীকালে ভালো ভালো বিজ্ঞানাগার থেকে এম. এস-সি পাস করার পর অনেকেই সেটা আরো পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করেছে। এদের কেউ কেউ যখন সাংবাদিক-জগতে প্রবেশ করল, তখন তাদের অনুরোধের তাড়নায় তিনি সেগুলি প্রবন্ধাকারে লিখে দেন। 'আনন্দবাজারে' 'দেশে' তাঁর প্রচুর লেখা বেরিয়েছে। এই তো সেদিন মাত্র কলকাতা থেকে আমার উপর তাগিদ এল, তেজেশবাবুর পিছনে লেগে থাকো, যতক্ষণ না তাঁর লেখাটি শেষ হয়।

ছেলেবেলায় আমরা এই শান্তিনিকেতনে দেখেছি ছাতিমফুল, শালফুল আর বকুল। খোয়াইভাঙাতে আনন্দ। তাই এই তিনটি প্রথমোক্ত কবিজনবল্লভ পুষ্প-বন্দনা যখন নিতান্তই শেষ হয়ে গেল, তখন রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—

'যেদিন প্রথম কবি-গান
বসন্তের জাগাল আহ্বান
ছন্দের উৎসব সভাতলে,
সেদিন মালতী যূথী জাতি
কৌতুহলে উঠেছিল মাতি
ছুটে এসেছিল দলে দলে।
আসিল মল্লিকা চম্পা কুরুবক
কাঞ্চন করবী
সুরের বরণমাল্যে সবারে
বরিয়া নিল কবি।
কী সংকোচে এলে না যে,
সভার দুয়ার হল বন্ধ
সব পিছে রহিল আবন্দ।

মোটামুটি ঐ সময়ে হঠাৎ দেখা গেল, তেজেশচন্দ্র সেন মাথায় সাঁওতালি টোকা, হাতে নিড়েন নিয়ে ১১৪ ডিগ্রী গরমে আশ্রমের সর্বত্র খোঁচাখুঁচি আরম্ভ করেছেন। কি ব্যাপার? তিনি তাঁর ষোল বৎসরের সঞ্চিত উদ্ভিদবিদ্যা কাজে লাগিয়ে হাতে-নিড়েনে দেখিয়ে দেবেন, এই কাঁকর-বালি-উই-পাথর, ক্ষণে জলাভাব ক্ষণে অতিবৃষ্টির খোয়াইভাঙাতেও মরসুমী ফুল ফোটানো যায়। বাধ্য হয়ে 'আকন্দে' যাবার প্রয়োজন নেই।

আজকের লোক এ সব সহজে বিশ্বাস করবেন না। এখানে এখন ভারতের সব ফুল তো ফোটেই, তার ওপর ফোটে নানা বিদেশী ফুল, এমন কি অযত্নে আগাছার মত - রবীন্দ্রনাথের বহু বিদেশী শিষ্য-সখা এগুলো নানা দেশ থেকে তেজেশচন্দ্রের কৃতকার্যতার পর এখানে পাঠাতে আরম্ভ করেন। রবীন্দ্রনাথের 'বনবাণী'তে তার অনেকখানি ইতিহাস আছে। আজ যে 'উত্তরায়ণে' এত ফুলের বাহার, সেটা সম্ভব হল তেজেশচন্দ্রের পরীক্ষা সফল হল বলে।

বোধ হয় এই সফলতা জানিয়েই তিনি রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লেখেন। প্রভাত মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্র-জীবনীতে লিখেছেন, 'ভিয়েনা প্রবাসকালে কবিকে শান্তিনিকেতন হইতে তথাকার পুরাতন শিক্ষক তেজেশচন্দ্র সেন গাছপালা সম্বন্ধে কতকগুলি রচনা পাঠাইয়া দেন। তাহার উত্তরে (২৩ শে অক্টোবর, ১৯২৬) কবি লিখিতেছেন, "তোমার লেখাগুলির মধ্যে শান্তিনিকেতনের গাছপালাগুলি মর্মরধ্বনি ক'রে উঠচে! তাতেই আমার মন পুলকিত করে দিল।" পরবর্তী কালে তাঁর উদ্দেশে আবার লিখেছেন,

'একথা কারো মনে রবে কি কালি,
মাটির পরে গেলে হৃদয় ঢালি।'

কার্তিকের বউ কলাগাছ। অকৃতদার তেজেশচন্দ্র বরণ করেছিলেন একটি তালগাছকে। আমার মনে হয় শান্তিনিকেতনের প্রতীক সপ্তপর্ণী না হয়ে তালগাছ হওয়া উচিত। এখানকার আদিম ছাতিম গাছটি খুঁজে বের করতে হয়।

অথচ এখানে পেঁছিবার বহু পূর্বেই দূর থেকে দেখা যায়, আশ্রমের এদিক-ওদিক সারি সারি তালগাছ প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে দিগন্তের পানে তাকিয়ে আছে অপ্রত্যাশিত মিত্রের আগমন আশঙ্কায়। তালগাছগুলি যে যুগের, তখন বীরভূমে ডাকাতের অনটন ছিল না। দ্বিজেন্দ্রনাথকে বলতে শুনেছি (১৯২৫) তিনি যখন চল্লিশ বৎসর পূর্বে এদেশে প্রথম আসেন, তখনো ঐ তালগাছ-গুলোর ঐ উচ্চতাই ছিল।

শান্তিনিকেতনে বোধ হয় এমন কেউ আসেন নি যিনি, একটি তালগাছকে ঘিরে গোল একখানা কুটির দেখেন নি। মন্দিরে উত্তর-পূর্ব কোণে, ডাকঘরের প্রায়-মুখোমুখি। এটি তেজেশচন্দ্রের নীড়।

রবীন্দ্রনাথের 'বনবাণী'তে একটি কবিতা আছে 'কুটিরবাসী'। কবিতাটির ভূমিকা-স্বরূপ তিনি লেখেন,

তরুবিলাসী আমাদের এক তরুণ বন্ধু এই আশ্রমের কোণে পথের ধারে এক খানি গোলাকার কুটির রচনা (এখানে লক্ষণীয় নির্মাণ নয়—'রচনা') করেছেন। সেটি আছে একটি পুরাতন তালগাছের চরণ বেষ্টন ক'রে। তাই তার নাম হয়েছে তালধ্বজ। এটি যেন মৌচাকের মতো নিভৃতবাসের মধু দিয়ে ভরা। লোভনীয় বলেই মনে করি, সেই সঙ্গে এও মনে হয়, বাসস্থান সম্বন্ধে অধিকার-ভেদ আছে ঃ যেখানে আশ্রয় নেবার ইচ্ছা থাকে সেখানে হয়তো আশ্রয় নেবার যোগ্যতা থাকে না।'

তেজেশ-শিষ্যমণ্ডলীর কাছে 'কুটিরবাসী' কবিতাটি সুপরিচিত। এর দুটি পাঠ আছে। পাঠকমাত্রকেই এ-দুটি মর্মস্পর্শী কবিতাটি পড়তে অনুরোধ করি। আমি মাত্র কয়েকটি ছত্র তুলে দিচ্ছি—

'তোমারি মত তব
কুটিরখানি,
স্নিগ্ধ ছায়া তার
বলে না বাণী।
তাহার শিয়রেতে তালের গাছে
বিরল পাতা ক'টি আলোয় নাচে,
সম্মুখে খোলা মাঠ
করিছে ধু-ধু
দাঁড়ায়ে দূরে দূরে
খেজুর শুধু।
কীর্তিজালে ঘেরা আমি তো ভাবি
তোমার ঘরে ছিল আমারো দাবি;
হারায়ে ফেলেছি সে
ঘূর্ণিবায়ে,
অনেক কাজে আর,
অনেক দায়ে।'

যাঁর সরল, নিষ্কাম জীবন দেখে বিশ্বকবি পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে আপন মনে নিজের সম্বন্ধে জমা-খরচ নিতে গিয়ে ক্ষুব্ধ হয়েছেন, তাঁর সম্বন্ধে আমাদের আর বেশী কিছু বলার কি থাকতে পারে ?

শুধু এইটুকু বলি—তেজেশচন্দ্র নির্জন লোকচক্ষুর অগোচরে থাকতে ভালোবাসতেন। তাই যাবার সময়ও তিনি সকলের অগোচরে চলে গেলেন। ভোরবেলা জাগতে গিয়ে দেখা গেল, লোকচক্ষুর অগোচরে তিনি চলে গিয়েছেন॥

নাত্যুচ্চশিক্ষা

এদেশে ছেলেদের প্রায় সবাই ম্যাট্রিক পাসের পর কলেজ পানে ধাওয়া করে। তার কারণ কি এদেশের গুণীজ্ঞানীরা 'উচ্চশিক্ষা চাই' 'উচ্চশিক্ষা চাই' বলে বড্ডবেশী চেচামেচি করেছেন বলে! তাঁরা তো আরো বেশী হট্টগোল করে বলেন, 'সিনেমা ফুটবলে অত বেশী যাস নি', 'রকবাজি কমা', 'পরীক্ষার হলে আসবাব পত্র ভাঙিস নি', কই, কেউ তো শোনে না। উচ্চশিক্ষার বেলাতেই হঠাৎ তাদের অত্যধিক মুরুব্বী-মহব্বৎ বেড়ে যাবে এ-কথা তো চট করে বিশ্বাস করা যায় না। আসলে তারা কলেজ পানে ধাওয়া করে দুই কারণে,

(ক) ম্যাট্রিক পাস করার পর অন্য কিছু করার নেই বলে, এবং

(খ) চাকরি পেতে হলে বি এ-টা অন্তত থাকা চাইই।

এ অবস্থাটা আমাদের দেশের একচেটে নয়। অন্যান্য দেশেও এটা মধ্যে মধ্যে হয়ে থাকে। একটা উদাহরণ দিই।

আশা করি, একথা কেউ বলবেন না, জর্মনি অশিক্ষিত দেশ। সেখানে আমি যখন ১৯২৯ সালে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকি, তখন দেখি দুই পিরিয়ডের মধ্যে করিডরে করিডরে এত ভিড় যে চলা-ফেরা করা রীতিমত কষ্টের ব্যাপার।

আমি আশ্চর্য হই নি। ভেবেছিলুম, জর্মন উচ্চশিক্ষিতদের দেশ, ভিড় হবে না কেন? কিছুদিন পরে কিন্তু আমার ভুল ভাঙলো, যখন শুনলুম, এক অধ্যাপক দুঃখ করে বলছেন, 'এত বেশী ছেলেমেয়ে এসে ভিড় জমিয়েছে যে পড়াই কি করে?' আমি তাঁকে জিজ্ঞেসবাদ করে জানতে পারলুম, জর্মনিতে ছেলে-মেয়েরা ১৭।১৮।১৯ বছর বয়সে ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়ে বা পাস করে সচরাচর কাজকর্মে চাকরি-বাকরিতে ঢুকে যায়; মাত্র কিছু সংখ্যক (ক) মেধাবী ছেলেমেয়ে—উচ্চশিক্ষার প্রতি যাদের একটা প্রাণের টান আছে—তারা, (খ) যে সব অধ্যাপক, জজ, ব্যারিস্টারের পরিবারে অনেক পুরুষ ধরে উচ্চশিক্ষার ঐতিহ্য আছে তাদের ছেলেমেয়ে (কোনো কোনো ক্ষেত্রে মেধাবী না হয়েও) এবং (গ) উচ্চশিক্ষার পালিশ-লোভী হঠাৎ-নবাবদের দু একটা ছেলেমেয়ে—এই তিন শ্রেণীর ছাত্রই পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতো (মেধাবী ছেলেদের প্রায় সবাই স্কলারশিপ পায় এবং আর গাধাদের উঁচু মাইনে দিতে হয় 'নাকের ভিতর

দিয়ে,) এবং অধিকাংশই সেই কারণে উচ্চশিক্ষার জন্য উৎসুক এবং শাস্ত্রাধিকারী। এখন অর্থাৎ ১৯২৯ সালে বেকারের সংখ্যা এত অসম্ভব রকমে বেড়ে গিয়েছে যে ছেলেছোকরারা, এমন কি মেয়েরাও কাজকর্মে চাকরি-বাকরিতে কোনো রকম ওপ্নিং না পেয়ে বেনো জলের মত বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকছে।

এই তো গেল ১৯২৯-এর কথা। ৩০।৩১।৩২ ক্রমাগত এদের সংখ্যা বেড়েই চললো। ১৯৩৩-এ হিটলার জর্মনির চ্যানসেলর হলেন। আমি দেশে ফিরে-ছিলুম ৩২-এ।

১৯৩৮ ফের জর্মনি বেড়াতে গিয়ে আমার এক বন্ধ অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা করতে যাই বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রথমটায় ভেবেছিলুম, ছুটির দিন বুঝি, না হলে করিডরগুলি অত ফাঁকা কেন? অধ্যাপক বুঝিয়ে বললেন, বিশ্ববিদ্যালয়টাই ফাঁকা; হিটলার বেকার সমস্যা সমাধান করে দেওয়াতে ছেলেরা এখন ম্যাট্রিক পাস না-পাস করেই কাজে ঢুকে যায়, পয়সা কামাচ্ছে বলে বিয়ে করছে, তাই মেয়েরাও কলেজে আসছে না, এমন কি মেধাবী ছেলেদের অনেকেই বলে, ৬।৭ বছর ঘণ্টে ঘণ্টে পাস করে যখন কাজে ঢুকবো তখন দেখবো যারা ৬।৭ বছর আগে ঢুকেছিল তারা কামাচ্ছে বেশী। লাভ? বেনোজল এখন ভাঁটার টানে খাবার জলও টেনে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

আমার আশ্চর্য বোধ হল। আমার বিশ্বাস ছিল ধনী দেশে (যেখানে বেকার নেই) বুঝি উচ্চশিক্ষার তৃষ্ণা বেশী, গরীব দেশে কম। এখন দেখি উল্টো!

এ বিষয় নিয়ে আমি অনেক চিন্তা করেছি। ফলস্বরূপ আমার যে ধারণা হয়েছে সেটা যে আমি সপ্রমাণ করতে পারবো তা নয়। তবে আপনারা চিন্তা করে দেখতে পারেন।

মানুষ যা চায় পারতপক্ষে সেই দিকেই ধায়। ১৮।১৯।২০ বৎসরে মানুষ আপন হাতে কিছু একটা করতে চায়, গড়তে চায়, ঐ সময়ে তার স্বাধীনতা প্রবৃত্তিটা প্রখরতর হয় বলে কিছু-একটা অর্থকরী করতে চায়, এবং তৃতীয়ত সে তখন সঙ্গিনী খুঁজতে আরম্ভ করে। মোদ্দা কথা, সে তখন আপন বাড়ি বেঁধে, বউ এনে পয়সাকড়ি কামিয়ে ছা-পোষা গেরস্ত হতে চায়।

প্রাচীন ভারতে কি ব্যবস্থা ছিল?—ধরে নিচ্ছি আমরা তখন এতখানি বেকার গরীব ছিলুম না। গুণীজ্ঞানীরা আমাকে বললেন, 'ঐ ১৭।১৮।১৯-এ গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য সমাপন—অর্থাৎ লেখাপড়া শেষ করে—গৃহস্থাশ্রমে ঢুকতো, অর্থাৎ বিয়ে-শাদী করে টাকা পয়সা কামিয়ে সংসার চালাতো। তবে হ্যাঁ, দীর্ঘতর ব্রহ্মচর্যের ব্যবস্থাও ছিল; ২৬।২৮।৩০-এ সংসারধর্মে প্রবেশ করছে, এ-ও হয়।' বুঝলুম, এই শেষের দল, আমাদের আজকের দিনের বি এ, এম. এ, পি এচ. ডি. কিংবা আরো সুপার পি. এচ. ডি.'র দল।

লেখাপড়া করাটা কি খুব স্বাভাবিক, না সকলের পক্ষে আনন্দের বিষয়? দিনের পর দিন ৩০।৪০।৫০ বছর পর্যন্ত একটা লোক বইয়ের ভিতর মুখ গুঁজে

বসে আছে, মাঝে মাঝে কাগজে খসখস করছে এইটে স্বাভাবিক, না ফসল ফলানো, খাল কাটা, এমারৎ তোলা, দোকানপাট চালানো, ঐসব কর্মে দৌড়-ঝাঁপ করা, শরীরের অবাধ চলাচল চালু রাখা—এসব স্বাভাবিক ? অবশ্য ভাববেন না, এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক বুঝি সংসারে ঢুকে সব রকম লেখাপড়া একদম বন্ধ করে দেয়। অবসর সময় যার যে রকম রুচি সে রকম করে। বস্তুত ইয়োরোপে প্রায়ই দেখতে পাবেন, ম্যাট্রিক পাস পাদ্রী (পরে কিছু ধর্মশিক্ষা করেছে মাত্র) অবসর সময়েই অধ্যয়নের ফলে ভূতত্ত্ব, পুরাতত্ত্বে নাম করেছে,—টমাস মানের মত প্রচুর সাহিত্যিক আছেন যাঁরা কখনো কলেজ যান নি। আর লেখালেখি করে নাম করাটাই তো সব চেয়ে বড় কথা নয়। কাজ-কর্মে, লোকসেবার মাধ্যমে, পরিবার পালন করে, অবসর সময় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনার ভিতর দিয়ে মানুষ জীবনকে যতখানি সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারে, কর্ম-অভিজ্ঞতা-জ্ঞান দিয়ে জীবনকে যতখানি মধুময় এবং ঐশ্বর্যশালী করতে পারে সেইটেই তো বড় কথা। পক্ষান্তরে পাণ্ডিত্যে যাদের স্বভাবসিদ্ধ অনুরাগ তারা উচ্চশিক্ষা লাভ করে ঐ কর্মে লিপ্ত হবে।

অবশ্য মনে রাখতে হবে কন্টিনেন্টে ১৭।১৮-এর পূর্বে কেউ ম্যাট্রিক পাস করে না। এবং তাদের ঐ সময়ের ভিতর এমনই নিবিড় (inten-e) শিক্ষা দেওয়া হয় যে ওরই কল্যাণে পরবর্তী জীবনে সে অনেক কিছু আপনচেষ্টাতেই শিখতে পারে, রস নিতে পারে।

এদেশে ছেলেমেয়েকে ১৭।১৮ অবধি ইস্কুলে রাখুন আর নাই রাখুন, উত্তম পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করুন আর নাই করুন, প্রশ্ন এই তারা বেরিয়ে এসে করবে কি ? কৃষি, বাণিজ্য, কলকব্জা বানানো, ম্যাট্রিকে তাকে যাই শেখান না কেন, বাইরে এসে তার ওপনিং কোথায় ? যত ভালো কৃষিই সে শিখুক না কেন, গ্রামে যেটুকু জমি সে যোগাড় করতে পারবে তাতে সে জাপানের ড্রাই-ফার্মিংই করুক আর আইরল্যান্ডের কো-অপারেটিভই করুক, ঐ দিয়ে আণ্ডা-বাচ্চা পুষতে পারবে ? আমি সাধারণ প্রতিভাবান ছেলেকে তিন বছরে তিনটে বিদেশী ভাষা শিখিয়ে দিতে পারি, যার জোরে সে ইয়োরোপে ভাল কাজ পাবে। এখানে ?

কাজেই বাইরের অনুকূল পরিস্থিতি, আবহাওয়া, ওপনিংও সৃষ্টি করতে হবে। তা সে দেশকে ইনডাসট্রিয়ালাইজ বা এগ্রিকালচারাইজ বা অন্যান্য যা-কিছু হোক সে সব 'আইজ' করে, কিংবা অন্য কিছু করে। সেটা কি করে করতে হয় আমি জানি নে।

ততদিন কলেজে কলেজে ভিড়। অনিচ্ছুক লেখাপড়া করবে—আখেরে যার কোনো মূল্যও নেই। দেশের অর্থক্ষয়, শক্তিক্ষয়। সর্ব অপচয়।

কথায় বলে, 'ওরে পাগল, কাপড় পরিস নে কেন ?' পাগল বললে, 'পাড় পছন্দ হয় না।' আমাদের হয়েছে উল্টোটা। ভাবছি, 'উচ্চশিক্ষার' যত বস্তা বস্তা কাপড় ছেলের ঘাড়ে পিঠে বাঁধবো ততই সে সুবেশ নটবর হবে॥

ইংরেজের সুনাম, সে স্বদেশপ্রেমী। বিদেশে প্রত্যেক ইংরেজকেই তাই তার দেশের 'বেসরকারী' রাজদূত বলা হয়। মুসলমান মাত্রই মিশনারী। বিধর্মীকে ইসলামে টেনে আনার মত পুণ্য তার কাছে কমই আছে। এবং সে পুণ্যের বিনিময়ে অর্থগ্রহণ মহাপাপ। ইসলামে তাই মাইনে দিয়ে বা অন্য কোনো প্রকারের অর্থসাহায্য করে মিশনারী সম্প্রদায় গড়া হয় না। প্রত্যেক মুসলিম ব্যবসায়ীই তার ধর্মের মিশনারী। আফ্রিকায় এখনও মুসলমান হাতির দাঁতের কারবারী অনারারি মিশনারী পাল্লা দেয় মাইনে-খোর খৃষ্টান মিশনারীর সঙ্গে। মাইনে নেওয়ার অসুবিধা এই যে বিধর্মী স্বভাবতই সন্দেহ করে যে মিশনারী তার ধর্মপ্রচার করছে সে শুধু নিজের পেট পোষবার জন্য।

আরব বণিকরা সমুদ্রপথে চট্টগ্রাম অঞ্চলে এসে বেকার হিন্দু মাঝিমাল্লাকে আহ্বান জানালে, 'এসো আমাদের নৌকায় করে—দেশ-দেশান্তরে ব্যবসা-বাণিজ্য করবে, মাঝিমাল্লার কাজ করবে, তোমার শ্রীবৃদ্ধি হবে। তুমি সমাজচ্যুত হবে? আমি তোমাকে আমার সমাজে গ্রহণ করবো। সে সমাজ ক্ষুদ্র নয়। তুমি লাভবান হবে। আর আমার সমাজে নবদীক্ষিতের সম্মান সর্বোচ্চ এবং আমার সমাজে জাতিভেদ নেই।'

মুসলমানদের সুবিধা এই ছিল যে তাদের পূর্বে যারা এসেছিল তারা আপন ধর্মে অন্য লোককে দীক্ষিত করতো না, এবং আরব মুসলিমদের ভিতর যে সাম্যবাদ অত্যন্ত প্রখর সে কথা সবাই জানে।

আমার বিশ্বাস এই করে ইসলাম পূব বাঙলায় প্রচারিত হয় ৭।৮।৯ম শতাব্দীতে।

হিন্দুসমাজের আরেকটা বিপদ যে মানুষ সেখানে অনিচ্ছায় জাতিচ্যুত হতে পারে। কোনো হিন্দু যদি ভালোবাসা বশত ধর্মান্তরিত তার ভাই মুসলমান বা খৃষ্টানকে তার বাড়িতে তার সঙ্গে খেতে বসতে দেয় তবে সমাজ সে হিন্দুকেও বর্জন করে। মুসলমান যদি তার খৃষ্টান ভাইকে বাড়িতে থাকতে দেয় তবে সমাজচ্যুত হয় না। তাকে পরিষ্কার বলতে হয়, সে ইসলামে বিশ্বাস করে না, তবে সে সমাজচ্যুত হবে। হিন্দু তার ধর্মে বিশ্বাস রেখেও সমাজচ্যুত হতে পারে। রামমোহন, আদি ব্রাহ্মসমাজের কথা স্মরণ করিলেই কথাটা সুস্পষ্ট হয়।

কাজেই কোন মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত নাবিক তার হিন্দু চাষা ভাইয়ের বাড়িতে আশ্রয় পেলে তারও জাত যেত। সবাই যে আশ্রয় দিয়েছে তা নয়, কিন্তু যারা দিয়েছে তারা শেষ পর্যন্ত ইচ্ছা-অনিচ্ছায় মুসলমানই হয়ে গিয়েছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এতটা ছড়ালো কি করে? তার একটি তুলনা দিতে পারি। প্যালেস্টাইন থেকে প্রথম প্রথম যে সব খৃষ্টানদের রোমে ক্রীতদাসরূপে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তাদের কি ভাবে সিংহের মুখে ফেলে দেওয়া হত সে ছবি অনেকেই নিশ্চয় সিনেমায় দেখেছেন—কুও ভাদিস্ পুস্তক কিংবা ছবি এদেশেও অপরিচিত নয়। অথচ এদেরই সংখ্যা একদিন এমনই বেড়ে গেল যে

সে দেশের সীজারকেও শেষটায় খৃষ্টান হতে হল। এবং আশ্চর্য, রোমের পোপকে আজকেও রোমান সম্প্রদায়ের লোক হতে হয়। এরও জন্য উদাহরণ আছে। ইসলামের শেষের দিকের খলীফারা তুর্ক। আরব রক্ত এদের গায়ে একেবারেই নেই।

এবং খিলজীর বঙ্গাগমনের পূর্বেই বণিকদের কাছে খবর পেয়ে আস্তে আস্তে ধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত (বণিকরা মিশনারী বটেন, কিন্তু সব সময় শাস্ত্রী হন না) সদাচারী মুসলমান সাধুসন্ত পূর্ববঙ্গে আসতে আরম্ভ করেন। এঁদের নাতি-বিস্তৃত খবর এবং আমাদের মূল বক্তব্য নিয়ে আলোচনা পাঠক পাবেন ডক্টর মহম্মদ এনামুল হকের বই 'পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম' পুস্তিকায়। আমাদের এই নিয়ে অনেক মতভেদ আছে সত্য[১] কিন্তু আমাদের মূল সিদ্ধান্ত একই—সমুদ্রপথেই ইসলাম পূব বাঙলায় আসে! মমাগ্রজ সৈয়দ মরতুজা আলী সাহেবের চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্ট সম্বন্ধে লিখিত একাধিক প্রবন্ধে পাঠক আরো খবর পাবেন।

এই সাধু-সন্তরা ইসলাম প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন সন্দেহ নেই এবং হিন্দু রাজা তথা জনসাধারণ বিধর্মী সাধু-সন্তদের প্রতিও আকৃষ্ট হন এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু মূল তত্ত্ব এই যে বণিকরা কতকগুলো কেন্দ্র নির্মাণ না করে থাকলে এঁরা অতখানি করতে পারতেন না। একটি উদাহরণ নিবেদন করি: ভারতবর্ষের সর্বত্র সুপরিচিত পাঁচজন চিশতী সম্প্রদায়ের সন্তদের মধ্যে তিনজনের কর্মভূমি ও সমাধি দিল্লীতে। কুৎবউদ্দীন বখতিয়ার কাকী (এঁর কবর কুৎবমিনারের কাছে), নিজামউদ্দীন (এঁকে নিয়েই দিল্লী দূর অস্‌ৎ গল্প), এবং নাসিরউদ্দীন চিরাগ দিল্লী বহু শিষ্য পেয়েছিলেন কিন্তু এঁরা ধর্ম পরিবর্তন করেন নি, দিল্লীতে এখনো তাঁদের উর্সপর্বে হিন্দু এবং শিখ ভক্ত অধিকতর এবং সর্বপ্রধান কথা—দিল্লী কখনো মুসলমান প্রধান হয় নি।

মুসলমান বাদশারা কতখানি সাহায্য করেছিলেন? আমার বিশ্বাস, অল্পই। যেখানে শুধুমাত্র অস্ত্রবলে বিধর্মী এসে রাজ্য স্থাপন করে—পূর্বে যেখানে বিজয়ীর আপন ধর্মীয় কেউ ছিল না—সে সেখানে যদি প্রজার ধর্মে হস্তক্ষেপ করে তবে তাকে বেশী দিন রাজত্ব করতে হয় না। পূর্ব বাঙলায় পরিস্থিতি অন্য রকম ছিল। রাজারা পূর্ব দীক্ষিত মুসলমানদের সুখ-সুবিধা দিয়ে প্রতিবেশী হিন্দুকে আকৃষ্ট করতে পারতেন।

কু দ্য পালে (রাজপ্রাসাদে হঠাৎ রাজাকে সরানো), কু দেতা (দেশে হঠাৎ সশস্ত্র বা বেআইনী রাষ্ট্র পরিবর্তন) এ ফরাসী কথাগুলো আমাদের কাছে এখন সুপরিচিত। বিশেষ করে সুয়েজ থেকে আরম্ভ করে চীন পর্যন্ত এ ঘটনা এখন নিত্য নিত্য হচ্ছে।

১ খলীফা হারুন অর্ রশীদের ৭৮৮ খৃ. মুদ্রিত একটি মুদ্রা পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসস্তূপে আবিষ্কৃত হয়েছে। এ আবিষ্কারের মূল্য আমি খুব বেশী দিই না—হক সাহেব দেন।

বখতিয়ার খিলজী অষ্টাদশ অশ্বারোহী নিয়ে করেছিলেন, কু দ্য পালে। সেটা কিছু অসম্ভব নয়। কিন্তু প্রশ্ন, পরদিনই রাজার সৈন্যরা এসে লড়াই দিল না কেন ?

তবে কি জনসাধারণ, সৈন্যদল রাজার আচরণে অসন্তুষ্ট ছিল ? কোনো কোনো ঐতিহাসিক সে ইঙ্গিত দিয়েছেন। এর দৃষ্টান্তও আছে। আরবের মুষ্টিমেয় প্রথম সৈন্যবাহিনী যখন মরুভূমি অতিক্রম করে মহাপরাক্রান্ত ইরান রাজকে আক্রমণ করলো তখন সেই বিরাট শক্তিশালী রাজবাহিনী অতিশয় অনিচ্ছায় যুদ্ধে নামল। আরবরা বিজয়ী হল। ইয়োরোপীয় ঐতিহাসিকরা বলছেন, ইরানে তার পূর্বেই খবর রটে গিয়েছে, হজরৎ মুহম্মদ নামীয় এক আরব মহাপুরুষ হ্যাভনট্‌ নিঃস্বদের জন্য নূতন আশার বাণী নিয়ে এসেছেন। এরা সে ধর্মে বিশ্বাসী।

আমার প্রশ্ন, তবে কি পূব বাঙলার মুসলমান তখন অসন্তুষ্ট জনসাধারণের মধ্যে হজরতের বাণী হোক আর নাই হোক খিলজীকে পরিত্রাণ কর্তারূপে, কিংবা যে কোনো মুসলমান অভিযানকারীকে ঐ রূপে অঙ্কিত করে এমনই আবহাওয়ার সৃষ্টি করে রেখেছিল যে খিলজী তার কু দ্য পালেকে পরে কু দেতাতে পরিবর্তিত করতে পেরেছিলেন ? ॥

গেজেটেড অফিসার কবি

এ সংসারে দীনবন্ধুর বড়ই অভাব। তবে জগবন্ধুর কল্যাণে এ অধমের দু'-একজন আছেন। তাঁরা মাঝে-মধ্যে দয়া করে আমাকে দু'একখানা অতিশয় উচ্চাঙ্গের, সাতিশয়, 'হাইব্রাও'—'উন্নাসিক' মাসিক পাঠান। আগের দিন হলে আমার আর কোনো দুঃখ রইত না। এসব মাসিক থেকে চুরি করে হপ্তার পর হপ্তা দিব্য অরিজিনাল লেখা লিখে দেশে নাম করে ফেলতুম, কারণ এদেশে ক'টা গ্যোটে আছেন যে আমার লেখা পড়ে বলবেন, 'মহাশয়, আপনার লেখাতে অনেক অরিজিনাল এবং অনেক সুন্দর কথা আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় যেগুলো অরিজিনাল সেগুলো সুন্দর নয়, আর যেগুলো সুন্দর সেগুলো অরিজিনাল নয়।' চুরি করতে এখন অসুবিধাটা কি ? সব চেয়ে বড় অসুবিধা, ত্রিশ বৎসর আগেও আমি এসব লেখা পড়ে বেশ বুঝতে পারতুম, এখন আর পারি নে। তার কারণ, ইয়োরোপীয় লেখকের অধিকাংশই, ইংরিজীতে যাকে বলে বিউইল-ডার্ড—হতভম্ভ দিক্‌ভ্রান্ত, মাথা গুবলেট—যা খুশি বলতে পারেন। নিজের কৃষ্টি-কলচর সম্বন্ধে এদের মনে দ্বিধা, হৃদয়-দ্বন্দ্বের অন্ত নেই ; শ্লীল-অশ্লীল বিবেচনা করতে গিয়ে লেডি চ্যাটার্লির মত সাধারণ বই এঁদের তালুক-মুলুক-কুল্লে দেশে হালের চাটগাঁইয়া সাইক্লোন তোলে ; এক দেশের বড় পাদ্রী অন্য দেশের বড় পাদ্রীর সঙ্গে সামান্য লৌকিকতার দেখা করতে গেলে তারা হুররা রব ছেড়ে বলে, এবারে তাবৎ মুশকিল্‌ আসান, ঘড়ি ঘড়ি কলচরল কনফারেনস্‌,

তাড়াহুড়ি ফের নেশার অবসাদ, পুনরায় খোঁয়ারি—

আর সর্বক্ষণ আর্তরব! ঐ এল রে, ঐ খেল রে! কে? কম্যুনিস্ট।

এঁরা এই একটি বিষয়ে সম্পূর্ণ মনস্থির করে ফেলেছেন যে, কম্যুনিস্ট এলে এঁদের আর কোনো গতি নেই। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ বিলকুল বরবাদ হবে। সারি বেঁধে সবাই সাইবেরিয়া।

ওদিকে কম্যুনিস্টরা অভয় দিয়ে বলছে, আমরা এলেই তো তোমাদের পরিত্রাণ। ধনপতির অত্যাচারে খেতে পারছো না, পরতে পাও না, রাষ্ট্র তোমাদের জন্য কড়ে আঙ্গুলটি তোলে না, বস্তা-পচা ধর্মের আফিঙ পর্যন্ত এখন যে তোমাদের নেশায় বুঁদ করে রাখবে তারও উপায় নেই, ইত্যাদি অনেক মূল্যবান কথা।

পশ্চিম ইয়োরোপের লেখকরা কম্যুনিস্টদের এই অভয়বাণী, যে তাঁরা এলে পর ক্যাপিটালিস্ট দেশের লেখকরা অন্ততপক্ষে খেয়ে পরে বাঁচবে, কতখানি মনে মনে বিশ্বাস করেন সে-কথা বলা-কঠিন, কিন্তু তাঁরা কম্যুনিস্টদের এই অভয়-বাণীর পরিপূর্ণ সুযোগ নিচ্ছেন।

সেইটে ইদানীং একটি পত্রিকাতে সরল ভাষায় আলোচিত হয়েছে। ঐটেই নিবেদন করি। বাকি—ঐ যে বললুম—বিউইলডার্ড জিনিস, সে তো আর চুরি করা যায় না, খালি-পকেট মারা যায় না, কিংবা বলতে পারেন, হাওয়ার কোমরে রশি বাঁধা যায় না।

সুইডেন থেকে জনৈক সুইস সংবাদদাতা তাঁর দেশের খবরের কাগজে সংবাদ পাঠিয়েছেন যে, দেশের লেখকেরা তাঁদের মূল্য বৃদ্ধির জন্য সরকারকে উদ্ব্যাস্ত করে তুলেছেন (এস্থলে আমার মন্তব্য, ভাবটা এই, কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে লেখক কত সুখে আছে, এদিকে তোমার তথাকথিত জনকল্যাণ রাষ্ট্র আমাদের জন্য কিছুই করছে না, অনেকটা 'পাশের বাড়ির চাটুজ্যে তার গিন্নীকে কি রকম গয়না দিয়েছে দ্যাখো গে' গোছ)। পত্রলেখক সুইডেনের লেখক সম্প্রদায় সরকার থেকে যে সব অর্থসাহায্য পান তার যে সবিস্তর নির্ঘণ্ট দিয়েছেন তার থেকে মাত্র একটি আমি তুলে দিচ্ছি—এ দেশে চালালে মন্দ হয় না—সাধারণ পাঠাগার থেকে যে পাঠক ধার নিয়ে বই পড়ে তার প্রত্যেক বারের জন্য সরকার—পাঠক নয়—লেখককে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দেন। সেটা সামান্যই, কিন্তু জনপ্রিয় লেখকের কাছে সেটা কিছু সামান্য নয়।

হালে তাই ডেনমার্ক, নরওয়ে, ফিনল্যাণ্ড এবং সুইডেনের লেখক সম্প্রদায়ের মুরুব্বীরা সমবেত হয়ে রেডিয়ো টেলিভিসনে তাঁদের ফরিয়াদ ক্রন্দন শুনিয়েছেন ও দেখিয়েছেন। হেলসিঙ্কি শহরের তালকিসুৎ বললেন, 'সরকার লেখকদের বই কিনে পাঠাগারে পাঠাগারে ফ্রী বিতরণ করে লেখককে বদলে দেন করুণার মুষ্টিভিক্ষা (উপরে যেটা উল্লেখ করেছি)। অপিচ, পশ্য পশ্য, ঐ লেখক নামক জীবটি না থাকলে তামাম বইয়ের ব্যবসা লাটে উঠতো। প্রকাশক, মুদ্রাকর, দপ্তরী, পুস্তক বিক্রেতা, এমন কি পুস্তক সমালোচকের পর্যন্ত পাকা-পোক্ত আমদানি আছে, নেই কেবল লেখকের, তাকে সর্বক্ষণ কাঁপতে হয় অনিশ্চয়তার

ভয়ে ভয়ে। সুইডিশ লেখক-সম্প্রদায়ের প্রধান মুরুব্বী বললেন, 'পূর্বে লেখক ছিল গরীবদের মধ্যে একজন গরীব; আজ সে-ই একমাত্র গরীব।' যখন অকরুণ ইঙ্গিত করা হল, আজকের দিনে লেখকদেরও বড্ড বেশী ছড়াছড়ি, তখন তিনি বললেন, 'হিমালয়ের নৈসর্গিক সৌন্দর্য শুধু পাহাড়ের চূড়ো দিয়ে নির্মিত হয় না।'

শেষ পর্যন্ত এঁরা দাবী জানিয়েছেন, সরকারকে ওরকম ভিক্ষে দিলে চলবে না (বর্তমান লেখকের মন্তব্য ঃ ব্যক্তিগতভাবে আমার কণা পরিমাণ ভিক্ষা নিতে কণামাত্র আপত্তি নেই); দিতে হবে পাকা-পোক্ত মাইনে। তবেই সে নিশ্চিন্ত মনে, পূর্ণ স্বাধীনতায় আপন সৃষ্টিকার্য করে যেতে পারবে, এবং তার জন্য সে সরকারের কাছে বাধ্যবাধক হবে না (রাশার প্রতি ইঙ্গিত নাকি ?)। এঁদের মতে সরকার এবং ফ্রী পাঠাগার থেকে লেখকরা বর্তমানে যা পান সেটাকে দশগুণ বাড়িয়ে দিলেও তাঁরা সে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য পাবেন না, যার কৃপায়, অন্য চাকরি না করে তারা দারাপুত্র পোষণ করে আপন কার্যে মন দিতে পারবেন।

তারপর ইংরেজ, যুগোশ্লাভ সুইডিশ ও জর্মন লেখকরা আপন আপন দেশ থেকেই টেলিফোন যোগে আপন আপন মন্তব্য সুইডেনে পাঠালেন ও সেখানকার বেতার কেন্দ্র থেকে সেগুলো বিশ্ব-সংসারের জন্য বেতারিত হল।

জর্মনির হাইনরিষ ব্যোল বললেন, 'ঈশ্বর রক্ষতু (ফর হেভেন্স্ সেক, উম্ হিমেল্স্ বিলেন্)! সর্বনাশ হবে—লেখক যদি সরকারের মাইনে-খোর হয়। সে সৃষ্টির কাজ করে যাবে নিছক সৃষ্টিরই জন্যে। এই আমাদের জর্মনিতে পঁইত্রিশ হাজার লেখক আছেন (সর্বনাশ! এই সোনার বাঙলায় পঁয়ত্রিশ হাজার ক্রেতা নেই)। কে এমন মাপকাঠি বের করবে যা দিয়ে স্থির করা হবে, কোন্ লেখক কত পাবেন? কৃতকার্য লেখকই যে মূল্যবান লেখক এ কথা বলে কে (সাকসেস এবং কোয়ালিটি সমার্থসূচক নয়)।'

লণ্ডন থেকে রবার্ট গ্রেভসেরও বিচলিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'আমার আটটি সন্তান। সত্য বলতে কি, এদের পালা-পোষা আমার পক্ষে সব সময় সহজ হয় নি। তাই বলে যে-কাজ আমি এখনো আদপেই করি নি তার জন্য আগেভাগেই পয়সা নিয়ে বসবো? ইংরাজীতে একটি প্রবাদ আছে, "হি হু পেজ দি পাইপার কমাণ্ড দি ট্যুন—যে কড়ি ফেলে সে-ই হুকুম দেয় কোন্ সুর গাইতে হবে।" আমি আমার ইচ্ছেমত যে সুর খুশী গাইব।'

আর বেলগ্রেড থেকে উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল ডুসান মাটিকের,—'না, দয়া করে চাকুরে কবি তৈরী করতে যাবেন না। আমরা কারো চাকরি করি নে। কবিতা রচনা করা আর ফর্ম ফিল্ আপ করা এক কাজ নয়। মানুষকে লেখক হবার জন্য জোর করা যায় না, কবিতা রচনা করার সময় কোনো কবি কর্তব্য বোধ থেকে তা করে না, বরঞ্চ সে রচে যখন ভিতরকার তাড়না সে আর থামিয়ে রাখতে পারে না। কি করে মানুষ যে কবিকে সরকারী চাকুরে বানাবে তা তো আমার বুদ্ধির অগম্য……।'

এসব নিদারুণ মন্তব্য শোনার পরও কিন্তু সুইডেনের ঔপন্যাসিক ফলুকে ইসাকসন তাঁর সুইডিস নৌকার হাল ছাড়লেন না, অর্থাৎ সরকারী সাহায্যের প্রস্তাবটা। বললেন, 'কত ভালো লেখক দৈনন্দিন জীবনধারণ সমস্যায় এমনই ভারগ্রস্ত যে, লেখার কাজ করে উঠতে পারেন না। সরকারের কিছু একটা করা উচিত··· ।' তার মানে এই নয়, সুইডেনের সব লেখকই এই মত পোষণ করেন। জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক আকে ভার্সিং বলেছেন, 'প্রচুর, প্রচুর আমি শিখেছি মানব-চরিত্রের, গড়ে তুলেছি আমার জীবনদর্শন, আমার জীবনের পেশা থেকে।' এঁর পেশা দারোয়ানী। অর্থাৎ বাড়ির দরওয়ান। পত্রলেখক জাল্ৎসার চিঠি শেষ করেছেন এই মন্তব্য করে, 'বাড়ির দরওয়ানই যদি এত ভালো লেখে তবে চিন্তা করো তো হোটেলের পোর্টার (দরওয়ানই তো) আরো কত শতগুণে ভালো লিখবে!' অর্থাৎ কাকতালীয়!

* * *

লেখাটি পড়ে শোনাতে আমার একজন প্রিয় লেখক-বন্ধু আশ্চর্য হয়ে শুধোলেন, 'বলেন কি মশাই! ওসব দেশে পাঠক যখন প্রতিবার লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে যায় তার জন্য লেখককে পয়সা দেয়। আর এদেশের লাইব্রেরি আমার কাছ থেকে ফ্রী বই চায়! বইটার দাম পর্যন্ত দিতে চায় না।'

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললুম, 'গরীব দেশ!' তারপর বললুম, 'কিন্তু ভেবে দেখুন, না চাইলে কি আরো ভালো হত? একদম পড়তেই চায় না, সেটা কি আরো ভালো হত? প্রিয়ার বিরহ বেদনা পীড়াদায়ক; কিন্তু যার একদম কোনো প্রিয়াই নেই?'

বন্ধু অধৈর্য হয়ে শুধোলেন, 'তোমার কাছে চাইলে তুমি কি করতে?'

আমার চিত্তে সহসা কবিত্বের উদয় হল। বাইরের দিকে তাকিয়ে উদাস নয়নে প্রকৃতির সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করতে লাগলুম।

বাচুভাই শুক্ল

বরোদা-আহমদাবাদ-বোম্বাই করছি, আর বার বার মনে পড়ছে, স্বর্গত বাচু-ভাই শুক্লের কথা। ইনি রবীন্দ্রনাথের অতি প্রিয় শিষ্য ছিলেন।

১৯২১ বিশ্বভারতীর কলেজ-(উত্তর)-বিভাগ খোলার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সেই সুদূর সৌরাষ্ট্র থেকে এসে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের পদপ্রান্তে আসন নেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে যে দুজন বিশ্বভারতীর শেষ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে উপাধি লাভ করেন, ইনি তাঁদেরই একজন। বিশ্বভারতীর সর্বপ্রথম সমাবর্তন উৎসব হয় ১৯২৭। বাচুভাই রবীন্দ্রনাথের হাত থেকে তাঁর উপাধি-পত্র গ্রহণ করেন। শুনেছি, স্বয়ং নন্দলাল সে উপাধি-পত্রের পরিকল্পনা ও চিত্রণকর্ম করেছিলেন। পরবর্তী যুগে তিনি গুজরাতী ভাষায় রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুবাদকরূপে খ্যাতি লাভ করেন।

দাড়িগোঁফ গজাবার চিহ্নমাত্র নেই—সেই সুদূর কাঠিয়াওয়াড় থেকে এসে ছোকরাটি সীট পেল সত্য কুটিরে। কয়েক দিন যেতে না যেতে তার হল টাই-ফয়েড। বাসুদেব বিশ্বনাথ গোখলে ও আমি তাকে আমাদের কামরায় নিয়ে এলুম। সেই তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ১৯২১ সালে। তারপর ১৯:৭ সালে তাঁর অকালমৃত্যুর দিন পর্যন্ত আমাদের যোগসূত্র কখনো ছিন্ন হয় নি।

তাঁর গুরু ছিলেন মার্ক কলিন্‌স্। তাঁর কাছে বাচুভাই উপাধি লাভ করার পরও দীর্ঘ সাত বৎসর তুলনাত্মক ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন। আমিও কলিন্‌সের শিষ্য। তাই তাঁর কিঞ্চিৎ পরিচয় দিই। ইনি জাতে আইরিশ, শিক্ষালাভ করেন অক্সফোর্ড জর্মনির লাইপৎসিগে। এই বছর দুই পূর্বে লাইপৎসিগ বিশ্ববিদ্যালয় তার কোনো পরব উপলক্ষে মালমশলা যোগাড় করতে গিয়ে বিশ্বভারতীকে প্রশ্ন করে পাঠায়, কলিন্‌স্ এখানে কি কি কাজ করে গেছেন ? অর্থাৎ ছাত্র হিসেবেই তিনি সেখানে এত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন যে পরবর্তী যুগের অধ্যাপকেরা তাঁর কীর্তি-কলাপের সন্ধানে এদেশেও তাঁর খবর নিতে উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন। কেউ দশটা ভাষা জানে, কেউ বিশটা জানে একথা শুনলে আমি কণামাত্র বিচলিত হই নে। কারণ মার্সেই, পোর্ট সঈদ, সিঙ্গাপুরের দালাল দোভাষীরাও দশভাষী, বিশভাষী। কিন্তু কলিন্‌স্ ছিলেন সত্যকার ভাষার জহুরী। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে, তিনি আমাকে তুর্কী ভাষায় বাবুরের আত্মজীবনী অনুবাদ করে করে শুনিয়েছেন, শেলির প্রমিথিয়ুস্ আন-বাউণ্ড পড়াবার সময় ইস্কিলাসের গ্রীক প্রমিথিয়ুস্ থেকে মুখস্থ বলে গছেন, আমি তাঁকে একখানা আরবী স্থাপত্যের বই দেখাতে তিনি তার ছবি কুফী-আরবীতে লেখা ইন্‌সক্রিপশন অনুবাদ করে করে শুনিযেছিলেন। তার সঙ্গে মাত্র এইটুকু যোগ করি আমার জীবনের সেই তিন বৎসরে আমি কখনো গুরু কলিন্‌স্‌কে কোনো প্রাচীন-অর্বাচীন চেনা-অচেনা ভাষার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে শুনি নি, 'আমি তো এ ভাষা জানি নে'—অবশ্য সে-সব ভাষারই কথা হচ্ছে যার যে কোনো একটা অন্তত একজন লোকও পড়তে পারে।

বাচুভাই ছিলেই তাঁরই পুত্রপ্রতিম প্রিয় শিষ্য। কিন্তু বাচুভাই জানতেন, এ দেশে বিস্তর ভাষা শেখার মত মাল-মশলা নেই, তাই তিনি বিস্তারে না গিয়ে গিয়েছিলেন গভীরে। বস্তুত তিনি শান্তিনিকেতনে শিখেছিলেন মাত্র একটি জিনিস—ভাষাতত্ত্ব। নিজের চেষ্টায় শিখেছিলেন সংস্কৃত। আমরা যেরকম খাবলে খাবলে—অর্থাৎ স্কিপ করে করে—রাবিশ বাঙলা উপন্যাস পড়ি (সব বাঙলা উপন্যাস রাবিশ বলছি নে), বাচুভাই ঠিক তেমনি সংস্কৃত পড়তে পারতেন।

বোম্বাইয়ে ফিরে গিয়ে তিনি সর্বপ্রথম লেখেন একখানি অতি উপাদেয় গুজরাতী ব্যাকরণ। ভারতীয় অর্বাচীন ভাষাদের মধ্যে এই ব্যাকরণই যে সর্বোত্তম সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। আমরা সচরাচর বাঙলা ব্যাকরণের নাম দিয়ে লিখে থাকি সংস্কৃত ব্যাকরণ। ভারতের অন্যান্য অর্বাচীন ভাষাগুলিতেও তাই। গুজরাতী একমাত্র ব্যত্যয়—বাচুভাইয়ের কল্যাণে।

বরোদায় গাইকোয়াড় সীরিজে এটি প্রকাশিত হয়।

এই সময়ে তিনি অন্য লোকের সহযোগিতায় বোম্বাইয়ে একটি ইস্কুল খোলেন। সাধারণ ইস্কুল, কিন্তু অনেকখানি শান্তিনিকেতন ইস্কুল প্যাটার্নের। অন্যান্য বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে শেখানো হত রবীন্দ্রসঙ্গীত ও রবীন্দ্র নৃত্য-নাট্য। বাধ্য হয়ে তাঁকে তখন রবীন্দ্রসঙ্গীতের গুজরাতী অনুবাদ করতে হয়, এবং শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ তথা বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে গুজরাতী রসিক সম্প্রদায়ের পরিচয় করিয়ে দেওয়াই তাঁর জীবনের চরম ব্রত হয়ে দাঁড়ায়। বোম্বাইয়ে শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ তিনিই প্রতিষ্ঠিত করেন। সেখানকার টেগোর সোসাইটির তিনিই অন্যতম উদ্যোক্তা।

বিয়াল্লিশের আন্দোলন আরম্ভ করার প্রাক্কালে মহাত্মাজী গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের শেষ অনুরোধ, এণ্ড্রুজ মেমোরিয়াল ফাণ্ডের জন্য অর্থসঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে বোম্বাইয়ে আসেন। এসেই খবর দেন বাচুভাইকে, তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনবেন। বাচুভাই তাঁর ইস্কুলের গুজরাতি ছেলেমেয়েদের নিয়ে তাঁকে শুনিয়ে এলেন—বিশ্বাস করবেন না—বাঙলা ভাষাতেই রবীন্দ্রসঙ্গীত। 'জীবন যখন শুকায়ে যায়,' 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে এবং আরো অনেক গান। রবীন্দ্রসঙ্গীতে বাচুভাইয়ের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল—তিনি জানতেন. মহাত্মাজী যখন শান্তিনিকেতন ইস্কুলে অধ্যক্ষ ছিলেন, ঠিক সেই সময় রবীন্দ্রনাথ কোন্ কোন্ গান রচেছিলেন এবং স্বভাবতই সেগুলোই মহাত্মাজীর বিশেষ করে জানার কথা। গাঁধীজীর ফরমায়েশমত বাচুভাই সেদিন তাঁকে সব গানই শোনাতে পেরেছিলেন। সেদিন আজো, ক'জন বাঙালী পারে?

রবীন্দ্রনাথের তাবৎ নৃত্য-নাট্য তিনি অনুবাদ করেছেন। 'গোরা', 'নৌকাডুবি'র মত বৃহৎ বৃহৎ উপন্যাসের পূর্ণাঙ্গ সর্বাঙ্গসুন্দর অনুবাদ করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথের আরো কত রচনা, কত গান, কত কবিতা, কত ছোট গল্প যে অতিশয় সাধুতার সঙ্গে অনুবাদ করেছেন তার সম্পূর্ণ ফিরিস্তি দেওয়া আমার ক্ষমতার বাইরে—যদিও ঐ সময়ে আমি গুজরাতেই ছিলুম এবং সাহিত্যজগতে তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে সানন্দে সোৎসাহে লক্ষ্য করেছি। এই সাধুতা আকস্মিক ঘটনা নয়। বাচুভাই তাঁর 'অরিজিনাল' আইডিয়া রবীন্দ্রনাথের অনুবাদের ভিতর দিয়ে পাচার করতে চান নি—সাধারণ অনুবাদকরা যা আকছারই করে থাকেন। কারণ তাঁর নিজের মৌলিক উপন্যাস এবং নাট্য গুজরাতী সাহিত্যে বছরের সেরা বইরূপে সম্মানিত হয়েছে।

নাট্যে এবং নৃত্য-নাট্যে, ফিল্ম এবং রঙ্গমঞ্চে বাচুভাইয়ের কৃতিত্বখ্যাতি গুজরাতের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। ফলে আকাশবাণী তাঁকে দিল্লিতে বড় চাকরি দিয়ে নিয়ে যান—তাঁর কাজ ছিল সর্বভারতের তাবৎ রেডিয়োড্রামার মূল্য বিচার করে সেই অনুযায়ী আকাশবাণীকে নির্দেশ দেওয়া। কিন্তু ঐ সময়ও তিনি সমস্ত অবকাশ ব্যয় করেছেন রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প গুজরাতীতে অনুবাদ করাতে—সাহিত্য আকাদেমির অনুরোধে। এ কাজটি তিনি সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলেন।

পঞ্চাশ পেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই গুজরাতী সাহিত্যের এই প্রতিভাবান লেখক সে সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি করে ইহলোক ত্যাগ করেন।

আমাদের শোক, বাঙলা সাহিত্যের গুজরাতী এম্বেসেডার প্লেনিপটেনশিয়ারি অকালে তাঁর কাজ পূর্ণ করে, কিন্তু আমাদের কাজ অসম্পূর্ণ রেখে চলে গেলেন। আমার ব্যক্তিগত শোকের কথা বলবো না। তাঁর একমাত্র কিশোর পুত্রকে কাছে এনে আমাকেই দুঃসংবাদ দিতে হয়েছিল, তার পিতা ইহলোক ত্যাগ করেছেন॥

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী

টমাস মান্ সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতায় বিশ্বাস করতেন; পক্ষান্তরে হিটলার বিশ্বাস করতেন হটেনটট এবং ফরাসী-জর্মন ইংরেজ বরাবর নয়; অতএব পৃথিবীটাকে যদি ভালো করেই চালাতে হয়, তবে সে-কাজটা সর্বশ্রেষ্ঠ জাতের উপরই ছেড়ে দেওয়া সমীচীন। হিটলার মান্‌কে ডেকে পাঠালেন তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করতে। মান্ নারাজ হলেন। হিটলার চটে গিয়ে বন্ বিশ্ববিদ্যালয়কে হুকুম দিলেন, মান্‌কে যে অনারারি ডক্টরেট দেওয়া হয়েছিল সেটা যেন প্রত্যাহার করা হয়। উত্তরে মান্ এই সর্বপ্রথম নাৎসি 'জীবনদর্শন' সম্পর্কে আপন মত প্রকাশ করলেন। অতুলনীয় সে পত্র বিশ্বসাহিত্যে—রাজনীতিতে তার মূল্য কি আছে ঐ বাবদে গুণীরা তা বলতে পারবেন। আমি বলতে পারি, সে-পত্র আমার মনে মিলটনের এরিয়োপেজিটিকার চেয়েও গভীরতর রেখা কেটে গেছে।

ডক্টরেট হারানোতে মান্ আদৌ মনঃক্ষুণ্ণ হন নি। স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে বলছি, মান্ তাঁর খোলা চিঠি আরম্ভ করেছিলেন এইভাবে—'আজ আমি ডাক খোলার সঙ্গে সঙ্গে বন্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাচার পেলুম, আমাকে একদা যে অনারারি ডক্টরেট দেওয়া হয়েছিল, সেটা প্রত্যাহার করা হয়েছে। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি কখনো বিদ্যাভ্যাস করি নি বলে সঠিক জানি নে এ সংবাদটি কি ভাবে সর্বসাধারণকে অবগত করানো হয়। অনুমান করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে সেটা সেঁটে দেওয়া হয়। আমার অনুমান যদি সত্য হয়, তবে অনুরোধ করি, ঐ নোটিশের পাশে আরেকটি নোটিশও যেন সেঁটে দেওয়া হয়—বনের চিঠির সঙ্গে সঙ্গে একই ডাকে হার্ভার্ড (কিংবা অন্য কোনো মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়, আমার ঠিক মনে নেই—সে-মু-আ) আমাকে জানিয়েছেন যে, তাঁরা আমাকে অনারারি ডক্টরেট দিয়েছেন। এই সুবাদে এটাও বলে রাখি, বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট আমি কখনো আমার নামের সঙ্গে জুড়ি নি কিংবা অন্য কোনো প্রকারে কাজে লাগাই নি; হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেটও কাজে লাগালুম এই প্রথম এবং এই শেষবারের মত। কিন্তু কেন—?'

এই বলে মান্ জর্মনির সংস্কৃতি ঐতিহ্য তথা আদৌ ইয়োরোপীয় সভ্যতা

বৈদগ্ধ্য বলতে কি বোঝায়, নাৎসি 'জীবনদর্শন' কিংবা বলি 'অদূরদর্শন' কি সেই সম্বন্ধে শান্ত, বজ্রদৃঢ় কণ্ঠে প্রকাশ করেছেন আপন অতিশয় সুচিন্তিত যুক্তি-তর্ক-অভিজ্ঞতা-প্রসূত অভিমত। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, গভীর দরদ দিয়ে। সেই যে জাপানী যক্ষ্মারোগী চিত্রকর, যে তার বুক কেটে তার থেকে তুলি দিয়ে রক্ত তুলে তুলে নিয়ে ছবি এঁকেছিল, ঠিক সেই রকম।

তারপর মান্ নীরব হলেন। কারণ তিনি রাজনৈতিক নন।

তারপর প্রায় সমস্ত পৃথিবীর উপর দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তাণ্ডবনৃত্য নেচে নিয়ে চলে গেল। কে তখন স্মরণ করে মানের ক্ষীণ কাকলি? তারপর তথাকথিত শান্তি। মনের বাসনা গেল আপন মাতৃভূমি পুনর্দর্শন করার। পশ্চিম জর্মনিতে তিনি এলেন। শেকস্পীয়র আজ ইংলণ্ডে ফিরে এলে এর সিকি সম্মানে তুষ্ট হতেন।

মান্ কম্যুনিজম পছন্দ করতেন না, তবে কতখানি অপছন্দ করতেন সেটা আমার পক্ষে বলা অসম্ভব, কারণ তাঁর তাবৎ লেখা এ-দেশে পাবার যো নেই।[১] তাই এক জর্মন তাঁকে ভীরু কণ্ঠে শুধোলেন, 'আপনি কি পূর্ব জর্মনিও (কম্যুনিস্ট জর্মনি) যাবেন?

মান্ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'জর্মন ভাষা যেখানে পূজা পায় সে ভূমিই আমার মাতৃভূমি।'

এত দীর্ঘ অবতরণিকা দেবার কারণ, অনেকেই মনে করেন মান্ এসকে-পিস্ট ছিলেন—এই সুবাদে ঘটনাটির উল্লেখ করার সুযোগ হ'ল।

শিলঙ, কটক, পাটনা—এই তিন জায়গায় বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের তিনটি বড় কেন্দ্র আছে। এ-তিনটির সঙ্গে আমি সুপরিচিত। ভাগলপুর, এলাহাবাদ, জব্বলপুর এবং আরো নানা জায়গায়ও আছে কিন্তু তাদের সঙ্গে আমার পরিচয় ক্ষীণ।[২]

এদের নানারকম সমস্যা আছে। তার চরম নিদর্শন তো হালে আসামের সর্বত্র হয়ে গেল।

১ নেতিবাচক বাক্য বলা বড় কঠিন; অস্তিবাচক বাক্য বলা সহজ। দৃষ্টান্তঃ আমাকে যদি কেউ শুধোয়, 'ঘোড়া' শব্দ বাঙলাতে আছে কিনা; আমি অতি অবশ্য বলব 'নিশ্চয়ই', কারণ এ শব্দ আমি বাঙলা পুস্তকে শতাধিকবার পেয়েছি, কিন্তু কেউ যদি শুধোয়, 'কটহ' শব্দ বাঙলা শব্দ কি না, তবে আমি কি উত্তর দিই? এযাবৎ চোখে পড়ে নি, তাই বলে কি বলবো, বাঙলা শব্দ নয়—কারণ আমি তো তাবৎ বাঙলা বই, পুঁথি, পাণ্ডুলিপি পড়ি নি যে, হলফ করে বলবো, এটা বাঙলা শব্দ নয়।

২ ভাগলপুরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; আমার অগ্রজপ্রতিম জনৈক বন্ধু 'ভাগলপুরের বাঙলা ও বাঙালী' এই বিষয়ে একখানি প্রামাণিক পুস্তিকা লিখেছেন। সেটির দিকে এই বেলায়ই আমার পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে রাখছি।

প্রধান সমস্যা এই ঃ মনে করুন আমি পটনায় ডাক্তারি করি। আমার ঠাকুরদা সেখানে গিয়ে প্রথম বসবাস করেন। আদি নিবাস বিক্রমপুরের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র এখন সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। আগে রাষ্ট্রভাষা ইংরিজী ছিল বলে আমি শিখেছিলুম বাঙলা এবং ইংরিজী। হিন্দীর বিশেষ প্রয়োজন হত না বলে ওটা আমি মেহন্নৎ করে শিখি নি। ধাই-আয়াদের কাছ থেকে রাস্তাঘাটে ওটা আমি 'পিক্ অপ' করে নিয়েছিলুম।

এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। হিন্দী রাষ্ট্রভাষা। আমার ছেলে যদি বিহারীদের সঙ্গে পাল্লা দিতে চায় তবে তাকে অত্যুত্তম হিন্দী শিখতে হবে। সে যখন কথা বলবে তখন যেন কেউ ঘূণাক্ষরেও না বুঝতে পারে যে হিন্দী তার মাতৃভাষা নয়; আর উচ্চারণ তার কথন-শৈলী নিয়ে যেন কোনো হিন্দী-ভাষা টিটকারি না দিতে পারে।

এতখানি হিন্দী তাকে শেখানো যদি আমার আদর্শ হয় তবে তাকে অতি ছেলেবেলা থেকেই পাঠাতে হবে হিন্দী পাঠশালায়। শুধু তাই নয়, যেহেতু বাড়িতে সে বাঙলা বলে, সে হ্যাণ্ডিক্যাপ কাটিয়ে ওঠবার জন্য তার জন্য আমার ফালতো ব্যবস্থাও করতে হবে। এসব তাবৎ ব্যবস্থা যদি করি তবে সে উত্তম হিন্দী শিখবে সন্দেহ নেই, কিন্তু সে যদি হরিনাথ দের মতন ভাষাবাবদে সব্যসাচী না হয়—এবং সে সম্ভাবনাই বেশী—তবে তার বাঙলা থেকে যাবে কাঁচা।

অথচ দেখুন, ভদ্রসন্তানই তার পিতামাতাকে শ্রদ্ধা করে। ভদ্রসন্তানই পুত্রকে শিক্ষা দেয়, পিতাকে মাতাকে পিতৃপুরুষকে শ্রদ্ধা জানাতে। তার সরল অর্থ, পরিবারগত জাতিগত ঐতিহ্যকে সম্মান জানাতে। এর সব-কিছুই করতে হয় মাতৃভাষার মারফতে। ছেলেবেলা থেকে হিন্দী শেখার ফলে মাতৃভাষা হবেন অবহেলিত। এবং তারই শেষ ফল ঃ—পাটনার সর্বত্র সে সম্মান পাবে তার হিন্দীর জোরে, কিন্তু আপন বাড়িতে সে পরদেশী, আপন ঐতিহ্য তার ধমনীতে প্রবেশ করতে পারলো না,—সে বর্বর। এবং তার জন্য দায়ী আমি।

বোম্বাইয়ের বাঙালী ইস্কুলের ছেলেমেয়েরা ম্যাট্রিক পাস করে বাঙলা মাতৃভাষা নিয়ে। এরা বড় সুন্দর বাঙলা লেখে। এ কথা আমি জানি; তার কারণ স্বর্গত শ্যামাপ্রসাদবাবুর কল্যাণে (ভুল হলে কেউ শুধরে দেবেন) যখন বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় বাঙলাকে অন্যতম পরীক্ষার ভাষারূপে স্বীকার করে নিলেন তখন আমি হলাম তাদের এগজামিনার। তেরো বৎসর পরে আবার সে ইস্কুল দেখতে গিয়েছিলুম। বড় আনন্দ হল। সে যুগের দু'চারটি শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর পরিচিতি স্মিতহাস্য বয়ানও দেখতে পেলুম।

এঁরা বোম্বাইয়ে' বাঙলা ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রেখেছেন। আমার অনুরোধ, ইস্কুলের ছেলেমেয়েরা যেন মারাঠী ভাষা অবহেলা না করে॥

রবীন্দ্র রসের ফিল্মরূপ

অনেকেই হয়তো মনে করতে পারেন মুনিঋষিদের মত পরিবর্তন হয় না; আজীবন একই বাণী প্রচার করে যান। আমি এ মত পোষণ করি নে। আমরা বিশ্বাস করি তাঁদেরও পরিবর্তন হয়, তবে আমার আরেকটি অন্ধ-বিশ্বাস,— মত পরিবর্তন সত্ত্বেও তাঁদের একটি মূল সুর বরাবরই বজায় থাকে।

রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতনে প্রথম বিদ্যালয় স্থাপনা করেন তখন এটাকে ব্রহ্মচর্যাশ্রম বা ব্রহ্মবিদ্যালয় বলা হত। ছেলেরা জুতো পরতো না, নিরামিষ খেত, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণেতরের জন্য পৃথক পৃথক পঙক্তি ছিল; এমন কি প্রশ্ন উঠেছিল, ব্রাহ্মণ ছাত্র কায়স্থ গুরুর পদধূলি নেবে কি না!

সেই শান্তিনিকেতনেই, রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায়ই, পৃথক পৃথক পঙক্তি উঠে গেল, আমিষ প্রচলিত হল, গ্রামোফোন বাজলো, ফিল্ম দেখানো হল। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পূর্বেই শান্তিনিকেতন সত্যার্থে বিশ্বভারতী বা ইণ্টারন্যাশনাল য়ুনিভার্সিটি রূপে পরিচিত হল। বস্তুত এরকম উদার সর্বজনীন বাসস্থল পৃথিবীতে কোথাও নেই।

* * *

একদিকে তিনি যেমন চাইতেন আমাদের চাষবাসের ট্র্যাক্টর এবং অন্যান্য কলকব্জা প্রচলিত হয়ে আমাদের ফসলোৎপাদন বৃদ্ধি করুক, অন্যদিকে ঠিক তেমনি ইয়োরোপের মানুষ কি ভাবে অত্যধিক যন্ত্রপাতির নিপীড়নে তার মনুষ্যত্ব হারাচ্ছে সে সম্বন্ধে তাঁর তীব্র মন্তব্য বিশ্বজনকে জানিয়ে গিয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁর জীবনদর্শন কি ছিল তার আলোচনা কঠিন এবং দীর্ঘ, আমাদের সামনে প্রশ্ন—আজ যে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প, উপন্যাস, নাট্য, নৃত্যনাট্য ফিল্মে আত্মপ্রকাশ করছে সেটা কি ভাবে করলে তিনি আনন্দিত হতেন?

এ-কথা সত্য, প্রথম যৌবনে তিনি গ্রামোফোনের প্রতি বিরূপ ছিলেন এবং পরবর্তীকালে তিনি তার জন্য গেয়েওছেন। পিয়ানোযোগে তাঁর একাধিক নাট্য মঞ্চস্থ হয়েছে অথচ তিনি হারমোনিয়াম পছন্দ করতেন না। ফিল্মের প্রতি তাঁর অবজ্ঞা ছিল না; এমন কি শুনেছি তাঁর 'প্রাণ চায় চক্ষু না চায়' গানটিতে তিনি যে সুর দিয়েছেন তাতে কিছুটা ফিল্মের রস দেবার চেষ্টা করেছিলেন। এবং 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী' জাতীয় একাধিক গানে যে বিলিতি সুর আছে সে তো জানা কথা।

প্রথম নিন রেডিয়োর কথা।

আমার বিস্ময় বোধ হয়, কোন সাহসে রেডিও নাট্যে প্রডুসার রবীন্দ্রনাটকের কাটছাঁট করেন!

গান, কবিতা, ছোট গল্প, উপন্যাস প্রত্যেক রসবস্তুরই একটা নির্দিষ্ট আয়তন আছে এবং সেটি ধরা পড়ে রসবস্তুটি সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হয়ে আত্মপ্রকাশ করার পর। 'আগুনের পরশমণি'কে তিন ঘণ্টা ধরে পালা কীর্তনের মত করে গাইলে তার রস বাড়ে না, আবার কোনো মার্কিন কোটিপতির আদেশে তাজ-

মহলকে কাটছাঁট করে তার জাহাজে করে নিয়ে যাবার মত সাইজ-সই করে দেবার চেষ্টাও বাতুলতা।

এই কিছুদিন পূর্বে বেতারে রবীন্দ্রনাথের একটি নাটক শুনছিলুম। এক ঘণ্টাতে সেটাকে ফিট করার জন্য তার উপর যে কী নির্মম কাঁচি চালানো হয়েছিল সেটা সর্বকঠিন প্রতিবাদেরও বাইরে চলে যায়। শব্দে শব্দে ছত্রে ছত্রে, প্রশ্ন উত্তরে, ঘটনা ঘটনায় যতখানি সময় নিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি তুলে ধরলেন তাতে কাট-ছাঁট করলে যে কী রসভঙ্গ হয় সে শুধু ঐ সব দাম্ভিকেরা বোঝে না। আমার মনে হয় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও যদি অতি অনিচ্ছায় কোনো কারণে রাজী হতেন ওটাকে ছোট করতে, তবে তাঁকেও বিষম বিপাকে পড়তে হত। স্থাপত্যের বেলা জিনিসটা আরো সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়। আজ যদি পুরাতত্ত্ব বিভাগ তদারকির খরচ কমাবার জন্য তাজমহলটাকে আকারে ক্ষুদ্রতর করার চেষ্টা করেন তবে কি অবস্থা হয় চিন্তা করুন তো। কিংবা ফিল্মেরই উদাহরণ নিন। বছর পাঁচেক পূর্বে আমি একটা নামকরা বিদেশী ফিল্ম দেখে অবাক হয়ে বললুম, প্রত্যেক অংশই সুন্দর কিন্তু তবু রস জমলো না। তখন খবর নিয়ে জানা গেল, ফিল্ম বোর্ডএর উপর এমনি নির্মম কাঁচি চালিয়েছেন যে তার একটা বিপুল ভাগ কাটা পড়েছে। যেমন মনে করুন তাজের গম্বুজ এবং দুটি মিনারিকা কেটে নেওয়া হলে পর তার যে রকম চেহারা দাঁড়াবে!

আমার প্রশ্ন, কি দরকার? দুনিয়ায় এতশত জিনিস যখন রয়েছে যেগুলো বেতারের সময় অনুযায়ী পরিবেশন করা যায় তখন কী প্রয়োজন সর্বাঙ্গসুন্দর জিনিস বিকলাঙ্গ করার? হনুমান হনুমানই সই, কিন্তু শিব কেটে ঠুঁটো জগন্নাথ করার কি প্রয়োজন?

দুই নম্বর: রবীন্দ্রনাথের নাট্যের শব্দ পরিবর্তন। কিছুদিন পূর্বে একটি নাট্যে এ রকম পরিবর্তন শুনে কান যখন ঝালাপালা—বস্তুত কিছুক্ষণ শোনার পরই আমার মনে হল, এ ভাষা রবীন্দ্রনাথের হতেই পারে না এবং তাই বইখানি চোখের সামনে খুলে ধরে নাট্যটি শুনছিলুম—তখন এক জায়গায় দেখি ছাপাতে আছে 'কে তুমি'? এবং নাট্যে বলা হল 'তুমি কে'?

এ দুটোর তফাত তো ইস্কুল-বয়ও জানে।

নাট্যমঞ্চে হলে তবুও না হয় ভাবতুম, হয়তো নট ভালো করে মুখস্থ করেন নি, কিন্তু এ তো বেতারের ব্যাপার—ছাপা বই তো সামনে রয়েছে।

পুনরায় প্রশ্ন করি, কী প্রয়োজন, কী প্রয়োজন? জানি, পনেরো আনা শ্রোতা ভাষা সম্বন্ধে অত সচেতন নয়, কিন্তু যেখানে কোনো প্রয়োজন নেই সেখানে এক আনা লোককেই বা কেন পীড়া দেওয়া?

তিন নম্বর—এবং সেইটেই সব চেয়ে মারাত্মক!

রবীন্দ্রনাথের একটি গল্পকে নাটক করা হয়েছে। গল্পটি গত শতকের শেষের কিংবা এই শতকের গোড়ার পটভূমিতে আঁকা এবং নিম্ন মধ্যবর্তী শ্রেণী নিয়ে লেখা। বাপ-মায়েতে ঠিক হয়েছে অমুকের সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে দেওয়া হবে। তখন বাপ তাঁর স্ত্রীকে শুধোচ্ছেন, 'তোমার মেয়ে কি বলে?' মা যে

কী ন্যাকরার সুরে বললে সে অবর্ণনীয়—'ওকে জিজ্ঞেস করবে কি ? সে তো সকাল-বিকাল ওরই ঘরে ঘুর ঘুর করছে।' সক্কলের পয়লা কথা, সে যুগে মেয়েকে বিয়ের পূর্বে ওরকম জিজ্ঞেস করা হত না, সে কাকে বিয়ে করতে চায়, দ্বিতীয়ত মেয়ের প্রেমে পড়া নিয়ে সে যুগে বাপে-মায়ে এরকম 'ন্যাকরা' করে কথা বলা হত না।

আমার কাছে এমনি বেখাপ্পা লাগলো যে, আমি কিছুতেই বুঝতে পারলুম না রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এ জিনিস কি প্রকারে সম্ভব ! তখন উঠে বই খুলে পড়ে দেখি, মেয়ের মতামত জানবার জন্য বাপ-মায়েতে এই কথোপকথন গল্পটিতে আদৌ নেই !

সস্তা, কুরুচিপূর্ণ, ন্যক্কারজনক বাজে নাটক শুনে শুনে আমাদের রুচি এমনিই বিগড়ে গিয়েছে যে, প্রডুসার মনে করেন যে প্রচুর পরিমাণে ন্যাকামোর লঙ্কাফোড়ন না দিলে আমরা আর কোনো জিনিসই সুস্বাদু বলে গ্রহণ করতে পারবো না ! দোষ শুধু প্রডুসারের নয়—আমাদেরও।

তবে প্রশ্ন উঠতে পারে ঃ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই অনেক কিছু করেছেন।

যেমন মনে করুন 'শ্যামা' নাট্য তাঁর 'পরিশোধ' কবিতার উপর গড়া। আবার 'পরিশোধে'র প্লটটি জাতক থেকে নেওয়া। তাতেও আবার রবীন্দ্রনাথ মূল প্লটকে শেষের দিকে খানিকটা বদলে দিয়েছেন। এস্থলে বক্তব্য, জাতকের গল্পেতে থাকে শুধু প্লটই। সেখানে অন্য কোন রসের পরিবেশ থাকে না বলে সেই প্লট নিয়ে কৃতকর্মা রসনির্মাতা গল্প উপন্যাস নাট্য নির্মাণ করতে পারেন। অর্থাৎ দেবীর কাঠামোর উপর মাটি-কাদা-রঙ লাগিয়ে প্রতিমা নির্মাণ করা এক কথা– সেটা সহজও, যে যার খুশীমত করে তাকে সুন্দর করতে পারলেই হল—কিন্তু প্রস্তুত প্রতিমার উপর আরো মাটি লাগিয়ে হাত দুটিকে আরো লম্বা করা, কিংবা দশ হাতের উপর আরো দুটি চড়িয়ে দেওয়া, সে সম্পূর্ণ অন্য কথা। দ্বিতীয়ত রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পরিশোধ'কে 'শ্যামা'তে পরিবর্তিত করতে পারেন তাঁর সে শক্তি আছে। সে রকম শক্তিমান আমাদের ভিতর কই ? এবং আমার মনে হয় সে রকম শক্তিমান ফিল্ম-ডিরেক্টর রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া না করেও এমন প্লট অন্যত্র পাবে যেখানে সে তার জিনিয়াস, তার সৃজনীশক্তি আরো সহজে, আরো সুন্দর করে দেখাতে পারবে।

জাতক পড়ুন, জাতক পড়ুন জাতক পড়ুন। ওর মত ভাণ্ডার কোনো ভাষাতেই নেই।

এবং রবীন্দ্রনাথ কি ভাবে জাতকের প্লট নিয়ে কবিতা এবং নাট্য করতেন সেই টেক্‌নীকটি রপ্ত করে নিন॥

সম্পাদক লেখক পাঠক

শ্রীযুত জলসা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

মহাশয়,

সচরাচর আমি পাঠকদের জন্যই আপনার কাগজে লিখে থাকি (এবং আপনার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি যে প্রতি সংখ্যায়ই কিছু লেখা দেব)। আপনার পড়ার জন্য নয়। কারণ আমি নিন্দুকের মুখে শুনেছি, সম্পাদকেরা এত ঝামেলার ভিতর পত্রিকা প্রকাশ করেন যে তারপর প্রবন্ধগুলো পড়ার মত মুখে আর তাঁদের লালা থাকে না। কথাটা হয়তো একেবারে মিথ্যা নয়। কারণ

তিন্তিড়ী পলাণ্ডু লংকা লয়ে সযতনে
উচ্ছে আর ইক্ষুগুড় করি বিড়ম্বিত
প্রপঞ্চ ফোড়ন লয়ে

যেদিন আমি রন্ধন-কর্ম সমাধান করি, সেদিন আমারও ক্ষিদে সম্পূর্ণ লোপ পায়। কাজেই আপনার বিরুদ্ধে যে প্রিমা ফাশি কেস্ একেবারেই নেই, সে-কথা বলতে পারবেন না। অন্তত আমার লেখা যে আপনি একেবারেই পড়েন না, সে বিষয়ে আমি সুনিশ্চয়—কারণ পড়া থাকলে দ্বিতীয়বারের জন্য লেখা চাইতেন না। ন্যাড়া একাধিকবার যেতে পারে বেলতলা— নিমতলা কিন্তু যায় একবারই।

ইতিমধ্যে আমি কথা দিয়েও কথা রাখতে পারি নি। অথচ দোষটা পড়েছে নিশ্চয়ই আপনার ঘাড়ে। বাঙলাতে বলে,

খেলেন দই রমাকান্ত
বিকারের বেলা গোবর্দ্ধন!

অর্থাৎ জবান খেলাপ করলুম আমি, বিকারটা হল আপনার।

'অয়, অয়, জানতি পারো না'—আকছারই হয়। তার কারণটাও সরল। যে-দোষ আপনি করেছেন, তার গালমন্দ আপনিই খাবেন, এ তো হক্ কথা, এ তো আপনার ন্যায্য প্রাপ্য। তাই তাতে আপনার ক্ষোভ থাকাটা অশোভন, কিন্তু সংসারটাতো ন্যায়ের উপর চলে না, সে কথা তো আপনি বিলক্ষণ জানেন— তাই মাঝে মাঝে অন্যায় অপবাদ সইতে হয়। আপনারই কাগজে দেখলুম, এক পাঠক আপনাদের টাইট দিয়েছেন, রাবিশ লেখা ছাপেন কেন? উত্তরদাতা বেচারী মুখ শুকনো করে (আমি হরফগুলোর মারফতেই তাঁর চেহারাটি স্পষ্ট দেখতে পেলুম) বলছেন, নাচার, নাচার স্যর! নামকরা লেখক। অনুরোধ জানিয়েছিলুম, একটি লেখা দিতে—অজানা জনকে তো আর অনুরোধ করতে পারি নে, বৃষ্টিতে ভেজার ভয়ে পুকুরে তো আর ডুব মারতে প্যারি নে—তারপর এসে উপস্থিত এই খাজা মাল। না ছাপিয়ে করি কি?'

বিলকুল সচ্চী বাৎ (আপনার কাগজে হিন্দী উর্দু শব্দের ব্যবহার দিতে আমার বাধে না, কারণ আপনার পাঠক সম্প্রদায় পাইকিরি দরে হিন্দী ফিলিম

দেখে দেখে দিব্য হিন্দী বুঝতে পারেন)! কারণ ফ্রান্স-জর্মনিতেও বলে, বরঞ্চ রদ্দি মাল খেয়ে পেটের অসুখ করবো, তবু শা—হোটেলওলাকে ফেরৎ দেব না, পয়সা যখন দিতেই হবে,—পাছে অন্য খদ্দেরকে বিক্রি করে ডবল পয়সা কামায়!' অতএব আমার মতে ছাপিয়ে দেওয়াটাই সুবুদ্ধিমানের কর্ম।

এ হেন অবস্থায় একটা মাস যে মিস্ গেছে, সেটা কি খুব খারাপ হল? বুঝলেন না? তাহলে একটি সত্যি ঘটনা বলি ঃ

ফিল্মাকাশের পূর্ণচন্দ্র শ্রীযুত দেবকী বসু আমার বন্ধু। দিল্লীতে যখন তাঁর 'রত্নদীপে'র হিন্দী কার্বন কপি দেখানো হয়, তখন দিল্লীর ফিল্ম সম্প্রদায় তাঁকে সেখানে নিমন্ত্রণ করে অভ্যর্থনা জানায়। স্বাগতাভিভাষণটি বলবার অনুরোধ আমাকেই করা হয়েছিল। কেন, তা জানি নে। এই তো ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো নয়। দেবকীবাবু যদি চটকদার রাবিশ ফিল্ম বানাতেন, তবে আমি ডাক পেলে আশ্চর্য হতুম না। তখন বুঝলুম, 'মুক্তো ফেলতে ডুবুরী' অর্থাৎ জউরী, সে সত্যই মুক্তোর মূল্য জানে, সে জলে নামে না—নামে মুক্তো বাবদে আনাড়ি ডুবুরী। কারণ আমি ফিল্ম দেখতে যাই নে—এরকম একটা বদনাম তরুণদের মধ্যে আমার আছে। বৃদ্ধেরা অবশ্য খুশী হয়ে বলবেন, 'বা, বা, বেড়ে ছেলে, খাসা ছেলে।' আমি কিন্তু বৃদ্ধের প্রশংসার চেয়ে তরুণের নিন্দাই কামনা করি। সংস্কৃতেও বলে বৃদ্ধার আলিঙ্গনের চেয়ে তরুণীর পদাঘাত শ্রেয়।'

যাক সেকথা। সেই সূত্রে দেবকীবাবুর পুত্র দিলীপের সঙ্গেও পরিচয় হয়। তদ্দণ্ডেই সে আমার ন্যাওটা হয়ে যায়। খাসা ছেলে। ফিল্ম দেখেও বেড়ে ছেলে—তরুণ বৃদ্ধ এক সুরেই বলবেন।

সে ডাক্তারি প্র্যাকটিসে নামার কয়েক বৎসর পর—আমি তখন ঘরের ছেলে কলকাতায় ফিরে এসেছি—দেবকীবাবু আমাকে একদিন শুধোলেন, 'দিলীপ কি রকম ডাক্তার!'

মিত্রপুত্রের প্রশংসা করতে সবাই আনন্দ পায়; একগাল হেসে বললুম, 'চৌকশ, তালেবর।'

'মানে?'

'অতি সরল। এই দেখুন না, মাস ছয় আগে আমার হল দারুণ আর্ত-রাইটিস—আর্তরব ছেড়ে ডাকলুম ডাকসাইটে অমুক ডাক্তারকে। তিনি ওষুধ দেওয়ার পর আমার এমনি অবস্থা যে আর্তরব স্মার্তরব কোন রবই আর ছাড়তে পারি নে। তখন এলেন আরেক বাঘা ডাক্তার। তিনি নাকি মড়াকে জ্যান্ত করতে পারেন। আমার বেলা হয় উল্টো; জ্যান্তকে মরা করতে লাগলেন। যাই যাই। সেই যে—

এক দুই তিন,
নাড়ি বড় ক্ষীণ।
চার পাঁচ ছয়,
কি হয় না হয়।

সাত আট নয়,
মরিবে নিশ্চয়।
দশ এগারো বারো,
খাট যোগাড় করো।
আঠারো উনিশ কুড়ি
বল্ "হরি হরি।"

কী আর করি? মরি তো মরি, মরবো না হয় দিলীপেরই হাতে। আর যা হোক হোক, আমাকে মানে। ভোঁতা নীড্‌ল দিয়ে শেষ ইন্‌জেকশনটা দেবে না।'

আমি থামলুম। দেবকীবাবু রুদ্ধশ্বাসে, শঙ্কিত কণ্ঠে শুধোলেন, 'তার-পর কি হল? আপনি বেঁচে উঠেছিলেন কি?'

আমি বললুম, 'দিলীপ বাড়িতে ছিল না, তাই আসতে পারল না। আমি সেরে উঠলুম।"

তবেই দেখুন, সে ভালো ডাক্তার কি না।'

সম্পাদক মশাই, আপনাদেরও কি সেই অবস্থা নয়? ডাকসাইটে অমুক লেখকের লেখা ছাপালেন। কাগজ নাবলো নিচে। বাঁচতে গিয়ে ডেকে পাঠালেন আর এক বাঘা লেখককে। আপনাদের অবস্থা হল আরো খারাপ! তখন আমি দিলীপ—কাঁচা লেখক—চাইলেন আমার লেখা। আমি বরদায়। লেখা পাঠাতে পারলুম না। হুশ করে আপনার কাগজের মান উঁচু হয়ে গেল। বিশ্বাস না হয়, আপনার সেলস্ ডিপার্টমেণ্টে খবর নিন—যে সংখ্যায় আমার লেখা ছিল না সেটি শুধু ইণ্ডো-পাকিস্তান ক্রিকেট টিকিটের মত বিক্রী হয় নি, ডাকে বিস্তরে বিস্তর খোয়া যায় নি, হয়তো বা আপনার অজানতে কালোবাজারও হয়েছে। বলতে কি, ঐ সংখ্যাটি আমারও বড্ড ভালো লেগেছে। বিশেষ করে রঞ্জনের লেখাটি এবং ভোম্বে থেকে বৌমিকের 'প্রশ্নবান'। বস্তুত, আমি আজ ঠিক করেছিলুম এ সংখ্যাটি নিয়েই আলোচনা করবো কিন্তু উপস্থিত মাত্র দু' একটি মন্তব্য করে সে-আলোচনা মুলতুবি রাখি।

যেমন মনে করুন, রঞ্জন লিখেছেন, 'বম্বের চিত্রনির্মাতা ঠিকই ধরেছেন যে অধিকাংশ দর্শক আড়াই ঘণ্টার জন্য (যখন ছবি ওই সময়ে শেষ হয়) আপন আসন্ন পরিবেশ থেকে অব্যাহতি পেতে চায়।' সত্যই কি তাই? তবে আমার প্রশ্ন, বৃদ্ধের আসন্ন পরিবেশ মৃত্যুর। এবং মৃত্যুভয় সব চেয়ে বড় ভয়। তবে বৃদ্ধেরা সিনেমা দেখতে যায় না কেন? আবার দেখুন, লড়াই যখন চলতে থাকে তখন ছুটি-ফেরা জোয়ান সেপাই জোর সিনেমা যায়। চল্লিশ এবং পঞ্চাশের মাঝামাঝি সময়েই এদেশের পরিবেশ সর্বাপেক্ষা নিরানন্দময়। ছেলে-দের পড়াবার পয়সা নেই, মেয়েরা বড় হয়েছে অথচ বর জুটছে না, চাকরিতে আর যে একটা মহৎ পদোন্নতি হবে সে সম্ভাবনাও আর নেই—তবুও ঐ বয়সের

লোক সিনেমায় যায় কম। অথচ তার কলেজী ছেলে—যার ঘাড়ে এখনো সংসারের চাপ পড়ে নি, খেলাধুলো সে করতে পারে, রকবাজিও তোফা জিনিস, তার আসন্ন পরিবেশ প্রৌঢ় বা বৃদ্ধের তুলনায় অনেক কম ভয়াবহ—সেই বা ড্যাং ড্যাং করে সিনেমায় যায় কেন? না আমার মন সাড়া দিচ্ছে না।

মঞ্জু বসু আমাদের ভৌমিক সায়েবকে শুধিয়েছেন, 'বারাঙ্গনার বীরাঙ্গনাতে রূপান্তরিতের একটি উদাহরণ দিন।' ভৌমিক ঠিক উত্তরই দিয়েছেন—'বাজিরাও প্রেমিকা মস্তানা বেগম্।'

আমি উল্টোটার বিস্তর উদাহরণ দিতে পারি। বীরাঙ্গনা কি করে বারাঙ্গনা হয়। যে কোনো খবরের কাগজে যে কোনো দিন দেখতে পাবেন। আমি তো প্রথম দিনে হকচকিয়ে উঠেছিলুম। এক বিখ্যাত বাঙলা দৈনিকের প্রথম পাতার এক কোণে দেখি, একটি সৌম্যদর্শন মহিলার ফটোগ্রাফ এবং নিচে লেখা 'বারাঙ্গনা—অমুক'। এদের কি মাথা খারাপ, না এরা পাগল যে বারাঙ্গনার ছবি কাগজের পয়লা পাতায় ঘটা করে ছাপায়। তলায় আবার পরিচয়—'মহিলাটি বঁটি হাতে একা একটা ডাকাতকে ঘায়েল করে প্রাণ হারান।' তখন আমার কানে জল গেল। বাঙলা হরফের উপরের ও নীচের দিকের অংশ প্রায়ই ভেঙে যায়। ী দীর্ঘঈকারের উপরের লুপটি ভেঙে যাওয়াতে 'বী' বদলে হয়ে গিয়েছে 'বা'। এটা এক দিনের নয়। উপরের লুপ, ('বঞ্চিত' শব্দের উপরের হুক ভেঙে গেলে অবস্থা আরো মারাত্মক), নিচের হ্রস্বউকার গণ্ডায় গণ্ডায় নিত্যি নিত্যি ভাঙে। আমরা অভ্যাসবশে পড়ে যাই বলে লক্ষ্য করি নে। যদি ঠিক যে-রকম ছাপাটি হয়েছে—ভাঙাচোরার পর—সে-রকমটি পড়েন তবে দেখবেন বিস্তর বীরাঙ্গনা বারাঙ্গনা হচ্ছেন, এবং আরো অনেক সরেস উদাহরণ পাবেন যেগুলো স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে ছাপলে আমি সমাজে মুখ দেখাতে পারতুম না। আপনাকে বলে রাখি, এখনো পারি নে—তবে সেটা পাওনাদারের ভয়ে।

অরুণ গুহ শুধিয়েছেন, 'এমন একটি আশ্চর্য জিনিসের নাম বলুন, যা আজ আছে কিন্তু ত্রিশ বৎসর আগে ছিল না।' ভৌমিক উত্তর দিয়েছেন, 'শচীন ভৌমিক।' সরেস উত্তর।

তারপর অরুণ গুহ ফের শুধিয়েছেন, 'এমন একটি জিনিসের নাম বলুন যা না থাকলে বিশ্বের কোন ক্ষতি হত না।' ভৌমিক উত্তর দিয়েছেন, 'অরুণ গুহ।' আমি শচীন ভৌমিক হলে লিখতুম, 'শচীন ভৌমিক'—এবারেও। কারণটা বুঝিয়ে বলি।

রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকী চলেছে, সেই সুবাদ নিয়েই বলছি—

বিলাতের বিখ্যাত স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজীন একবার পৃথিবী সেরা সেরা গুণীজ্ঞানীদের প্রশ্ন শোধান,

১। আপনার সব চেয়ে প্রিয় পাপমতি কি (হোয়াট ইজ ইয়োর বেস্ট ফেভরিট ভাইস)?

২। আপনার সব চেয়ে প্রিয় পুণ্যমতী কি (হোয়াট ইজ ইয়োর মোস্ট ফেভরিট ভার্চু)?

উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

১। ইন্‌কন্‌সিস্‌টেন্‌সি (অর্থাৎ কোনো জিনিসে অবিচল থাকতে পারি নে—অর্থাৎ মত বদলাই)।

২। ইন্‌কন্‌সিস্‌টেন্‌সি (অর্থাৎ কোনো জিনিসে অবিচল থাকতে পারি নে—অর্থাৎ মত বদলাই)।

একবার চিন্তা করলেই দেখবেন, ইন্‌কন্‌সিস্‌টেন্‌সি জিনিসটা পাপ বটে, পুণ্যও বটে।

যখন আমি স্বার্থের অংশ কিংবা শত্রুভয়ে কাপুরুষের মতন আপন সত্য মত বদলাই (কুলোকে বলে এ ব্যামোটা রাজনৈতিকদের ভিতরই বেশী—'টার্ণ-কোট' এর নাম) তখন আমার ইন্‌কন্‌সিস্‌টেন্‌সি পাপ। আবার যখন বুঝতে পারি আমার পূর্বমত ভুল ছিল, তখন লোক-লজ্জাকে ড্যাম-কেয়ার করে, এমন কি প্রয়োজন হলে স্বার্থত্যাগ করেও যখন মত বদলাই তখন আমার ইন্‌কন্‌সিস্‌টেন্‌সি সাতিশয় পুণ্যকর্ম।

ঠিক সেইরকম ভৌমিক সায়েব যখন বলেন তিনি ত্রিশ বৎসরের আশ্চর্য জিনিস, আমরা সানন্দে সায় দিই। কারণ তিনি সুন্দর সুন্দর এবং চোখা-চোখা, মৌলিক এবং চিন্তাশীল উত্তর দিতে পারেন। কখনো আনন্দিত হয়ে বলি 'বাঃ', কখনো মার খেয়ে বলি 'আঃ'।

আর তিনি না থাকলেও কোনো ক্ষতি হত না। ইংরিজীতে বলে, 'যা তোমার অজানা সে তোমাকে বেদনা দিতে পারে না।' কিংবা বলবো, 'আমরা জানিলাম না, আমরা কি হারাইতেছি।'

একটু চিন্তা করে দেখুন, কথাটা শুধু ভৌমিক সাহেব না, টলস্টয় কালিদাস, আপনি আমি সকলের বেলাই খাটে কিনা।

* * *

রবীন্দ্রনাথ ও ইন্‌কন্‌সিস্‌টেন্‌সির সংবাদে আমাদের দুটি নিবেদন আছে।

গেল মাসে মিস গেছে তার জন্যই আমি সম্পূর্ণ দায়ী নই। বড় লেখক হলে আমি অনায়াসে বলতে পারতুম, 'মশাই, ইন্‌স্‌পিরেশন্‌ আসে নি—আমি কি দর্জি না ছুতোর অর্ডার-মাফিক মাল দেব?' তা নয়। আমি সাধারণ লেখক। আমি আজ পর্যন্ত ইন্‌স্‌পায়ার্ড হয়ে লিখি নি। আমি লিখি পেটের ধান্দায়। পূর্বেই বলেছি, চতুর্দিকে আমার পাওনাদার। কে বলে আমি টাকার মূল্য বুঝি নে? যতবার ফুরিয়ে গিয়েছে ততবারই হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। একটু বেশী ব্যক্তিগত হয়ে যাচ্ছে, তবু না বলে উপায় নেই, আপনি হয়তো লক্ষ্য করেন নি, আমি চাকরিতে থাকাকালীন কোনো প্রকারের 'সাহিত্যসৃষ্টি' করি নে—চাকরিতে থাকাকালীন আমার কোন বই বেরয় নি। তখন তো পকেট গরম, লিখতে যাবে কোন্‌ মূর্খ! অতএব ইন্‌স্‌পিরেশনের দোহাই কাড়লে অধর্ম হবে।

আমি গিয়েছিলুম বরদা। সেখানে আমি মধ্য যৌবনে আট বছর কাজ করি। ১৯৪৭-এ বরদা ছাড়ি। সেখানে রবি শতবার্ষিকী উদ্বোধন করতে

আমাকে আহ্বান জানানো হয়, পুরনো চেনা লোক বলে, অন্য কোন কারণে নয়। না গেলে নেমক-হারামী হত। ট্রেনে লেখা যেত না ? না। আপনি যদি গবেষণামূলক উচ্চাঙ্গ উন্নাসিক গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ চাইতেন সে আমি গণ্ডায় গণ্ডায় ট্রেনে-বাসে, ভেস্টিবুলে-তরুমূলে যেখানে সেখানে বসে—না বসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও লিখে দিতে পারি। কিন্তু একটুখানি রসের ভিয়েন দিতে গেলেই চিত্তির। তার জন্য ইনস্পিরেশন্ না হোক, অবকাশটি চাই। সাধে কি আর জি. কে চেস্টারটন বলেছিলেন, 'টাইমস্ কাগজের গুরুগম্ভীর সম্পদকীয় কলাম আমি দিনের পর দিন আধ ঘণ্টার ভিতর লিখে দিতে পারি, কিন্তু ঐ যে ট্রাম-বাসের কাগজ 'টিট্ বিটস'—তার পয়লা পাতার বিশটি রসিকতার চুটকিলা গল্প একসঙ্গে আমি কখনো রচনা করে উঠতে পারবো না।' অথচ কে না জানে, চেস্টারটন ছিলেন সে যুগের সুরসিক লেখক। আর আমি ? থাক গে।

দ্বিতীয়ত ঐ ইন্‌কন্‌সিস্‌টেন্‌সির কথা। ওটার বাড়াবাড়ি করলে লোকে ভাববে পাগল। গল্পটা তাই নিয়ে।

ট্রেনে ফেরার মুখে এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে শোনা। ওটা উনি কোন ছাপা বই থেকে পড়ে বলেছেন কি না হলপ করে বলতে পারবো না, তবে এই-টুকু বলতে পারি সেই থেকে যাকে বলেছি, তিনি উত্তরে বলেছেন, এটা তিনি আগে কখনো শোনেন নি। আজ দোলপূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ ছিল—তার সঙ্গেও এর কিঞ্চিৎ যোগ (অর্থাৎ এশোসিয়েশন অব্ আইডিয়াজ) রয়েছে।

ক্লাস-টীচার বললেন, 'গত শতাব্দীর সূর্যগ্রহণ সংখ্যা থেকে চন্দ্রগ্রহণ সংখ্যা বিয়োগ করে, তোমার কলারের সাইজের সঙ্গে এ বাড়ির থামের সংখ্যা যোগ দিয়ে, পদীপিসির নামকে ক্ষান্তমাসির নাম দিয়ে ভাগ করে বল দিকিনি আমার বয়স কত ?'

ছেলেরা তো অবাক ! এ কখনো হয় !

একটি চালাক ছোকরা হাত তুলে বললে, 'আমি পারি, স্যর।'

টীচার বললেন, 'বল।'

'চুয়াল্লিশ।'

টীচার ভারী খুশী হয়ে বললেন, ঠিক বলেছিস। কিন্তু স্টেপগুলো বাংলা তো, কি করে তুই সঠিক রেজাল্টে পেঁছিলি।'

ছেলেটি তিন গাল হেসে বললে, 'মাত্র তিনটি স্টেপ, স্যর। অতি সোজা :—

আমাদের বাড়িতে একটা আধ-পাগলা আছে ;

তার বয়স বাইশ ;

অতএব আপনার বয়স চুয়াল্লিশ॥'

রবীন্দ্র রচনাবলী

রবীন্দ্র রচনাবলী/জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ/বিশ্বভারতীর সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে শিক্ষাসচিব শ্রীধীরেন্দ্রমোহন সেন কর্তৃক প্রকাশিত/২৫ বৈশাখ ১৩৬৮/বিশ্বভারতীয় কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে গ্রন্থ সম্পাদনের সহায়তা করেছেন শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীঅমিয়কুমার সেন।

রবীন্দ্র রচনাবলী সদ্য প্রকাশিত এই দুই খণ্ড যে আমার এবং আমার মত রবীন্দ্রানুরাগী বহু সহস্র পাঠকের মনে কি গভীর পরিতৃপ্তি সৃষ্টি করেছে সেটি এই অবকাশেই প্রকাশ না করলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথা বাঙালী জনমতের প্রতি বিলক্ষণ অবিচার করা হবে। উভয়েরই কৃতিত্ব সমান। রবীন্দ্রশতাব্দী উপলক্ষে সুলভ রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশিত হোক, এই ঐকান্তিক ও ঐক্যবদ্ধ কামনা দেশের কাগজে কাগজে প্রকাশিত হয়েছে; আমরা, যাদের কথার কোনো মূল্যই নেই, যতদূর সম্ভব অনুনয়-বিনয় করেছি কর্তৃপক্ষের কাছে, উৎসাহ দিয়েছি যাঁরা বাঙালীর হয়ে তাঁদের কামনাটি বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে জানিয়েছেন। অবশ্য বলে রাখা উচিত, এই উভয় কর্তৃপক্ষের ভিতর বিস্তর রবীন্দ্রানুরাগীও আছেন যাঁরা এই সুলভ রচনাবলী প্রকাশের জন্য জনমত তৈরী হওয়ার পূর্বেই এ ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন। বলা বাহুল্য, এঁদের সকলেই বিস্তর বিরুদ্ধাচরণ অতিক্রম করে আজ সাফল্যের দ্বারে এসে পৌঁচেছেন। বলা আরো বাহুল্য বিরুদ্ধাচারিগণ যে রবীন্দ্র-ভক্তি নন এ কথা বললে অন্যায় বলা হবে। কি কারণে তাঁরা এ প্রস্তাব অনুমোদন করেন নি সে প্রসঙ্গ এস্থলে নিষ্প্রয়োজন।

এই দুই খণ্ড যে ছাপা, বাঁধাই, কাগজ, ছবি, কবির হস্তলিপি ইত্যাদি নিয়ে অনবদ্য সে-বিষয়ে কোনো তর্কের অবকাশ নেই।

কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা, প্রথম আড়াই বা তিন খণ্ডেই আমরা কবির তাবৎ কবিতা ও প্রচুর গান একসঙ্গে পেয়ে যাচ্ছি। যাঁরা প্রাচীন রচনাবলী নিয়ে কাজ করতেন তাঁরাই জানেন রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা বের করতে আমাদের কী বেগই না পেতে হত। কোনো বিশেষ ছোট গল্প, নাট্য বা প্রবন্ধ নিয়ে প্রায় ঐ একই অসুবিধায় পড়তে হত। এই দ্বিতীয় অসুবিধাটিও বর্তমান রচনাবলী দূর করে দেবে—কারণ এতে প্রাচীন রচনাবলীর মত চার রকমের জিনিসের (১. কবিতা ও গান, ২. নাটক ও প্রহসন, ৩ উপন্যাস ও গল্প ৪. প্রবন্ধ) পাঁচমেশালি থাকবে না।

আমি রবীন্দ্রসৃষ্টির বিশেষজ্ঞ নই, কিন্তু আরো বহু বঙ্গসন্তানের মত রবীন্দ্রনাথের কোনো বিশেষ কবিতা পাঠ করে ভাবোদয় হলে সেটা তাদেরই মত প্রকাশ করতে চেয়েছি। এযাবৎ সেটাও করতে পারি নি তার কারণ ঐ ছাব্বিশ খণ্ড নিয়ে রেফেরেন্স খুঁজে বেড়ানো আমাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল। আমার শোক—নবীন রচনাবলীখানা কুড়ি বৎসর পূর্বে পেলে হয়তো

এই নিয়ে কোনো বৃহৎ কাজে হাত দিতে পারতুম। বক্তব্য একটু ব্যক্তিগত হয়ে গেল, কিন্তু আমার একাধিক অনুরাগী পাঠক এই নিয়ে ফরিয়াদ করেছেন বলেই এই সাফাইটি গাইতে হল। আমি কিন্তু প্রাচীন রচনাবলীর নিন্দা করার উদ্দেশ্য নিয়ে এ প্রবন্ধিকা লিখতে বসি নি—যাঁরা চার রকমের লেখা পাঁচমেশালী করেছিলেন তাঁদের উদ্দেশ্য শুভই ছিল, সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই।

এখন প্রশ্ন, নবীন রচনাবলীর সম্পাদনা কি রকমে হয়েছে।

আমি বলবো উত্তম, অতি উত্তম। কিন্তু সর্বাঙ্গ-সুন্দর সম্পাদনা হতে এখনো একশ' কিংবা দুশ' বছর লাগবে। কারণ এ কাজ দশজন পণ্ডিতকে দশ বছর খাটিয়ে নিলেই হয় না।

প্রথমত, কবির তাবৎ প্রকাশিত রচনাবলীর প্রথম প্রকাশের ফোটোস্টাট, তাঁর জীবিতাবস্থায় তিনি যে-সব পরিবর্তন করেছিলেন সে সব এবং তাঁর পাণ্ডু-লিপি (এগুলো সংগ্রহ করতে কতদিন লাগবে, কেউ বলতে পারে না) যেমন যেমন পাওয়া যাবে তারও ফোটোস্টাট (অন্য একটা নূতন সস্তা পদ্ধতিও হালে বেরিয়েছে) বের করতে হবে। তাদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে কবির দেহ-ত্যাগের পর যে-সব পুনর্মুদ্রণ এবং নূতন সংস্করণ বেরিয়েছে তাতে যে সব পরিবর্তন করা হয়েছে সেগুলি পাণ্ডুলিপি-সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত হয়েছে কিনা। এখন এ কাজ সম্ভব নয়। ত্রিশ বৎসর পর যখন এ সব পুস্তকের উপর কারো কোনো কপিরাইট থাকবে না, তখনই উৎসাহী, অগ্রণী নানা প্রকারের প্রকাশক নানা রকম জিনিস প্রকাশ করে পণ্ডিতদের সামনে তুলে ধরবেন। তাঁরা বাঙলার ভিতরে বাইরে বসে বসে যে-সব গবেষণা প্রকাশ করলেন যে সমস্ত যাচাই বাছাই করে ধীরে ধীরে তৈরী হবে প্রামাণিক সংস্করণ। একটি তুলনা দিই ; জর্মন কবি হাইনরিষ হাইনের মৃত্যু-শতাব্দী উদ্‌যাপিত হয়েছে বছর পাঁচেক পূর্বে (আমরা রবীন্দ্রনাথের জন্ম শত-বার্ষিকী করছি এখন) এবং আজও তাঁর চিঠিপত্র মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হচ্ছে! কবে শেষ হবে, অনুমান করা কঠিন।

নবীন রচনাবলীর সম্পাদকগণ এ ধরনের কাজে হাত না দিয়ে যে প্রাচীন রচনাবলী যেভাবে ছাপা হয়েছিল মোটামুটি সেভাবেই ছেপেছেন সেইটেই করেছেন ভালো। 'মোটামুটি' কথাটা বোঝাবার জন্য একটি ক্ষুদ্র উদাহরণ দিই ; প্রাচীন রচনাবলীর একাদশ খণ্ডে, গীতাঞ্জলি পুস্তকে আছে—

কত অজানারে জানাইলে তুমি,
কত ঘরে দিলে ঠাঁই
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু
পরকে করিলে ভাই।

গীতবিতানেও তাই। কিন্তু ব্রহ্মসঙ্গীতে 'নিকটে'র পর কমা নেই। অর্থাৎ 'নিকট-বন্ধু'রূপে পড়া যেতে পারে। আমরাও ছেলেবেলায় ঐ অর্থে পড়েছি —'বন্ধুকে' ভকেটিভ কেসে নিই নি। জন্ম-শতবার্ষিক সংস্করণের (২য় খণ্ড,

২১৬ পৃষ্ঠায়) পাচ্ছি 'নিকট বন্ধু,'—মাঝখানে কমা নেই। অর্থাৎ ব্রহ্ম-সঙ্গীতেও আমরা ছেলেবেলায় যেটি শুনেছি সেই পাঠ। কবিতাটির পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রসদনে নেই। ওদিকে ঐ সদনের জনৈক দায়িত্বশীল কর্মচারী আমাকে বলেছেন, তিনি রবীন্দ্রনাথের আপন হাতে অটোগ্রাফ বইয়ে লেখা এই কবিতা-টিতে 'নিকট' ও 'বন্ধুর' মাঝখানে কমা পেয়েছেন।

নবীন সংস্করণের সম্পাদকগণ কমা না দিয়ে ভালো করেছেন না ভুল করেছেন সেটা পরবর্তীকালে হয়তো স্থির হবে। উপস্থিত এই পাঠটি দেওয়াতে, আমাদের ভিতর যে আলোচনা হত সেটি সজীব রইল, এবং আরো পাঁচজনের সামনেও প্রকাশ পেল।

প্রাচীন সংস্করণ কপি করাতে নবীন সংস্করণে আরো কিছু কিছু অসম্পূর্ণতা থেকে যাবে সন্দেহ নেই, কিন্তু পূর্বেই বলেছি গত্যন্তর ছিল না। যেমন প্রাচীন রচনাবলী পূরবী পুস্তকের 'দুঃখ-সম্পদ' কবিতাটি শেষ হয়েছে, 'তখন বুঝিতে পারি আপনার মাঝে। আপন অমরাবতী চিরদিন গোপনে বিরাজে।' কিন্তু রবীন্দ্র সদনে সুরক্ষিত ঐ পুস্তকের পাণ্ডুলিপিতে এর পর আরো ছয়টি ছত্র আছে—

> যখনি কুঁড়ির বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দেয় তাপে,
> তখনি ত জানি, ফুল চিরদিন ছিল ভাপে।
> দুঃখ চেয়ে আরো বড় না থাকিতে কিছু
> জীবনের প্রতিদিন হ'ত মাথা নীচু
> তবে জীবনের অবসান
> মৃত্যুর বিদ্রূপ হাস্যে আনিত চরম অসম্মান।

দু'একটি শব্দের তফাৎ নয় বলে এ কয়টি লাইনের বিশেষ মূল্য আছে ও প্রাচীন রচনাবলীর গ্রন্থ-পরিচয়ে দেওয়া আছে। যদিও বাজারে প্রচলিত ভাদ্র ১৩৬৩ পুনর্মুদ্রণের 'পূরবী'তে নেই।

*　　*　　*

ঠিক সেই রকম বানান, সমাসবদ্ধ শব্দ লেখার পদ্ধতি নিয়েও নানা কথা উঠবে, নানা আলোচনা হবে। কিন্তু বর্তমান সম্পাদকগণ সেদিকে না গিয়ে ভালোই করেছেন। প্রাচীন রচনাবলী নানা প্রতিকূল অবস্থার মাঝখানে সম্পাদিত ও মুদ্রিত হয়েছিল। তাতে অনেক বিষয়ে অনেকের মতান্তর থাকবে। আমরা চেয়েছিলুম, সেই প্রাচীন সংস্করণেরই একটি সুলভ, কবিতা গল্প ইত্যাদি আলাদা আলাদা করা হ্যাণ্ডি সংস্করণ। তাই পেয়েছি॥

বাঙলা দেশ

কতকগুলো প্রশ্ন আমাকে ছেলেবেলা থেকেই চিন্তান্বিত করেছে এগুলোর সদুত্তর আমি বহু জায়গায় অনুসন্ধান করে কয়েকটি মীমাংসায় পৌঁচেছি বটে কিন্তু যতখানি দলিল-দস্তাবেজ থাকলে এগুলো প্রমাণ রূপে পেশ করা যায় ততখানি

করে উঠতে পারি নি। তার প্রধান কারণ আমার আলসেমি নয়—দস্তাবেজের অপ্রাচুর্যই তার আসল কারণ। অনেকদিন ধরে তাই ভেবেছি, আমার যা বলবার তা বলে ফেলি—দলিল থাক আর নাই থাক—যারা এসব লাইনে কাজ করেন, হয়তো তাঁদের উপকারে লেগে যেতে পারে। 'দেশ' সম্পাদকও এই মত পোষণ করেন—বস্তুত তাঁরই অনুরোধে আমি আমার সমস্যা ও মীমাংসাগুলি পাঠকদের সামনে পেশ করছি, কিন্তু আবার সাবধান করে দিচ্ছি, যথেষ্ট প্রমাণপঞ্জি আমার হাতে নেই।

আমার প্রথম প্রশ্ন, দিল্লী আগ্রা পাঠান-মুগলদের রাজধানী ছিল। সেখানে মুসলমানের সংখ্যা অত কম কেন? যুক্তপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিম বাঙলার দিকে যতই এগোই, ততই দেখি মুসলমানের সংখ্যা কমে আসছে—সেইটেই স্বাভাবিক —কিন্তু হঠাৎ পূব বাঙলায় এসে এদের সংখ্যাধিক্য কেন? দিল্লীর বাদশা দিল্লী, এলাহাবাদ ছেড়ে দিয়ে হঠাৎ পূব বাঙলায়ই তলোয়ার চালিয়ে জনসাধারণকে মুসলমান করলেন কেন? উত্তরে কেউ কেউ বলেন, দিল্লীর বাদশারা তলোয়ার চালান নি, চালিয়েছিল বাঙলার স্বাধীন পাঠান বাদশারা। তাই যদি হবে, তবে যে যুগে বেহার, বিজাপুর আহমদাবাদেও স্বাধীন পাঠান রাজারা ছিলেন। তাঁরাই বা তলোয়ার চালালেন না কেন? কেউ কেউ বলেন, বাঙলা দেশ বৌদ্ধ-প্রধান স্থান ছিল—তারা ভালো করে পুনরায় হিন্দুধর্মে ফিরে যাবার পূর্বেই মুসলমান ধর্ম বাঙলা দেশে আসে বলে এদের অনেকেই মুসলমান হয়ে যায়। এর উত্তরে আমার নিবেদন,—রাজগির, বুদ্ধগয়া, পাটলিপুত্র, নালন্দা, বিক্রমশিলা সবই বিহার প্রদেশে—সে তো আরো বৌদ্ধ-প্রধান ছিল। তবে তারাই বা মুসলমান হল না কেন?

সর্বশেষে আরো সামান্য একটি বক্তব্য আছে। বহুকাল পূর্বে (শ্রাবণ, ১৩৫৮, 'বসুমতী') আমি স্বামী বিবেকানন্দের একটি উদ্ধৃতিতে পড়ি,

"ভারতবর্ষের দরিদ্রগণের মধ্যে মুসলমান এত সংখ্যাধিক্য কেন? এ কথা বলা মূর্খতা যে তরবারির সাহায্যে তাহাদিগকে ধর্মান্তর গ্রহণে বাধ্য করা হইয়াছিল।......বস্তুত জমিদার ও পুরুতবর্গের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য ইহারা ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিল। আর সেইজন্য বাঙলা দেশে যেখানে জমিদারের বিশেষ সংখ্যাধিক্য সেখানে কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা বেশী।"[১]

আমার মূল বক্তব্যের সঙ্গে স্বামীজীর কথা কিছুটা মিলে। পরে তার দীর্ঘতর আলোচনা হবে। উপস্থিত তরবারির সাহায্যে যে ব্যাপক ভাবে ধর্ম প্রচার করা যায় না, সেই সিদ্ধান্তটি মেনে নিয়ে এগোচ্ছি।

আরবভূমি যদিও মরুময়, তবু তার তিন দিকে সমুদ্র। নৌযাত্রায় আরবরা

১ এ উদ্ধৃতিতে যে কয়েকটি ফুটকি আছে, সেগুলো প্রবন্ধের সংকলন কর্তাই দিয়েছিলেন। মূল সম্পূর্ণ লেখাটি পেলে আমাদের আলোচনার সুবিধে হয়।

তাই কখনো পরাঙ্মুখ ছিল না। বিশেষত হজরৎ মহম্মদের সময় তারা ঐক্য-বদ্ধ হয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে নৌপথে দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এ বিষয়ে দুখানা উত্তম গ্রন্থ এলাহাবাদ একাডেমি থেকে উর্দু ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে—আরবোঁকী জাহাজরাণী (আরব নৌবিদ্যা) ও হিন্দ ও আরবকী তাল্লুকাৎ (ভারত ও আরবের যোগসূত্র)। অতদূর না গিয়ে যারা আরব্যোপন্যাসের সিন্দ-বাদকে স্মরণে আনতে পারবেন তাঁরাই বলতে পারবেন এক বিশেষ যুগে আরবজাতি কী দুর্দান্ত সমুদ্রাভিযানই করেছে।[২] ওরাই মৌসুমী (শব্দটি আসলে আরবী ও ইংরিজী মনসুনও তার থেকে) বাতাস আবিষ্কার করে ও ফলে উপকূল ধরে ধরে না এসে এডেন-সোকোত্রা থেকে সোজা সিংহল-ভারত আসা সুগম ও দ্রুততর হয়ে যায়।

স্থলপথে আরবরা, ইরান আফগানিস্থান জয় করে। জলপথে সিংধুদেশ।

এ ছাড়া সমুদ্রপথে যারা বাণিজ্য করতে ছড়িয়ে পড়ল তাদের নিয়েই আজ আমার আলোচনা। এরা প্রথমে সোকোত্রা (সংস্কৃত, 'দ্বীপ সুখদ্বার'—এডেনের কাছেই,) তার পর মালদ্বীপ লাক্ষাদ্বীপে ইসলাম প্রচার করে। দক্ষিণ ভারতে পারে নি, (পূব বাঙলার কথা পরে হবে), বর্মায় পারে নি, মালয় ও ইন্দোনেশিয়ায় পেরেছিল।

হিন্দুদের সমুদ্রযাত্রা কেন নিষিদ্ধ করা হয়েছিল আমি ঠিক জানি নে, তবে যাঁরা বৌদ্ধদের পরাস্ত করে হিন্দুধর্ম পুনর্জীবিত করেছিলেন তাঁরা হয়তো চান নি যে সাগর-পারের বৌদ্ধদের সঙ্গে আমাদের কোনো যোগসূত্র থাকে—যার ফলে আবার একদিন বৌদ্ধধর্ম মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে।

তা সে যাই হোক, অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে পূব বাঙলার মাল্লা-মাঝি, আমদানী-রপ্তানি ব্যবসায়ীদের দুরবস্থা চরমে। আজো যে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, সিলেটের মাঝি-মাল্লারা দুনিয়ার সর্বত্র ঘুরে বেড়ায় (আজ তারা আবার ইংলণ্ডে বসতি স্থাপন করতে আরম্ভ করেছে, প্লেন চার্টার করে পূব বাঙলায় বেড়াতে আসে) এটা কিছু নূতন নয়। হিন্দু বৌদ্ধ যুগে এরাই বাঙলার তাবৎ এবং পূব ভারতের প্রচুর মাল আমদানি-রপ্তানি করেছে, নৌ-নির্মাণ ও নৌবহর চালিয়েছিল বটেই।

সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হওয়ায় ফলে প্রধানত এরাই হল অন্নহীন।

আরব ভৌগোলিক (ও ঐতিহাসিকরা) বলেন, অষ্টম ও নবম শতাব্দীতেই (অর্থাৎ বখতিয়ার খিলজীর বহু পূর্বেই) আরবরা চটগ্রামে উপনিবেশ স্থাপন করেছে ও এ বন্দরেই সব কিছু সংগ্রহ করে (হিন্দুরা তো যাবে না) দক্ষিণ-পূবেও ছড়িয়ে পড়ত।

আরবী ভাষাতে 'চ' ও 'গ' অক্ষর নেই। 'ট' 'ত'-তেও পার্থক্য নেই। সেই হয়েছে বিপদ। তদুপরি নকলনবিশদের ভুল-ত্রুটি তো আছেই। কাজেই যদি

২ আরব্যোপন্যাসের প্রথম গল্পটি জাতক থেকে নেওয়া। সতীদাহ ও কোনার্ক মন্দিরের 'প্রতিচ্ছবি'ও ঐ পুস্তকে পাওয়া যায়।

বা চট্টগ্রাম শব্দটি বোঝা যায়, তবু পরবর্তী যুগে এরা, 'সপ্তগ্রাম' ও 'সোনার গাঁ'-র সঙ্গেও এটা ঘুলিয়ে দিয়েছে। তারো পরবর্তী যুগের পর্তুগীজরা তাই চট্টগ্রামের উল্লেখ করতো পোর্টে গ্রান্ডে (বড় বন্দর) ও সপ্তগ্রামকে পোর্টে পিকোনে (ছোট বন্দর) বলে।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে বর্তমান ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের সমুদ্র তটেই আরবরা বসতি স্থাপন করে—সিলেটের সঙ্গে জলপথে যাতায়াত আরও সহজ ছিল। এরাই মিশনারি এবং বণিক—একাধারে। এরাই অষ্টম নবম শতাব্দীতে, একদা যারা মাঝি-মাল্লা ছিল, সেই সব হিন্দুদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করতে আরম্ভ করে। এ তত্ত্বটা মেনে নিলে 'অষ্টাদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গ জয়' অন্য দৃষ্টিতে দেখা যায়। কিন্তু তার জন্য নূতন অধ্যায় প্রয়োজন॥

ভবঘুরে

ছন্নছাড়া, গৃহ হারা, বাউণ্ডুলে, ভবঘুরে, যাযাবর—কত হরেক রকম রঙবেরঙের শব্দই না আছে বাঙলাতে ভ্যাগাবণ্ড বোঝাবার জন্য। কিন্তু তবু সত্যকার বাউণ্ডুলিপনা করতে হলে সব চেয়ে উত্তম ব্যবস্থা—গেরুয়াধারণ। ইরান-তুরান-আরবিস্থানে দরবেশ সাজা। ইয়োরোপে এই ঐতিহ্যমূলক পরিপাটি ব্যবস্থা না থাকলেও অন্যান্য মুষ্টিযোগ আছে যার কৃপায় মোটামুটি কাজ চলে যায়। সেগুলোর কথা পরে হবে।

তবে এই সন্ন্যাসী বেশ ধারণ করার আগে একটুখানি ভেবে-চিন্তে নেওয়া দরকার। একটি ছোট উদাহরণ দেই।

আমি তখন বরদায়। বহু বৎসর আগেকার কথা। হঠাৎ সেখানে এক বঙ্গ সন্তানের উদয়। ছোকরা এম. এ পাস করে কি করে সেখানে একটা চাকুরি জুটিয়ে বসেছে—মাইনে সামান্যই, কষ্টে-শ্রেষ্ঠে দিন কেটে যায়।

ছোকরা আমাদের সঙ্গে মেলেমেশে বটে কিন্তু শনির সন্ধ্যা থেকে সোমের সকাল পর্যন্ত তার পাত্তা পাওয়া যায় না—অথচ ঐ সময়টাতেই তো চাকুরেদের দহরম-মহরম, গাল-গল্প করা, বিশেষ করে যখন বিনয়তোষের বাড়িতে রবির দুপুরে ভূরি-ভোজনের জন্য তাবৎ বাঙালীর ঢালাও নেমন্তন্ন। অনুসন্ধান না করেই জানা গেল বাঁড়ুয্যে ছোকরার দু-পায়ে দুখানা এ্যাব্বড়া বড়া বড়া চক্কর। শনির দুপুরে আপিস ছুটি হতে না হ'তেই সে ছুট দেয় ইস্টিশান পানে। সেখানে কোন একটা গাড়ি পেলেই হল। টিকিট মিনু-টিকিটে চললো সে ইঞ্জিনের এক চোখা দৃষ্টিতে সে যেদিকে ধায়।

পূর্বেই বলেছি, এহেন সৃষ্টি-ছাড়া কর্মের জন্য সন্ন্যাসী-বেশ প্রশস্ততম। হিন্দু-মুসলমান টিকিট-চেকারের কথা বাদ দিন, সে যুগের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান দুঁদে চেকার পর্যন্ত মিনু-টিকিটের গেরুয়াকে ট্রেন থেকে নামাতো না—বিড়বিড় করতে করতে আমিই একাধিক বার শুনেছি, 'গড্ ড্যাম হোলি ম্যান—নাথিং

ডুইং।' অর্থাৎ ওটা খোদার খাসী, কিচ্ছুটি করার যো নেই।'

আমাদের বাঁড়ুয্যে ছোকরাটি অতিশয় চৌকশ তালেবর। দু'টি উইক-এণ্ডের বাউণ্ডুলিপনা করতে না করতেই আবিষ্কার করে ফেললে এই হৃদয়-রঞ্জন তথ্যটি —সঙ্গে সঙ্গে তার পায়ের চক্করদুটি টাইমপীসের ছেঁড়া স্প্রীং-এর মত ছিটকে তার পা দুটিকেও ছাড়িয়ে গেল। বিশেষ করে যেদিন খবর পেল, সৌরাষ্ট্রের বীরমগাম ওয়াচওয়ান থেকে আরম্ভ করে ভাওনগর দ্বারকাতীর্থ অবধি বহু ট্রেনে একটি ইস্পিশেল কামরা থাকে যার নাম 'মেণ্ডিকেণ্ট কম্পার্টমেণ্ট'; গেরুয়া পরা থাকলেই সে কামরায় মিন্ টিকিটে উঠতে দেয়। সেখানে নাকি সাধু-সন্ন্যাসীরা আপোসে নির্বিঘ্নে আত্মচিন্তা-ধর্মচিন্তা পরব্রহ্মে মনোনিবেশ করতে পারেন। তবে নেহাত বেলেল্লা নাস্তিকদের মুখে শুনেছি সেখানে নাকি বিশেষ এক ধোঁয়ার গন্ধ এমনই প্রচণ্ড যে কাগে বগে সেখান থেকে বাপ-বাপ করে পালায় —দুষ্টেরা আরো বাঁকা হাসি হেসে বলে, আসলে নিরীহ প্যাসেঞ্জারদের ঐ কৈবল্য ধুম্রের উৎপাত থেকে বাঁচানোর জন্য ঐ খয়রাতী মেণ্ডিকেণ্ট কম্পার্টমেণ্টের উৎপত্তি। কিন্তু আমাদের বাঁড়ুয্যে তার থোড়াই পরোয়া করে—আসলে সে খাস দর্জিপাড়ার ছেলে, বাবা,—ছোকরা বয়েস থেকে বিস্তর ইটালিয়ান (অর্থাৎ ইঁটের উপর বসে) ছিলিমফাটানো দেখেছে, দু'চার কাচ্চা যে নাকে ঢোকে নি সে-কথাও কসম খেয়ে অস্বীকার করতে সে নারাজ। দুআ ভুআ না করে বাঁড়ুয্যে তন্দণ্ডেই ধুতিখানি গেরুয়া রঙে ছুপিয়ে মাদ্রাজী প্যাটার্নে লুঙ্গিপানা করে পরলো, বাসন্তী রঙ করাতে গিয়ে গেরুয়াতে জাতান্তরিত তার একখানি উড়ুনি আগের থেকেই ছিল। 'ব্যোম ভোলানাথ' বলতে বলতে বাঁড়ুয্যে চাপলো 'মণ্ডিকেণ্ট কম্পার্টমেণ্টে'। বাবাজী চলেছেন সোমনাথ দর্শনে।

আমাদের বাঁড়ুয্যে কিপ্টে নয়। মিন্ টিকিটে চড়ার পরও তার টাঁ্যাকে ছুঁচোর নেত্য। তাই আহারাদিতেও তাকে হাত টেনে হাত বাড়াতে হত পয়সা দিতে। তাই ঐ ব্যাপারে রিট্রেঞ্চমেণ্ট করতে গিয়ে সে আবিষ্কার করলো আরেকটি তথ্য—পুরী তরকারি, দহিবড়া-শিঙাড়ার চেয়ে শিককাবাব ঢের সস্তা, পোষ্টাইও বটে। এক পেট পরোটা-শিককাবাব খেয়ে নিলে শুবো-শাম ত্রিযামা-যামিনী নিশ্চিন্তি।

'গোস্ত-রোটী কাবাব-রোটী' যেই না ফেরিওয়ালা দিয়েছে হাঁক অমনি বাঁড়ুয্যে তিন লম্ফে দরজার কাছে এসে তাকে দিল ডাক। লোকটা প্রথমে কেমন যেন হকচকিয়ে গেল।—আসতে চাইল না। বাঁড়ুয্যে ঘন ঘন ডাকে, 'আরে দেখতে নাহি পারতা হায়, হাম তুমকো ডাকতে ডাকতে গলা ফাটাতা হায়—' সে-হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা না বলে 'লোষ্ট্রভাষা' বলাই উচিত। এক-একটি লব্জো যেন ইঁটের থান।

ফেরিওলা কাছে এসে কাঁচুমাচু হয়ে হিন্দী-গুজরাতীতে বুঝিয়ে বললে, 'সাধুজী এ তোমার খাওয়ার জিনিস নয়। বাঁড়ুয্যে গেল চটে। সে কি এতই অগা যে জানে না, শিককাবাব কোন্ অখাদ্য চাতুষ্পদ থেকে তৈরী হয়! তেড়ে বললে, 'হাম ক্যা খাতা হায়, নাহী খাতা হায়, তোমার ক্যা ভেটকি-লোচন?'

ফেরিওলা তর্ক না করে,—স্পষ্ট বোঝা গেল অনিচ্ছায়—কাবাব রুটি দিয়ে পয়সাগুলো না গুনেই ধামাতে ফেলে চলে গেল।

ট্রেন ছেড়েছে। বাঁড়ুয্যে কাবাব রুটি মুখে দিতে গিয়েছে—লক্ষ্য করে নি, কামরার থমথমে ভাবটা। এমন সময় দশটা হেড়ে গলায় একসঙ্গে হুংকার উঠলো, 'এই শালা, ক্যা খাতা হৈ ?'

প্রথমটায় বাঁড়ুয্যে বুঝতে পারে নি। আস্তে আস্তে তার চৈতন্যোদয় হতে লাগল—সন্ন্যাসীদের প্রাণঘাতী চিৎকারের ফলে। 'শালা পাষণ্ড, নাস্তিক। অখাদ্য খায়, ওদিকে ধরেছে গেরুয়া। চোর ডাকাত কিংবা খুনীও হতে পারে। ফেরার হয়ে ধরেছে ভেক। এই করতে তো সাধু-সন্ন্যাসীদের বদনাম হয়েছে, যে তাদের কেউ কেউ আসলে ফেরারী আসামী।'

বাঁড়ুয্যে কি করে বলে সে জানতো না, ওটা অখাদ্য। একে মাংস, তায় —। ওদিকে ওরা ফেরিওলাতে বাঁড়ুয্যেতে যে কথা-কাটাকাটি হয়েছে সেটা যে ভালো করেই শুনেছে, তাও ওদের কথা থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল।

ওদিকে সন্ন্যাসীরা এক বাক্য স্থির করে ফেলেছে, এই নরপশুকে চলন্ত ট্রেন থেকে ফেলে দিয়ে এর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করানো হোক। দু' একটা ষণ্ডা তার দিকে তখন এগিয়ে আসছে।

বাঁড়ুয্যের মনের অবস্থা কল্পনা করুন। চেন টানার ব্যবস্থা থাকলেও-সেদিকেও দুশমনদের ভিড়। সে বিকল অবশ। এরকম অবশ্য-মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছে কটা লোক ?

একজন তার দু বাহুতে হাত দিয়ে ধরতেই কম্পার্টমেণ্টের এক কোণ থেকে হুংকার এল, 'ঠহ্‌রো।' সবাই সেদিকে তাকালে। এক অতি বৃদ্ধ সন্ন্যাসী উপরের দিকে হাত তুলেছেন। ইনি এতক্ষণ এদের আলোচনায় যোগ দেন নি।

বললেন, 'সাধুরা সব শোনো। এঁর গায়ে হাত তুলো না। ইনি কি ধরনের সন্ন্যাসী তোমরা জান না। উনি যে দেশ থেকে এসেছেন সে দেশের এক জাতের সন্ন্যাসীকে সব-কিছু খেতে হয়, লজ্জা ঘৃণা ভয় ওঁদের ত্যাগ করতে হয়। শুধু ত্যাগ নয় সানন্দে গ্রহণ করতে হয়। ইনি সেই শ্রেণীর সন্ন্যাসী। তোমরা তো জানো না সন্ন্যাসের গুরু বুদ্ধদেব শুয়োরের মাংস খেয়ে নির্বাণ লাভ করেছিলেন। এঁকে একদিন ঐ পর্যায়ে উঠতে হবে। মৃত্যুভয় এঁর নেই। দেখলে না উনি এখনো পর্যন্ত একটি শব্দ মাত্র করেন নি। ঘৃণা এবং ভয় থেকে উনি মুক্ত হয়েছেন। বোধ হয় একমাত্র লজ্জা-জয়টি এখনো তাঁর হয় নি। তাই এখনো পরনে লজ্জাবরণ। সেও তিনি একদিন জয় করবেন।

তোমরা ওঁর গায়ে হাত দিয়ো না।'

কতখানি বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর যুক্তিবাদের ফলে, কতখানি তার সৌম্যদর্শন শান্ত বচনের ফলে মারমুখো সন্ন্যাসীরা ঠাণ্ডা হল বলা কঠিন।

বাঁড়ুয্যে সেযাত্রায় বেঁচে গেল।

দু-তিন স্টেশন পরই সব সন্ন্যাসী নেমে গেল ঐ বৃদ্ধ ছাড়া।

তখন তিনি বাঁড়ুয্যেকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, 'বাবুজী

এযাত্রায় ভগবানের দয়ায় বেঁচে গেছ, ভবিষ্যতে সাবধান হয়ো।'

*　　*　　*

সেই থেকে ঐ বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর সন্ধান আমি প্রতি তীর্থেই করি। উনি যদি একবার আমার গৃহিণীকে বুঝিয়ে দেন, আমিও একটা অবধূত-টবধূত তাহলে ওর খাই-বয়নাক্কা-নথ ঝামটা থেকে নিষ্কৃতি পাই। দশটা মারমুখো সন্ন্যাসীকে ঠাণ্ডা করতে পারলেন আর ওকে পারবেন না? কি জানি!

*　　*　　*

ভবঘুরে সব দেশেই আছে কিন্তু শীত এলেই ইয়োরোপের ভবঘুরেদের সর্বনাশ। ঐ জমাট বরফের শীতে বাইরে শোওয়া অসম্ভব। যদি বা কেউ পার্কের বেঞ্চের উপরে খবরের কাগজ পেতে (এই খবরের কাগজ সত্যি শরীর-টাকে খুব গরম করে রাখে; হিমালয়ের চটিতে যদি দু'খানা কম্বলেও শীত না ভাঙে তবে কম্বলের উপর পা থেকে মাথা পর্যন্ত কয়েকখানা খবরের কাগজের শীট সন্তর্পণে বিছিয়ে নেবেন। আমি কোন কোন খানদানী ট্র্যাম্পকে বুকে-পিঠে খবরের কাগজ জড়িয়ে তার উপর ছেঁড়া শার্ট পরতে দেখেছি) শোবার চেষ্টা করে তবে বেদরদ পুলিস এসে লাগায় হুনো। প্যারিসে তখন কেউ কেউ আশ্রয় নেয় নদীর কোনো একটা ব্রিজের তলায় শুকনো ডাঙায়। সেখানেও সকালবেলা পুলিস আবিষ্কার করে শীতে জমে গিয়ে মরা ট্র্যাম্প। পাশে দু'-একটা মরা চড়ুইও! গরমের আশায় মানুষের শরীরের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল। গর্কি না কার যেন লেখাতে পড়েছি, এক ট্র্যাম্প ছোকরাকে সমস্ত রাত জড়িয়ে ধরে একটি ট্র্যাম্প মেয়ে সমস্ত রাত কাটিয়ে যে যার পথে—কিংবা বিপথেও বলতে পরেন—চলে গেল। (এদেশে বর্ষাকাল তাই বুদ্ধদেবও সন্ন্যাসীর সংঘে আশ্রয় নিতে আদেশ দিয়ে গেছেন।)

এই বিপথে কথাটার উপর আমি জোর দিতে চাই। গ্লোব-ট্রটার জীবটি আদপেই ভবঘুরে নয়—যদিও একটা শব্দ যেন আরেকটা শব্দের অনুবাদ। গ্লোবট্রটার সম্মুখপানে এগিয়ে চলে, তার নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থল আছে। ভবঘুরে যেখানে খুশী দু'চারদিন এমন কি দু'চার মাসও স্বচ্ছন্দে কাটায়, এমন কি কোনো দয়া শীলের আশ্রয়ে সুখেও কাটায়। কিন্তু হঠাৎ একদিন বলা-নেই কওয়া-নেই, হুট করে নেবে যায় রাস্তায়। কেন? কেউ জানে না। ওরা নিজেরাই জানে না। শুধু এইটুকু বলা যায়, সুখের নীড় তাদের বেশীদিন সয় না—নামে দুঃখের পথে; আবার দুঃখের পথে চলতে চলতে সন্ধান করে একটু সুখের আশ্রয়। দুটোই তার চাই, আর কোনটাই তার চাই নে। এ বড় সৃষ্টিছাড়া দ্বন্দ্ব সৃষ্টিছাড়াদের।

যাদের ভিতরে গোপনে চুরি করার রোগ ঘাপটি মেরে বসে আছে—ওটাকে সত্যই দৈহিক রোগের মত মানসিক রোগ ব'লে ধরে নেওয়া হয়েছে বলে এটার নাম ক্লেপ্টোমেনিয়া—তাদের জন্য আমাদের শাস্ত্রকাররা বৎসরে একদিন চুরি করার—তাও ফলমূল মাত্র—অনুমতি দিয়েছেন। ওটা যেন এক্‌জস্ট পাইপ। ঠিক তেমনি হোলির দিন একটুখানি বেএক্তেয়ার হওয়ার অনুমতি কর্তারা

আমাদের দিয়েছেন। এটাও অন্য আরেক ধরনের এক্‌জস্ট পাইপ।

জর্মন জাতটা একটু চিন্তাশীল। তারা স্থির করলে এই বাউণ্ডুলেপনা যাদের রক্তে ঘাপটি মেরে বসে আছে—এদের নাম ভাণ্ডার-ফ্যোগেল অর্থাৎ ওয়াণ্ডারিং বার্ডজ অর্থাৎ উড়ুক্কু পাখী—তাদের জন্য জায়গায় জায়গায় অতিশয় সস্তায় রেস্ট হাউস করে দাও, যেখানে তারা নিজে রেঁধে খেতে পারবে, যদি অতি সস্তায় তৈয়ারী খানা খায় তবে বাসন বর্তন মেজে দিতে হবে, যদি ফ্রী বালিশের ওয়াড় বিছানার চাদর চায় তবে সেগুলো কিংবা আগের রাত্রের জন্য কারোর ব্যবহার-করা বাসি ওয়াড়-চাদর কেচে দিতে হবে যাতে করে, ইচ্ছে করলে, সে অতি ভোরেই ফের রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে পারে। ওদের রান্নাঘরে নিজের আলু-মালু সেদ্ধ করে খেলে আর চাদর ওয়াড় না চাইলে রাত্রি-বাস একদম ফ্রী।

উড়ুক্কু পাখীরা অনেক সময় দল বেঁধে বেরোয়; সঙ্গে রান্নাবান্নার জিনিস এবং বিশেষ করে বাজনার যন্ত্র—ৎসী হারমনিকা (হাত অর্গন) ব্যাঞ্জো, মাণ্ডলিন। ঐ সব রেস্ট হাউসের কমন রুমে তারা গাওনা-বাজনা নাচানাচি করে সমস্ত রাত কাটাতো। অনেকেই শনির দুপুরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোমের সকালে বাড়ি ফিরত। কেউ-কেউ পুরো গরমের ছুটি, কেউ-কেউ দীর্ঘ-তর অনির্দিষ্টকাল।

এ-সব আমার শোনা কথা।

রাস্তার ট্র্যাম্পকে অনেকেই লিফট্ দেয়। জোড়া পাখী যদি হয় তবে লিফ্‌ট পাওয়া আরো সোজা, একটু কৌশল করলেই। ছেলেটা দাঁড়ায় গাছের আড়ালে। মেয়েটা ফ্রক হাঁটু পর্যন্ত তুলে গার্টার ফিট করার ভান করে সুডৌল পা-টি দেখায়। রসিক নটবর গাড়ি থামিয়ে মধুর হেসে দরজা খোলেন। ছোকরা তখন আড়াল থেকে আস্তে আস্তে এসে পিছনে দাঁড়ায়, নটবর তখন ব্যাক-আউট করেন কি করে? করলেও দৈবাৎ। যে উড়ুক্কু পক্ষিনী আমাকে গল্পটি বলেছিল তার পা-টি ছিল সত্যই সুন্দর। তা সে যাক গে।

অনেকেই আবার লিফ্‌ট্ দিতে ডরায়। তাদের বিরুদ্ধে নিম্নের গল্পটি প্রচলিত ঃ—

কুখ্যাত ডার্টমুর জেলের সামনে সদ্য খালাসপ্রাপ্ত দুজন কয়েদী লিফটের জন্য হাত তুলছে। যে ভদ্রলোক মোটর দাঁড় করালেন তিনি কাছে এসে যখন বুঝতে পারলেন এরা কয়েদী তখন গড়িমসি করতে লাগলেন। তারা অনেক কাকুতি-মিনতি করে বোঝালে তারা সামান্য চোর—খুনীটুনী নয়। সামনের টাউনে পোঁছে দিলেই বাস ধরে রাতারাতি বাড়ি পেঁছিতে পারবে। ভদ্রলোক অনেকটা অনিচ্ছায়ই রাজী হলেন। পরের টাউনে ভদ্রলোকেরও বাড়ি। পরের টাউনে পোঁছতেই লাইটিং টাইম হয়ে গিয়েছে। ওদিকে ওঁর হেডলাইট ছিল খারাপ। পড়লেন ধরা। পুলিশ ফুটবোর্ডে পা রেখে নম্বর টুকে হিপ পকেটে নোটবুক-খানা রেখে দিয়ে চলে গেল। ভদ্রলোক আপসোস করে বললেন, তোমাদের সঙ্গে কথা কইতে যে তিন মিনিট বাজে খর্চা হল সেটা না করলে এতক্ষণ আমি বাড়ি পেঁছে যেতুম। এখন পুলিশ কোর্টে আমার জেরবার হয়ে যাবে। লোকে কি

আর সাধে বলে কারো উপকার করতে নেই! দুই খালাস পাওয়া কয়েদী হাসতে হাসতে গাড়ি থেকে নামার সময় বললে, 'আপনার কিছু ভয় নেই, হুজুর, আপনার নামে কোনো সমন আসবে না। এই নিন সেই পুলিসের নোটবুক—যাতে আপনার গাড়ীর নম্বর টোকা ছিল। আমরা পুলিসের পকেট তখনই পিক করেছি। আসলে পকেট মেরেই ধরা পড়াতে আমাদের জেল হয়েছিল। আপনি আমাদের উপকার করতে গিয়ে বিপদে পড়বেন, এটা আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি কি প্রকারে বলুন!

আমি নিজে কখনো খানদানী বাউণ্ডুলে ব'নে বাড়ি থেকে বেরোই নি; তবে হেঁটে সাইক্লে, আধা-বোটে—অর্থাৎ কোনো প্রকারের রাহা খরচা না করে হাইকিং করেছি বিস্তর।

আমি তখন রাইন নদীর পারে বন্ শহরে বাস করি। রাইনের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখবার জন্য পৃথিবীর লোক সেখানে প্লেজার স্টীমারে করে উজান-ভাটা করে। আমিও একবার করার পর আমার মনে বাসনা জাগলো ঐ অঞ্চলেই হাইক্ করে রাইন তো দেখবো দেখবোই, সঙ্গে সঙ্গে ঐ এলাকার গিরি-পর্বত, উপত্যকার ক্ষেতখামার, গ্রামাঞ্চলের বাড়ি ঘরদোর, নিরিবিলি গ্রাম্যজীবন সব কিছুই দেখে নেব। আর যদি রাইন অঞ্চল ভালো না লাগে তবে চলে যাব যেদিক খুশী।

আমার ল্যাণ্ড-লেডিই আমাকে রাস্তা-দুরস্ত করে দিলে। মাথায় প্রকাণ্ড ঘেরের ছাতা-হ্যাট। পশমের পুরু শার্টের উপর চামড়ার কোট। চামড়ার শার্ট। সাইক্লোমোজা। ভারী বুট জুতো।

শব্দার্থে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা একটি হেভার-স্যাক। তার ভিতরে রান্নার সরঞ্জাম, অর্থাৎ অতি, অতি হাল্কা এবং পাতলা কিন্তু বেশ শক্ত এলুমিনিয়ামের সসপেন জাতীয় বস্তু, প্লেট, চামচে—ছুরি-কাঁটা নিই নি—স্পিরিট স্টোভ এবং অত্যন্ত ছোট সাইজের বলে দুবার মাত্র হাঁড়ি চড়ানো যায়—কয়েক গোলা চর্বি, কিঞ্চিৎ মাখন, নুন-লংকা আর একটি রবারের বালিশ—ফুঁ দিয়ে ফোলান যায়।

আর বিশেষ কিছু ছিল বলে মনে পড়ছে না। এসবে আমার খর্চা হয়েছিল অতি সামান্যই, কারণ বাড়ির একাধিক লোক এসব বস্তু একাধিক বার ব্যবহার করেছেন। এস্তেক কোট পাতলুনে একাধিক তালি! ল্যাণ্ড-লেডি বুঝিয়ে বললে, উকীলের গাউনের মত এ-সব বস্তু যত পুরোন হয় ততই সে খানদানী ট্র্যাম্প!

পকেটে হাইনের 'বুখ ড্যার লীডার'—কবিতার বই। কবি হাইনে বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় এ বইয়ের কবিতাগুলো লিখেছিলেন। এতে রাইন নদী বার বার আত্মপ্রকাশ করেছেন।

রবির অতি ভোরে গির্জার প্রথম ম্যাসে হাজিরা দিয়ে রাস্তায় নামলুম।

একটা কোঁৎকা ছাড়া হাইকিঙে বেরোতে নেই। অবশ্য সর্বক্ষণ সদর রাস্তার উপর দিয়ে চললে তার বড় প্রয়োজন হয় না, কিন্তু সদর রাস্তার দুপাশে আলুক্ষেত, আপেল বাগান থাকে না, লোকজন যারা থাকে তারাও ট্রাম্প ভিখিরি পছন্দ করে না। পিঠের ব্যাগটা খালি হয়ে গেলে সেটা বিনু-খর্চায় ভরে নিতে হলে অজ পাড়াগাঁই প্রশস্ততম।

কিন্তু যত প্রচণ্ড শিক্ষিত দেশই হোক না কেন পাড়াগাঁয়ে দু' একটা বদ-মেজাজী কুকুর থাকবেই। এবং তারা পয়লা নম্বরের স্নব্। ছিমছাম ফিটফাট সুট পরে গটগট করে চলে যান—কিচ্ছুটি বলবে না। কিন্তু আপনি বেরিয়েছেন হাইকিঙে—যতই ফিটফাট হয়ে বাড়ি থেকে বেরোন না কেন, লজঝড় কাক বক তাড়ানোর স্কেয়ার-ক্রো বনে যেতে আপনার দুদিনও লাগবে না। দু'দিন কেন, গাছতলায় এক রাত কাটানোর পর সকালবেলাই সুটমুটের যা চেহারা হয় তার মিল অনেকটা ভ্যাগাবণ্ড চার্লিরই মত, এবং ঐ স্নব কুকুরগুলো তখন ভাবে, আপনাকে ভগবান নির্মাণ করেছেন নিছক তাদের ডিনার লাঞ্চের মাংস যোগাবার জন্য—সিঙিকে যেমন হরিণ দিয়েছেন, বাঘকে যে রকম শুয়োর দিয়েছেন। পেছন থেকে হঠাৎ কামড় মেরে আপনার পায়ের ডিম কি করে সরানো যায় সেই তাদের একমাত্র উচ্চাভিলাষ। ওটাতে আপনারও যে কোনো প্রকারের প্রয়োজন থাকতে পারে সে বিষয়ে ওরা সম্পূর্ণ উদাসীন।

আমার ল্যাণ্ড-লেডি হাতে লাঠি তুলে দিতে দিতে বললে, এক জর্মন গিয়েছে ঘোর শীতকালে স্পেনে। স্পেনের গ্রামাঞ্চল যে বিশ্ব-সারমেয়ের ইউনাইটেড নেশন সেটা ভদ্রলোক জানতেন না। তারই গণ্ডা তিনেক তাঁকে দিয়েছে হুড়ো। ভদ্রলোক আর কিছু না পেয়ে রাস্তা থেকে পাথর কুড়োতে গিয়ে দেখেন সেগুলো জমিতে জোর সেঁটে রয়েছে—আসলে হয়েছে কি শীতে জল জমে বরফের ভিতর সেগুলো মোক্ষম আটকে গেছে। ভদ্রলোক খাঁটি গ্লোব-ট্রটারের মত আত্মচিন্তা করলেন, 'অদ্ভুত দেশ! কুকুরগুলোকে এরা রাস্তায় ছেড়ে দেয়, আর পাথরগুলোকে চেন্ দিয়ে বেঁধে রাখে।'

ল্যাণ্ড-লেডিকে বলতে হল না—আমি বিলক্ষণ জানতুম, তদুপরি আমার শ্যামমনোহর বর্ণটি অষ্টাবক্র স্কন্ধ-কটি—ভদ্রাভদ্র যে কোনো সারমেয় সন্তানই এই ভিনদেশী চীজটিকে তাড়া লাগানো একাধারে কর্তব্যকর্ম সম্পাদন এবং আয়বর্ধন রূপে ধরে নেবে—লক্ষ্য করেন নি চীনেম্যান আমাদের গাঁয়ে ঢুকলে কি হয়!

কোঁৎকাটা ঠুকতে ঠুকতে শহর ছেড়ে মেঠো পথে নামলুম।

খৃস্টান দেশে রববারে ক্ষেতখামারের কাজও ক্ষান্ত থাকে। পথের দুধারের ফসল ক্ষেতে জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। রাস্তায়ও মাত্র দু'একটি লোকের সঙ্গে অনেকক্ষণ চলার পর দেখা হয়। তারাও গ্রামের লোক বলে হ্যাট তুলে গুটেন-টাখ্ বা গুটেন মর্গেন (শুভদিন বা শুভ দিবস) বলে আমাকে অভিবাদন

জানায়। বিহার মধ্য-প্রদেশের গ্রামাঞ্চলেও ঠিক এই রকম অপরিচিত জনকেও 'রাম রাম' বলে অভিবাদন করার পদ্ধতি আছে। কাবুলে তারও বাড়া। একবার আমি শহরের বাইরের উপত্যকায় বেড়াতে গিয়েছিলুম। রাস্তা প্রায় জনমানবহীন। বিরাট শিলওয়ার এবং বিরাটতর পাগড়ী পরা মাত্র একটি কাবুলী ধীরে মন্থরে চলেছে—গ্রামের লোক শহুরেদের তুলনায় হাঁটে অতি মন্থর গমনে এবং তারো চেয়ে মন্দ গতিতে চলে যারা একদম পাহাড়ের উপর থাকে। তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি তাকে ধরে ফেললুম। ঘাড় ফিরিয়ে অলস কৌতূহলে আমার দিকে তাকিয়ে, 'ভালো তো? কুশল তো?' শুধিয়েই আমার দিকে এক গুচ্ছ স্যালাড পাতা এগিয়ে দিলে। এস্থলে এটিকেট কি বলে জানি নে—আমি একটি পাতা তুলে নিলুম। তখন এগিয়ে দিলে বাঁ হাতের পাতার ঠোঙাটি। সেটাতে দেখি হলদে-লালচে রঙের ঘন কি একটা পদার্থ। আমি বোকার মত তাকিয়ে আছি দেখে সে নিজে একখানা স্যালাড পাতা নিয়ে ঐ তরল পদার্থে গুত্তা মেরে মুখে পুরে চিবোতে লাগল। আমিও করলুম। দেখি, জিনিসটা মধু এবং অত্যুত্তম মধু। ঐ প্রথম শিখলুম, কাবুলীরা তেল-নুন-সিরকা দিয়ে স্যালাড পাতা খায় না, খায় মধু দিয়ে। কিন্তু সেটা আসল কথা নয়, মোদ্দা কথা দেহাতী কাবুলী যদি কিছু খেতে খেতে রাস্তা দিয়ে চলে তবে পরিচিত অপরিচিত সবাইকে তার হিস্যা এগিয়ে দেবেই দেবে। এবং স্ট্রিক্‌টলি ব্রাদারলি ডিভিজন্—অর্থাৎ আমার একখানা পাতা চিবানো শেষ না হতে হতেই আরেকখানা পাতা এবং 'মধুভাণ্ড' এগিয়ে দেয়। পরে গ্রামে ঢোকা মাত্রই সে আমাকে এক চায়ের দোকানে টেনে নিয়ে যায় এবং দাম দেবার জন্য আখেরে বিস্তর ধস্তাধস্তি করে। কিন্তু থাক সে কথা—এটা আছে 'কাবুলে ভবঘুরেমি' অনুচ্ছেদে।

এস্থলে স্থির করলুম, অপরিচিতকেও নমস্কার জানানো যখন এ-দেশে রেওয়াজ তবে এবার থেকে আমিই করবো।

আধঘণ্টাটাক পরে দেখি এগিয়ে আসছে একজন। বয়সে আমার চেয়ে বড়ও বটে। ও মোকা পাবার পূর্বেই আমি বেশ চেঁচিয়ে বললুম, 'গ্র্যুস গট্!'

এস্থলে নব জর্মন শিক্ষার্থীদের বলে রাখি, জর্মনভাষী জর্মন এবং সুইস সচরাচর 'গুটেনাখ গুড্ ডে', শুভদিবস ইত্যাদি বলে থাকে, কারণ এরা বড্ড সেকুলারাইজড (ধর্মনিরপেক্ষ) হয়ে গিয়েছে। পক্ষান্তরে অস্ট্রিয়াবাসী জর্মন-ভাষীগণের অনেকেই এখনো 'গ্র্যুস গট্'—'ভগবানের আশীর্বাদ' বলে থাকে। এদেশের মুসলমানরা আল্লাকে স্মরণ করেই 'সালাম' বলেন, হিন্দুরা 'রাম রাম' এবং বিদায় নেবার বেলা গুজরাতে 'জয় জয়! জয় শিব, জয় শঙ্কর।'

স্পষ্ট বোঝা গেল লোকটা 'গ্র্যুস গটের' জন্য আদপেই তৈরী ছিল না। 'গুটেনটাখ, গুটেনটাখ' বলে শেষটায় বার কয়েক 'গ্র্যুস গট্', বলে সমানে দাঁড়াল। শুধালে, 'কোথায় যাচ্ছ?'

ইংলণ্ডে গ্রামাঞ্চলের এটিকেট জানি নে। সেখানেও বোধ হয় শহুরেদের কড়াক্কড়ি নেই।

বললুম, 'বিশেষ কোথাও যাচ্ছি নে। ঐ সামনের গ্রামটায় দুপুরবেলা একটু জেরোবো। রাতটা কাটাবো, তারপরের কোনো একটা গ্রামে, কিংবা গাছ-তলায়।'

বললে, 'আমি যাচ্ছি শহরে!' তার পর বললে, 'চলো না, ঐ গাছতলায় একটু জিরোনো যাক।' আমি বললুম, 'বিলক্ষণ।' ভবঘুরেমির ঐ একটা ডাঙর সুবিধে। না হয় কেটেই গেল ঐ গাছতলাটায় ঘণ্টা কয়েক—যদিও ওটা তেঁতুল গাছ নয় এবং ন'জন সুজন তো এখনো দেখতে পাচ্ছি নে।

চতুর্দিক নির্জন নিস্তব্ধ। ইয়োরোপেও মধ্যাদিন আসন্ন হলে পাখী গান বন্ধ করে। শুধু দূরে অতি দূর থেকে গির্জায় ঘণ্টা অনেকক্ষণ ধরে বেজে যাচ্ছে। রবির দুপুরের ঐ শেষ আরতি—হাই ম্যাস—তাই অনেকক্ষণ ধরে ঘণ্টা বেজেই চলেছে দূরে-দূরান্তে—ঐ বহুদূরে যেখানে দেখা যাচ্ছে ভিনাস পাহাড়ের চূড়ার উপর গাছের ডগাগুলো।

বললে, 'আসলে পাইপটা অনেকক্ষণ টানি নি; তাই এই জিরোনো।' তারপর শুধালে, 'তোমার দেশ কোথায়?' আমি বললুম, 'আমি ইণ্ডার (ভারতীয়)।' এমনি চমক খেল যে তার হ্যাটটা তিন ইঞ্চি কাৎ হয়ে গেল। তোৎলালে, 'ইণ্ডিয়ানার?'

'ইণ্ডার' অর্থাৎ 'ইণ্ডিয়ান', আর 'ইণ্ডিয়ানার' অর্থ 'রেড্ ইণ্ডিয়ান।' দেহাতীদের কথা বাদ দিন, শহরে অর্ধ-শিক্ষিতেরাও এ দুটোতে আকছারই ঘুলিয়ে ফেলে। অনেক রকম করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলুম, আমি কোন্ দেশের লোক। শেষ পর্যন্ত সে বুঝতে পেরেছিল কি না জানি নে তবে তার বিস্ময় যে চরমে পেঁচেছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

আর বার বার শুধু মাথা নাড়ে আর বলে, 'বিপদে ফেললে, বড় বিপদে ফেললে!'

আমি শুধালুম 'কিসের বিপদ?'

'কত ভবঘুরে, বাউণ্ডুলে কত দেশ-দেশান্তরে যাচ্ছে—আমার তাতে কি! কিন্তু তুমি অত দূর দেশের লোক, আমার গাঁয়ের ভিতর দিয়ে যাচ্ছ, আমার সঙ্গে আলাপ হল আর তোমাকে আমার বাড়ি নিয়ে যেতে পারলুম না—এতে দুঃখ হয় না আমার?'

তারপর মরীয়া হয়ে বললে, 'আসলে কি জানো, আমার স্ত্রী একটি জাঁতিকল? দুনিয়ার লোকের হাড় গুঁড়িয়ে দেওয়াই ও'র স্বভাব। না হলে তোমাকে বলতুম, আমার বাড়িতে বিকেল অবধি জিরিয়ে নিতে—আমিও ফিরে আসতুম।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'কত লোক ইয়ার-দোস্তকে দাওয়াৎ করে খাওয়ায়, গাল-গল্প করে, আমার কপালে সেটি নেই।'

আমি তাকে অনেক সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, তার সহৃদয়তাই আমাকে যথেষ্ট মুগ্ধ করেছে, যদি সম্ভব হয় তবে ফেরার মুখে তার খবর নেব।

পুনরায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'কিছু মনে করো না, কিন্তু ভবঘুরেদের কি আর কথা রাখবার উপায় আছে? আমার নামটা কিন্তু মনে রেখো—টেরমের।'

আমি বললুম, 'সে কি ! আমি তো ফের বন্ শহরে ফিরে যাবো। এই নাও আমার ঠিকানা। সেখানে আমার খবর নিয়ো। দুজনাতে ফুর্তি করা যাবে।

খুশী হয়ে উঠলো। বললে, 'বড্ডই জরুরী কাজ তাই। উকিল বসে আছে, এই রববারেও, আমার জন্যে। টাকাটা না দিলে সোমবার দিন কিস্তি খেলাপ হবে।'

আমি বললুম, 'ভগবান্ তোমার সঙ্গে থাকুন।' বললে, 'যতদিন না আবার দেখা হয়।'

দশ পা এগিয়েছি কি না, এমন সময় শুনি পিছন থেকে চেঁচিয়ে বলছে, 'ঐ সামনের মোড় নিতেই দেখতে পাবে ডানদিকে এক-পাল ভেড়া চরছে। ওখানে কিন্তু দাঁড়িয়ো না। ভেড়াগুলোকে সামলায় এক দুঁজাল আলসেশিয়ান কুকুর। ওর মনে যদি সন্দেহ হয় তোমার কোনো কুমৎলব আছে, তবে বড় বিপদ হবে।'

কথাটা আমার জানা ছিল, কিন্তু স্মরণ ছিল না। বললুম, 'অনেক ধন্যবাদ।'

॥ ৪ ॥

ইউরোপ তখনো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধকল কাটিয়ে উঠতে পারে নি। এর বর্ণনা সে মহাদেশের কবি, চিত্রকার, বস্তুত চিন্তাশীল তথা দরদী ব্যক্তি মাত্রেরই দেওয়া সত্ত্বেও বলতে হয়, না দেখলে তার আংশিক জ্ঞানও হয় না। তুলনা দিয়ে এদেশের ভাষায় বলা যেতে পারে, বন্যা ও ভূমিকম্পের মার যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই জানেন এর জের দেশকে কতদিন ধরে টানতে হয়।

মোড় নিতেই দেখি, বাঁ দিকের ক্ষেতের ভিতর দিয়ে নাসপাতি-ভর্তি ঠেলা গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে রাজ-আল ধরে আসছে একটি বয়স্ক লোক। সর্ব প্রথমই চোখে পড়ল, তার ডান হাতখানা কনুই অবধি নেই। হাতের আস্তিন ভাঁজ করে ঘাড়ের সঙ্গে পিন করা। বড় রাস্তায় সে উঠলো ঠিক আমি যেখানে পৌঁচেছি সেখানেই। আমি প্রথমটায় 'গ্র্যুস্ গট্' বলে তার অনুমতির অপেক্ষা না করেই গাড়িটায় এক হাত দিয়ে ঠেলতে লাগলুম। এ অভিবাদনে লোকটি প্রথম চাষার মত মোটেই হকচকালো না, এবং প্রত্যুত্তরে 'গ্র্যুস্ গট্' বলে আর পাঁচজনেরই মত 'গুটেনটাখ'—'সুদিবস' জানালে। তারপর বলল, 'ও গাড়ি আমি একাই ঠেলতে পারি। নাসপাতিগুলোর প্রতি তোমার যদি লোভ হয়ে থাকে তবে অত হ্যাঙ্গামা পোহাতে হবে না—যত ইচ্ছে তুলে নাও।' আমি এই অন্যায় অপবাদে চটি নি—পেলুম গভীর লজ্জা। কী যে বলব ঠিক করার পূর্বেই সে বললে, 'হাত না দিলেও দিতুম।'

আমি তখন মোকা পেয়ে বললুম, 'নাসপাতি খেতে আমি ভালোবাসি

নিশ্চয়ই, এবং তোমারগুলো যে অসাধারণ সরেস সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু ঠেলা দেবার সময় আমার মনে কোনো মতলব ছিল না, এবং তুমিও যে স্বচ্ছন্দে ছোট রাস্তা থেকে বড় রাস্তার উঁচুতে গাড়িটাকে ঠেলে তুললে সেও আমি লক্ষ্য করেছি। আমি হাত দিয়েছিলুম এমনি। পাশাপাশি যাচ্ছি, কথা বলতে বলতে যাবো, তখন দুজনাই যে একই কাজ করতে করতে যাবো সেই তো স্বাভাবিক—এতে সাহায্য লোভ কোনো কিছুরই কথা ওঠে না।'

চাষা হেসে বললে, 'তোমার রসবোধ নেই। আর তুমি জানো না, এবারে নাসপাতি এত অজস্র একই সঙ্গে পেকেছে যে এখন বাজারে এর দর অতি অল্পই। এই সামনের গ্রামগুলোর ভিতর দিয়ে যখন যাবে তখন দেখতে পাবে গাছতলায় নাসপাতি পড়ে আছে—কুড়িয়ে নিয়ে যাবার লোক নেই। যত ইচ্ছে খাও, কেউ কিছু বলবে না।'

আমি বললুম, 'আমাদের দেশেও এই রেওয়াজ।'

কোথায়, কোন দেশ, ইন্ডিয়ান আর রেড-ইন্ডিয়ানে পুনরায় সেই গুবলেট, আরপর আশ-কথা পাশ-কথা সেরে সর্বশেষে নিজেই বললে, তার হাতখানা গেছে গত যুদ্ধে। হেসে বললে, 'লোকে বলে, তারা করুণার পাত্র হতে চায় না; আমার কিন্তু তাতে কোনো আপত্তি নেই। হাত গিয়ে কত সুবিধে হয়েছে বলবো! গেরস্তালীর কোনো কিছু করতে গেলে বউ বেটি হা হা করে ঠেকায়, যদিও আমি এক হাত দিয়েই দুনিয়ার চোদ্দ আনা কাজ করতে পারি। চাষবাস, ফলের ব্যবসা, বাড়ি মেরামতী সবই তো করে যাচ্ছি—যদিও মেয়ে-জামাই ঠ্যাকাবার চেষ্টা করেছিল এবং শেষটায় করতে দিলে, হয়তো এই ভেবে যে কিছু না করতে পেলে আমি হন্যে হয়ে যাব।'

আমি বললুম, 'তোমরা তো খৃষ্টান; তোমাদের না রববারে কাজ করা মানা।'

লোকটা উত্তর না দিয়ে হকচকিয়ে শুধালে, 'তুমি খৃষ্টান নও?'

'না।'

'তবে কি?'

'হীদেন।'

আমি জানতুম, পৃথিবীর খৃষ্টানদের নিরানব্বই নয়া পয়সা বিশ্বাস করে, অখৃষ্টান মাত্রই হীদেন। তা সে মুসলমান হোক আর বৌদ্ধই হোক। নিতান্ত ইহুদীদের বেলা হয়তো কিঞ্চিৎ ব্যত্যয়, অবশ্য সেটা পুষিয়ে নেয় তাদের বেধড়ক ঠেঙিয়ে। তাই ইচ্ছে করেই বললুম, হীদেন।

লোকটা অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করে বললে, 'আমি গত যুদ্ধে ঈশ্বরকে হারিয়েছি। তবে কি আমিও হীদেন?' নিজের মনে যেন নিজেকেই শুধোলে।

আমি বললুম, 'আমি তো পরমেশ্বরে বিশ্বাস করি।'

এবারে সে স্তম্ভিত। এবং শব্দার্থে। কারণ গাড়ি ঠেলা বন্ধ করে আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালে। শেষটায় বললে, 'এটা কিন্তু আমাকে সোজা করে দিতে হবে। আমাদের পাদ্রী তো বলে, তোমরা নাকি গাছ, জল এই সব

পুজো করো, পাথরের সামনে মানুষ বলি দাও।'

আমি বললুম, 'কোনো কোনো হীদেন দেয়, আমরা দিই নে। আমি বিশ্বাস করি, ঈশ্বরকে ভক্তি দিলেই যথেষ্ট।'

বোকার মত তাকিয়ে বললে, 'তবে তো তুমি খৃষ্টান! আমাকে সব-কিছু বুঝিয়ে বলো।'

আমি বললুম, 'থাক। ফেরার সময় দেখা হলে হবে।'

তাড়াতাড়ি বললে, 'সরি, সরি। তুমি বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। ঐ তো সামনে গ্রাম। আমার বাড়িতে একটু জিরিয়ে যাবে?'

আমি টেরমেরের স্মরণে শুধালুম, 'তোমার বউ বুঝি টেরমেরের বউয়ের মত খাণ্ডার নয়?'

সে তো অবাক। শুধালে 'ওকে তুমি চিনলে কি করে?' সব কিছু খুলে বললুম। ভারী ফুর্তি অনুভব করে বলল, 'টেরমের একটু দিলদরিয়া গোছ লোক আর তার বউ একটু হিসেবী—এই যা। আর এ-সব ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করলেই চিন্তা বাড়ে। যুদ্ধের সময়, আমার এক জর্মনের সঙ্গে আলাপ হয়—সে বুলগেরিয়াতে বিয়ে করে বসবাস করছিল। তিন বছর সুখে কাটাবার পর একদিন তার স্ত্রীর এক বান্ধবী তাকে নির্জনে পেয়ে শুধোলে, "তুমি তোমার বউকে ভালোবাসো না কেন—অমন লক্ষ্মী মেয়ে।" সে তো অবাক! শুধোলে "কে বললে? কি করে জানলে?" বান্ধবী বললে "তোমার বউ বলেছে, তুমি তাকে তিন বছরের ভিতর একদিনও ঠ্যাঙাও নি!" শোনো কথা!'

আমি অবাক হয়ে শুধালুম, 'আমি তো বুঝতে পারছি নে।'

সে বললে, 'আমিও বুঝতে পারি নি, প্রথমটায় ঐ জর্মন স্বামীও বুঝতে পারে নি। পরে জানা গেল, মেয়েটা বলতে চায়, এই তিন বছর নিশ্চয়ই সে কোনো না কোনো পর-পুরুষের সঙ্গে দু'একটি হাসিঠাট্টা করেছে, স্বামী দেখেছে, কিন্তু পরে ঠ্যাঙায় নি। তার অর্থ, স্বামী তাকে কোনো মূল্যই দেয় না। সে যদি কাল কোনো পর-পুরুষের সঙ্গে পালিয়ে যায়, তবে স্বামী কোনো শোক করবে না, নিশ্চিন্ত মনে আরেকটা নয়া শাদী করবে। ভালবাসলে ওকে হারাবার ভয়ে নিশ্চয়ই ওকে ঠেঙিয়ে সোজা রাখতো।'

আমি বললুম, 'এ তো বড় অদ্ভুত যুক্তি!'

'আমিও তাই বলি। কিন্তু ঐ করে বুলগেরিয়া চলছে। আর এদেশের বউকে কড়া কথা বলেছ কি সে চললো ডিভোর্সের জন্য। তাই তো তোমায় বললুম, ওসব নিয়ে বড্ড বেশী ভাবতে নেই। লড়াইয়ে বহু দেশের জাত-বেজাতের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। অনেক দেখেছি। অনেক শিখেছি।'

আমার মনে পড়ল ওরই দেশবাসী রেমার্কের 'পশ্চিম রণাঙ্গন নিশ্চুপ' বই-খানার কথা। সেখানে তো সব কটা সেপাই বাড়ি ফিরেছিল—অর্থাৎ যে কটা আদপেই ফিরেছিল—সর্বসত্তা তিক্ততায় নিমজ্জিত করে। আদর্শবাদ গেছে, ন্যায়-অন্যায়-বোধ গেছে; যেটুকু আছে সে শুধু যাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অহরহ মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছে তাদের জন্য। দেশের জন্যে আত্মদান, জাতির

উন্নতির জন্য সর্বস্ব ত্যাগ, ফ্রান্সকে পরাজিত করার জন্য জীবন-দান—এসব বললে মারমুখো হয়ে বেআইনী পিস্তল নিয়ে তাড়া লাগায়।

নাসপাতিওলাকে শুধোতে সে বললে সে বইটই পড়ে না। খবরের কাগজ পড়ে বাজার দর জানবার জন্য, আর নিতান্তই যদি কোনো রগরগে খুন কিংবা কেলেংকারি কেচ্ছার বয়ান থাকে। তবে হ্যাঁ, ওর মনে পড়ছে ফিল্মটা নাকি জর্মনীতে বারণ করে দেওয়া হয়েছিল—ওর মেয়ের মুখে শোনা। আমি শুধালুম, 'ছবিটা দেখে ছেলেছোকরাদের লড়াইয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা হবে বলে?' বললে, 'না, ওতে নাকি জর্মনদের বড় বর্বররূপে দেখানো হয়েছে বলে।' তখন আমার মনে পড়ল, ফ্রান্সেও দেখাবার সময় যে অংশে ফরাসী নারীরা ক্ষুধার তাড়ায় জর্মন সেপাইদের কাছে রুটির জন্য দেহ বিক্রয় করার ইঙ্গিত আছে সেটা কেটে দেওয়া হয়।

অনেকক্ষণ দুজনাই চুপচাপ। নাসপাতিওলা ভাবছে। হঠাৎ বললে, "পিছন পানে তাকিয়ে আর লাভ কি? যারা মরেছে তারা গেছে। যারা পাগল হয়ে গিয়েছে, যাদের মুখ এমনই বিকৃত হয়েছে যে দেখলে মানুষ ভয় পায়, যাদের হাত পা গিয়ে অচল হয়ে আছে নিছক মাংসপিণ্ডবৎ, তাদের বড় বড় হাসপাতালে লুকিয়ে রাখা হয়েছে; আর আত্মীয়স্বজনদের বলা হয়েছে তারা মারা গিয়েছে—এরাও নাকি ফিরে যেতে চায় না। আর আমার হাল তো দেখছই।

আমাদের গ্রামের সব কিছু থিতিয়ে যাওয়ার পর একটা ট্র্যাজেডির দিকে সকলেরই নজর গেল। একটা ছেলে গ্রাম থেকে ফিরে এসে শোনে, তার অবর্তমানে তার বাগদত্তা মেয়েটি পরপুরুষের সঙ্গে প্রণয় করেছিল। এতে আর নূতন কি? লড়াইয়ের সময় সব দেশেই হয়েছে এবং হবে। মেয়েটা তবু পদে আছে—জারজ সন্তান জন্মায় নি। আর সেই দু'দিনের প্রেমিক কবে কোথায় চলে গেছে কে জানে!

এ অবস্থায় আর পাঁচটা ছেলে অন্য মেয়ে নেয়, কিংবা ক্ষেমাঘেন্না করে আগের-টাকেই বিয়ে করে। এ হয়ে গেল মনমরা। সমস্ত দিন ছন্নের মত ঘুরে বেড়ায়, কারো সঙ্গে কথাবার্তা কয় না, আমাদের পীড়াপীড়িতেও বিয়ার খেতে আসে না। মেয়েটা নাকি একাধিকবার তার পায়ে ধরে কেঁদেছে। সে কিছু বলে না।

ছোট গাঁ, বোঝ অবস্থাটা। গির্জেয়, রাস্তায়, মুদির দোকানে প্রতিদিন আমাদের একে অন্যের সঙ্গে যে কতবার কথা হয় ঠিকঠিকানা নেই। মেয়েটা করুণ নয়নে তাকায়, ছেলেটা ঘাড় ফিরিয়ে নেয়। আমরা যারা তখন সামনে পড়ি, বোঝো আমাদের অবস্থাটা। ছেলেটা সামনে পড়লে আমাদের মুখ গম্ভীর, মেয়েটা সামনে পড়লে অন্যদিকে তাকাই, আর দুজনা সামনে পড়লে তো চরম। ছেলেটা যখন মুরুব্বী, পুরনো দিনের ইয়ার-বক্সী ইস্তেক পাদ্রী সায়েব কারো কথায় কান দিলে না, তখন মেয়েটাকে বলা হল সে যেন অন্য একটা বেছে নেয়। যদিও বরের অভাব তবু সুন্দর এবং পয়সাওয়ালার মেয়ে বলে

পেয়েও যেতে পারে। দেখা গেল, সেও নারাজ।'

নাসপাতিওলা রাস্তায় থেমে বলল, 'এই যে বাড়ি পেঁছে গিয়েছি। চলো ভিতরে।'

আমি বললুম, 'না ভাই, মাফ করো।'

'তবে ফেরার সময় খবর নিয়ো। বাড়ি চেনা রইল।'

আমি বললুম, 'নিশ্চয়। কিন্তু ওদের কি হল?'

'কাদের? হ্যাঁ, ঐ দুটোর। একদিন ঐ হোথাকার (আঙুল তুলে দেখালে) ডোবায় পাওয়া গেল লাশ।'

আমি শুধালুম, 'ছেলেটার?'

'না মেয়েটার।'

'আর ছেলেটা?'

'এখনো ছন্নের মত ঘুরে বেড়ায়। এক্ষুনি আসবে। থাকো না—আলাপ করিয়ে দেব।' আমি পা চালিয়ে মনে মনে বললুম, এ গ্রাম বিষবৎ পরিত্যজ্য।

॥ ৫ ॥

সিনেমার কল্যাণে আজকাল বহু নৈসর্গিক দৃশ্য, শহর-বাড়ি, পশুপক্ষী বিনা মেহন্নতে দেখা যায়। এমন কি বাস্তবের চেয়েও অনেক সময় সিনেমা ভালো। বাস্তবে বেলকনি থেকে রানীকে আর কতখানি দেখতে পেলুম? সিনেমায় তাঁর আংটি, জুতোর বকলস, হ্যাটের সিল্কটি পর্যন্ত বাদ গেল না। আলীপুরে গিয়ে বাঘ-সিংি না দেখে সিনেমাতে দেখাই ভালো—ক্যামেরামেন যতখানি প্রাণ হাতে করে ক্লোজ-আপ নেয় অতখানি ঝুঁকি নিতে আপনি আমি নারাজ।

বিলিতি ছবির মারফতে তাই ওদের শহর, বার, রেস্টুরেন্ট, নাচ, রাস্তা-বাড়ি, দালান-কোঠা আমাদের বিস্তর দেখা হয়ে গিয়েছে কিন্তু গ্রামের ছবি এরা দেখায় অল্পই। গ্রামে বৈচিত্র্যই বা কি, সেখানে রোমান্সই বা কোথায়? অন্তত সিনেমাওলাদের চোখে সেটা ধরা পড়ে না—ধরা পড়ে এখনো আর্টিস্টদের কাছে। ইউরোপীয় গ্রাম্যজীবনের ছবি এখনো তাঁরা এঁকে যাচ্ছেন আর পুরনো দিনের মিলে, ভান গগের তো কথাই নেই।

আমাদের গ্রামে সাধারণত সদর রাস্তা থাকে না। প্রত্যেক চাষা আপন খড়ের ঘরের চতুর্দিকে ঘিরে রেখেছে আম-কাঁঠাল-সুপুরি-জাম গাছ দিয়ে—কিছুটা অবশ্য ঝড় থেকে কুঁড়েগুলোকে বাঁচাবার জন্য। এখানে সে ভাবনা নেই বলে গ্রামে সদর রাস্তা থাকে, তার দুদিকে চাষাভুষো, মুদী, দর্জি, কসাই, জুতোওলা সবাই বাড়ি বেঁধেছে। আর আছে ইস্কুল, গির্জে আর পাব—জর্মনে 'লোকাল' (অর্থাৎ 'স্থানীয় মিলনভূমি')। এইটেকেই গ্রামের কেন্দ্র বললে ভুল বলা হয় না।

রাস্তাটা যে খুব বাহারে তা বলা যায় না। শীতকালে অনেক সময় এত

বরফ জমে ওঠে যে চলাফেরাও কয়েকদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যেতে পারে—আমাদের দেশে বর্ষাকালে যে রকম হয়। শুধু বাচ্চাদেরই দেখতে পাওয়া যায় তারই উপর লাফালাফি করছে, পেঁজা বরফের গুঁড়ো দিয়ে বল বানিয়ে একে অন্যকে ছুঁড়ে মারছে।

অনেক কট্টর প্রোটেস্টান্ট দেশে—স্কটল্যাণ্ড না কোথায় যেন—রববার দিন কাচ্চাবাচ্চাদেরও খেলতে দেওয়া হয় না! এখানে দেখি, ছেলে এবং মেয়েরাও রাস্তার উপর একটা নিম-চুবসে-যাওয়া ফুটবলে ধপাধপ কিক্ লাগাচ্ছে। এদের একটা মস্ত সুবিধে যে জাতিভেদ এদের মধ্যে নেই। দর্জীর ছেলে মুচির মেয়েকে বিয়ে করতে পারে, ইস্কুল মাস্টারের মেয়ে শুঁড়ির ছেলেকেও পারে। পাদ্রির ছেলেকেও পারতো—কিন্তু ক্যাথলিক পাদ্রির বিয়ে বারণ। আফগানিস্থানে যে-রকম মেয়েদের মোল্লা হওয়া বারণ—দাড়ি নেই বলে।

একে ট্র্যাম্প তায় বিদেশী, খেলা বন্ধ করে আমার দিকে যে প্যাট প্যাট করে তাকাবে তাতে আর আশ্চর্য কি! এমন কি ওদের মা-বাপরাও। ওদের অনেকেই রবির সকালটা কাটায় জানলার উপর কুশন্ রেখে তাতে দুই কনুইয়ে ভর দিয়ে, বাইরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। প্রথম প্রথম আমার অস্বস্তি বোধ হত, শেষটায় অভ্যেস হয়ে গেল। সেটা অবশ্য পরের কথা।

ছবিতে দেখেছিলুম ছোঁড়াদের একজন চার্লির পিছন থেকে এসে একটানে তাঁর ছেঁড়া শার্ট ফর-ফর করে একদম দু-টুকরো করে দিলে—সেটা অবশ্য শহরে। এবং আমার শার্টটা শক্ত চামড়ার তৈরী, ওটা ছেঁড়া ছোঁড়াদের কর্ম নয়! কিন্তু তবু দেখি গোটাপাঁচেক ছেলেমেয়ে এক জায়গায় জটলা পাকিয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছে আর ফন্দি-ফিকির আঁটছে। একটি দশ-বারো বছরের মেয়েই দেখলুম ওদের হণ্টরওয়ালী, ফিয়ারলেস নাদিয়া, মিস্ ফ্রণ্টিয়ার মেল, ডাকুকী দিলরুবা, জম্বুকী বেটী যা খুশী বলতে পারেন। হঠাৎ বলা নেই, কওয়া নেই সে দল ছেড়ে গট্‌গট করে এসে প্রায় আমার রাস্তা বন্ধ করে মধুর হাসি হেসে বললে, 'সুপ্রভাত।' সঙ্গে সঙ্গে একটি মোলায়েম কার্টসিও করলে—অর্থাৎ বাঁ পা-টি সোজা সটান পেছিয়ে দিয়ে, ডান হাঁটু ইঞ্চি তিনেক নিচু করে দু হাতে দু পাশের স্কার্ট আলতো ভাবে একটু উপরের দিকে তুলে নিয়ে বাও করলে। এই কার্টসি করাটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর শহরে লোপ পেয়েছে, গ্রামাঞ্চলে তখনো ছিল, এখনো বোধ করি আছে।

এরা 'গ্রুস গট্' হয়তো জীবনে কখনো শোনেই নি। এদের জন্ম প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর। তাই 'গুটেন্ মার্গেন' বলার পূর্বে প্রথম ছাড়লুম একখানা মৃদু হাস্য—একান ওকান ছোঁয়া। আমার মুখখানাও বোম্বাই সাইজের। কলাটা আড়াআড়ি খেতে পারি। স্যাণ্ডউইচ খাবার সময় রুটির মাখম আকছারই দু' ক্যানের ড্যালায় লেগে যায়।

ইতিমধ্যে মেয়েটি অতিশয় বিশুদ্ধ ব্যাকরণে আমাকে যা শুধালো তার যদি শব্দে শব্দে অনুবাদ করা হয় তবে সেটা বাইবেলের ভাষার মতই শোনাবে। 'আপনি ইচ্ছে করলে বললে হয়তো বলতেও পারেন এখন কটা বেজেছে।'

পশ্চিম ইউরোপীয় ভাষাগুলোকে সবজনক্টিভ মুড তথা কন্ডিশনাল প্রচুরতম মেকদারে লাগালে প্রভূততম ভদ্রতা দেখানো হয়। বাঙলায় আমরা অতীত কাল লাগিয়ে ভদ্রতা দেখাই। শ্বশুরমশাই যখন শুধোন, 'বাবাজী তাহলে আবার কবে আসছ?' আমরা বলি, 'আজ্ঞে, আমি তো ভেবেছিলুম—' অর্থাৎ আমি যা ভেবেছিলুম কথাটা আপনার সম্মতি পাবে না বলে প্রায় নাকচ করে বসে আছি। তবু আপনি নিতান্ত জিজ্ঞেস করলেন বলে বললুম।

তা সে যাক্ গে। মেয়েটি তো দুনিয়ার কুল্লে সবজনক্টিভ একেবারে কপি বুক স্টাইলে, ক্লাস-টীচারকে খুশী করার মত ডবল হেল্পিং দিয়ে প্রশ্নটি শুধোলে। আমিও কটা সবজনক্টিভ লাগাবো মনে মনে যখন চিন্তা করেছি এমন সময় গির্জার ঘড়িতে ঢং করে বাজল একটা। আমার মাথায় দুষ্টবুদ্ধি খেলল। কোনো কথা না বলে ডান হাত কানের পেছনে রেখে যেদিক থেকে শব্দ আসছিল সেই দিকে কান পাতলুম।

ইতিমধ্যে দু'চারটে ছোঁড়া রাস্তা ক্রস্ করে মেয়েটার চতুর্দিকে দাঁড়িয়েছে। সে আস্তে আস্তে ফিসফিস করে ওদের বললে, 'বোধ হয় জর্মন বোঝেন, কিন্তু বলতে পারেন না।'

আমি বললুম, 'বোধ হয় তুমি জর্মন বলতে পারো, কিন্তু শুনতে পাও না।'

অবাক হয়ে শুধোলে, 'কি রকম?'

আমি বললুম, 'গির্জার ঘড়িতে ঢং করে বাজল একটা—বদ্ধ কালাও শুনতে পায়। আর তুমি আমায় শুধোলে, কটা বেজেছে। গির্জার ঘণ্টা যে শুনতে পায় না, সে আমার গলা শুনতে পাবে কি করে? তাই তো উত্তর দিই নি।' তারপর ছোঁড়াগুলোর দিকে তাকিয়ে বললুম, কি বলো ভাইরা সব।'ও নিশ্চয়ই লড়াইয়ে গিয়েছিল। সেখানে শেলশকে কালা হয়ে গিয়েছে—আহা বেচারী!'

সবাই তো হেসে লুটোপুটি। ইস্তেক মেয়েটি নিজে। একাধিক কণ্ঠস্বর শোনা গেল: 'মেয়েছেলে আবার লড়াইয়ে যায় নাকি? তা-ও এইটুকু মেয়ে!' আমি গোবেচারীর মত মুখ করে বললুম, 'তা কি করে জানবো ভাই। আমি তো বিদেশী। কোন দেশে কি কায়দা, কি করে জানবো, বলো। এই তো তোমরা যখন ঠাহর করতে চাইলে, আমি জর্মন জানি কি না, তখন পাঠালে মেয়েটাকে। আমাদের দেশ হলে মেয়েটা বুদ্ধি যোগাতো, কোনো একটা ছেলে ঠেলা সামলাবার জন্য এগোতো।'

একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন, 'আপনার দেশ কোথায়? যাবেন কোথায়?' ইত্যাদি।

আমার মাথায় তখন কলি ঢুকেছে। সংস্কৃতে বললুম, 'অহং বৈদেশিকঃ। মম কোঽপি নিবাসো নাস্তি। সর্বদা পরিভ্রমণমেব করোমি।'

কী উল্লাস! কী আনন্দ তাদের!

আমি ইন্ডিয়ান, আমি রেড্ ইন্ডিয়ান, আমি চীনেম্যান এমন কি আমি নিগ্রো ইস্তেক। যে যার মত বলে গেল একই সঙ্গে চীৎকার করে।

আমি আশ্চর্য হলুম, কেউ একবারের তরে শুধোলে না, আমি কোন্ ভাষায়

কি বললুম সেটা অনুবাদ করে দিতে। তখন মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, তাঁর বাল্য বয়সে শিশুসাহিত্য নামক কোনো জিনিস প্রায় ছিল না বলে তিনি বয়স্কদের জন্য লেখা বই পড়ে যেতেন এবং বলেছেন, তাতে সব-কিছু যে বুঝতে পারতেন তা নয়, কিন্তু নিতান্ত আবছায়া-গোছের কি একটা মনের মধ্যে তৈরী করে সেই আপন মনের নানা রঙের ছিন্ন সূত্রে গ্রন্থি বেঁধে তাতে ছবি-গেঁথেছিলেন—বইখানাতে অনেকগুলো ছবি ছিল বলে তিনি নিজেই না বোঝার অভাবটা পুষিয়ে নিয়েছিলেন। কথাটা খুবই খাঁটি। বাচ্চারা যে কতখানি কল্পনাশক্তি দিয়ে না-বোঝার ফাঁকা অংশগুলো ভরে নিতে জানে, তা যাঁরা বাচ্চাদের পড়িয়েছেন তাঁদের কাছেই সুস্পষ্ট। অনেক স্থলেই হয়তো ভুল সিদ্ধান্তে পেঁছিয় কিন্তু তাতে কি এসে যায়। আমি চীনেম্যান না নিগ্রো তাতে কার ক্ষতি-বৃদ্ধি! তারা বিদেশী, অজানা নূতন কিছু একটা পেয়েই খুশি। আর আমি খুশী যে বিনা মেহন্নৎ বিনা কসরৎ আমি এতগুলো বাচ্চাকে খুশী করতে পেরেছি—কারণ আমি বিলক্ষণ জানি, আমি সোনার মোহরটি নই যে দেখা মাত্রই সবাই উদ্বাহু হয়ে উল্লাসে উল্লম্ফন দেবে।

তা সে যাই হোক, শেষ পর্যন্ত স্থির হল আমি রেড্ ইণ্ডিয়ান। তার কারণটা একটু পরেই আমার কাছে পরিষ্কার হল। এরা কয়েকদিন পর ইস্কুলের শো-তে একটা রেড্-ইণ্ডিয়ান নাচ, তীর ছোঁড়া এবং 'শান্তির পাইপ খাবার' অভিনয় করবে—আমি যখন স্বয়ং রেড্ ইণ্ডিয়ান উপস্থিত, তখন আমি রিহার্সেলটি তদারক করে দিলে পাশের গ্রামের ছেলেমেয়েরা একেবারে থ মেরে যাবে। ওঃ! তাদের কী সৌভাগ্য!

আমি নৃতত্ত্বের কিছুই জানি নে। রেড ইণ্ডিয়ানদের সম্বন্ধে আমার জ্ঞান নির্জলা নিল্। তাদের 'শান্তির পাইপ' কি, সে সম্বন্ধে আমার কণামাত্র জ্ঞান নেই। বুশ-মেনের বেশ-পোশাক আর রেড-ইণ্ডিয়ানের ঐ বস্ত্রতে কি তফাত তাও বলতে পারবো না।

অথচ ওদের নিরাশ করি কি প্রকারে?

যাক্। দেখেই নি ওরা কতদূর এগিয়েছে।

তখন দেখি, ইয়াল্লা, এরা জানে আমার চেয়েও কম! ছোট্ট ইস্কুল-বাড়ির একটা ঘর থেকে বেঞ্চি ডেস্ক সরিয়ে সেখানে রিহার্সেল আরম্ভ হল। রেড-ইণ্ডিয়ান মাথায় পালক দিয়েছে বটে কিন্তু বাদবাকি তার সাকুল্য পোশাক কাওবয়দের মত। আরো যে কত 'অনাছিষ্টি' সে বলে শেষ করা যায় না।

তখন আবার বুঝলুম রবীন্দ্রনাথের সেই কথাই আপ্তবাক্য। অল্পবয়স্করা কল্পনা দিয়েই সব-কিছু পুষিয়ে নেয়। তদুপরি এদের প্রাণশক্তি অফুরন্ত। এরা পেট ভরে খেতে পায়। জামা-কাপড়ে এদের মধ্যেও কিছু কিছু দামী সস্তা ছিল বটে কিন্তু ছেঁড়া জামা-জুতো কারোরই নয়। আট বছর হতে-না-হতে এরা ক্ষেতখামারের কাজে ঢোকে না। কোথায় এদের গ্রামের কাচ্চা-বাচ্চারা আর কোথায় আমার গ্রামের কাচ্চা-বাচ্চারা! এই বাচ্চাদের হাসিখুশী দেখে এদের যে কোন একটির মাথায় হাত রেখে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা যায়;—

তুমি একটি ফুলের মত মণি
এমনই মিষ্টি এমনই সুন্দর
মুখের পানে তাকাই যখনি
ব্যথায় কেন কাঁদায় অন্তর !

শিরে তোমার হস্ত দুটি রাখি
পড়ি এই আশিস মন্তর,
বিধি তোরে রাখুন চিরকাল
এমনই মিষ্টি এমনই সুন্দর !

ডু বিস্‌ট্‌ ভী আইনে ব্লুমে
জো হোল্ট, উন্‌ট্‌ শ্যোন উন্‌ট্‌ রাইন্‌;
ইষ শাও' ডিষ আন, উন্‌ট্‌ ভেমুট
শ্লাইষ্‌ট্‌ মীর ইন্‌স্‌ হের্ৎস্‌ হিনাইন ।

মীর ইস্ট্‌ আল্‌স্‌ অপ ইষ ডি হ্যান্‌ডে
আউফ্‌স্‌ হাউপ্‌ট্‌ ডীর লেগেন জল্ট,'
বেটেন্ড, ডাস্‌ গট্‌ ডীর এরহাল্টে
জো রাইন উন্‌ট্‌ শ্যোন উন্‌ট্‌ হোল্ট্‌ ।

এই গ্রামের পাশে বন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হাইন্‌রিষ হাইনে যাঁর ছোট্ট কবিতার বইটি, 'বুখ ড্যার লীডার' পকেটে নিয়ে বন্‌ থেকে বেরিয়েছি এই কবিতাটি তার থেকে নেওয়া ।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে পরম বিস্ময়বোধ হয় এই কথা স্মরণ করে যে তিনিই প্রথম বাঙলাতে অনুবাদ করেন—এবং খুব সম্ভব ভারতের সব ভাষা নিলে বাঙলাতেই প্রথম—হাইনের কবিতা । এবং তাও হাইনের মৃত্যুর পর চল্লিশ বছর যেতে না যেতেই ! এবং মূল জর্মন থেকে—ইংরিজী অনুবাদ মারফতে নয় ! পরবর্তী কবিদের অধিকাংশই অনুবাদ করেছেন ইংরিজী থেকে । মাত্র সত্যেন দত্ত ও যতীন্দ্র বাগচীরই অনুবাদ রবীন্দ্রনাথের অনুবাদের কিছুটা কাছে আসতে পারে । রবীন্দ্রনাথই যে প্রথম হাইনের বাঙলা অনুবাদ করেছিলেন সেদিকে হালে শ্রীযুক্ত অরুণ সরকার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ধন্যবাদ ভাজন হয়েছেন, কারণ রবীন্দ্রনাথের চলিত অচলিত কোনো রচনাবলীতেই এ অনুবাদের উল্লেখ পর্যন্ত নেই ।

হাইনের সঙ্গে চণ্ডীদাসের তুলনা করা যায় । দুজনাই হৃদয়বেদনা নিবেদন করেছেন অতি সরল ভাষায় । দরদী বাঙালী তাই সহজেই এঁর সঙ্গে একাত্ম অনুভব করে ।

গ্যোটে যে সংস্কৃতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তার অন্যতম কারণ সংস্কৃত এবং গ্যোটের দেশ ও জাতের ভাষা দুটোই আর্য ভাষা । কিন্তু হাইনে জাতে

ইহুদী। আর্য-সভ্যতা এবং ইহুদীদের সেমিতি সভ্যতা আলাদা। তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন নিছক ভারতবর্ষের নৈসর্গিক দৃশ্যের বর্ণনা পড়ে এবং শুনে।

তাঁর যে গুরু ফন্ শ্লেগেল তাঁর মাথায় সর্বপ্রথম কবির মুকুট পরিয়ে দেন যিনি তিনি ছিলেন বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক।

॥ ৬ ॥

গেরো বাঁধলো 'শান্তির পাইপ খাওয়া' নিয়ে। এটা বোধ হয় ড্রেস রিহার্সেল। তাই এই প্রথম সত্যকার পাইপে করে সত্যকার তামাক খাওয়া হবে। যে ছেলেটি রেড-ইণ্ডিয়ানদের দলপতি সে বোধ হয় একটু অতিরিক্ত মাত্রায় গোবেচারী—নিতান্ত দিক-ধেড়েঙ্গে ঢ্যাঙা বলে তাকে দলপতি বানানো হয়েছে এবং জীবনে কখনো রান্নাঘরের পিছনে, ওদের ভাষায় চিলেকোঠায় (এ্যাটিকে) কিংবা খড় রাখার ঘরে গোপনে আধ-পোড়া সিগারেটও টেনে দেখে নি। না হলে আগেভাগেই জানা থাকতো ভস্‌ভস্ করে পাইপ ফোঁকা চাট্টিখানি কথা নয়।

দিয়েছে আবার ব্রহ্ম টান! মাটির ছিলিম হলে ফাটার কথা!

ভিরমি যায়-যায়। হৈহৈ রৈরৈ কাণ্ড। একটা ছোট ছেলে তো ভ্যাঁক করে কেঁদেই ফেললে। ওদিকে আমিই ওদের মধ্যে মুরুব্বী। আমাকে কিছু একটা করতে হয়। একজনকে ছুটে গিয়ে মিনরেল-ওয়াটার আনতে বললুম—ও জিনিস এ-অঞ্চলে পাওয়া যায় সহজেই—টাই-কালার খুলে দিয়ে শির-দাঁড়া ঘষতে লাগলুম। এসব মুষ্টিযোগে কিছু হয় কি না জানি নে—শুনেছি মৃত্যুর দু' একদিন পূর্বে রবীন্দ্রনাথের হিক্কা থামাবার জন্য ময়ূরের পালক-পোড়া না কি যেন খাওয়ানো হয়েছিল—তবে সাইকলজিকাল কিছু একটা হবে নিশ্চয়ই। আমি যখন রেড-ইণ্ডিয়ান তখন ওদের পাইপের পাপ কি করে ঠেকাতে হয় আমারই জানার কথা।

ফাঁড়া কেটে যাওয়ার পর দুর্ভাবনা জাগলো, শো'র দিনে পাইপ টানা হবে কি প্রকারে? হায়, হায়, এত সব বখেড়া পোওয়াবার পর, এমন কি জলজ্যান্ত রেড-ইণ্ডিয়ান পাওয়ার পর তীরে এসে ভরাডুবি!

আমি বললুম, 'কুচ পরোয়া নেই। সব ঠিক হো যায়েগা। কয়েক ফোঁটা ইউকেলিপ্‌টাস তেল নিয়ে এস'—অজ পাড়াগাঁ হলে কি হয়, এ যে জর্মনি।

তারই কয়েক ফোঁটা তামাকে ফেলে আগুন ধরাতেই প্রথমটায় দপ্ করে জ্বলে উঠলো। সেটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে ফের ধরালুম। তারপর ভস্ ভস্ করে কয়েক টান দিয়ে বললুম, 'এইবারে তোমরা খাও। কাশি, নাকের জল, বমি কিছুই হবে না।' কেউ সাহস করে না। শেষটায় ঐ মারিয়ানা, ফিয়ারলেস্ নাদিয়াই দিলে দম! সঙ্গে সঙ্গে খুশীতে মুখচোখ ভরে নিয়ে বললে, 'খাসা! হচ্ছে ইউকেলিপটাসের ধুঁয়োয় নাক-গলা ভর্তি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কেমন

যেন শুকনো শুকনো।'

আমি বললুম, 'মাদাম ক্যুরিকে হার মানালি। ধরেছিস ঠিকই। শুকনো শুকনো ভাব বলেই খুব ভিজে সর্দি হলে ডাক্তাররা এই প্রক্রিয়ায় ইউকেলিপটাস ব্যবহার করতে বলে।'

শুধালে, 'আর তামাকের কি হল? তার স্বাদ তো আদপেই পাচ্ছি নে।'

সাক্ষাৎ মা দুর্গা! দশ হাতে একসঙ্গে পাঁচ ছিলিম গাঁজা সেজে—কুলোকে বলে নিতান্ত ঐ গাঁজার স্টেডি সাপ্লাইয়ের জন্যই শিব দশভুজাকে বিয়ে করেছিলেন—বাবার হাতে তুলে দেবার পূর্বে মা নিশ্চয়ই তাঁর বখরার পূর্ব-প্রসাদ নিয়ে নিতেন। এ মেয়ে শিব পাবার পূর্বেই নেশাটা মকসো করে রেখেছে—বেঁচে থাকলে শিবতুল্য বর হবে।

আমি বললুম, 'তামাক কর্পূর—মায় নিকোটিন।'

এমন সময় স্পষ্ট শোনা গেল গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে বাজলো দুটো। সঙ্গে সঙ্গে এদের সক্কলের মুখ গেল শুকিয়ে। কি ব্যাপার? দুটোর সময় সব্বাইয়ের বাড়ি ফেরার হুকুম। মধ্যাহ্ন-ভোজন।

জর্মনি কড়া আইন, ডিসিপ্লিনের দেশ। বাচ্চাদের ডিসিপ্লিন আরম্ভ হয়, জন্মের প্রথম দিন থেকেই—সে কথা আরেকদিন হবে। সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, বিপদে পড়েছে আমাকে নিয়ে। ছেলেমানুষ হোক আর যাই হোক একটা লোককে হুট করে বিদায় দেয় কি করে? ওদিকে আমিও যে এগোতে পারলে বাঁচি সেটা বোঝাতে গেলে ওরা যদি কষ্ট পায়!

গোবেচারী মনে হয়েছিল বটে, কিন্তু এখন দেখলুম, যার দলপতি সাজবার কথা সে ছেলেটা অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে শুধালে, 'তুমি লাঞ্চ খেয়েছো?'

আমার সত্য ধর্ম ছিল মিথ্যা বলার, অর্থাৎ হ্যাঁ, কিন্তু আমার ভিতরকার শয়তান আমাকে বিপদে ফেলার জন্য হামেহাল তৈরী। সে-ই সত্যভাষণ করে বললে, 'না, কিন্তু—'

কয়েকজন ছেলেমেয়ে একসঙ্গে চেঁচিয়ে বললে, 'আমার বাড়ি চলো।'

মেলা হট্টগোল। আমি বললুম, 'অনেক ধন্যবাদ, বাছারা, কিন্তু তোমাদের বাপ-মা একটা ট্র্যাম্পকে—?'

মারিয়ানা মেয়েটা একদিন জর্মনীর রানী হবে যদি কৈলাস থেকে হুলিয়া বেরোয়। বলা-নেই-কওয়া-নেই খপ করে তার ছোট্ট হাত দিয়ে আমার হাতখানা ধরে বললে, 'চলো আমার বাড়ি। আমাতে ঠাকুমাতে থাকি। কেউ কিছু বলবে না। ঠাকুমা আমায় বড্ড ভালবাসে।' তারপর ফিস্-ফিস্ করে কানে কানে বললে—যদিও আমার বিশ্বাস সবাই শুনতে পেলে, 'ঠাকুমা চোখে দেখতে পায় না।'

ইস্কুল থেকে বেরিয়ে বিস্তর হ্যান্ড-শেক, বিস্তর চকলেট বদলাবদলি হল। মারিয়ানা বললে, 'চলো। আমাদের বাড়ি গ্রামের সর্বশেষে। তুমি যেদিকে চলছিলে সেই দিকেই। খামোখা উল্টো পথে যেতে হবে না।'

আজ স্বীকার করছি, তখনো আমি উজবুক ছিলুম। কাকে কি জিজ্ঞেস

করতে হয়, না হয়, জানতুম না ; কিংবা হয়তো, কিছুদিন পূর্বেই কাবুলে ছিলুম বলে সেখানকার রেওয়াজের জের টানছিলুম—সেখানে অনেকক্ষণ ধরে ইনিয়ে বিনিয়ে হরেক রকমের ব্যক্তিগত প্রশ্ন শোধানো হল ভদ্রতার প্রথম চিহ্ন। জিজ্ঞেস করে বসেছি, 'তোমার বাপ মা ?'

অত্যন্ত সহজ কণ্ঠে উত্তর দিলে, 'বাবা ? তাকে আমি কখনো দেখি নি। আমার জন্মের পূর্বেই লড়াইয়ে মারা যায়। আর মা ? তাকেও দেখি নি। দেখেছি নিশ্চয়, কিন্তু কোনো স্মরণ নেই। সে গেল, আমার যখন বয়েস এক মাস।'

ইচ্ছে করে এরকম প্রশ্ন শুধিয়ে বিপদে পড়া আহাম্মুখিই। লড়াই, লড়াই, লড়াই ! হে ভগবান ! তুমি সব পারো, শুধু এইটে বন্ধ করতে পারো না ?

ভাবলুম, কোন্ ব্যামোতে মা মারা গেল সেইটে শুধোলে হয় তো আলাপটা অন্য মোড় নেবে। শুধালুম, 'মা গেল কিসে ?'

বারো, জোর তেরো বছরের মেয়ে। কিন্তু যা উত্তর দিলে তাতে আমি বুঝলুম, আহাম্মুখের মত এক প্রশ্ন শুধিয়ে বিপদ এড়াবার জন্য অন্য প্রশ্ন শুধোতে নেই। বললে, 'আমাদের গাঁয়ে ডাক্তার নেই। বন্ শহরের ডাক্তার বলে, মা গেছে হার্টে। ঠাকুমা বলে, অন্য হার্টে। মা নাকি বাবাকে বড্ড ভালোবাসতো। সবে নাকি তাদের বিয়ে হয়েছিল।'

* * *

নির্জন পথ চিত্রিতবৎ সাড়া নেই সারা দেশে।
রাজার দুয়ারে দুইটি প্রহরী ঢুলিছে নিদ্রাবেশে ॥

তার বদলে একটি সিঁড়ির উপর পাশাপাশি বসে দুটি বুড়ী ঢুলছে।

আর খোলা জানালা দিয়ে আসছে ক্যানারি পাখীর গিটকিরিওল হুইসেলের মিষ্টিমধুর সঙ্গীত। ম্যারিয়ানা বললে,'দুই দুই বুড়ীর ঐ এক সঙ্গী—পাখিটি।'

॥ ৭ ॥

গ্রামের ঐ একটিমাত্র সদর-রাস্তা পেরিয়ে যাওয়ার পর দু'দিকের বাড়িগুলো রাস্তা থেকে বেশ একটুখানি দূরে—অর্থাৎ গেট খুলে বাগান পেরিয়ে গিয়ে ঘরে উঠতে হয়।

'বাগান' বললুম বটে, কিন্তু সেটাকে ঠিক কি নাম দিলে পাঠকের চোখের সামনে ছবিটি ফুটে উঠবে ভেবে পাচ্ছি নে।

ঢুকতেই কম্পাউণ্ডের বাঁ দিকে একটা ডোবাতে অনেকগুলো রাজহাঁস প্যাকপ্যাক করছে। টলটল স্বচ্ছ সরোবরে তরতর করে রাজহাঁস মরাল-সন্তরণে ভেসে যাওয়ার শৌখিন ছবি নয়—এ নিছক ডোবা, এদিকে-ওদিকে ভাঙা, ধসে-যাওয়া পাড়, জল ঘোলা এবং কিছু কিছু শুকনো পাতা এদিক-ওদিক ভাসছে। সোজা বাঙলায়, এখানে রাজহাঁসের চাষ হচ্ছে, বাগানের নয়নাভিরাম দৃশ্য হিসেবে এটাকে তৈরী করা হয় নি।

মারিয়ানার গন্ধ পেয়েই রাজহাঁসগুলো একজোটে ডোবা ছেড়ে তার চতুর্দিকে জড়ো হল। আমি লাফ দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়ালুম। রাজহাঁস, ময়ূর এরা মোটেই নিরীহ প্রাণী নয়—যে যাই বলুন। মারিয়ানাও ব্যাপারটা বুঝতে পেরে শুধু বলল, 'বাপ রে বাপ, জানোয়ারগুলোর কি খাঁই! এই সকালবেলা উঠেই গাদাগুচ্ছের খাইয়ে গিয়েছি, ডোবাতেও এতক্ষণ এটা-সেটা খেয়েছে, আবার দেখো, কি রকম লেগেছে! এদের পুষে যে কী লাভ, ভগবান জানেন।

ইতিমধ্যে দেখি আরেক দল মোর্গামুর্গী এসে জুটেছে।

ঘরে ঢোকার আগে দেখি বাড়ির পিছনে এক কোণে জালের বেড়ার ভিতর গোটাতিনেক শুয়োর।

আমি অবাক হয়ে মারিয়ানাকে শুধালুম, 'এই সব-কিছুর দেখ-ভাল তুমিই করো? তোমার ঠাকুমা না—?'

ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে, 'আমি করি কোথায়? করে তো কার্ল!'

আমি শুধালুম, 'সে আবার কে? তুমি না বললে, তোমরা মাত্র দু'জনা?'

ইতিমধ্যে কার্ল এসে জুটেছে। মাঝারি সাইজের এলসেশিয়ান হলেও এলসেশিয়ান তো বটে—জর্মনরা বলে শেপার্ড ডগ, অর্থাৎ রাখাল কুকুর—কাজেই একদিকে রাজহাঁস, অন্যদিকে কুকুর, এ নিয়ে বিব্রত হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু দেখলুম, কার্ল স্যানা ছেলে, আমাকে একবার শুঁকেই মনস্থির করে ফেলেছে, আমি মিত্রপক্ষ।

মারিয়ানা বললে, 'আমি ওদের খাওয়াই-টাওয়াই। কার্লই দেখা শোনা করে। তোমার মত ট্র্যাম্প কিংবা জিপসি সুযোগ পেলেই কপ্ করে একটা মুরগী ইস্তেক হাঁসের গলা মটকে পকেটে পুরে হাওয়া হয়ে যাবে।'

আমি বললাম, 'মনে রইল। এবারে সুযোগ পেলে ছাড়ব না।'

ভয় পেয়ে বললে, 'এমন কম্মটি করতে যেয়ো না, লক্ষ্মীটি। অনেকেরই কার্লের চেয়েও বিরাট দু-আঁসলা শেপার্ড ডগ রয়েছে। সেগুলো বড্ড বদ্ হয়।'

আমি অবাক হয়ে ভাবছি, এই বারো বছরের মেয়ে দু-আঁসলা, এক-আঁসলা ক্রস-ব্রীডের কি বোঝে?

মারিয়ানাই বুঝিয়ে বললে, 'খাঁটি আলসেশিয়ান কার্লের চেয়ে বড় সাইজের হয় না। আলসেশিয়ানকে আরো তাগড়াই করার জন্য কোনো কোনো আহাম্মুক আরো বড় কুকুরের সঙ্গে ক্রস করায়। সেগুলো সত্যিকার দু-আঁসলা, বদমেজাজী আর খায়ও কয়লার ইঞ্জিনের মত।'

এর অনেক পরে এক ডাক্তার আমায় বুঝিয়ে বলেছিলেন, গরু-ভেড়া-ছাগল-মুরগী নিয়ে গ্রামের সকলেরই কারবার বলে কাচ্চাবাচ্চারা অল্পবয়সেই ব্রীডিং বুল, 'বাঁচি'র মোরগ কি বুঝে যায়। তাই শহুরেদের তুলনায় এ-বিষয়ে ওদের সুস্থ স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গি জন্মায়, এবং পরিণত বয়সে যৌন-জীবনে শহুরেদের তুলনায় এদের আচরণ অনেক বেশী স্বাভাবিক ও বেহাঙ্গামা হয়।

থাক্ সে কথা। তবে এইবেলা এ কথাটি বলে রাখি, এই গ্রামাঞ্চলে ঘোরাঘুরির ফলে মানুষের জীবনধারা সম্বন্ধে যে জ্ঞান সঞ্চয় করেছি, শহরের বহু ড্রয়িংরুম, বার-রেস্তোরাঁর পাকা জউরি হয়েও তার সিকির সিকিও হয় নি।

* * *

'ঠাকুমা, আমি অতিথি নিয়ে এসেছি।'

আমি বললুম, 'গ্রুস্ গট্ ঠাকুমা। আমি বিদেশী।'

ঠাকুমা সেই প্রাচীন যুগের লোক। গ্রুস গট্ বলাটাই হয়তো এখনো তাঁর অভ্যাস। তাই বলে বসলেন, 'বসো।' মারিয়ানাকে বললেন, 'এত দেরি করলি যে! খেতে বস্। আর সানডে সেট বের কর। আর শোন, চীজ, চেরি-ব্রাণ্ডি ভুলিস নি।'

'হ্যাঁ, ঠাকুমা নিশ্চয়ই ঠাকুমা—' বলতে বলতে আমার দিকে তাকিয়ে একটু-খানি চোখ টিপে হাসলে। বিশেষ করে দেরাজের উপরের থাকের চেরি-ব্র্যাণ্ডির বোতল দেখিয়ে। অর্থাৎ অতিথি-সৎকার হচ্ছে। সচরাচর এগুলো তোলাই থাকে।

এবং এটাও বোঝা গেল, নিতান্ত ঠাকুমা নাতনী ছাড়া আর কেউ নেই বলে রবিবার দিনও সানডে সেটের কাপ-প্লেট বের করা হয় না।

মারিয়ানা টেবিল সাজাচ্ছে। আমি ঠাকুমাকে শুধালুম, 'আপনার স্বাস্থ্য কি রকম যাচ্ছে?'

ঠাকুমা উত্তর না দিয়ে বললেন, 'তুমি তো আমার মত কথা বলো, আমার নাতনীর মত বলো না!'

আমি শুধালুম, 'একটু বুঝিয়ে বলুন।'

ঠাকুমা বললেন, 'আমি হানোফারের মেয়ে। সেই ভাষাতেই কথা বলি। সে-ভাষা বড় মিষ্টি। আমি ছাড়বো কেন? আর নাতনীর বাপ-ঠাকুর্দা রাইনল্যাণ্ডের লোক। এরা সবই রাইনিশ বলে। তুমি তো হানোফারের কথা বলছো!'

মারিয়ানা বলে উঠলো, 'ওঃ, কত না মিষ্টি! শ্‌পৎসে, শ্‌টাইন বলতে পারে না; বলে স্পৎসে, স্টাইন।'

(অর্থাৎ 'শ, স'-এ তফাত করতে পারে না; আমরা যে রকম 'সামবাজারের সসিবাবুর সসা খেয়ে খেয়ে সগ্‌গারোন' নিয়ে ঠাট্টা করি।)

ঠাকুমা কণামাত্র বিচলিত না হয়ে বললেন, 'আর তোরা ত কির্শে', কির্ষেতে তফাত করতে পারিস নে।'

(এ দুটো উচ্চারণের পার্থক্য বাঙলা হরফ দিয়ে বোঝানো অসম্ভব। তবে এক উচ্চারণ করলে ফলে দাঁড়ায় 'আমি গির্জেটা (কির্ষে) খেলুম (!), এবং তারপর চেরি ফলে (কির্শে) ঢুকলুম (!)'—যেখানে উচ্চারণে ঠিক ঠিক পার্থক্য করলে সত্যকার বক্তব্য প্রকাশ হবে, 'আমি চেরিফল খেয়ে গির্জেয় ঢুকলুম।')

আমি বাঙাল-ঘটি যে-রকম উচ্চারণ নিয়ে তর্ক করে, সে ধরনের কাজিয়ার বাড়াবাড়ি থামাবার জন্য বললুম, 'আমার গুরু ছিলেন হানোফারের লোক।'

॥ ৮ ॥

"ধন্য হে জননী মেরী, তুমি মা করুণাময়ী। তুমি প্রভুর সান্নিধ্যলাভ করেছ। রমণীজাতির মধ্যে তুমিই ধন্য, আর ধন্য তোমার দেহজাত সন্তান যীশু। মহিমাময়ী মা মেরি, এই পাপীতাপীদের তুমি দয়া করো, আর দয়া করো যেদিন মরণের ছায়া আমাদের চতুর্দিকে ঘনিয়ে আসবে।"

এই 'আভে মারিয়া' বা 'মেরি-আবাহন-মন্ত্র' উচ্চারণ না করে সাধারণত ক্যাথলিকরা খেতে বসে না—আর গ্রামাঞ্চলে তো কথাই নেই। অনেকটা হিন্দুদের গণ্ডুষের মত। আর প্রটেস্টান্টরা সাধারণত 'হে আমাদের দ্যুলোকের পিতা' (পাতের নস্তের) মন্ত্র পাঠ করে। কোনো কোনো পরিবারের উপাসনাটা অতি ক্ষুদ্র:

'এস হে যীশু!
আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করো।
আমাদের যা দিয়েছো তার উপর
তোমার আশীর্বাদ রাখো।
'কমে য়েজু, জাই উনজের গাস্ট্
উনট্ জেগনে ভাস ডু
উনস্ বেশেরট্ হাস্ট্॥[১]

মুসলমানদের উপাসনাটিও ক্ষুদ্র: 'আমি সেই খুদার নামে আরম্ভ করি যিনি দয়াময়, করুণাময়।'

১ বিলাতের কোনো এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভোজনগৃহে এই মন্ত্রপাঠ করার সময় জনৈক ভারতীয় ভোজনালয় ত্যাগ করেন। দেশে ফিরে এসে তিনি সেটি ফলাও করে তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে বর্ণনা দেন। নাস্তিকের এই 'সৎসাহসের' কর্মটি তিনি যদি ইনকুইজিশন যুগে করতেন তবু না হয় তার অর্থ বোঝা যেত। কিন্তু তাঁর এই আচরণ থেকে ধরে নিতে হবে, হয় ভারতীয়রা পরধর্ম সম্বন্ধে অসহিষ্ণু, অথবা ঐ লেখক ভারতীয় নন। জানি একজন ভারতীয়ের আচরণ থেকে তাবৎ ভারতীয় সম্বন্ধে কোনো অভিমত নির্মাণ করা অযৌক্তিক কিন্তু দেশ-বিদেশে সর্বত্রই তাই করা হয়।

পক্ষান্তরে খাঁটি নাস্তিক আনাতোল ফ্রাঁস যখন একবার শুনতে পান, ফরাসী সরকার যে পুস্তকে ভগবানের নাম উল্লেখ থাকে সে-পুস্তক স্কুল লাইব্রেরীর জন্য কিনতে দেয় না, তখন তিনি রুদ্ধকণ্ঠে বলেছিলেন, 'তাহলে ফরাসী বিদ্রোহে এত রক্তপাত করে পেলুম আমরা কী সে স্বাধীনতা—যে স্বাধীনতা আস্তিককে তার ধর্মবিশ্বাস প্রচার করতে দেয় না।

এদের এই মন্ত্রপাঠে একটি আচার আমার ভালো লাগে ; পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ—যে সবে আধো আধো মন্ত্রোচ্চারণ করতে শিখেছে—তাকেই সর্বজ্যেষ্ঠ আদেশ দেন, উপাসনা আরম্ভ করতে।

ঠাকুমা আদেশ করলেন, 'মারিয়ানা, ফাণ্ডেমাল্ আন—আরম্ভ কর।'

প্রাগুক্ত শুদ্ধ-বুদ্ধ-বিবেকমণ্ডিত 'নাস্তিক' ভ্রমণকাহিনী লেখক আমি নই। (ভ্রমণকাহিনী যদিও লিখেছি তবু তাঁর মত খ্যাতিলাভ করতে পারি নি।) তাই আমি হস্তী দ্বারা তাড্যমানের ন্যায় খৃষ্টানের গৃহ ত্যাগ করলুম না।

মারিয়ানার কিন্তু তখনো খাবার সাজানো হয় নি—রোববারের বাসন-কোশন বের করতে একটু সময় লেগেছে বই কি, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। সুপ্ স্যালাড আনতে আনতেই, সেই সদাপ্রসন্ন তরুণ মুখটিতে কণামাত্র গাম্ভীর্য না এনে সহজ সরল কণ্ঠে বলে উঠলো,

'ধন্য হে জননী মেরি, তুমি মা
করুণাময়।—'

বাচ্চাদের উপাসনা আমার সব সময়েই বড় ভালো লাগে। বড়দের কথায় বিশ্বাস করে তারা সরল চিত্তে ধরে নিয়েছে ভগবান সামনেই রয়েছেন। ফলে তাদের মন্ত্রোচ্চারণের সময় মনে হয় তারা যেন তাঁর সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে কথা কইছে—যেন ঠাকুরমার সঙ্গে কথা না বলে ভগবানের সঙ্গে কথা বলছে। আর আমরা, বয়স্করা, কখনো উপরের দিকে, কখনো মাথা নিচু করে 'উপাসনা করি'—তাঁর সঙ্গে কথা বলি নে।

গ্রামের লোক হাতী ঘোড়া খায় না। শহুরেদের মত আটপদী নিরতিশয় ব্যালানস্ড্ ফুড—ফলে স্বভাবতই আন-ব্যালান্স্ড্!—খায় না বলেই শুনেছি তাদের নাকি থ্রম্বোসিস কম হয়।

সুপ।

আপনারা সায়েবী রেস্তোরাঁয় যে আড়াই ফোঁটা পোশাকী সুপ খেয়ে ন্যাপকিন দিয়ে তার দেড় ফোঁটা ঠোঁট থেকে ব্লট করেন এ সে বস্তু নয়। তার থাকে তনু, এর আছে বপু।

হেন বস্তু নেই যা এ সুপে পাবেন না।

মাংস, মজ্জা সুদ্ধ হাড়, চর্বি সেদ্ধ করা আরম্ভ হয়েছে কাল সন্ধ্যা থেকে, না আজ সকাল থেকে বলতে পারবো না। তারপর তাতে এসেছে, বাঁধাকপি, ফুলকপি, ব্রাসেল স্প্রাউটস্, দু'এক টুকরো আলু, এবং প্রচুর পরিমাণে মটরশুঁটি। মাংসের টুকরো তো আছেই—তার কিছুটা গলে গিয়ে ক্বাথ হয়ে গিয়েছে, বাকিটা অর্ধ-বিগলিতালিঙ্গনে তরকারির টুকরোগুলোকে জড়িয়ে ধরেছে। এবং সর্বোপরি হেথা হোথা হাবুডুবু খাচ্ছে অতিশয় মোলায়েম চাক্তি চাক্তি ফ্রাঙ্কফুর্টার সসিজ। চর্বিঘন-মাংসবহুল-তরকারি সম্বলিত মজ্জামণ্ডিত এই সুপের পৌরুষ-দার্ঢ্যের সঙ্গে ফেনীস রেস্তোরাঁর নমনীয় কমনীয় কাঁচসংসদ ভোজ্য সুপ নামে পরিচিত তরল পদার্থের কোনো তুলনাই হয় না।

এর সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে এদেশের ভাষায় বলতে গেলে বলবো, মা মাসীদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে কোনো গতিকে পিকনিকে নিয়ে যেতে পারলে তাঁরা সাড়ে বত্রিশ উপকরণ দিয়ে যে খিচুড়ী রাঁধেন, ধর্মে-গোত্রে এ যেন তাই। খেয়েই যাচ্ছি, খেয়েই যাচ্ছি, শুধুমাত্র খিচুড়িই খেয়ে যাচ্ছি—শেষটায় দেখি, ওমা, বেগুনভাজা যামলেটে হাত পর্যন্ত দেওয়া হয় নি।

জর্মনির জনপদবাসী ঠিক সেই রকম সচরাচর ঐ একটিমাত্র সুপই খায়। তার সঙ্গে কেউ কেউ রুটি পর্যন্ত খায় না।

আজ রোববার, তাই ভিন্ন ব্যবস্থা। অতএব আছে, দ্বিতীয়ত, স্যালাড।

আবার বলছি, আপনাদের সেই 'ফিনসি' রেস্তোরাঁর উন্নাসিক 'সালাদ রুস' 'সালাদ আলা মায়োনেজ', 'সালাদ ভারিয়ে ও-পোয়াসোঁ' ওসব মাল বেবাক ভুলে যান।

সুপে যেমন ছিল দুনিয়ার সাকুল্যে সর্বকিছু, স্যালাডে ঠিক তার উল্টোটি। আছে মাত্র তিনটি বস্তু: লেটিসের পাতা, টমাটোর টুকরো, প্যাঁজের চাকতি —ব্যস!

এগুলো মেশানো হয়েছে আরো তিনটি বস্তু দিয়ে। ভিনিগার, অলিভ ওয়েল এবং জলে-মিশিয়ে-নেওয়া সরষেবাটা। অবশ্য নুন আছে এবং গোলমরিচের গুঁড়ো থাকলে থাকতেও পারে। কিন্তু ঐ যে সিরকা, তেল, সর্ষে সেই তিন বস্তুর কতটা কতখানি দিতে হবে, কতক্ষণ মাখতে হবে—বেশী মাখলে স্যালাড জবুথবু হয়ে নেতিয়ে যাবে, কম মাখলে সর্বাঙ্গে সর্ব জিনিসের পরশন শিহরণ জাগবে না—সেই হল গিয়ে স্যালাডের তমসাবৃত, সৃষ্টির নিগূঢ় রহস্য।

দম্ভভরে বলছি, আমি শংকর কপিল পড়েছি, কাণ্ট হেগেল আমার কাছে অজানা নন। অলংকার নব্যন্যায় খুঁচিয়ে দেখেছি, ভয় পাই নি। উপনিষদ, সুফীতত্ত্বও আমার কাছে বিভীষিকা নয়। আমার পরীক্ষা নিয়ে সত্যেন বোসের এক সহকর্মী আমাকে বলেছিলেন, তিনি বছরে তিনি আমায় রিলেটি-ভিটি কলকাতার দুগ্ধবত্তরলম্‌ করে দিতে পারবেন। পুনরপি দম্ভ ভরে বলছি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের হেন বস্তু নেই যার সামনে দাঁড়িয়ে হকচকিয়ে বলেছি, এ জিনিস? না, এ জিনিস আমাদ্বারা কক্‌খনো হবে না। আপ্রাণ চেষ্টা করলেও হবে না।

কিন্তু ভগ্নদূতের মত নতমস্তকে বার বার স্বীকার করছি ঐ স্যালাড মেশা-নোর বিদ্যেটা আমি আজো রপ্ত করে উঠতে পারি নি। অথচ বন্ধুমহলে—বোম্বাইয়ের শচীন চৌধুরী থেকে আরম্ভ করে কলকাতার ডাক্তার ঘোষ পর্যন্ত—স্যালাড মেশানো ব্যাপারে আমার রীতিমত খ্যাতি আছে। তাঁরা যখন আমার তৈরী স্যালাড খেয়ে 'আ মরি', 'আ মরি' করেন, আমি তখন ঠাকুমার সেই স্যালাডের স্মরণে জানলা দিয়ে হঠাৎ কখনো বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করতে থাকি, কখনো বা মাথা নীচু করে বসে থাকি।

বাঙলা কথায় তুলনা দিয়ে বলতে হলে, শুধোই, তেলমুড়ি আপনি মাখতে পারেন, আম্মো পারি, কিন্তু পারেন ঠাকুমার মত? ধনেপাতার চাটনিতে

কীই বা এমন কেরদানী ! কিন্তু পারেন পাদ্রি পিসি পারা পিষতে ?

* * *

'গুটেন্ আপেটিট' —গুড্ এপিটাইট !

এর ঠিক বাংলা নেই। উপাসনার পর একে অন্যের দিকে তাকিয়ে সবাই বলে, 'আশা করি তোমার যেন বেশ ক্ষুধার উদ্রেক হয়, আর তুমি তৃপ্তির সঙ্গে খেতে পারো।' ইংরিজীর মত জর্মনেও 'হাঙার' (হুঙার) ও 'এপিটাইট' ('আপেটিট') দুটো শব্দ আছে। 'এপিটাইটে'র ঠিক বাংলা প্রতিশব্দ নেই। 'খাওয়ার রুচি, বাসনা' অনেক কিছু দিয়ে মোটামুটি বোঝানো চলে কিন্তু ঠিক অর্থটি বেরোয় না'। যেমন ইংরিজিতে বলা চলে, 'আই এম্ হাঙরি বাট হ্যাভ নো এপিটাইট'—'আমার ক্ষুধা আছে কিন্তু খাবার প্রবৃত্তি নেই,' কিংবা 'মুখে রুচছে না'। আবার পেটুক ছেলে যখন খাই-খাই করে তখন অনেকেই বলে, 'দি বয় হ্যাজ এপিটাইট বাট হি ইজ নট হাঙরি এট অল।' এস্থলে 'এপিটাইট' তাহলে দাঁড়ায় 'চোখের ক্ষিধে'। আমার অবশ্য, দুইই ছিল।

আইনানুযায়ী আমার মাঝখানে বসার কথা, কিন্তু আমি একরকম জোর করে মারিয়ানাকে মাঝখানে বসিয়ে দিলুম। ঠাকুমার কখন কি দরকার হয় আমি তো জানি নে। মারিয়ানা কাছে থাকলে ওঁকে সাহায্য করতে পারবে।

বিরাট গোল এক চামচ দিয়ে সুপের বড় বোল্ থেকে আমার গভীর সুপ-প্লেটে মারিয়ানা চালান করতে লাগল লিটার লিটার সুপ। আমি যতই বাধা দিই কোন কথা শোনে না। তবু মাঝে মাঝে পাকা গিন্নীর মত বলে, 'মান্ জল্ অর্ডন্টুলিষ এসেন—ভালো করে খেতে হয়, ভালো করে খেতে হয় !'

ঠাকুমা দেখি তখনো কি যেন বিড়বিড় করছেন। হয়তো নিত্য মন্ত্রের উপর তাঁর কোন ইষ্টমন্ত্র আছে—সেইটেই জপ করছেন।

আমার মা বলতো, আমাকে দেখলে যতটা বোকা বলে মনে হয়, আমি ততটা বোকা নই ; আর বড়দা বলতো, আমাকে দেখলে যতটা বুদ্ধিমান বলে মনে হয়, আমি ততটা বুদ্ধিমান নই। কোন্‌টা ঠিক জানি নে, তবে আমার স্মৃতি-শক্তিটি ভালো সে-কথাটা উভয়েই স্বীকার করতেন। আমার মনে পড়ে গেল, আমার শহুরে বন্ধু পাউল একবার আমাকে 'উপাসনার অত্যাচারে'র কথা শুনিয়েছিল। সমস্ত দিন খেটে খিদেয় হন্যে হয়ে চাষারা তাকিয়ে আছে সুপ-প্লেটের দিকে—ঝাঁপিয়ে পড়বে তার উপর—আর পাদ্রীসায়েব, তিনি সমস্তদিন 'প্রভুকে স্মরণ করেছেন বলে' তাঁর হাঙার এপিটাইট কিছুই নেই—পাদ্রী সায়েবের উপাসনার আর অন্ত নেই।

আমি অনুমান করলুম, আমি বিদেশী বলে হয়তো মারিয়ানা মন্ত্রোচ্চারণে কিছু কিছু কাট-ছাঁট করেছে। ফিস্ ফিস্ করে সে কথা শোধাতে তার সর্ব মুখ শুদ্ধ নয়, যেন ব্লন্ড চুলের গোড়াগুলো পর্যন্ত লাল হয়ে গেল। অপরাধ স্বীকার করে বললে, খাওয়ার পরের উপাসনা পুরোপুরি করে দেবে।

ঠাকুমার প্লেটে মারিয়ানা সুপ ঢেলেছিল অল্পই। তিনি প্রথম চামচ মুখে দেওয়ার পর আমরাও খেতে আরম্ভ করলুম। সঙ্গে সঙ্গে মারিয়ানা আমাকে

দিকে তাকিয়ে শুধোলে, 'শ্মেকট্ এস্ ?' অর্থাৎ 'খেতে ভালো লাগছে তো ?' এটা হল এদেশের দু নম্বরের টেবিল এটিকেট। আমি বললুম, 'ধন্যবাদ ! অপূর্ব ! রাজসিক !' জর্মনে কথাটা 'হ্যারলিষ'—তার বাঙলা 'রাজকীয়' 'রাজসিক'।

আমি বললুম, 'ঠাকুমা, আপনাদের এই রবিবারের সেটটি ভারী চমৎকার।'

ঠাকুমা বললেন, 'এ বাড়িতে কিন্তু মোটেই খাপ খায় না। তা কি করবো বলো। আমার মামা কাজ করতেন এক পর্সেলিন কারখানায়। তিনি আমাকে এটা দেন। সে কতকালের কথা—এস্ ইস্ট্ সো লাঙে হের।'

মারিয়ানা বললে, 'চেপে যেও না, ঠাকুমা ! তোমার বিয়ের সময় উপহার পেয়েছিলে সেটা বললে কোন অপরাধ হবে না। ফের "এস্ ইস্ট্ সো লাঙে হের" বলে আরম্ভ করো না।'

আমি শুধালুম, 'এস্ ইস্ট্ সো লাঙে হের—সে আবার কি ?'

উৎসাহের সঙ্গে মারিয়ানা বললে, 'বুঝিয়ে বলছি, শোনো। ঠাকুমা যখনই আমাকে ধমক দিতে চায়, তখন হঠাৎ তাঁর স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর হয়ে উঠে। "তোর বাপ এ-পরবের সময় এরকম ধারা করতো না, তুই কেন করছিস ? তোর মা তার সাম্বৎসরিক পরবের দিনে (নামেনস্টাখ্) ভোরবেলা চার্চে গিয়েছিল, আর তুই ন'টা অবধি ভস্ভস্ করে নাক ডাকালি।" কে কবে হেসেছিল, কে কবে কেশেছিল টায়-টায় মনে গাঁথা আছে। আবার দেখো শীতকালে যখন দিনভর রাতভর দিনের পর দিন বরফ পড়ে, বাড়ি থেকে বেরনো যায় না, তখন যদি সময় কাটাবার জন্য ঠাকুরমাকে জিজ্ঞেস করি, 'হ্যাঁ, ঠাকুমা বলো তো ভাই, লক্ষ্মীটি, ঠাকুরদা কি ভাবে তোমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পেড়েছিল। এক হাঁটু গেড়ে আরক হাঁটু মুড়ে, ফুলের তোড়া বাঁ-হাতে নিয়ে এগিয়ে দিয়ে, ডান হাত বুকের উপর চেপে নিয়ে—।'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'অবাক করলি ! তুই এসব শিখলি কোথায় ? তোর কাছে কেউ বিয়ের প্রস্তাব পেড়েছিল নাকি ?'

এইবারে ঠাকুমা ঠোঁট খুলল। বললেন, 'বেশ হয়েছে।'

মারিয়ানা মুখ আবার লাল করে বললে, 'দ্যৎ ! সিনেমাতে দেখেছি। উইলহেলম বুশের আঁকা ছবিতে দেখেছি।[1] তা সে যাক গে, আমার কথা শোনো। ঐসব বিয়ের প্রস্তাব, বিয়ের পর পয়লা ঝগড়া, ঠাকুরদা যখন লড়াইয়ে চলে গেল তখনকার কথা, এসব কথা জিজ্ঞেস করলে হঠাৎ ঠাকুরমার স্মৃতিশক্তি একদম লোপ পায়। আমাদের ঐ কার্ল কুকুরটা যেরকম পূর্ণচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে ডুকরে ডুকরে আর্তরব ছাড়ে ঠিক সেই গলায় কাকিয়ে কাকিয়ে বলে, সেই এক কথা—"এস্ ইস্ট্ সো লাঙে হের", "সে কত প্রাচীন দিনের কথা, সে সব কি

১ জর্মনদের সুকুমার রায়। ওঁরই মত নিজের কবিতার ছবি নিজেই আঁকতেন। তবে সুকুমারের মত 'প্যোর ননসেন্স' লেখেন নি। ওঁর বেশীর ভাগই ইলাসট্রেটেড গল্প।

আর আমার মনে আছে।" ধমকের বেলা সব মনে থাকে—তখন আর "লাঙে হের, লাঙে হের" নয়।'

আমি বললুম, 'আলবাৎ, আলবাৎ।'

তার থেকে অবশ্য বোঝা গেল না আমি কোন্ পক্ষ নিলুম। পরে বিপদে পড়লে যেদিকে খুশী ঘুরিয়ে নেব। অবশ্য আমি কালো, কৃষ্ণপক্ষ, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেই থাকার চেষ্টা করি।

ইতিমধ্যে আমি মারিয়ানার কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘরটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছি।

ঘরের উত্তর-পুব কোণে দুই দেওয়ালের সঙ্গে মিলে সিন্‌ক্—জর্মনে বলে শ্‌প্যুল-স্টাইন।

দেয়ালে গাঁথা ওয়াশস্টেণ্ডের মত, ছোট্ট চৌবাচ্চা-পানা—দেয়ালে গাঁথা বলে যেন হাওয়ায় দুলছে—মাটি পর্যন্ত নেবে আসে নি। সেখানে ট্যাপে বাসন কোশণ মাজা হয়, মাছ-মাংস ধোওয়া হয়—তাই রান্নাঘরে, কিংবা খাওয়ায় (অবশ্য এই শীতের দেশে খাওয়া জিনিসটাই নেই) ঘড়াঘড়া জল রাখতে হয় না। খাওয়া-খাওয়ার পর তাবৎ বাসন-বর্তন, হাঁড়ি-কুড়ি ঐটেতে রেখে সেটাকে জলভর্তি করা হয়। তারই উপরে বাঁদিকের দেয়ালে কয়েকটা হুকে ঝুলছে ধুঁধুলের জালের পরিবর্তে ওয়েস্ট কটন, অতি সূক্ষ্ম তারের জালের স্পঞ্জ, খান দুই ঝাড়ন। আর তার নীচে দেয়ালে গাঁথা শেল্‌ফের উপর ভিন্নজাতীয় (ওদের বোধ হয় 'পের্জিল') গুঁড়োর চোঙা, সাবান, আর দু-একটা টুকিটাকি যেগুলো আমি চিনি নে। আমি তো আর জর্মন রান্নাঘরে ছেলেবেলা কাটাই নি। ডান দিকের দেয়ালে গাঁথা, কিংবা ঝোলানো একটা বেশ বড় খোলা শেল্‌ফ। সিন্‌কে হয়তো দুচার কাৎলি গরম জলও ঢেলে দেওয়া হয়েছে—রান্না শেষ হওয়ার পর যেটুকু আগুন বেঁচে থাকে, সেটা যাতে করে খামকা নষ্ট না হয়, তাই তখন তার উপর কাৎলি চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং সেই গরম জলে বাসন-কোশনের চর্বি গলাবার জন্যে সিন্‌কে ঢেলে দেওয়া হয়, আর ইতিমধ্যে কেউ কফি বা চা খেতে চাইলে তো কথাই নেই। সিন্‌কের সামনে দেয়ালমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে উপর থেকে ভিম্, স্পঞ্জ পেড়ে নিয়ে এক একটা করে হাঁড়ি মাজবে, ঝাড়ন দিয়ে সেটা শুকোবে, তারপর ডান দিকের শেল্‌ফে রাখবে। ভাল হয় যদি একজন মাজে আর অন্যজন ঝাড়ন দিয়ে পোঁছে।

সিন্‌কের ডান দিকে পুবের দেয়ালের সঙ্গে গা ঘেঁষে একটি প্রমাণ সাইজের মোক্ষম টেবিল। উপরের তক্তাখানা অন্তত দু ইঞ্চি পুরু হবে। এর উপরেই মাছমাংস-তরকারি কাটাকুটি হয়। তাই তার সর্ব-পৃষ্ঠে ক্রিস্ ক্রস্ ছোট-বড় সব রকম কাটার দাগ। পোয়া ইঞ্চি পরিমাণ জায়গা বেরোবে না যেখানে কোনো দাগ নেই। টেবিলের এক পাশে মাংস কোফ্‌তা করার জন্য একটা কল লাগানো আছে। টেবিলের সামনে একটি টুল—কিন্তু জর্মন মেয়েরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই রান্নার কাজ করতে ভালোবাসে।

সিন্‌কের বাঁদিকে উত্তরের দেয়ালের সঙ্গে গা ঘেঁষে হার্থ, উনুন, যা খুশী

বলতে পারেন। প্রায় টেবিল সাইজের একটা লোহার বাক্স। উপরে চারটে উনুনের মুখ। নিচের দরজা খুলে কয়লা পোরা হয়। ভাঙা টুকরো টুকরো পাথুরে কয়লা ছাড়া এরা ব্যবহার করে ব্রিকেট। কয়লা গুঁড়ো করে ইঁটের (ব্রিক) সাইজে বানানো হয় বলে এগুলোর নাম ব্রিকেট। হাত ময়লা না করে সাঁড়াশি দিয়ে তোলা যায়, আগুনও ধরে খুব তাড়াতাড়ি আর ধুঁয়োও দেয় অত্যল্প। উনুনের পাশে একটা বালতিতে কয়লা, অন্য বালতিতে চিমটেসুদ্ধ একগাদা ব্রিকেট। উনুন থেকে ধুঁয়ো নিকাশের চোঙা বেরিয়ে যেখানে দেয়ালে গিয়ে ঢুকেছে তারই ডান পাশে দেয়ালে গাঁথা আরেকটা শেলফ্, তাতে বড় বড় জার্। কোনোটাতে লেখা 'মেল'—ময়দা, কোনোটাতে 'ৎসুকার'—চিনি, কোনোটাতে 'জাল্ৎস্'—নুন। তামচীনির (স্টোন-ওয়েয়ার) জারগুলো পোড়াবার আগেই কথাগুলো লেখা হয়েছিলো বলে ওগুলো কখনো মুছে যাবে না।[২] তারপর বোতল বোতল তেল, সিরকা ইত্যাদি তরল পদার্থ। সর্বশেষে মার্গারীন, মাখন আরো কি সব।

ঘরের মাঝখানে খাবার টেবিল।

ঘরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে—অর্থাৎ সিনকের তির্যক কোণে—একখানা পুরনো নিচু আর্ম-চেয়ার। দক্ষিণ থেকে ঘরে ঢুকতেই বাঁদিকে পড়ে। এ-চেয়ারে ঠাকুমা বসে বসে ঢোলেন। সামনের ছোট ফুটস্টুল বা পাদপীঠের উপর পা রেখে।

এদের ড্রইংরুম-কম্-ডাইনিংরুম আছে। কিন্তু তার ব্যবহার বড় একটা হয় না। সেটা যেন বড্ড পোশাকী। বসে সুখ পাওয়া যায় না, কথাবার্তা কেমন যেন জমে না। বন্ধ ঘরের কেমন যেন একটা ভ্যাপসা গন্ধ।

আর এ-ঘরে কেমন যেন একটা হৃদ্যতা, খোলাখুলি ভাব। কেউ যেন [illegible]া পর নয়।

॥ ৯ ॥

কুকু-কুকু, কুকু-কুকু, কুকু-কুকু!

এ কি?

এত যে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রান্নাঘরের বর্ণনা দিলুম, ঘড়িটা গিয়েছি বিলকুল ভুলে। লক্ষ্যই করি নি। পর্যবেক্ষণ-শক্তি আমার বিলক্ষণ অক্ষম বলে ছেলেবেলায়ই আমার গুরুমশাই আমাকে 'রাত্র্যন্ধ, দিবান্ধ' ইত্যাদি উত্তম উত্তম

২ 'স্টোন-ওয়েয়ার' শব্দ বাংলা অভিধানে 'পাথরের বাসন' বলা হয়। আসলে ওটা সব চেয়ে নিরেস পর্সেলিন বা 'গ্লেজড্ পটারি' বলা যেতে পারে। তাম্রবর্ণের চীনেমাটি বলে এ সব জারকে পূর্ববাঙলায় তাম্র-চীনি বলে। উত্তর বাঙলায়ই এগুলো ব্যবহার হয় প্রধানত আচার রাখার জন্য।

খেতাবে বিভূষিত করে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, আমাদ্বারা আর যা হোক সাহিত্যিক হওয়া হবে না। আমার দোষের মধ্যে, লাটসায়েবের কুকুরের যে একটা ঠ্যাঙ নেই, সেটা আমি লক্ষ্য করি নি। এবার সেটা পুনরায় সপ্রমাণ হল। অবশ্য আমার একমাত্র সান্ত্বনা, মারিয়ানা আমায় চেয়ে একমাথা খাটো বলে দেয়াল ঘাড়িটা ঠিক আই-লেভেলে ঝোলানো হয় নি।

এসব ঘড়ি সস্তা হলেও এদেশে বড় একটা আসে না। ছোট্ট একটি বাক্সের উপর ডায়েল লাগানো কিন্তু কাঁচের আবরণ নেই। বাক্সের উপর ছোট্ট একটি কুটিরের মডেল—ব্ল্যাক ফরেস্ট (শুয়াৎস্‌ ভাল্ট—কালো বন) অঞ্চলে যে-রকম সচরাচর হয়ে থাকে, এবং কুটিরটি দেখা যাচ্ছে যেন তার পাশ থেকে, কারণ কোনো দরজা সেখানে নেই, আছে একটি হলদে রঙের জানালা—কুটিরটি সবুজ রঙের। প্রতি ঘণ্টায় ফটাস্‌ করে জানলার দুটি পাট খুলে যায় আর ভিতর থেকে লাফ দিয়ে তার চৌকাঠে বসে একটি ছোট্ট পাখী মাথা দোলাতে দোলাতে কু-কু করে জানিয়ে দেয় কটা বেজেছে। তারপর সে ভিতরে ডুব মারে আর সঙ্গে সঙ্গে জানলার দুটি পাট কটাস করে বন্ধ হয়ে যায়।

ব্ল্যাক ফরেস্টের কুটিরশিল্প। এ দেশে রপ্তানি হতে শুনিনি। হলেও বেকার হবে। এতটুকু কাঁচের আবরণ যে ঘড়ির কোথাও নেই সে ঘড়ি এই ধুলো-বালির দেশে দু দিনেই ধুলিশয্যা গ্রহণ করবে।

আমি চমকে উঠে বললুম, সর্বনাশ! তিনটে বেজে গেছে। আমাকে যে এগুতে হবে।'

আমাদের তখন সবেমাত্র সুপ-পর্ব সমাধান হয়েছে। ঠাকুমা সুপ শেষ করে চুপচাপ বসে আছেন।

মারিয়ানা বললে, 'এগুতে হবে মানে? খাবার শেষ করে তো যাবে। আজ যে রোববারের লাঞ্চ—তার উপর রয়েছে রে রাগু।'

'রাগু' কথাটা ফরাসী। অর্থাৎ কোফ্‌তা-কাটা মাংস। আর 'রে' মানে হরিণ।

তার সঙ্গে টুকরো টুকরো করে কাটা থাকে ব্যাঙের ছাতা (এ দেশে মেদিনী-পুর বাঁকুড়ার লোক এর তত্ত্ব কিছু কিছু জানে, কাশ্মীরীরা ভালো করেই জানে এবং টিনে করে রপ্তানি আরম্ভ হয়ে গিয়েছে), প্যাজ আর ট্রাফ্‌ল—অবশ্য যদি এই শেষোক্ত বস্তুটি পাওয়া যায়।[১] রীতিমত রাজভোগ!

১ ট্রাফ্‌ল নামক সবজিটি জন্মায় মাটির কয়েক ইঞ্চি নীচে, প্রধানত ফ্রান্সেই। একমাত্র কুকুর আর শুয়োরই মাটির উপর থেকে গন্ধ পেয়ে এটা খুঁড়ে বের করতে পারে—যদিও ট্রাফ্‌ল কুকুরের খাদ্য নয়। এ জিনিস বের করার জন্য মাংসের টুকরোর লোভ দেখিয়ে দেখিয়ে কুকুরকে ট্রেন করতে হয়। বেচারী কুকুরগুলোকে স্বার্থপর মানুষ অত্যন্ত কম খাইয়ে খাইয়ে রাখে—না হলে তারা ট্রাফ্‌লের সন্ধান করে না। আর কুকুরগুলোকে ট্রাফ্‌ল শিকারী খোঁজবার সময় যে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে সে শোনবার মত—'ও যাদু, ও বাছা, ও আমার

আমি শুধালুম, 'হরিণের মাংস পেলে কোথায় ?'

বললে, 'দাঁড়াও, রাগুটা নিয়ে আসি।'

আমার আর মারিয়ানার সুপ প্লেটের নীচে আগের থেকেই মারিয়ানা প্রধান খাদ্যের প্লেট সাজিযে রেখেছিল। এখন শুধু সুপ প্লেটই উপর থেকে সরাতে হল। শুনেছি রাশাতে চার পদের লাঞ্চ ডিনার হলে এরকম ধারা চার চারখানা প্লেট একটার উপর আরেকটা সাজানো হয়। যেমন যেমন এক এক পদ খাওয়া শেষ হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে সেই প্লেট সরানো হয়—প্রতিবারে নূতন করে পরের পদের জন্যে প্লেট সাজাতে হয় না। এ কথা আমি শুনেছি, কারণ একাধিক রাশানের বাড়িতে আমি খেয়েছি—বলশী এবং জারিস্ট দুই সম্প্রদায়েরই কিন্তু এ-ব্যবস্থা দেখি নি। একখানা প্লেটের উপর সুপ প্লেট রাখলে উচ্চতায় বিশেষ কিছু হের-ফের হয় না, কিন্তু চারখানা প্লেটের উপর সুপ প্লেট রাখলে সে তো নাকের ডগায় পেঁছে যাবে।

আভেন্ খুলে মারিয়ানা রে রাগু নিয়ে এল।

আমি ঠাকুমার দিকে তাকিয়ে মারিয়ানাকে চোখের ইশারা করলুম।

মারিয়ানা বললে, 'ঠাকুমা এক সুপ ভিন্ন অন্য কিছু খায় না। আমিও না। কিন্তু ঐ না জিজ্ঞেস করলে হরিণের মাংস কোথায় পেলুম ? আমাদের গ্রাম থেকে বেরুলে দূরে দক্ষিণে দেখতে পাবে আরেকটা গ্রাম—তার নাম মুফেন্-ডর্ফ। তারপর-পুরো একটা ক্ষেত পেরিয়ে র‍্যুঙস্ ডর্ফ। তার শেষে নাম-করা হোটেল ড্রেজেন—রাইনের পাড়ে। সেখানে কিন্তু ওপারে যাবার খেয়া নেই। তাই কিছুটা দক্ষিণে গিয়ে মেলেম্ খেয়াঘাট। ওপারে ক্যোনিগ্ সভিন্টার। সেটা সীবেন-গেবির্গের (সপ্তকুলাচলের) অংশ। তার আরো অনেক দক্ষিণে গিয়ে লরেলাই। ঐ যে তোমার পকেটে রয়েছে হাইনের কবিতার বই তাতে আছে লরেলাই সম্বন্ধে কবিতা'।[২]

মারিয়ানা ইস্কুল-মাস্টারের মত আমাকে বেশ কিছুটা ভূগোল-জ্ঞান দান করে বললে, 'হ্যাঁ, হরিণের মাংসের কথা হচ্ছিল। ঐ যে মুফেন্ ডর্ফ (ডর্ফ = গ্রাম) সেটা এমনি অজ যে আমরা ওটাকে ডাকি মুফ্রিকা—আফ্রিকার মত সভ্যতা থেকে অনেক দূরে আছে বলে আফ্রিকার 'ফ্রিকা'টি জুড়ে নিয়ে। আর আফ্রিকাবাসীকে যেমন জর্মনে বলা হয় 'আফ্রিকানার' ঠিক তেমনি ওদের আমরা ডাকি 'মুফ্রিকানার'।

আমি হেসে বললুম, 'তোমাদের রসবোধ আছে।'

সোনার খনি! এগো না বাবা, খোঁজ না ধন!'—আরো কত কী! শেষের দিকে বেচারী কুকুরকে মাংসের পরিবর্তে বাসী রুটির ছোট ছোট টুকরো দিয়ে ভোলানো হয়! ট্রাফ্‌লের নাকি এফ্রোডিসিয়াক গুণ আছে। ফ্রান্স ঐ দিয়ে বছরে লক্ষ লক্ষ টাকা কামায়।

২ অধুনা প্রকাশিত 'হাইনের শ্রেষ্ঠ কবিতা' ('দীপায়ন প্রকাশনা'। 'দেশ' ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৮ সংখ্যা, পৃ: ৪১৮ দ্রঃ : পুস্তিকার ৮৬ ও ৮৭ পৃ: পশ্য।

মারিয়ানা বললে, 'ঐ মুক্কিকার কাকা হান্স্ বাবার বন্ধু। আসলে অবশ্য বাবার বন্ধু বলেই ওঁকে ডাকি অঙ্ক্ল্ হান্স। দুজনাতে প্রতি শনিবারে শিকারে যেত। যতদিন বাবা বেঁচেছিল। এখন একা যায়। যেদিন ভালো শিকার জোটে সেদিন মাংসের খানিকটে আমায় দিয়ে যায়। ব্যাঙের ছাতা আমি নিজে বন থেকে কুড়িয়ে নিয়ে আসি আর প্যাঁজ তো ঘরে আছেই।'

আমি বললুম, 'মারিয়ানা, লক্ষ্মী মেয়ে, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

ঠাকুমার সূপ প্লেট সরানোর পর তিনি হাত দুটি একজোড়া করে অতি শান্তভাবে আমাদের কথাবার্তা শুনে যাচ্ছিলেন। মাঝে মাঝে অল্প মৃদু হাস্য করলে গাল দুটি টুকটুকে লাল হয়ে যাচ্ছিল। যেন সর্ব শরীরের রক্ত ছুটে গিয়ে গাল দুটিতে আশ্রয় নিচ্ছিল—হায়, বুড়ীদের গায়ে ক' ফোঁটা রক্তই বা থাকে!

এবার তিনি মুখ খুলে বললেন, 'মারিয়ানা না বললো তুমি পায়ে হেঁটে হাইকিঙে বেরিয়েছো, তবে তোমার তাড়া কিসের? এ গ্রাম যা, সামনের গ্রামও তা। গ্রামে গ্রামে তফাত কোথায়? শহরে শহরে থাকে। কারণ ভগবান বানিয়েছেন গ্রাম, আর মানুষ বানিয়েছে শহর।'

এক লম্ফে চেয়ার ছেড়ে মারিয়ানা ঠাকুমার কাছে গিয়ে দু হাতে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে তার গালে ঝপাঝপ গণ্ডা তিনেক চুমো খেলে। আর সঙ্গে সঙ্গে 'ওঃ! তুমি কি লক্ষ্মীটি ঠাকুমা! তোমার মত মেয়ে হয় না ঠাকুমা! আমার কথা শুনতে যাবে কেন ঐ ভবঘুরেটা। দেখা হয়েছে অবধি শুধু পালাই পালাই করছে।'

ঠাকুমা ব্যতিব্যস্ত না হয়ে বললেন, 'হয়েছে, হয়েছে। তুই খাওয়া শেষ কর।'

রে রাগুর সঙ্গে নোনা জলে সেদ্ধ করা আলু আর জাওয়ার ক্রাউট।

ঠাকুমা ব্যতিব্যস্ত না হয়ে বললেন, 'ক্রাউট খেতে ভালোবাসো? আমি তো শুনেছি, বিদেশীরা ও জিনিসটা বড় একটা পছন্দ করে না।'

আমি বললুম, 'জিনিসটা যে বাঁধাকপির টক আচার। সত্যি বলতে কি, প্রথম দিন আমার ভালো লাগে নি। এখন সপ্তাহে নিদেন তিন দিন আমার চাই-ই চাই। জানেন, ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী পিয়েল লাভাল যখন একবার বার্লিনে আসেন তখন তাঁর দেশবাসী কে যেন তাঁকে বলেছিল জর্মনদের মত জাওয়ার ক্রাউট কেউ বানাতে পারে না। সে কথা তাঁর মনে পড়ল যেদিন ভোরে তিনি চলে যাবেন তার আগের রাত্রে আড়াইটার সময়। রেস্তোরাঁ তখন বন্ধ; হলে কি হয় ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী, তিনি খাবেন ফ্রান্সের জাওয়ার ক্রাউট—যোগাড় করতেই হল।

সেই রাত সাড়ে চৌদ্দটার সময় ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী সোল্লাসে খেলেন জাও-য়ার ক্রাউট!'

আমি যে এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা পছন্দ করি না তার প্রধান কারণ ঐ খাদ্যটি সম্বন্ধে তিনি অচেতন।

* * *

জাওয়ার ক্রাউট নিয়ে বড্ড বেশী বাগাড়ম্বর করার বাসনা নেই। আমাদের কাসুন্দোর মত ওতে বড্ড বায়নাক্কার খটিনাটি। তার কারণ সমস্যা দু'জনারই এক। তেল, নুন, সিরকা, চিনি এসব কোনো সংরক্ষণকারী বস্তু অর্থাৎ প্রিজার-ভেটিভ ব্যবহার না করে কিংবা যতদূর সম্ভব অল্প ব্যবহার করে কি প্রকারে খাদ্যবস্তু বহুকাল ধরে আহারোপযোগী করে রাখা যায়, কাসুন্দো ও জাওয়ার ক্রাউটের এই নিয়ে একই শিরঃপীড়া। সেই কারণেই বোধ হয় কাসুন্দো বানাবার 'আস্য' পূব বাঙলার বেশী পরিবারে নেই। মুসলমানরা আদপেই কাসুন্দো বানাতে পারে না বলে কাসুন্দো বানাবার সময় অক্ষয় তৃতীয়ায় হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি বড্ড বেড়ে যায়। বানাবার 'আস্য' না থাকলেও সহাস্য বদনে খাবার 'আস্য' সকলেরই আছে।

পশ্চিমের উপর খুদাতালার মেহেরবানিও অত্যধিক। ওদের তরি-তরকারি ফলমূল বেবাক তৈরী হয়ে ওঠে গ্রীষ্মের শেষে। তার পরেই শীত এসে খাদ্য-বস্তু সংরক্ষণে সাহায্য করে। আমাদের উত্তম উত্তম তরি-তরকারি তৈরী হয় শীতের শেষে—তার পরই আসে গ্রীষ্মকাল—সংরক্ষণকর্মে প্রকৃতির কোনোই সহায়তা পাই নে। ফল পাকে গ্রীষ্মকালে—তার পরই এসে যায় ভ্যাপসা বর্ষা—মসনে-ছাতি পড়ে সব-কুছ বরবাদ। পচা বর্ষার শেষের দিকে দুই নয়া পয়সার রোদ্দুর ওঠা মাত্রই গিন্নীমা'রা আচারের বোয়াম নিয়ে টাট্টু ঘোড়ার বেগে বেরোন ঘর থেকে। ফের পইপ্ট জিরো ইলশে গুঁড়ি নাবামাত্র তাঁরা 'ঐযা, গেল গেল, ধর ধর' বলে বেরোন রকেট-পারা। আর বাইবেলী ভাষায় 'ধন্য যাহারা সরল হৃদয়'—অর্থাৎ ভোলা-মন, তাদের তো সর্বনাশ।

জানি, তেলে টইটম্বুর করে রাখলে মসনে পড়ে না, কিন্তু বড্ড বেশী তেল চিটচিটে আচার খেয়ে সুখ নেই। তদুপরি ভেজাল তেলের ঠেলায় এ গ্রীষ্মে মোক্ষম মার খেয়ে আমি আচারের মাথায় ঘোল ঢেলে দিয়ে বিদায় দিয়েছি। এখন রইলেন শুধু জারক নেবু, আর বাজারের ওঁচা আচার!

আমি বললুম, 'মারিয়ানা, ঠাকুমার সেই "লাঙে হের, লাঙে হের"—পুরনো দিনের গল্প বলো না?'

অপরাহ্নের ট্যারচা সোনালী রোদ এসে পড়েছে ঠাকুরমার নীল সাদা সেটের উপর আর মারিয়ানার ব্লন্ড চুলের উপর। চেরী ব্রাণ্ডির বেগনী রঙের সঙ্গে সে আলো মিশে গিয়ে ধরেছে এক অদ্ভুত নূতন রঙ। ডাবরের সুপের ফোঁটা ফোঁটা চর্বির উপর আলো যেন স্থান না পেয়ে ঠিকরে পড়ছে। সে রোদে ঠাকুমার বরফের মত সাদা চুল যেন সোনালী হয়ে উঠলো। তার পিঠের কালো জামার উপর সে আলো যেন আদর করে হাত বুলোচ্ছে। জানলার পরদা যেমন যেমন হাওয়ায় দুলছে সঙ্গে সঙ্গে আলোর নাচ আরম্ভ হয় ঝকঝকে বাসন-কোশনের উপর, গেলাসের তরল দ্রব্যের উপর আর ঠাকুমা-নাতনীর চুলের উপর।

অনেককাল পর গ্রামাঞ্চলে এসেছি বলে খেতে খেতে শুনছি, রকম-বেরকম

পাখির মধুর কূজন। এদের সময় ঘনিয়ে এসেছে। এরা আর বেশীদিন এখানে থাকবে না। শীত এলে দক্ষিণের দিকে পাড়ি দেবে। তখন গ্রাম শহরের তফাৎ ঘুচে যাবে।

আসবার সময় এক সারি পপলার গাছের নিচু দিয়ে ছায়ায় ছায়ায় বাড়ি পৌঁছেছিলুম। রবিবারের অপরাহ্ন বলে এখনো সমস্ত গ্রাম সুষুপ্ত—শুধু ঐ চিনারের মগডালের ভিতর দিয়ে বাতাস চলার সামান্য গুঞ্জরণ ধ্বনি কানে আসছে, কিংবা কি এদেরই ডোবার পাড়ে যে নুয়ে পড়া উইপিং উইলো দেখেছি তারই ভিতর দিয়ে বাতাস ঘুরে ফিরে বেরোবার পথ পাচ্ছে না? এ গাছের জলের উপর লুটিয়ে-পড়া, মাথার সমস্ত চুল এলোমেলো করে দিয়ে সদ্য-বিধবার মত গুমরে গুমরে যেন কান্নার ক্ষীণ রব ছাড়া—এগুলো আমার মনকে বড় বেদনায় ভরে দেয়। দেশের শিউলি ফুলের কথা মনে পড়ে। তার নামও কেউ কেউ ইংরিজীতে দিয়েছে 'সরো ফ্লাওয়ার' বিষাদ-কুসুম।

ঠাকুমা ঢুলতে ঢুলতে হঠাৎ জেগে উঠলেন। জানি নে, বোধ হয় 'লাঙে হেরে'র ফাঁড়া কাটাবার জন্য মারিয়ানাকে শুধোলেন, 'কাল হের হান্সের সঙ্গে কি কথাবার্তা হল?'

মারিয়ানা আমার দিকে তাকিয়ে দুষ্টু হাসি হেসে বললে, 'দেখলে? তা সে যাক্। কিন্তু জানো, হান্স্ কাকা বড় মজার লোক। যত সব অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প বলে—কোন্‌টা যে সত্যি, কোন্‌টা যে তার বানানো কিচ্ছুটি বোঝার উপায় নেই। কাল বলছিল, একবার হান্স্ কাকা আর বাবা নাকি লড়াইয়ের ছুটি পেয়ে দুজনা শিকারে গেছে—তখন লড়াইয়ের সময় বলে বন্দুকের লাইসেন্স নিয়ে বড্ড কড়াকড়ি। হঠাৎ একটা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়েছে পুলিস, দেখতে চেয়েছে লাইসেন্স। পুলিসকে যেই না দেখা অমনি হান্স্ কাকা বাবাকে ফেলে দিয়ে চোঁ-চাঁ ছুট। পুলিসও ধরবে বলে ছুটেছে পিছনে। ওদিকে হান্স্ কাকা মোটা-সোটা গাব্দা-গোব্দা মানুষ। আধ মাইল যেতে না যেতেই পুলিস তাকে ধরে ফেলেছে। কাকা বললে, পুলিস নাকি হুঙ্কার দিয়ে লাইসেন্স চাইলে। কাকাও নাকি ভাল মানুষের মত গোবেচারী মুখ করে পকেট থেকে লাইসেন্স বের করে দেখালে।'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'লাইসেন্স যদি ছিল তবে ওরকম পাগলের মত ছুটলো কেন?'

মারিয়ানা বললে, 'আহ্, শোনোই না। তোমার কিছুতেই সবুর সয় না। পুলিসও তোমারই মত বেকুব বনে ঐ প্রশ্নই শুধালে। তখন হান্স্ কাকা নাকি হাসতে হাসতে গড়াগড়ি দিয়ে বললে, আমার লাইসেন্স আছে, কিন্তু আমার বন্ধুর নেই। সে এতক্ষণে হাওয়া হয়ে গিয়েছে।' পুলিস নাকি প্রায় তাকে মারতে তাড়া করেছিল।'

আমি হাসতে হাসতে বললুম, 'খাসা গল্প। পুলিসের তখনকার মুখের ভাবটা দেখবার আমার বড় ইচ্ছে হচ্ছে। জানো, আমাকেও একবার পুলিস তাড়া করেছিল। ওরে বাপ রে বাপ! সে কী ছুট, কী ছুট, কিন্তু ধরতে পারে নি।'

মারিয়ানার কচি মুখ ভয়ে শুকিয়ে গিয়েছে। হোঁচট খেতে খেতে শুধোলে, 'কেন, কি হয়েছিলো?'

আমি বললুম, 'কি আর হবে, যা আকছারই হয়ে থাকে। পুলিসে স্টুডেন্টে পাল্লা।'

মারিয়ানা নির্বাক ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি শুধোলুম, 'কি হল? আমার মাথার পিছনে ভূত এসে দাঁড়িয়েছে নাকি?'

তোৎলাতে তোৎলাতে শুধোলে, 'তুমি য়ুনিভার্সিটির স্টুডেন্ট!'

আমার তখনো জানা ছিল না, এ দেশের গ্রামাঞ্চলের লোক বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় একটা যায় না। কাজেই এখানে তাদের বড় সম্মান, রীতিমত সমীহ করে চলা হয়। তাই আমি আমার সফরের শেষের দিকে কথাটা বেবাক চেপে যেতুম। আমি ট্র্যাম্প, ট্র্যাম্পই সই। কী হবে ভদ্রলোক সেজে!

মারিয়ানা বললে, 'তাই বলো। আমিও ভাবছি, ট্র্যাম্পই যদি হবে তবে নখের ভিতর দু'ইঞ্চি ময়লা নেই কেন? ট্র্যাম্পই যদি হবে তবে গোগ্রাসে গিলছে না কেন? খেতে খেতে অন্তত বার তিনেক ছুরিটা মুখে পুরলো না কেন?'

আমি অপরাধ স্বীকার করে নিয়ে বললুম, 'ভুলগুলো মেরামত করে নেব।'

'ধ্যাৎ! ওগুলো নোংরামি। শিখতে হয় নাকি?'

আমি বললুম, কোথায় স্টুডেন্ট বলে পরিচয় দিলে লাভ, আর কোথায় ট্র্যাম্প সাজলে লাভ এখনো ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারি নি। যখন যেটা কাজে লাগে সেইটে করতে হবে তো। এই তো যেমন তুমি। মনে হচ্ছে ট্র্যাম্পের কদরই তোমার কাছে বেশী।'

এইটুকু মেয়ে। কি বা জানে, কীই বা বোঝে। তবু তার মুখে বেদনার ছায়া পড়লো। বড় বড় দুই চোখ মেলে নিঃসঙ্কোচে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তোমাকে আমার ভালো লাগে, তা তুমি ট্র্যাম্পই হও, আর স্টুডেন্টই হও।'

পঞ্চদশীর স্মরণে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'অকারণ বেদনার ছায়া ঘনায় মনের দিগন্তে, ছলো ছল জল এনে দেয় নয়নপাতে।' এ মেয়ে একদিন বড় হবে। ভালোবাসতে শিখবে। সেইদিনের আগমনী আজকের দিনের এই 'ক্বচিৎ জাগরিত বিহঙ্গ-কাকলীতে।'

॥ ১০ ॥

এবারে কিন্তু মারিয়ানা সেয়ানা। আহারান্তে উপাসনা আরম্ভ করলে, 'তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাই, হে প্রভু সর্বশক্তিমান' দিয়ে এবং শেষ করলো পরলোকগত খৃস্টাত্মাদের স্মরণে।

এসব প্রার্থনার সুন্দর অনুবাদ করা প্রায় অসম্ভব। সর্ব ভাষার সর্ব

প্রার্থনার বেলাই তাই। প্রণব কিংবা 'রুদ্র যত্তে দক্ষিণম্ মুখম তেন মাং পাহি নিত্যম্'-এর বাঙলা অনুবাদ হয় না। আমি বহু বৎসর ধরে মুসলমানের প্রধান উপাসনা, 'ফাতিহা' অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি। আজ পর্যন্ত কোনো অনুবাদই মনকে প্রসন্ন করতে পারে নি। 'আভে মারিয়া' মন্ত্রটি অতি ক্ষুদ্র। ট্রামে-বাসে ঘরে-বাইরে বার বার মনে মনে এটির অনুবাদ করেছি—আঠারো বছর ধরে, এবং এখনো করছি—কোনোটাই মনঃপূত হয় না। দেশের ট্রেনে আমার পরিচিত এক ক্যাথলিক পাদ্রী সাহেবের সঙ্গে আমার অনেকক্ষণ ধরে ঐ 'আভে মারিয়া'র দুটি শব্দ নিয়ে আলোচনা হয়। ঐ মন্ত্রে মা-মেরির বিশেষণে লাতিনে আছে, 'গ্রাৎসিয়া প্লেনা', ইংরিজীতে 'ফুল অব গ্রেস', জর্মনে 'ফল্ ডের গ্নাডে'। আমি বাংলা করেছিলুম 'করুণাময়ী'। পাদ্রী সাহেবের সেটা জানা ছিল। শব্দটা আমার মনঃপূত হয় নি, কিন্তু দুজনাতে বহু চেষ্টা করেও পছন্দসই শব্দ বের করতে পারলুম না।

কাজেই মারিয়ানার প্রার্থনাগুলোর বাংলা অনুবাদ উপস্থিত মুলতুবী থাক।

মারিয়ানা বাসনকোশন হাঁড়িবর্তন সিন্কে ফেলেছে।

আমি উঠে গিয়ে সিন্কের সামনে দাঁড়িয়ে বললুম, 'আমি মাজি ঃ তুমি পোঁছো।'

জুতো দিয়ে কাঠের মেঝেতে ঠোক্কর মেরে মারিয়ানা বললে, 'একদম অসম্ভব! তার চেয়ে তুমি ঐ টুলটার উপর বসে আমাকে ইন্ডিয়ার গল্প বলো।'

এস্থলে আমার পাঠকদের বলে রাখা ভালো যে এ-কাহিনীতে অনেক কিছু কাট-ছাট বাদ-সাদ দিয়েই আমি লিখছি। কারণ ভারতবর্ষ কত বড় দেশ, পাহাড় নদী আছে কি না, লোকে কি খায়, মেয়েদের বিয়ে ক'বছর বয়সে হয়, এসব জানবার কৌতুহল বাঙালী পাঠকের হাওয়ার কথা নয়, আর হলেও জর্মনির গ্রামাঞ্চলে হাইকিঙের বর্ণনায় সেগুলো নিশ্চয়ই অবান্তর ঠেকবে। অথচ জর্মনরা ঐ সব প্রশ্নই বার বার জিজ্ঞেস করে বলে কথাবার্তার বারো আনা পরিমাণই ভারতবর্ষ নিয়ে। তাই পাঠক ভাববেন না, জর্মন জনপদবাসী আমার সামনে আপন দেশ নিয়েই বড়ফাট্টাই করেছে, আর-কিছু শুনতে চায় নি।

আমি বললুম, 'দেখো মারিয়ানা, তুমি যে বললে, আমাকে তোমার ভালো লাগে, সেটা নিছক মুখের কথা। আমাকে খাইয়েছো ব'লে আমাকে দিয়ে বাসন মাজিয়ে নিতে চাও না—কারণ তা হলে খাওয়ানোটা মজুরি হয়ে দাঁড়ায়। এসব হিসেব লোকে করে, যে-জন আপন নয়, তার সঙ্গে। আপনজনকে মানুষ সব কর্ম অকর্মের অংশীদার করে। এইটুকু বলে, রাস্তার নাসপাতিওলা যে আমাকে শেষ পর্যন্ত তার গাড়ি ঠেলতে দিয়েছিল সে-কথাও বললুম।

এ-কথাটা বলা হয়তো আমার উচিত হয় নি। টম্-বয় হোক, আর হুন্টরওয়ালীই হোক, মেয়েছেলে তো মেয়েছেলে। দেখি, মারিয়ানার চোখ টলটল করছে। আমাদের দেশে মানুষের নীল চোখ হয় না, আকাশের হয়। তাই রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন ঃ 'জল ভরেছে ঐ গগনের নীল-নয়নের কোণে—।' দেশে যে জিনিস আকাশে দেখেছি, এখানে সেটা মানুষের চোখে

দেখলুম। অবশ্য এদেশের আকাশ কিন্তু আমাদের আকশের মত ঘন নীল, ফিরোজা নীল হয় না।

আমি তাড়াতাড়ি এই সজল সংকট কাটাবার জন্যে ঝাড়ন নিয়ে মারিয়ানার পাশে দাঁড়ালুম। সে কিছু না বলে একখানা প্লেট আমার দিকে এগিয়ে দিলে।

আমি সংকটের সম্পূর্ণ অবসান করার জন্য মাজার গুঁড়ো একটা হাঁড়ির উপর ছড়াতে ছড়াতে শুধালুম, 'ঠাকুমা দুপুরবেলা ঘুমোয় না?'

'ঐ চেয়ারেই। দিন-রাতের আঠেরো ঘণ্টা ওরই উপরে কাটায়, রাত্রেও অনেক বলে-কয়ে তাকে শোবার ঘরে নিয়ে যাই। মাঝে মাঝে কার্ল অবশ্য ওকে বেড়াতে নিয়ে যায়।'

আমি শুধালুম, 'কার্ল? কুকুরটা? তুমি নিয়ে যাও না?'

'ঠাকুমা কার্লের সঙ্গে যেতেই পছন্দ করে। লীশে ঢিল পড়লেই ঠাকুমা থেমে যায়, টান পড়তেই আস্তে আস্তে এগোয়। ঠাকুমা বলে, ওতেই নাকি তার সুবিধা বেশী। জানো, লোকে আমার কথা বিশ্বাস করে না, যখন বলি কার্ল ঠিক বুঝতে পারে কখন বৃষ্টি নামবে। তার সম্ভাবনা দেখতে পেলেই সে ঠাকুমাকে বাড়ি ফেরত নিয়ে আসে।'

হঠাৎ কার্লের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, 'ঠাকুমাকে বেড়াতে নিয়ে যাবি নে?'

সঙ্গে সঙ্গে কার্ল পাশের ঘরে গিয়ে তার কলার লীশ মুখে করে নিয়ে এসে ঠাকুমার কোলে রাখল। তিনি চমকে উঠে বললেন—হয়তো বা ইতিমধ্যে তাঁর তন্দ্রা এসে গিয়েছিল—'আমি এখন বেড়াতে যাবো কি করে?'

মারিয়ানা হেসে বললে, 'না ঠাকুমা, আমি শুধু ওকে দেখাচ্ছিলুম কার্ল কি রকম চালাক।' তারপর কার্লকে বললে, 'যাও কার্ল! আজ ঠাকুমা বেরোবে না। স্পষ্ট বোঝা গেল, কার্ল অতিশয় ক্ষুণ্ণ মনে লীশ কলার মুখে তুলে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। এবং খুব সম্ভব, অভিমান করে ফিরে এল না।

আমি শুধালুম, 'ঠাকুমা কারো বাড়িতে যায়?'

মারিয়ানা বললে, 'রোববার দিন গির্জেয়। অন্যদিন হলে পাদ্রী সায়েবের বাড়ি। আর মাঝে মাঝে আমাকে নিয়ে গোরস্তান যায়। আমার কিন্তু খুব ভালো লাগে না। বাবা তো সেখানেই নেই, শুধু মা আছে। তাকেও চিনি নে।'

ওর বলার ধরণটা এমনই সরল আর স্বাভাবিক যে আমার চোখে জল এসে গেছে। পাছে সে সেটা দেখে ফেলে তাই শেলফ্‌টার কাছে গিয়ে শুকনো বাসনগুলো এক পাশে সরাতে লাগলুম। তাতেও দেখলুম, কোন কাজ হয় না। তখন বুঝলুম, এ বোঝা নামিয়ে ফেলাই ভালো।

ফের মারিয়ানার কাছে এসে বললুম, 'আমাদের দেশের কবির একটি কবিতা শুনবে?'

উৎসাহের সঙ্গে বললে, 'নিশ্চয়ই!'

আমি বললুম, 'অনুবাদে কিন্তু অনেকখানি রস মারা যায়। তবু শোনোঃ

"মনে পড়া মাকে আমার পড়ে না মনে।
শুধু কখন খেলতে গিয়ে
হঠাৎ অকারণে
একটা কী সুর গুনগুনিয়ে
কানে আমার বাজে,
মায়ের কথা মিলায় যেন
আমার খেলার মাঝে।
মা বুঝি গান গাইত, আমার
দোলনা ঠেলে ঠেলে ;
মা গিয়েছে, যেতে যেতে
গানটি গেছে ফেলে।
মাকে আমার পড়ে না মনে।
শুধু যখন বসি গিয়ে
শোবার ঘরের কোণে,
জানলা থেকে তাকাই দূরে
নীল আকাশের দিকে
মনে হয়, মা আমার পানে
চাইছে অনিমিখে।
কোলের 'পরে ধরে কবে
দেখতো আমায় চেয়ে,
সেই চাউনি রেখে গেছে
সারা আকাশ ছেয়ে !!"

এ কবিতার অনুবাদ যত কাঁচা জর্মনে যে কেউ করুক না কেন, মা-হারা কাঁচ হৃদয়কে নাড়া দেবেই দেবে। হয়তো এ কবিতাটি মারিয়ানাকে শোনানো আমার উচিত হয় নি, কিন্তু ইয়োরোপীয় সাহিত্যে মাকে নিয়ে কবিতা এত কম, এবং আমার দেশের কবির এত সুন্দর একটি কবিতা—এ প্রলোভন আমি সংবরণ করতে পারি নি বললে ভুল বলা হবে—আমি কেমন যেন আপন অজানাতেই কবিতাটি আবৃত্তি করে ফেলেছি।

রবীন্দ্রনাথ 'পলাতকা' লেখার পর প্রায় চার বছর কোনো কবিতাই লেখেননি কিংবা অতি অল্পই লিখেছিলেন। তারপর কয়েকদিনের ভিতর অনেকগুলি কবিতা লিখে আমাদের ডেকে পাঠিয়ে সেগুলি পড়ে শোনালেন। 'মাকে আমার পড়ে না মনে' তারই একটি। এ কবিতাটি শুনে আমরা সবাই যেন অবশ হয়ে গিয়েছিলুম। শেষটায় কে একজন যেন গুরুদেবকে শুধালে, ঠিক এই ধরনের কবিতা তিনি আরো রচনা করেন না কেন ? তিনি বললেন, মা-হারা শিশু তাঁর কাছে এমনই ট্র্যাজেডি বলে মনে হয় যে, ঐ নিয়ে কবিতা লিখতে তাঁর মন যায় না।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ যদি সেদিন মারিয়ানার মুখচ্ছবি দেখতেন তবে তিনি এ-কবিতাটি তাঁর কাব্য থেকে সরিয়ে ফেলতেন, এবং আমাদের উপর হুকুম করতেন, আমরা যেন কখনো আর এটি আবৃত্তি না করি।

ভেজা চোখেই মারিয়ানা শুধালো, 'তোমার নিশ্চয়ই মা আছে, আর তুমি তাকে খুব ভালবাসো?'

আমি আশ্চর্য হয়ে শুধালুম, 'তুমি কি করে জানলে?'

বললে, 'এ কবিতাটি তারই হৃদয় খুব স্পর্শ করবে যার মা নেই, আর যে মাকে খুব ভালোবাসে। আর আমার মনে হচ্ছিল, তোমার মা না থাকলে তুমি এ কবিতাটি আমাকে শোনাতে না।'

আমি বিস্ময়ে হতবাক। এইটুকু মেয়ে কি করে এতখানি বুঝলো! এতখানি হৃদয় দিয়ে বুঝতে পারলো! তখন আবার নূতন করে আমি সচেতন হলুম, ছোটদের আমরা যতখানি ছোট মনে করি ওরা অতখানি ছোট নয়। বিশেষ করে অনুভূতির ক্ষেত্রে। এবং সেখানেও যদি বাচ্চাটি মা-হারা হয় তবে তার বেদনা-কাতরতা এতই বৃদ্ধি পায় যে তার সঙ্গে কইতে হয় বেশ ভেবে-চিন্তে।

এবারে শুধালো শেষ মোক্ষম প্রশ্ন: 'তুমি যে এতদূর বিদেশে চলে এসেছো তাই নিয়ে তোমার মা কিছু বললে না? এই যে ঠাকুমা সমস্ত দিনরাত ঐ দোরের পাশের চেয়ারটায় বসে থাকতে চায় কেন জানো? বাবা ঠিক সেটারই পাশের দরজা দিয়ে সব সময় বাড়ি ঢুকত—সদর দরজা দিয়ে নয়—অবশ্য আমার শোনা কথা। বাবা যেন সর্বপ্রথম ঠাকুমাকে দেখতে পায়, ঠাকুমাই যেন বাবাকে দেখতে পায়। লড়াইয়ের সময়েই সেটা আরম্ভ হল। বাবা যে কখন ছুটি পাবে, কখন বাড়ি পেঁছিবে তার ঠিক-ঠিকানা ছিল না বলে ঠাকুমা দিবা-রাত্তির ঐ চেয়ারটার উপর কাটাতো। এখনো সে অভ্যাস ছাড়তে পারে না।'

আমি মিনতি করে বললুম, 'আর থাক, মারিয়ানা।'

কান্না-হাসি হেসে বললে, 'আচ্ছা, তবে এ দিকটা থাক। এখন আমার কথার উত্তর দাও। তোমার মা কি বলে?'

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললুম, 'মাকে ফেলে দূরে চলে আসাটাই আমার জীবনের সব চেয়ে বড় পাপ। কিন্তু কি করবো বলো। ইংরেজের সঙ্গে ঝগড়া করেছি, তার ইস্কুল-কলেজে পড়বো না—অবশ্য গাঁধীর আদেশে। বিদেশে না গিয়ে উপায় কি? কিন্তু মা কি সেটা বোঝে?'

এবার মারিয়ানা হেসে উঠলো। বললে, 'তুমি ভারী বোকা। মা-রা সব বোঝে, সব মাপ করে দেয়।'

এর কথাই ঠিক। এ তো একদিন মা হবে।

আবার বললে, 'তোমার কিচ্ছুটি ভাববার নেই। দাঁড়াও, তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই হল শেষ প্লেট। এটা পুঁছে নিয়ে বেশ করে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নাও। এই যে বোতলে তরল সাবান আছে তাতে নেবুর খুশবাই মাখানো আছে। তোমাকে একটা কবিতা পড়ে শোনাবো—তুমি তোমারটা

শোনালে না ?'

আমি হাত ধুয়ে ঠাকুমার মুখোমুখি দেয়ালের চেয়ারে এসে বসলুম।

রবারের এপ্রন্ খুলতে খুলতে মারিয়ানা বললে, 'কই, দাও তোমার বইখানা! ঐ যাতে হাইনের কবিতা আছে। আশ্চর্য এই যোগাযোগ! মাত্র কয়েক দিন আগে আমরা ক্লাসে কবিতাটি পড়েছি।'

এক ঝটকায় কবিতাটি বের করে বেশ সুন্দর গলায়, সুস্পষ্ট উচ্চারণে পড়তে আরম্ভ করলো,

"আন্ মাইনে মুটার" —মাতার উদ্দেশে

'ইষ বিন্‌স্ গেভোন্ট্—'

সমস্ত কবিতাটি পড়ে শেষের কয়েকটি লাইন আবৃত্তি করলে একাধিক বার ঃ—

'আজ ফিরিয়াছে মন ভবনে আপন,
যেথা মা গো, তুমি মোরে ডাকিছ সদাই।
আজ দেখিলাম যাহা দৃষ্টিতে তোমার,
সেই তো মমতা, চির আরাধ্য আমার।'[১]

আমি অস্বীকার করবো না, কবিতাটি আমার মনে অপূর্ব শান্তি এনে দিল। অন্য পরিবেশে হয়তো কবিতাটি আমার হৃদয়ের এতটা গভীরে প্রবেশ করতো না। বিশেষ করে ছাপাতে পড়া এক জিনিস আর একটি বারো-তেরো বছরের মেয়ে—অবশ্য তার কবিতা পাঠ, তার রসবোধ দেখে তার হৃদয়-মনের বয়েস ষোল সতেরো বলতে কোনো আপত্তি নেই—তার 'মায়ের উদ্দেশে' কবিতা সুন্দর উচ্চারণে, দরদ দিয়ে পড়ে শোনাচ্ছে, সে একেবারে ভিন্ন জিনিস।

ঠাকুমার গলা শোনা গেল। ক্ষীণ কণ্ঠে আমার উদ্দেশে বলছেন, 'তুমি কোনো চিন্তা করো না। তুমি তো কোনো অন্যায় করো নি। আর অন্যায় করলেও মা সব সময়ই মাপ করে দেয়। ছেলের অন্যায় করার শক্তি যতখানি, মায়ের মাপ করার শক্তি তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী। আর তুমি তোমার মাকে ভালোবাসো সেইটেই সব চেয়ে বড় কথা। কাছে থেকে না-ভালোবাসার চেয়ে কি দূরে থেকে ভালোবাসা বেশী কাম্য নয়? এই যে মারিয়ানার বাপ আমার আগে চলে গেল! আমার একটি মাত্র ছেলে। কিন্তু আমি জানি, সে মা-মেরির চরণতলে আশ্রয় পেয়েও এই মায়ের জন্য প্রতীক্ষা করছে। আমিও অনেক আগেই চলে যেতুম, কিন্তু এই তো রয়েছে আমার মারিয়ানা। আমি কি তার ঠাকুমা? আমি তার মা। এ প্রথম মা হোক, তারপর আমি হেসে হেসে চলে যাবো। তুমি কোনো চিন্তা করো না। আপন কর্তব্য করে যাও।'

---

১ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ। পূর্বোল্লিখিত 'হাইনের শ্রেষ্ঠ কবিতা', পৃ ১৬ দ্রষ্টব্য।

জর্মন ভাষায় নবীন সাধকদের এস্থলে একটু সাবধান করে দিই। ১৭ পৃষ্ঠায় মূল জর্মনে পঞ্চম ছত্র হবে চতুর্থ ছত্র, আর চতুর্থ ছত্র হবে পঞ্চম ছত্র।

ঠাকুমা কথাগুলি বললেন অতিশয় ক্ষীণ কণ্ঠে কিন্তু তাঁর বাক্যে বিশ্বাসের কী কঠিন দার্ঢ্য।

আমি উঠে গিয়ে ঠাকুমার হাত দুটিতে চুমো খেলুম। ফিরে এসে মারিয়ানার মস্তকাঘ্রাণ করলুম।

॥ ১১ ॥

বিদায় নেওয়াটা খুব সহজ হয় নি। অল্পক্ষণের পরিচয়ের বন্ধু আর বহুকালের পরিচিত বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নেবার ভিতর পার্থক্য আছে সত্য, কিন্তু অনেক সময় অল্প পরিচয়ের লোকও সেই স্বল্প সময়ের মধ্যেই এতখানি মোহাচ্ছন্ন করে দেয় যে, তার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় মনে ক্ষোভ থেকে যায় যে, এর সঙ্গে দীর্ঘতর পরিচয় হলে কত না নূতন নূতন বাঁকে বাঁকে নূতন নূতন ভুবন দেখতে পেতুম।

দু বছরের বাচ্চা মারা গেলে মার যে শোক হয় সে কি পঞ্চাশ বছরের ছেলে মরে যাওয়ার চেয়ে কম? আমার একটি ভাই দুই বছর বয়সে চলে যায়, কিন্তু থাক সে কথা—

* * *

এ-দেশে গ্রীষ্মের দিন যে কত দীর্ঘ হতে পারে সে সম্বন্ধে আমাদের মনে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থাকলেও তার অভিজ্ঞতা না হওয়া পর্যন্ত সে-সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হয় না। তুলনা দিয়ে বলতে পারি, পূর্ণচন্দ্র অমাবস্যায় কি পার্থক্য সেটা গ্রামের লোক যতখানি জানে চৌরঙ্গীর লোক কি ততখানি বোঝে? আমিও এ-দেশের শহুরে; গ্রামে এসে এই প্রথম 'নিদাঘের দীর্ঘদিন' কি সেটা প্রত্যক্ষ হৃদয়ঙ্গম হল।

সূর্য তখনো অস্ত যায় নি। হঠাৎ বেখেয়ালে ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখি রাত আটটা! কিন্তু 'রাত আটটা' কি ঠিক বলা হল? আটটার সময় যদি দিবালোক থাকে তবে তো সেটা এ-দেশে সকালের আটটা, দিনের আটটা। তা সে যাক্। সেক্সপীয়র ঠিকই বলেছেন, 'নামেতে কি করে? সূর্যেরে যে নামে ডাকো আলোক বিতরে!'

মধুময় সে আলো। অনেকটা আমাদের কনে দেখার আলোর মত। কোনো কোনো গাছে, ক্ষেতে ইতিমধ্যেই পাক ধরেছে। তাদের পাতা দেখে মনে হয়, সমস্ত দিনের সোনালী রোদ খেয়ে খেয়ে সোনালী হয়ে গিয়ে এখন তারাও যেন সোনালী আলো বিকিরণ করছে। কীট্স না কার যেন কবিতায় পড়েছিলুম, পাকা আঙুরগুলো সূর্যরশ্মির স্বর্ণসুধা পান করে করে টইটম্বুর হয়েই যাচ্ছে, হয়েই যাচ্ছে, আর তাদের মনে হচ্ছে এই নিদাঘ রৌদ্রের যেন আর অবসান নেই। আমিও এগোচ্ছি আর ভাবছি, এ-দিনের বুঝি আর শেষ নেই। এতক্ষণে বুঝতে পারলুম মারিয়ানা যখন আমাকে তাদের বাড়িতে রাতটা কাটাবার জন্য অনু-

রোধ করছিল তখন নানা আপত্তি দেখানো সত্ত্বেও এটা কেন বলে নি, রাতের অন্ধকারে আমি যাবো কি করে ? আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলেও যেমন অতিথিকে ঠেকাবার জন্য শরৎ-পূর্ণিমা-সন্ধ্যায় এ অজুহাত তোলা চলে না, রাতের অন্ধকারে পথ দেখবেন কি করে ?

গ্রামের শেষ বাড়িটার চেহারা দেখে আমার কেমন যেন মনে হল এ-বাড়িটার বর্ণনা কে যেন আমায় দিয়েছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা আমার যাত্রারম্ভের সেই প্রথম পরিচয়ের—কি যেন নাম, হ্যাঁ, টেরমের, হ্যাঁ, এটা সেই টেরমের, যার বউ নাকি খাণ্ডার, এটা তারই বাড়ি বটে নিশ্চয়।

সাদা রঙের বুক অবধি উঁচু ফালি ফালি কাঠের গেটের উপর দুই কনুই রেখে আবার একটি রমণী। কই, খাণ্ডারের মত চেহারা তো ঠিক নয়। আর এই অসময়ে এখানে দাঁড়িয়েই বা কেন ? তবে কি টেরমের এখনো বাড়ি ফেরে নি ?

আমার মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি খেলল। দেখিই না পরখ করে। সত্যি খাণ্ডার, না, পথে যে সেই লড়াই-ফেরতা বলেছিল, একটু হিসিবী এই যা। খাণ্ডার হোক্ আর যাই হোক্, আমাকে তো আর চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে পারবে না। আর খেলেও হজম করতে হবে না। এ-দেশে ভেজাল নেই। আমি নির্ভেজাল ভেজাল। ফুড-পইজনিঙে যা কাৎরাতে কাৎরাতে মরবে সে আর দেখতে হবে না। সখা টেরমেরও নয়া শাদি করে সুখী হবেন, কিংবা—কিংবা আকছারই যা হয়, যাদু টেরটি পাবেন, পয়লা বউটি কত না লক্ষ্মী মেয়ে ছিল—খাণ্ডার তো নয়, ছিল যেন গ্রীষ্মের তৃষ্ণায় কচি শশাটি। অবশ্য ইতিমধ্যে যদি আমার ভ্রাতা ইল্বল এখানে এসে ডাক ছাড়ে, "হে বাতাপে ! তুমি নিষ্ক্রান্ত হও।" তা হলে তো আর কথাই নেই। আমিও—মহাভারতের ভাষাতেই বলি—খাণ্ডারিনীর "পার্শ্বদেশ বিদীর্ণ করে সহাস্য-আস্যে নিষ্ক্রান্ত হব।"

ইতিমধ্যে আমি আমার লাইন অব্ অ্যাক্‌শন্ অর্থাৎ ব্যূহ নির্মাণ করে ফেলেছি।

কাছে এসে আমার সেই ছাতা হ্যাট হাতে নিয়ে প্রায় মাটি ছুঁইয়ে, বাঁ হাত বুকের উপর রেখে, কোমরে দু ভাঁজ হয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে অর্থাৎ গভীরতম 'বাও' করে মধ্যযুগীয় কায়দায় বিশুদ্ধতম উচ্চারণে বললুম, 'গুটেন আবেণ্ড, গ্নেডিগে ফ্রাউ' অর্থাৎ আপনার সন্ধ্যা শুভ হোক, সম্মানিতা মহিলা।'

এই 'সম্মানিতা মহিলা' বলাটা কবে উঠে গিয়েছে ভগবান জানেন। আজ যদি আমি কলকাতা শহরে কোনো মহিলাকে 'ভদ্রে' বলে সম্বোধন করি, কিংবা গৃহিণীকে 'মুগ্ধে' বলে কোনো কথা বোঝাতে যাই তা হলে যে রকম শোনাবে অনেকটা সেই রকমই শোনালো।

তাঁর গলা থেকে কি একটা শব্দ বেরুতে না বেরুতেই আমি শুধালুম, 'আপনি কি দয়া করে বলতে পারেন মেলেম গ্রামটি কোথায় ?'

অবাক হয়ে বললে, 'সে তো অন্তত ছ মাইল !'

আমি বললুম, 'তাই তো ! তবে আমি নিশ্চয়ই পথ ভুল করে বসে আছি।

তা সে যাক গে। আমি ম্যাপটা বের করে একটুখানি দেখে নিই। এই হাই-কিঙের কর্মে আজ সকালে মাত্র হাতেখড়ি কিনা।'

আমি ইচ্ছে করেই বাচালের মত হেসে হেসে কথাই কয়ে যেতে লাগলুম, 'থাকি বনু শহরে। গরমের কলেজের ছুটিতে যে যার গেছে আপন বাড়ি। আমি কি করে যাই সেই দূর-দরাজের ইণ্ডিয়ায় ? এই তো ম্যাপটা পেয়েছি। ঐযঃযা টর্চটা আনি নি! বললুম তো হাতেখড়ি। তা সে—'

এতক্ষণে রমণী অবাক হয়ে সেই পুরনো—এই নিয়ে চারবারের বার—ইণ্ডার-ইণ্ডিয়ানার গুবলেট পাকালে। সেটার আর পুনরাবৃত্তি করে কোন লাভ নেই।

আমি বললুম, 'তা হলে আসি, মাদাম (যেন আমার পালাবার কতই না তাড়া!)। আপনি শুধু মোটামুটি দিকটা বাৎলে দিন।'

কিন্তু ইতিমধ্যে দাওয়াই ধরেছে। মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'চলুন। ঘরের আলোতে ম্যাপটা ভালো করে দেখে নেবেন।'

আমি আমতা আমতা করে বললুম, 'হ্যাঁ, মাদাম, তা মাদাম, কিন্তু মাদাম—'

অথচ ওদিকে দিব্য খোলা গেট দিয়ে তাঁর পিছন পিছন মারিয়ানার কার্লের মত নির্ভয়ে এগিয়ে চললুম। মনে মনে এক গাল হেসে বললুম, 'ট্রয়ের ঘোড়া ঢুকেছে, হুঁশিয়ার।'

তবু বলতে হবে সাবধানী মেয়ে। রান্নাঘরে না নিয়ে গিয়ে গেল ড্রইংরুমে।

পাঠক আমাকে বোকা ঠাউরে বলবেন, ঐতেই তো আমাকে সম্মান দেখানো হলো বেশী; কিন্তু আমি তা পূর্বেই নিবেদন করেছি এ-দেশের গ্রামাঞ্চলে হৃদ্যতা দেখাতে হলে কিচেন, লৌকিকতা করতে হলে ড্রইংরুম।

আমাদের পূর্ব বাঙলায় যে রকম 'আত্তি' করতে হলে রাত্রিবেলা লুচি, আপন জন হলে ভাত।

॥ ১২ ॥

হিটলারের পিতা যখন তাঁর মাতাকে বিয়ে করতে চান, তখন বিশেষ কোনো কারণে চার্চের অনুমতির প্রয়োজন হয়েছিল। দরখাস্তে বিবাহের পক্ষে নানা সদ্‌যুক্তি দেখানোর পর সর্বশেষে বলা হয়, 'তদুপরি বধূ অর্থ-সামর্থ্যহীন; অতএব সে যে এ-রকম উত্তম বিবাহের সুযোগ পুনরায় এ-জীবনে পাবে সে আশা করা যায় না।'[১]

পণ-প্রথা তোলার চেষ্টা করুন আর না-ই করুন, এ জিনিসটা সমাজের

---

১ আউগুস্ট কুবিৎসেক কর্তৃক 'ইয়াং হিটলার', ১৯৫৪, পৃঃ ২৮। হিটলারের বাল্যজীবন সম্বন্ধে এ রকম উপাদেয় গ্রন্থ আর নেই।

বিশেষ বিশেষ শ্রেণীতে আমি পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই দেখেছি। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ে।

চাষার বাড়ির ড্রইংরুম প্রায় একই প্যাটার্নের। এই বাড়িতে কিন্তু দেখি, শেলফে বইয়ের সংখ্যা সচরাচর যা হয় তার চেয়ে অনেক বেশী, অপ্রত্যাশিত রকমের বেশী। তদুপরি দেখি, দেয়ালে বেশ কিছু অত্যুত্তম ছবির ভালো ভালো প্রিণ্ট, সুন্দর সুন্দর ফ্রেমে বাঁধা। আমার মুখে বোধ হয় বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল। মাদামই বললেন, 'বিয়ের পূর্বে আমি কিছুদিন বন্ শহরে এক প্রকাশকের ওখানে কাজ করেছিলুম।'

অ। সেই কথা। অর্থাৎ এ-দেশে যা আকছারই হয়ে থাকে। কনের বিত্ত-সামর্থ্য না থাকলে সে চাকরি করে পয়সা কামিয়ে 'যৌতুক' কেনে। 'যৌতুক' কথাটা ঠিক হল না। 'স্ত্রী-ধন' কথাটার সঙ্গে তাল রেখে ওটাকে 'বর-ধন' বলা যেতে পারে।

এ-দেশের নিয়ম কনেকে রান্নাঘরের বাসন-বর্তন, হাঁড়িকুড়ি, মায় সিন্ক্—রান্নাঘরের তাবৎ সাজ-সরঞ্জাম, যার বর্ণনা পূর্বের এক অনুচ্ছেদে দিয়েছি—শোবার ঘরের খাট-গদি-বালিশ-চাদর-ওয়াড়-আলমারি, বসবার ঘরের সোফা-চেয়ার ইত্যাদি সব কিছু সঙ্গে নিয়ে আসতে হয়। শহরাঞ্চলে বর শুধু একখানি ফ্ল্যাট ভাড়া করেই খালাস। বিয়ের কয়েকদিন আগে তিনি শুধু ফ্ল্যাটের চাবিটি কনের হাতে গুঁজে দেন। কনে বেচারী সতেরো-আঠারো বছর বয়েস থেকে গা-গতর খাটিয়ে যে পয়সা কামিয়েছে তাই দিয়ে এ-মাসে কিনেছে এটা, ও-মাসে কিনেছে সেটা—বছরখানেক ধরে, দাঁও বুঝে—এখন কয়েকদিন ধরে আস্তে আস্তে সেগুলো সরানো হবে, বরের ফ্ল্যাটে। বিয়ের পর বরকনে কখনো বা সোজা চলে যায় হানিমুনে, আর কখনো বা ফ্ল্যাটে দু'চার দিন কাটিয়ে। কিন্তু একটা কথা খাঁটি ; এর পর আর মেয়েকে ঘর-কন্না চালাবার জন্য অন্য-কিছু দিতে হয় না—জামাই ষষ্ঠীর তত্ত্ব ফত্ত্ব এ-দেশে নেই।

আর 'ট্রুসোর' কথাটা পাঠিকারা নিশ্চয়ই এঁচে নিয়েছেন। সেও আরম্ভ হয়ে যায় ঐ ষোল-সতেরো বছর বয়স থেকে। জামা-কাপড় ফ্রক-গাউনের এম্‌ব্রয়ডারি আরম্ভ হয়ে যায় ঐ সময়েই থেকেই—মায়ের সাহায্যে—এবং পরে কোনো পরিবারে চাকুরি নিলে সে বাড়ির গিন্নীমা অবসর সময়ে কখনো বা এমব্রডারির কাজ দেখিয়ে দেন, কখনো বা নিজেই খানিকটা করে দেন। শুনেছি, বাড়ন্ত মেয়েরা টাইট-ফিটের জামা গাউনগুলোর সব কিছু তৈরী করে রাখে—বিয়ের কয়েকদিন আগে দরজীর দোকানে গিয়ে কিংবা মা-মাসী সাহসিনী হলে তাঁদের সাহায্যে নিজেই কেটে সেলাই করে নেয়।

ব্যাপারটা দীর্ঘদিন ধরে চলে বলে এতে একটা আনন্দও আছে। আমার এক বন্ধু পরীক্ষা পাস করে চলে যাওয়ার সময় বলে গিয়েছিল তার ফিয়াঁসেকে যেন মাঝে মাঝে একটুখানি বেড়াতে নিয়ে যাই। বেচারী নিতান্ত একা পড়ে যাবে বলে, এবং আমার কোনো ফিয়ঁাসে এমন কি বান্ধবী পর্যন্ত নেই বলে।

রাস্তায় নেমে আমি হয়তো বললুম, 'বাসন-কোশনের আলমারি হয়েছে,

উনুন হয়েছে, এইবার সিন্‌ক্‌—না ?'

বললে, 'হ্যাঁ, গোটা তিনেক এদিক ওদিক দেখেছি। আমার একটা ভারী পছন্দ হয়েছে। শহরের ঐ প্রান্তে।'

আমি বললুম, 'আহা, চলই না, দেখে আসা যাক্ কি রকম।'

'তুমি না বলেছিলে, রাইনের ওপারে যাবে ?'

'কি জ্বালা! রাইন তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না।'

ছোট্ট শহর বন্। ডাইনে ম্যুনস্টার গির্জে রেখে, রেমিগিউস স্ট্রীট ধরে, ফের ডাইনেই য়ুনিভার্সিটি পেরিয়ে ঢুকলুম মার্কেট প্লেসে। বাঁ দিকে কাফে মনোপোল, ডান দিকে ম্যুনিসিপ্যাল আপিস। মার্গারেট বললে, 'দাঁড়াও। এদিকেই যদি এলে তবে চলো ঐ গলিটার ভিতর। রীডিং ল্যাম্পের সেল হচ্ছে—সস্তায় পাওয়া যাবে—আমার যদিও খুব পচ্ছন্দ হয় নি।'

দেখেই আমি বললুম, 'ছ্যাঃ!'

মার্গারেট হেসে বললে, 'আমিও তাই বলছিলুম।'

ক'রে ক'রে, অনেকক্ষণ সেটা দেখে দেখে—সবই রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, দোকানে ঢোকা নদারদ, এখনো পাকাপাকি কেনার কোনো কথাই ওঠে না, মার্গারেটের মা দেখবে, পিসি দেখবে, তবে তো—পেঁছিলুম সেই সিন্‌কের সামনে। আমি পাকা জউরির মত অনেকক্ষণ ধরে ডাইনে ঘাড় নাড়ালুম, বাঁয়ে ঘাড় নাড়ালুম, তার পর বাঁ হাতের কড়ে আঙুল দিয়ে ডান কানের উপরটা চুলকোতে চুলকোতে বললুম, 'হ্যাঁ, উত্তমই বটে। শেপটি চমৎকার, সাইজটিও বাঢ়িয়া—দুজন লোকের বাসনকোশনই বা ক'খানা, তবে হ্যাঁ, পরিবার বাড়লে—'মার্গারেট কি একটা বলছিল ; আমি কান না দিয়ে বললুম, 'তবে কি না বড্ড ধবধবে সাদা। এটিকে পরিষ্কার রাখতে জান বেরিয়ে যাবে। একটুখানি নীল ঘেঁষা হলে কিংবা ক্রেজি চাইনার মত হলে—' মার্গারেট বললে, 'সেই ঘষে ঘষে সাফ যদি করতে হয় তবে ধবধবে সাদাই ভালো। মেহন্নত করবো, উনি নীলচেই থেকে যাবেন, লোকে ভাববে হাড়-আলসে বলে নীল রঙের কিনেছি—কী দরকার!'

আহা, সে-সব শ্লো টেম্পোর ঢিমে তেতালার দিনগুলো সব গেল কোথায় ? এখন সকালে বিয়ে ঠিক, সন্ধ্যের ভিতরই ডেকরেটররা এসে সব-কিছু ছিমছাম ফিটফাট করে দিলে। তবে হ্যাঁ, তখন বাড়ি পাওয়া যেত সহজেই ; এখন আর সে সুখটি নেই। কিছুদিন পূর্বেই ইয়োরোপের কোন্ এক দেশে নাকি কাগজে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল :—

পাত্রী চাই! পাত্রী চাই! পাত্রী চাই!!! আপন নিজস্ব সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত বাড়ি যার আছে এমন পাত্রী চাই। বাড়ির ফোটোগ্রাফ পাঠান।

* * *

কোথা থেকে কোথা এসে পড়লুম! ট্র্যাম্পকে নিয়ে এই তো বিপদ। সে যে রকম সোজা রাস্তায় নাক-বরাবর চলতে জানে না, তার কাহিনীও তেমনই পারলেই সদর রাস্তা ছেড়ে এর খিড়কির দরজা দিয়ে তাকায়, ঝোপের আড়াল থেকে ওর

পিছনের পুকুরের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

আমি আমার ম্যাপ খুলে অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবার ভান করলুম। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে বললুম, 'অনেক ধন্যবাদ, মাদাম। আপনাকে অযথা বিরক্ত করলুম।'

এইবারে 'মাদামে'র অগ্নিপরীক্ষা। ...মাদাম পাস! টেরমের ফেল্।

অবশ্য কিছুটা কিন্তু-কিন্তু করেই বলেছিল—কিন্তু বলেছিল তো ঠিকই—'এখন তো রাত ন'টা। ভিন গাঁয়ে পেঁছিতে—'

আমি বাধা দিয়ে এক গাল হেসে বললুম, 'আদপেই না, মাদাম! আপনাকে সব কিছু খুলে কই।'

'বসুন না।' মাদাম শুধু পাস না; একেবারে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট।

'আমি শুনেছি, আপনাদের দেশে গরমের সময়ে দিনগুলো এত লম্বা হয় যে একটা দিনের আলো নাকি পরের দিনের ভোরকে 'গুড্ মর্নিং' বলার সুযোগ পায়। ঠিক মত অন্ধকার নাকি আদপেই হয় না। এখানে আমি থাকি শহরে। ছ'টা সাতটা বাজতে না বাজতেই সব কড়া কড়া বিজলি বাতি দেয় জ্বালিয়ে। কিচ্ছুটি বোঝবার উপায় নেই, আলো, না অন্ধকার। ফিকে অন্ধকার, তরল অন্ধকার, ঘোরঘুট্টি অন্ধকার—শুনেছি মিড্-সামারে নাকি গ্রামাঞ্চলে এর সব ক'টাই দেখা যায়। আমি হাঁটতে হাঁটতে দিব্য এগুতে থাকব আর অন্ধকারের গোড়াপত্তন থেকে তার নিকুচি পর্যন্ত রসিয়ে রসিয়ে চেখে চেখে যাবো। এবং—'

'কিন্তু আপনার আহারাদি?'

কে বলে এ রমণী খান্ডার!

মারিয়ানার ঠাকুমাই তাকে বলেছিল, 'দেখ দিকিনি, ও যে হাইকিঙে বেরিয়েছে, সঙ্গে স্যান্ডউইচ আছে কিনা।' আমার কোন আপত্তি না শুনে মারিয়ানা আমার আধা-বাসী সাদামাটা স্যান্ডউইচগুলো তুলে নিয়ে আমার ব্যাগটা ভরতি করে দিয়েছিল গাদা-গাদা রকম-বেরকমের স্যান্ডউইচে। সঙ্গে আবার টুথপেস্ট ট্যুবের মত একটা ট্যুবও দিয়েছিল। ওর ভিতরে নাকি মাস্টার্ড আছে। বলেছিল, 'স্যান্ডউইচে মাস্টার্ড মাখিয়ে দিলে ওগুলো খুব তাড়াতাড়ি মিইয়ে যায়। যখন খাবে, তখন রাইটা মাখিয়ে নিয়ো।' আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল, 'তোমারগুলো কাল সকালে আমি খাব।'

তাই আমার ব্যাগটাকে আদর করতে করতে তাড়াতাড়ি বললুম, 'কি আর বলবো, মাদাম, আমার সঙ্গে যা স্যান্ডউইচ আছে, তার জোরে আমি আপনাকে পর্যন্ত রুপালী বোর্ডারওয়ালা সোনালী চিঠি ছাপিয়ে নিমন্ত্রণ করতে পারি। কিন্তু সেটা আসল কথা নয়। আমি খাই অনেক দেরিতে। রাত এগারোটার সময়।'

বললে, 'সে তো ঠান্ডা। গরম সুপ আছে।'

আমি অনেক-কিছু এক ঝটকায় বুঝে গেলুম। সখা টেরমের প্রতি রাত্রে

না হোক রোববার রাত্রে ইয়ার-দোস্তের সঙ্গে 'পাবে' (মদের দোকান, ক্লাব এবং আড্ডার সমন্বয়) গুলতানী করে বাড়ি ফেরেন অনেক রাত্রিতে। পৃথিবীর কোনো জায়গাতেই গিন্নীমারা এ অভ্যাসটি নেকনজরে দেখেন না। তাই সৃষ্টির আদিম যুগ থেকে একটা ভীষণ লড়াই চলেছে খরবেগে। এক দিকে 'পাব'-ওয়ালা, অন্য দিকে গৃহিণীর দল। গ্রামের কোনো কোনো 'পাবে' তাই দেখেছি, পাব-ওয়ালা বেশ পয়সা খর্চা করে বড় বড় হরফে দেয়ালে নিম্নোক্ত কবিতাটি পেণ্ট করে নিয়েছে,

ফ্রাগে নিষট্ ডী উর ভী স্পেট এস সাই
ডাইনে ফ্রাউ শিমফট্ উমৎসেন
গেনাও ভী উম ড্রাই ॥

ঘড়িটাকে শুধিয়ো না, কটা বেজেছে।

তোমার বউ তোমাকে দশটার সময় সেই বকাই বকবে, যেটা তিনটের সময় বকে।

মানুষ করেই বা কি? জর্মনরা কারো বাড়িতে বসে আড্ডা জমানোটা আদপেই পছন্দ করে না। ডিনার লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করলে অবশ্য অন্য কথা—কিন্তু সে তো সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। এ-দেশেও একরকম লোক আছে, যাদের পেতে হলে চায়ের দোকানে যেতে হয়। পরের বাড়িতে যায় না, নিজের বাড়িতেও থাকে না।

এ অবস্থায় মেয়েরা কি করে?

কাচ্চা-বাচ্চা সামলায়। খামকা তিনবার বাচ্চাটার ফ্রক বদলিয়ে দেয়, চার বার পাউডার মাখায়, হাতের কাজ ক্ষান্ত দিয়ে ঘড়ি ঘড়ি ঢু মেরে যায়—বাচ্চা ঠিকমত ঘুমুচ্ছে কিনা।

সেইখানে, যেখানে থাকবার কথা, ভরা গাঙ্গের তরতর স্রোত, যার উপর দিয়ে কলরব করে ধেয়ে চলবে ভরা পাল তুলে টেরমের গিন্নীর যৌবনতরী—হায়, সেখানে বালুচড়া। নৌকাটি যে মোক্ষম আটকা আটকেছে, তার থেকে আর নিষ্কৃতি নেই—কি করে জানি নে, কথায় কথায় বেরিয়ে গিয়েছে, বেচারী সন্তানহীনা।

সমস্ত পৃথিবীটা নিষ্ফল সাহারায় পরিণত হোক, কিন্তু একটি রমণীও যেন সন্তানহীনা না হয়, মা হওয়ার আনন্দ থেকে বঞ্চিত না হয়।

তাই কি এ রমণীর হৃদয় থেকে সর্বরস বাষ্প হয়ে নক্ষত্রলোকে চলে গিয়েছে। —কেউ বলে খাণ্ডার, কেউ বলে হিসেবী? কিন্তু কই, ঠিক জায়গার সামান্যতম খোঁচা লাগা মাত্রই তো তার নৌকা চলুক আর না চলুক, পালে তো হাওয়া লাগল—স্বামীর জন্য তৈরী সুপ বাউণ্ডুলের সামনে তুলে ধরতে চায়।

আমি এসেছিলুম মজা করতে, বাজিয়ে দেখতে খাণ্ডার কিনা, এখন কেঁচো খুঁড়তে সাপ।

ঘরের আসবাবপত্র, ছবি, বই—এসব টেরমের-বউ যোগাড় করেছিল যৌতুকের টাকা জমাবার সময়—কেমন যেন আমার কাছে হঠাৎ অত্যন্ত নিরা-

নন্দ, নিঃসঙ্গ, নীরস বলে মনে হতে লাগল। এরই ভিতর একা-একা দিন কাটায় এ রমণী। টেরমের লোক নিশ্চয়ই খারাপ নয়—যে দু-চারটে কথা বলেছিলুম, তার থেকে আমার মনে অতি দৃঢ় ঐ প্রত্যয় হয়েছিল—এবং আমার মনে হল, দুজনার ভিতরে ভালবাসাও আছে যথেষ্ট, কিন্তু একজনকে ভালবাসা দেওয়া এক জিনিস, আর সঙ্গ দেওয়া অন্য জিনিস। এ-মেয়ে শান্ত গম্ভীর। খুব সম্ভব, স্বামী বাচ্চা নিয়ে নির্জনে থাকতে চায়, আর ওদিকে টেরমের ইয়ার-দোস্তের সঙ্গে বসে পাঁচজনের পাঁচ রকমের সুখ-দুঃখের কথা না শুনলে, না বললে, তার মনে হয় তার জীবনটা যেন সর্বক্ষণ অসম্পূর্ণ রয়ে গেল।

এসব বলা বৃথা, টেরমের গিন্নী কি অন্য কিছু দিয়ে জীবন ভরে তুলতে পারে না? কেউ কেউ পারে, কিন্তু অনেকেই পারে না। এ মেয়ে যেন গ্রামোফোন রেকর্ডের কাটা লাইনের ভিতরে পড়ে গিয়েছে সাউন্ড বক্সটা—আছে ঠায় দাঁড়িয়ে, রেকর্ড ঘুরেই যাচ্ছে, ঘুরেই যাচ্ছে, সে কিন্তু আর এগুতে পারছে না। আমার অনেক সময় মনে হয়, এই একঘেয়ে নীরস জীবনের চেয়ে অনটনের জীবন, সংকটের জীবন কাম্যতর। সেখানে অন্তত সেই অনটন, সেই সংকটের দিকে সর্বক্ষণ মনঃসংযোগ করতে হয় বলে মনটা কিছু-না-কিছু একটা নিয়ে থাকে। বেদনার শেষ আছে, কিন্তু শূন্যতার তো নেই।

আমার বড় লজ্জা বোধ হল। ঠাট্টাছলে মস্করা করতে এখানে এসেছিলুম বলে। স্থির করলুম, সব কথা খুলে বলবো, নিদেন এটা বলবো যে, তার স্বামীকে আমি চিনি, সে আমাকে নিমন্ত্রণ করতে চেয়েছিল।

আমি ভয়ে ভয়ে আরম্ভ করলুম, 'আপনার স্বামী—'

আমার কথা আর শেষ করতে হল না। এই শান্ত—এমন কি গুরুগম্ভীরও বলা যেতে পারে—মেয়ে হঠাৎ হো-হো করে অট্টহাস্যে হেসে উঠলো। কিন্তু ভারী মধুর। বিশেষ করে ঝকঝকে সাদা দু'পাটি দাঁত আর চোখ দুটি যা জ্বলজ্বল করে উঠলো সে যেন অন্ধকার রাত্রে আকাশের কোণে বিদ্যুল্লেখা! কতদিন পরে এ-রমণী এভাবে প্রাণ খুলে হাসলে কে জানে! কত তপ্ত নিদাঘ দিনের পর নামলো এ-বারিধারা! তাই হঠাৎ যেন চতুর্দিকের শুষ্কভূমি হয়ে গেল সবুজ। দেয়ালের ছবিগুলোর গুমড়ো কাচের মুখের উপর দিয়ে যেন খেলে গেল এক পশলা আলোর ঝলমলানি।

'আমার স্বামী—' বার বার হাসে আর বলে, আমার 'স্বামী—'। শেষটায় কোনো গতিকে হাসি চেপে বললে, 'আমার স্বামী আপনাকে পেলে হাল্লেলুইয়া রব ছেড়ে আপনাকে ধরে নাচতে আরম্ভ করতো। এ-গ্রামের যে-কোনো এক-জনকে পেলেই তার ক্রিসমাস। আপনি কত দূর দেশের লোক। আপনাকে পেলে এখ্খুনি নিয়ে যেত 'পাবে'।' আবার হাসতে হাসতে বললে, 'আপনি বুঝি ভয় পেয়েছেন, ও যদি হঠাৎ বাড়ি ফিরে দেখে আমি একটা ট্র্যাম্পকে—অবশ্য আপনি ট্র্যাম্প নন্—যত্ন করে সুপ খাওয়াচ্ছি তা হলে সে চটে গিয়ে তুলকালাম কাণ্ড করবে! হোলি মেরি! যান আপনি একবার 'পাবে'। ও গিয়েছিল শহরে। এতক্ষণে ফিরেছে নিশ্চয়ই, এবং বাড়ি না এসে গেছে সোজা

'পাবে'। শহরে কি কি দেখে এল তার গরমাগরম একটা রগরগে বর্ণনা তো দেওয়া চাই। যান না একবার সেখানে। নরক গুলজার।' তারপর আবার হাসি। শেষটায় বললে, 'আমি যদি ওকে বলি যে, সে যখন শহরে কিংবা 'পাবে', তখন এক বিদেশী—তাও সেই সুদূর ইণ্ডিয়া থেকে, ফ্রান্স কিংবা পর্তুগাল থেকে নয়—আমাদের বাড়িতে এসেছিল তা হলে সে দুঃখে ক্ষোভে বোধ হয় দেয়ালে মাথা ঠুকবে। তাই বলছি, যান একবার 'পাবে'। খর্চার কথা ভাবছেন? আমার স্বামী যতক্ষণ ওখানে রয়েছে—!'

আমি ইচ্ছে করেই বেশ শান্ত কণ্ঠে বললুম, 'আমি তো শুনেছি, আপনি চান না, আপনার স্বামী বেশী লোকের সঙ্গে মেলা-মেশা করুক।'

হঠাৎ তার মুখের হাসি শুকিয়ে গেল। আমার মনে দুঃখ হল। কিন্তু যখন মনঃস্থির করেছি সব কথা বলবোই তখন আর উপায় কি? গোড়ার থেকে সব কিছু বলে গেলুম, অবশ্য তাঁর স্বামীর ভাষাটাকে একটু মোলায়েম করে এবং লড়াই-ফেরতা চাষা কি বলেছিল তার অভিমতও।

নাঃ! বিধাতা আমার প্রতি সুপ্রসন্ন। টেরমেরিনীর মুখে ফের মৃদু হাস্য দেখা দিল। তা হলে বোধ হয়, একবার গাম্ভীর্যের বাঁধন ভাঙলে সেটাকে আর চট করে মেরামত করা যায় না। হাসিমুখেই বললে, 'সে এক দীর্ঘ কাহিনী। আপনি বরঞ্চ 'পাবে' যান।' আমি বললুম, 'আপনি যদি সঙ্গে চলেন, তবে যেতে রাজী আছি।' স্তম্ভিত হয়ে বললে, 'আমি? আমি যাবো 'পাবে'?' আমি বললুম, 'দোষটা কি?' আপনার স্বামী যখন সেখানে রয়েছেন।' তাড়াতাড়ি বললে, 'না, না। সে হয় না।' তারপর আমাকে যেন খুশী করার জন্য বললে, 'আরেকদিন যাব।'

আমি বললুম, 'সেই ভালো, মাদাম। ফেরার মুখে যখন এ গাঁ দিয়ে যাবো তখন তিনজনাতে একসঙ্গে যাব।'

রাস্তায় নেমে শেষ কথা বললুম, 'ঐ কথায় রইল।'

॥ ১৩ ॥

বিচক্ষণ লোক ঠিক জানে, এই শেষবার, এরপর দোকানী আর ধার দেবে না। হুঁশিয়ার লোক দোকানীর সামান্যতম চোখের পাতার কাঁপন কিংবা তার নিঃশ্বাসের গতিবেগ থেকে এই তত্ত্বটি জেনে যায়, এবং তারপর আর ও-পাড়া মাড়ায় না। নৈসর্গিক পরিবর্তন সম্বন্ধেও সে কিছু কম ওয়াকিফহাল নয়। মাঠ দিয়ে যেতে যেতে দিব্য আপনার সঙ্গে নিবিষ্ট মনে কথা বলে যাচ্ছে, যেন অন্য কোনো দিকে তার কোন খেয়াল নেই, অথচ আকাশের কোন্ কোণে কখন সামান্য এক রত্তি মেঘ জমেছে, কখন একটুখানি হাওয়া কোন্ দিক থেকে এসে তার টাকের উপর মোলায়েমসে হাত বুলিয়ে গিয়েছে সেটা লক্ষ্য করেছে ঠিকই, এবং হঠাৎ কথা বন্ধ করে বলবে, 'চল দাদা, একটু পা চালিয়ে। ঐ

মুদির দোকানে একটুখানি মুড়ি খাবো।' দোকানে ঢোকা মাত্রই কড়কড় করে বাজ আর টিনের ছাতের উপর চচ্চড় করে গামলা-ঢালা বৃষ্টি। তখন আপনার কানেও জল গেল, আপনার হুঁশিয়ার ইয়ার কোন্ মুদির সন্ধানে মুড়ির দোকানে ঢুকেছিলেন।

ট্র্যাম্প মাত্রেরই এ-দুটির কিছু কিছু দরকার। তালেবর ট্র্যাম্পরা তো—কাণ্টের ভাষায় বলি—মানুষের হৃদয় থেকে আরম্ভ করে আকাশের তারার গতিবিধি নখাগ্র-দর্পণে ধরে। তারই একজনের সঙ্গে আমার একবার সাক্ষাৎ হয়েছিল; অনুকূল লগ্নে সে-সব কথা হবে।

ওয়াকিফহাল তো নই-ই, দু ব্যাপারেই আমি বে-খেয়াল। কাজেই কখন যে শান্তাকাশের আস্যদেশে ভ্রূকুটির কটা ফেটে উঠেছে সেটা মোটেই লক্ষ্য করি নি। হঠাৎ ঘোরঘুট্টি অন্ধকার হয়ে গেল—আশ্চর্য! এরকম তো হওয়ার কথা ছিল না—এবং সঙ্গে সঙ্গে

কণ্ঠের বরণ যাঁর
  শ্যাম-জলধরোপম,
গৌরী-ভুজলতা যাহে
      রাজে বিদ্যুল্লতা সম
নীলকণ্ঠ প্রভু সেই
      করুন সবে রক্ষণ—

আমাকে 'রক্ষণ' না করে রুদ্রের অট্টহাস্য হেসে বৃষ্টি নামলেন আমার মস্তকে মুষলধারে। এরকম হঠাৎ, আচমকা, ঘনধার বৃষ্টি আমি আমার আপন দেশেও কখনো দেখি নি।

তবে এটা ঠিক—কালো মেঘের উপর সাদা বিদ্যুৎ খেললে কেন সেটা নীল-কণ্ঠের নীল-গলার উপর গৌরীর গোরা হাতের জড়িয়ে ধরার মত দেখায় সেটা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হল। বিস্তর বিদ্যুৎ চমকালো বটে।

আর সে কী অসম্ভব কনকনে সূচীভেদ্য ঠাণ্ডা!

এতদিনে বুঝতে পারলুম, ইয়োরোপীয় লেখকরা ভারত, মালয়, বর্মায় মৌসুমী বৃষ্টিতে ভিজে কেন লিখেছেন, ওয়োর্ম ট্রপিকাল রেন্স্। জ্যৈষ্ঠের খরদাহের পর আষাঢ়ের নবধারা নামলে আমরা শীতল হই, সে-বৃষ্টি হাড়ে কাঁপন ধরিয়ে দেয় না। তাই ইংরেজের কাছে এ বৃষ্টি ওয়োর্ম এবং আনন্দদায়ক। কারণ একে অন্যকে স্বাগত অভ্যর্থনা জানালে সায়েব বলে, আমি তার কাছ থেকে ওয়োর্ম রিসেপশন পেলুম। আর আমরা যদি বলি, আমাকে দেখেই উনি গরম হয়ে উঠলেন তবে অন্য মানে হয়।

যাক্ এসব আত্মচিন্তা। বাঙলা দেশে মানুষ বহুকাল ধরে তর্ক করেছে, মিষ্টি কথা দিয়ে কোনো জিনিস ভেজানো যায় কি না? কিন্তু উল্টোটা কখনো ভাবে নি—অর্থাৎ মিষ্টি কথা, এস্থলে আত্মচিন্তা দিয়ে 'সেলিকাজেলের' মত ভিজে জিনিস শুকনো করা যায় কি না? আবার এ বৃষ্টি আসছে চতুর্দিক থেকে, নাগাড়ে এবং ধরণী অবলুপ্ত।

অবশ্য দশ মিনিট যেতে না যেতেই আমার ভিজে যাওয়ার ভাবনা লোপ পেল। অল্প ভেজা থেকে মানুষ আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করে কিন্তু ভিজে ঢোল হয়ে যাওয়ার পর তার সে উদ্বেগ কেটে যায়। মড়ার উপর এক মণও মাটি, একশ' মণও মাটি। কিংবা সেই পুরনো দোঁহা,

অল্প শোকে কাতর।
অধিক শোকে পাথর॥

হোঁচট খেয়ে খেয়ে চলেছি। একটি গাড়ি কিংবা মানুষের সঙ্গেও দেখা হল না। গৌরী ও নীলকণ্ঠও বোধ হয় দ্যুলোকের পিকনিক সমাপন করে কৈলাসে ফিরে গিয়েছেন। বিদ্যুৎ আর চমকাচ্ছে না। ঘোরঘুট্টি অন্ধকার।

অনেকক্ষণ পরে আমার বাঁ দিকে—দিক বলতে পারবো না—অতি দূরের আকাশে একটা আলোর আভা পেলুম। প্রায় হাতড়ে হাতড়ে সামনে বাঁয়ের মোড় নিলুম। আভাটা কখনো দেখতে পাচ্ছি, কখনো না। যখন আলোটা বেশ কিছু পরিষ্কার হয়েছে, তখন সামনের কয়েকটা গাছের আড়াল থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এল একটা জোরদার বাড়ির আলো! বাঁচলুম।

কই বাঁচলুম? বাড়ির সামনের সাইনবোর্ডে আলোতে আলোতে লেখা 'তিন সিংহ'! বলে কি? ঘরে ঢুকে তিনটে সিঙির মুখোমুখি হতে হবে নাকি?

নাঃ। অতখানি জর্মন ভাষা আমি জানি। এরা এদের 'বার' হোটেল 'পাব'-এর বিদঘুটে বিদঘুটে নাম দেয়। 'তিন সিংহ', 'সোনালী হাঁস'—আরো কত কী!

দরজা খুলেই দেখি, আমি একটা খাঁচা কিংবা লিফটের মত বাক্সে দাঁড়িয়ে আছি। আমি আমার ভেজা জামাকাপড় নিয়ে কি করে ঢুকবো সে সম্বন্ধে সচেতন ছিলুম বলে লক্ষ্য করলুম, পায়ের তলায় জাফরির ফুটোওলা পুরো রবারের শীট। ভয়ে ভয়ে সামনের দরজা খুলে দেখি বিরাট এক নাচের ঘর প্লাস 'বার্-পাব্'। অথচ একটি মাত্র খদ্দের নেই। এক প্রান্তে 'বার'। পিছনে একটি তরুণী। সাদামাটা কাপড়েই অতি সুন্দর দেখাচ্ছে। আমি মুখ ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি দেখে বেশ একটু চেঁচিয়ে বললে, 'ভিতরে আসুন না?' আমি আমার জামা কাপড় দেখিয়ে বললুম, 'আমি যে জলভরা বালটির মত।' বললে, 'তা হোক্।' তারপর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে, একটা জাফরির রবারের পর্দা চলে গিয়েছে ঘরের অন্য প্রান্তের বাথরুম অবধি। আমি ঐটে ধরে ধরে বেবাক ঘর না ভিজিয়ে যখন প্রায় বাথরুমের কাছে পেঁছেছি তখন মেয়েটি কাউণ্টার ঘুরে পার হয়ে আমার কাছে এসে বললে, 'আপনি ভিতরে ঢুকুন। আমি আপনাকে তোয়ালে আর শুকনো কাপড় এনে দিচ্ছি।'

গ্রামাঞ্চলে এরা এসব আকছারই করে থাকে, না আমি বিদেশী বলে? কি জানি? শহরে এ রকম ঢোল আপন বাড়ি ছাড়া অন্যত্র কোথাও ঢুকতে কখনো দেখি নি।

শার্ট, সুয়েট্যার, প্যাণ্ট আর মোজা দিয়ে গেল। অবশ্য বাহারে নয়। বাহার! হুঃ! আমি তখন গঙ্গাসুর বা ব্যাঘ্রচর্ম পরে কৃত্তিবাস হতে রাজী আছি।

চার সাইজের বড় রাবারের জুতো টানতে টানতে 'বার'-এর নিকটতম সোফায় এসে হেলান দিয়ে এলিয়ে পড়লুম। মেয়েটি শুধালে, 'আপনি কি খাবেন?' আমি ক্লান্ত কণ্ঠে বললুম, 'যাচ্ছেতাই।'

এবারে যেন কিঞ্চিৎ দরদ-ভরা সুরে বললে, 'গরম ব্র্যান্ডি খান। আপনি যা ভিজেছেন তাতে অসুখ-বিসুখ করা বিচিত্র নয়। আমার কথা শুনুন। আমি সবাইকে ড্রিঙ্ক দিই। জানি, কখন কি খেতে হয়।'

আমি তখন ট্র্যাম্পিণ্ডের অন্নপ্রাশনের দিনেই নিমতলাগমন ঠেকাতে ব্যস্ত। পূর্বোল্লিখিত গজাসুরের গজ-বসাও খেতে প্রস্তুত। বললুম, 'তাই দিন।'

গরম ব্র্যান্ডি টেবিলের উপর রেখে বললে, 'ৎসুম' ভোল জাইন।' এটা এরা সব সময়েই বলে থাকে। অর্থ বোধ হয় অনেকটা—'এটা দ্বারা আপনার মঙ্গল হোক্।'

আমি বললুম, 'ধন্যবাদ। আপনি কিছু একটা নিন।'

বললে, 'আমার রয়েছে।'

আমি এক চুমুক খাওয়ায় বেশ কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি 'বার'-এর পিছন থেকে শুধলো, 'আপনি যদি নিতান্ত একা বসে না থাকতে চান তবে আমি সঙ্গ দিতে পারি।'

আমি খাড়া হয়ে উঠে বসে বললুম, 'নিশ্চয় নিশ্চয়। আস্তেজ্ঞা হোক, বোস্তেজ্ঞা হোক।' মেয়েটি এসে একটি চেয়ার একটুখানি দূরে টেনে নিয়ে এক জানুর উপর আরেক জানু তুলে বসলো।

কি সুন্দর সুডৌল পা দুটি!

॥ ১৪ ॥

হিটলার যখন মস্কোর চৌকাঠে তখন তিনি তাঁর খ্যাতির মধ্যগগনে। ঐ সময় লাঞ্চ-ডিনার খাওয়ার পর তিনি যে-সব বিশ্রম্ভালাপ করতেন সেগুলো তাঁর সেক্রেটারি বরমানের আদেশে লিখে রাখা হয়। তারই একাধিক জায়গায় হিটলার রমণীদের সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতা ও মতামত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, আমরা শহরে রঙ-চঙা সুন্দরীদের দেখে এতই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি যে, গ্রামের সুন্দরীরা আর আমাদের চোখে পড়ে না। অথচ তাঁর মতে, সিনেমা-ওলাদের সুন্দরীর সন্ধানে বেরোতে হলে যাওয়া উচিত গ্রামাঞ্চলে—সৌন্দর্যের খনি সেখানে।

লেখাটি পড়েছি আমি অনেক পরে, কিন্তু সেই অঝোরে ঝরার রাতে ক্যেটে কির্শনারকে দেখে আমার মনে এই তত্ত্বটিই আবছা-আবছা উদয় হয়েছিল। তার দেহটি তো স্বাস্থ্যে পরিপূর্ণ ছিলই, তদুপরি চোখে ছিল একটি অবর্ণনীয় শান্ত মধুর ভাব। চুল ছিল চেসনাট ব্লন্ড এবং এমনি অদ্ভুত ঝিলিক মারতো যে মনে হত যেন তেল ঝরে পড়ছে, যদিও জানি ইয়োরোপের মেয়েরা চুলে তেল মাখে না।

আমার টেবিলে আসার সময় সে তার অর্ধসমাপ্ত বিয়ারের গেলাস সঙ্গে এনেছিল। ঢাউস হাফ লিটারের পুরু কাঁচের মগ। ক্যেটের চোখ দুটি ঈষৎ রক্তাভ। সেটা বিয়ার খেয়ে হয়েছে, না, চোখের জল ফেলে হয়েছে বুঝতে পারলুম না। আবার এটাও তো হতে পারে যে কেঁদে কেঁদে যখন সান্ত্বনা পায় নি তখন শোক ভোলার জন্য বিয়ার খেয়েছে। কিন্তু আমিই বা এত সেন্টি-মেন্টাল কেন? পৃথিবীটা কি শুধু কান্নাতেই ভরা?

ইতিমধ্যে প্রাথমিক আলাপচারি হয়ে গিয়েছে।

আমি বার দুই বিয়ার মগের দিকে তাকিয়ে বললুম, 'আমাদের দেশে প্রবাদ আছে, ময়রা সন্দেশ খায় না।'

ক্যেটে হেসে বললে, 'এ-দেশেও মোটামুটি তাই। তবে আমি খাই অন্য কারণে। তাও সমস্ত দিন, এবং জালা জালা।'

এদেশে বিয়ার খাওয়াটা নিন্দনীয় নয়—বরঞ্চ সেইটেই স্বাভাবিক—কিন্তু পিপে পিপে খাওয়াটা নিন্দনীয়, আর মাতলামোটা তো রীতিমত অভদ্র, অন্যায় আচরণ বলে স্বীকৃত হয়েছে। আমাদের দেশে যে রকম একটু-আধটু তাস খেলা লোক মেনে নেয় কিন্তু জুয়ো খেলে সর্বস্ব উড়িয়ে দেওয়া পাপ বলে ধরা হয়।

ক্যেটে কেন জালা জালা খায় সেটা যখন নিজের থেকে বললে না, তখন আমিও আর খোঁচাখুঁচি করলুম না। শুধালুম, 'আমি এখানে আসার সময় আকাশে একটা আলোর আভা দেখতে পেয়েছিলুম। সেটা কিসের?'

'ও, সে তো রাইন নদীর ঘাট আর জাহাজগুলোর।'

আমি অবাক হয়ে বললুম, 'আমি কি রাইনের পারে এসে পেঁছে গিয়েছি?

হেসে বললে, 'যা বৃষ্টি হচ্ছে তাতে আপনি যে আপন অজানাতে পায়ে হেঁটেই রাইন পেরিয়ে ওপারে চলে যান নি সেই তো আশ্চর্য! আমাদের 'পাব্' থেকে রাইন তো অতি কাছে। আসলে আমাদের খদ্দেরও অধিকাংশ রাইনের মাঝি-মাল্লারা। সন্ধ্যার সময় নোঙ্গর ফেলে এখানে এসে বিয়ার খায়, নাচা-নাচি করে এবং মাঝে মাঝে মাতলামোও। সেলার কিনা! আজ জোর বৃষ্টি নেমেছে বলে 'পাব' একেবারে ফাঁকা। আমার আজ বড্ড ক্ষতি হল।'

'আপনার ক্ষতি? আমি তো ভেবেছিলুম, আপনি এখানে কাজ করেন।'

ক্ষণতরে শ্রীমতীর মুখ একটু গম্ভীর হল। মুনিবকে চাকর বললে তাঁর যে ভাব-পরিবর্তন হওয়ার কথা। তারপর ফের একটু হাসলে। বোধ হয় ভাবল, বিদেশী আর বুঝবেই বা কি? বললে, 'না। এটা আমার 'পাব'। অর্থাৎ মায়ের 'পাব্'। আমরা দুই বোন। ছোট বোন ইস্কুলে যায় আর 'পাব' চালা-বার মত গায়ের জোর মা'র নেই। তাই আমি এই জোয়ালে বাঁধা। অবশ্য আমি কাজ করতে ভালোবাসি। কিন্তু সকাল আটটা ন'টা থেকে রাত একটা অবধি কাজ করা চাট্টিখানি কথা নয়। ছোট বোনটা ইস্কুল থেকে ফিরে এসে মাঝে মাঝে আমাকে জোর করে ঘরে নিয়ে শুইয়ে দেয়। অবশ্য একটা ঠিকে আছে। কিন্তু সে বেচারীর আবার শিগগির বাচ্চা হবে।'

ক্যেটে যেভাবে সব কথা নিঃসংকোচে খোলাখুলি বলে যাচ্ছিল তাতে আমি ভরসা পেয়ে হেসে বললুম, 'তা আপনি একটা বিয়ে করলেই পারেন, এত বড় ব্যবসা তায় আপনি সুন্দরী—'

'চুপ করো—' হঠাৎ ক্যেটে 'আপনি' থেকে 'তুমি'-তে চলে এল। বললে, 'চুপ করো। আমি গাঁয়ে থাকি বলে কি গাঁইয়া? আমি কি জানি নে ইন্ডিয়ান নর্তকীরা কি অদ্ভুত সুন্দরী হয়? বর্ণটি সুন্দর শ্যাম, মিশমিশে কুচকুচে কালো চুল, লম্বা লম্বা জোড়া চোখ, চমৎকার বাস্ট আর হিপ—'

আমি গলা খাঁকারি দিয়ে বললুম, 'তুমি অতশত জানলে কোত্থেকে?'

বললে, 'এই যে সব মাঝি-মাল্লারা এখানে বিয়ার খেতে আসে তাদের অনে-কেই ভাটি রাইনে হল্যান্ড অবধি যায়। সেখানে সমুদ্রের জাহাজে কাজ নিয়ে কেউ কেউ তামাম দুনিয়া ঘুরে বেড়ায়। তাদেরই দু-একজন মাঝে মাঝে আমাকে ভিন্ন ভিন্ন দেশের ছবির পোস্টকার্ড পাঠায়। বিশেষ করে যারা আমার সঙ্গে প্রেম করতে গিয়ে খানিকটে হতাশ হয়েছে তারা ইন্ডিয়া, ইজিপ্ট, থেকে খুবসুরত মেয়েদের ছবি পাঠিয়ে জানাতে চায়, 'তুমি তো আমাকে পাত্তা দিলে না; এখন দেখ, আমি কি পেয়েছি।'

আমি রক্তের গন্ধ পেয়ে বললুম, 'সুন্দরী ক্যেটে, তুমি যে বললে, যারা তোমার সঙ্গে প্রেম করতে গিয়ে খানিকটে হতাশ হয়েছে—এ কথাটার প্রকৃত অর্থ আমাকে প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে বলবে কি?'

ক্যেটে বললে, 'সুন্দরী! বেশ বলেছো চাঁদ। কিন্তু সে কথা থাক। রাত একটা বেজেছে। পোলিৎসাই স্টুন্ডে—পুলিস-আওয়ার্স—অর্থাৎ 'পাব' বন্ধ করতে হবে। এই ঝড়-বৃষ্টিতে এখন তুমি যাবে কোথায়? উপরে চলো—'

আমি বাঙলা দেশের ছেলে। অন্য কারণে যা হোক তা হোক, কিন্তু বৃষ্টির ভয়ে আমি কারো বাড়িতে করুণার অতিথি হব—সেটা আমার জাত্যভিমানে জব্বর লাগে। অবশ্য এই পোড়ার দেশে বারান্দা, রক, ভিলিকিনি (ব্যালকনি) নেই বলে শুকনো নদীর পোলের তলা ছাড়া অন্য কোথাও বৃষ্টির সময় গা বাঁচানো যায় না। বললুম, 'দেখো ফ্রলাইন ক্যেটে—'

ক্যেটের অল্প নেশা হয়েছে কি না জানি নে—শুনেছি, অল্প নেশাতে নাকি মানুষের সাহস বেড়ে যায়—কিংবা সে টেরমের-গিন্নীর মত তথাকথিতা খান্ডারনী, কিংবা সত্যই প্রেমদায়িনী জানি নে। আমার দিকে কটকট করে তাকিয়ে বললে, 'চুপ!'

তারপর উঠে গিয়ে সব ক'টা জানলার কাঠের রেলিঙ পর্দা নামালে—এতক্ষণ শুধু শার্সিগুলোই বন্ধ ছিল—মেন দরজা আর সেই লিফটপানা খাঁচার ডবল তালার ডবল চাবি ঘোরালে, বারের পিছনে গিয়ে দু মিনিটে ক্যাশ মেলালে, সুইচ বোর্ডের কাছে গিয়ে পটপট করে সে ঘরের চোদ্দটা আলো নেবালে, উপরে যাবার আলো জ্বালিয়ে দিয়ে আমাকে বললে, 'চলো।'

উপরে গিয়ে একটা কামরার দরজা খুলে আলো জ্বালালে। সত্যি সুন্দর ঘর। চমৎকার আসবাবপত্র। এক কোণে বাহারে কটেজ পিয়ানো।

দেয়ালে নানা দেশের তীরধনুক ঝোলানো। এক প্রান্তে অতি সূক্ষ্ম ডাচ লেসের কাজওলা বেডকভার দিয়ে ঢাকা বিরাট রাজসিক কালো আবলুশ কাঠের পালঙ্ক।

বললে, 'বসো। আমি এখন দুটো গিলবো। এই ঘরেই নিয়ে আসছি। রোজ রাত্রে আমাকে একা খেতে হয়, বড় কষ্ট লাগে। তোমার খাওয়া হয়ে গিয়েছে নিশ্চয়ই। তবে দাড়াও, এই সিগারেটটা খাও।' ব'লে সেণ্টার টেবিলের উপর থেকে একটি সিগারেট নিয়ে ধরালে। আমার হাতে দিয়ে বললে, 'খাও।' এ রমণী সম্পূর্ণ লৌকিকতা-বর্জিতা।

দশ মিনিট পরে এল বিরাট এক ট্রে হাতে করে। তাতে দু প্লেট সুপ, দু প্লেট সার্ডিন-সসিজ-অলিভ, গুচ্ছের রুটি-মাখন। টেবিল সাজিয়ে, দুখানা চেয়ার মুখোমুখি বসিয়ে বললে, 'আরম্ভ করো।' আমি মারিয়ানার ঠাকুমার মত আদেশ করলুম, 'ক্যেটে, ফাঙে মাল আন্—আরম্ভ করো অর্থাৎ প্রার্থনা করো।' ক্যেটের হাত থেকে ঠং করে চামচ-কাঁটা পড়ে গেল। ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকালে।

শ্রীমতী ক্যেটেকে লজ্জা দেবার জন্য যে আমি উপাসনার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলুম তা নয়, আসলে আমি এ বাবদে চার্লস ল্যামের শিষ্য। তিনি বলেছেন খাবার পূর্বের এই প্রার্থনা কেমন যেন বেখাপ্পা। বরঞ্চ ভোরবেলায় শান্তমধুর পরিবেশে বেড়াতে বেরোবার পূর্বে, কিংবা চাঁদনী রাতে হেথা-হোথা চলতে চলতে আপন-ভোলা হয়ে যাওয়ার প্রাক্কালে, কিংবা বন্ধুসমাগমের পূর্বমুহূর্তের প্রতীক্ষাকালে ভিন্ন ভিন্ন উপাসনার প্রয়োজন। শুধু তাই? মিলটন পঠন আরম্ভ করার সময় বিশেষ প্রার্থনা করা উচিত, শেক্সপীয়রের জন্য অন্য উপাসনা এবং 'ফেয়ারি কুইন' পড়ার পূর্বে অন্য এক বিশেষ উপাসনার প্রয়োজন। ভোজনকর্মের চেয়ে এসব জিনিসের মূল্য আমাদের জীবনে অনেক বেশী। প্রার্থনা যদি করতে হয় তবে এগুলোর জন্য আলাদা আলাদা প্রার্থনা তৈরি করে রাখার প্রয়োজন।

ল্যামকে আমি শ্রদ্ধা করি অন্য কারণে। এই কার্যারম্ভের উপাসনা সম্বন্ধে বিবৃতি দেবার সময় তিনি এক জায়গায় বলেছেন, 'হায়! শাক-সবজির জগৎ থেকে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি—ওসব আর খেতে ভালো লাগে না, কিন্তু এখনো যখন এসপেরেগাস সামনে আসে তখন আমার মন মধুর আত্মচিন্তায় নিমগন হয়।' আপ্তবাক্য, আপ্তবাক্য, এ একটা আপ্তবাক্য!

আমার অনুরাগী পাঠকদের বলি, আমার লেখা যে আগের চেয়েও ক্রমাগত খারাপের দিকে যাচ্ছে তার প্রধান কারণ, বহুকাল ধরে এসপেরেগাসের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ নেই। তাজাটার কথা হচ্ছে না, তিনি মাথায় থাকুন, টিনেরটার কথাই বলছি। সরকার আমদানি বন্ধ করে দিয়েছেন। সেঁকো বিষ নাকি এখনো আসে।

খুব অল্প লোকই মুখের লাবণ্য জখম না করে চিবানো কর্মটি করতে পারে।

আমি একটি অপরূপ সুন্দরী অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মহিলাকে চিনতুম। চিবোবার সময় তাঁর দুই চোয়ালের উপরকার ছোট ছোট মাংসপেশীগুলো এমনই ছোট ছোট দড়ির মত পাকিয়ে পাকিয়ে উঠতো যে বোধ করি তিনিও সেটা জানতেন, তাই যতদূর সম্ভব মাথা নিচু করে একদম প্লেটের কাছে ঝুঁকে পড়ে মাংস চিবোতেন। ক্যেটের বেলা দেখলুম, উল্টোটা। খাবার সময় তার মুখের হাসি-খুসি ভাবটা যেন আরো বেড়ে গেল। অবশ্য সে খেল অল্পই। বিয়ার পান করল প্রচুর। উপরে আসবার সময় ঢাউস এক জাগ বিয়ার সঙ্গে এনেছিল।

আমি বললুম, 'অত বিয়ার খাও কেন? দিনের শেষে না হয় এক আধ গেলাস খেলে। ঐ বিয়ার খেয়ে খেয়ে ক্ষিদেটি তো একেবারে গেছে। আমার দেশে অনেকেই চা খেয়ে খেয়ে এ রকম পিত্তি চটায়।'

আশ্চর্য হয়ে শুধালো, 'চা খেয়ে খেয়ে! একজন মানুষ দিনে ক'কাপ চা খেতে পারে?'

আমি বললুম, 'আমার দেশের লোকও ঠিক এই রকম অবাক মেনে শুধোবে, "একজন মানুষ দিনে ক'গেলাস বিয়ার খেতে পারে?"

বিরক্তির সুরে বললে, 'থাক ওসব কথা। তুমি আর পাঁচজনের সঙ্গে গলা মিলিয়ে ঐ একই জিগির তুলো না। সমস্ত দিন ভূতের মত খাটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ঐ বিয়ারই আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। না হলে হুমড়ি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যেতুম।'

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললুম, 'কিন্তু এর তো একটা সরল সমাধানও আছে। তোমাদের 'পাবে' বিস্তর আমদানি, তুমি দেখতে ভালো, বিয়ে করে একটা ভালো লোক এনে তাকে কাজে ঢুকিয়ে দাও না? তোমাদের দেশে তো শুনেছি, এ ব্যবস্থাটা অনেকেরই মনঃপূত!'

ক্যেটের ঐ চড়ুই পাখীর খাওয়া ততক্ষণে শেষ হয়ে গিয়েছে। চেয়ারটা টেবিলের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে, আরেকখানা চেয়ারের উপরে দু পা লম্বা করে দিয়ে ভস্ ভস্ করে সিগারেট টানছিল। হেসে বললে, 'সে এক্সপেরিমেন্ট হয়ে গিয়েছে।'

আমি অবাক হয়ে শুধালুম, 'এই অল্প বয়সে তোমার আবার বিয়ে হল কি করে?'

'দূর পাগলা! আমি না। মা করেছিল এক্সপেরিমেন্টটা। সে তার বাপের একমাত্র মেয়ে। তাই বাবাকে বিয়ে করে এনে সঁপে দিয়েছিল 'পাব'টা তার হাতে।'

আমি শুধালুম, 'তারপর?'

চিন্তা করে বললে, 'সমস্তটা বলা একটু শক্ত। শুনেছি, বাবা কাজকারবার ভালোই করতো। এ ঘরের মত আর সব ঘরেও যে-সব ভালো ভালো আসবাব-পত্র আছে সেগুলো ঐ সময়েই কেনা—বাবা লোকটি শৌখিন। তারপর আমার আর আমার ছোট বোনের জন্ম হল। তারপর বাবার বয়েস যখন চল্লিশ—বাবা

মা'র একই বয়েস—তখন সে মজে গেল এক চিংড়ি মেয়ের প্রেমে, বয়েস এই উনিশ-বিশ। তারপর কি হয়েছিল জানি নে, আমি কিছু কিছু দেখেছি, তবে তখনো বোঝবার মত জ্ঞান-গম্যি হয় নি। শেষটায় একদিন নাকি হঠাৎ মা নিচে এসে 'বারে'র পিছনে দাঁড়াল, 'পাবে'র হিসেবপত্র নিজেই দেখতে আরম্ভ করলো। তখন বাবা নাকি বাড়ি ছেড়ে চলে গেল।'

আমি শুধালুম, 'ডিভোর্স হয়েছিল ?'

বললে, 'না। মা চায় নি, বাবাও চায়নি। কেন চায় নি জানি নে।'

আমি শুধালুম, 'তারপর কি হল ?'

ক্যেটে বললে, 'ঠিক ঠিক জানি নে। তবে শুনেছি, বাবাতে আর ঐ মেয়েতে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। কার নেশা আগে কেটেছিল বলতে পারবো না। তারপর হয়তো বাবা-মা'তে ফের বনিবনা হতে পারতো, কিন্তু হয় নি। বোধ হয় মা-ই চায় নি, অবশ্য আমি সঠিক বলতে পারবো না, কারণ মা আমার নিদারুন আত্মাভিমানিনী—এসব যা বললুম, এর কিছুটা আমার চোখে দেখা, আর কিছুটা পাঁচজনের কাছ থেকে শোনা—মা একদিনের তরে একটি কথাও বলে নি।'

আমি শুধালুম, 'তোমার বাবা—?'

বললে, 'বুঝেছি। মাইল তিনেক দূরে ঐ রুঃযাঙস্‌ডর্ফে থাকে। অবস্থা ভালো নয়, মন্দও নয়। আমার সঙ্গে মাসে ছ'মাসে রাস্তায় দেখা হলে, হ্যাট তুলে আগের থেকেই নমস্কার করে—যেন আমি তার পরিচিতা কতই না সম্মানিতা মহিলা—কাছে এসে কুশলাদিও শুধোয়। বাবার আদবকায়দা টিপ্‌টপ্‌। মায়ের সঙ্গে দেখা হলেও তাই। একবার আমি মায়ের সঙ্গে ছিলুম। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দুজনাতে কথাবার্তাও হল, তারপর যে যার পথ ধরলো।' এক মগ পুরো বিয়ার শূন্য করে বললে, 'তোমার বোধ হয় ঘুম পেয়েছে ?'

আমি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললুম, 'না না, মোটেই না।' আসলে আমার তখন জ্বর-জ্বর ভাব আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, আর সে-সময় সব রক্ত মাথায় উঠে গিয়ে ঘুম দেয় চটিয়ে।

ক্যেটে উঠে বললো, 'জল ধরেছে। এবারে জানলাটা খুলে দিই। দেখবে বৃষ্টিশেষের কী অদ্ভুত সুন্দর ভেজা পাইন-বনের গন্ধ আসছে।'

আমি বললুম, 'এই বিয়ার আর সিগারেটের গন্ধে তোমার তো নাক-মুখ ভরতি, এর ভিতরও সেই অতি সামান্য পাইনের খুশবাই পাও ?' ক্যেটে জানলা খুলে দিয়ে দুই কনুই কাঠের উপর রেখে নিঃশব্দে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। আমি নিবিষ্ট দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলুম, যেন আমাদের দেশের কোনো সুন্দরী নারীমূর্তি পিছন থেকে দেখছি। 'আমাদের দেশের নারীমূর্তি' ইচ্ছে করেই বললুম, কারণ ইয়োরোপীয় ভাস্কররা তাদের নারীমূর্তির পিছনের দিকটা বড় অযত্নে খোদাই করে। 'নিতম্বিনী'র ইংরিজী প্রতিশব্দ নেই।

ফিরে এসে বললে, 'কিছু মনে করো না, তোমাকে জাগিয়ে রাখছি বলে। তা আমি কি করবো, বলো! কাজ শেষ করে খেতে খেতে দেড়টা বেজে যায় তখন আমি কার সঙ্গে সোসাইটি করতে যাব? আমার সঙ্গে রসালাপ করার জন্য কেই বা তখন জেগে বসে'!'

আমি বললুম, 'সে রকম প্রাণের সখা থাকলে সমস্ত রাত জানলার নিচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রহর গোনে। পড়ো নি বাইবেল, তরুণী শোক করছে, তার দয়িত সমস্ত রাত হিমে দাঁড়িয়ে মাথার চুল ভিজিয়ে ফেলেছে বলে! অতখানি না হোক, একটা সাদামাটা ইয়াং ম্যানই যোগাড় করো না কেন?

বুকের কালো জামায় সিগারেটের ছাই পড়েছিল। সেইটে ঠোনা দিয়ে সরাতে সরাতে বললে, 'আমার আছে। না না, দাঁড়াও, ছিল। কি জানি, ছিল না আছে, কি করে বলবো!'

আমি অবাক হয়ে শুধালুম, 'সে কি? এ আবার কি রকম কথা?'

বললে, 'প্রথম যেদিন তাকে ভালোবেসেছিলুম সেদিনকার কথার স্মরণে আজও আমার মনপ্রাণ গভীর শান্তিতে ভরে যায়। আজও যদি তাই থাকতো, তবে এতক্ষণে ছুটে যেতুম না তার বাড়িতে? তাকে ধরে নিয়ে এসে তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতাম এই রাত তিনটেতেও!

॥ ১৫ ॥

ছেলেবেলায় শরচ্চাটুজ্যের আত্মজীবনী-মূলক ভ্রমণ-কাহিনীতে পড়েছিলুম, একদা গভীর রাতে হৃদয়-তাপের ভাপে ভরা একখানা চিঠি লিখে সেই গভীর রাতেই সেখানা পোস্ট করতে যান, কারণ মনে মনে বিলক্ষণ জানতেন, ভোরের আলো ফুটে ওঠার পর সাদা চোখে তিনি ও-চিঠি ডাকে ফেলতে পারবেন না। শরচ্চাটুজ্যে কোনোপ্রকারের নেশা না করে শুধু নিশীথের ভুতে পেয়েই বে-এক্তেয়ার হয়েছিলেন, আর এস্থলে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এতক্ষণে বিয়ার এ-মেয়ের মাথায় বেশ কিছুটা চেপেছে—কাজের জিম্মাদারিতে মগ্ন সচেতন মন ওটাকে ক্যাশ না মেলানো অবধি আমল দেয় নি—এবং জ্বরের তাড়সানিতে আমিও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নই; এখন মেয়েটি কি বলতে যে কি বলে ফেলবে আর পরে নিজের কাছে নিজেই লজ্জিত হবে সেই ভেবে আমি একটু শঙ্কিত হলুম।

হঠাৎ চেয়ারটা কাছে টেনে এনে আমার দিকে ঝুঁকে বললে, 'তুমি ভাবছো, আমি আমার হৃদয়টাকে জামার আস্তিনে বয়ে বয়ে বেড়াই—না? আর যে কেউ একজনকে পেলেই তার কাঁধে মাথা রেখে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে তার কোটের পিছন দিকটা ভিজিয়ে দিই—না?'

আমি অনিচ্ছায় বললুম, 'আর বললেই বা কি? আমরা প্রায় একবয়েসী, তায় আমি বিদেশী, কাল চলে যাবো আপন পথে—'

'কি বললে? কাল চলে যাবে? কি করে যাবে শুনি? আমি কি লক্ষ্য

করি নি যে তোমার জ্বর চড়ছে ? এখন তোমাকে শুতে দেওয়াই আমার উচিত। কিন্তু তাতে কোনো লাভ নেই। জ্বর তার চরমে না ওঠা পর্যন্ত এখন তুমি শুধু এপাশ-ওপাশ করবে, আর মাথা বনবন করে ঘুরবে। তাই কথাবার্তাই বলি। জ্বরের পর অবসাদ যখন আসবে তখন উঠবো।'

আমি এতক্ষণ একটা সুযোগ খুঁজছিলুম আমার এখানে থাকা-খাওয়ার দক্ষিণার কথাটা তুলতে। মোকা পেয়ে বললুম, 'দেখো, ফ্রলাইন ক্যেটে—'

'ফ্রলাইন বলতে হবে না।'

আমি বললুম, 'সুন্দরী ক্যেটে, কাটেরিনা অর্থাৎ ক্যাৎরীন, আমি বেরিয়েছি হাইকিঙে। তুমি আমার কাছ থেকে যত কমই নাও না কেন, 'ইন্', হোটেল 'ক্লাইপে'তে থাকবার মত রেস্ত আমার পকেটে নেই। কালই আমাকে যেতে হবে।'

ক্যেটে আপন মনে একটু হাসলে। তারপর বললে, 'তুমি বিদেশী, তদুপরি গ্রামাঞ্চলে কখনো বেরোও নি। না হলে বুঝতে এটা হোটেল নয়, এখানে রাত্রিবাসের কোনো ব্যবস্থা নেই। এ ঘরটা আমাদের আপন আত্মীয়স্বজনদের জন্য গেস্ট-রুম, এরকম আরো দু'-তিনটে আছে। প্রায় সংবৎসরই ফাঁকা পড়ে থাকে। কিন্তু সেটা আসল কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে, তুমি ভাবছো আমরা 'পাব' চালাই বলে আমাদের আর কোনো লৌকিকতা, সামাজিকতা নেই—দয়া-মায়া, দোস্তি-মহব্বতের কথা না হয় বাদই দিলুম। ভালোই হল। এবার থেকে যখন আমার গড্ফাদার এ ঘরটায় শোবে, তখন সকালবেলা ব্রেকফাস্টের সঙ্গে তাঁকে একটা বিল দেব!'

আমি আর ঘাটালুম না। আমি অপরিচিত, অনাত্মীয় এসব কথা রাত তিনটের সময় সুন্দরী তরুণীর সামনে—তাও নির্জন ঘরে—তুলে কোনো লাভ নেই। আমার শুধু আবছা-আবছা মনে পড়লো, আফ্রিকা না কোথায়, মার্কো পোলো গাছতলায় বসে ভিজছেন আর একটি নিগ্রো তরুণী গম না ভুট্টা কি যেন পিষতে পিষতে মা'কে গান গেয়ে গেয়ে বলছে, 'মা, ঐ বিদেশীকে বাড়ি ডেকে এনে আশ্রয় দিই।' সত্যেন দত্ত গানটির অনুবাদ করেছেন। এবং এ-কথাটাও এ-প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত, খাস নিগ্রোরা সাদা চামড়ার লোককে বড় 'তাচ্ছিল্যে'র দৃষ্টিতে দেখে—আমাদের মত সাদা-পাগলা নয়।

নিগ্রো তরুণীর মায়ের কথায় আমাদের কথার মোড় ঘোরাবার সুযোগ পেলুম। বললুম, 'হোটেল যদি না হয়, তবে এরকম অপরিচিতকে ঘরে আনাতে তোমার মা কি ভাববে ?

পাছে বাড়ির লোক ডিস্টার্বড্ হয় তাই রুমাল দিয়ে মুখ চেপে ক্যেটে তার খল খলানি হাসি থামাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু হাসি আর থামতেই চায় না। আমি বেকুবের মত দাঁড়িয়ে রইলুম।

অনেকক্ষণ পরে গুমরানো হাসি চেপে-ছেড়ে চেপে-ছেড়ে বললে, 'তোমার মত সরল লোক আমি সত্যই কখনো দেখি নি। তোমার কল্পনাশক্তিও একেবারেই নেই। আচ্ছা ভাবো তো, রাত বারোটার সময় তিনটে আধ-মাতাল

মাল্লা যদি আমার 'পাবে' ঢুকে বিয়ার চায়, তখন কি আমি তাদের তাড়িয়ে দিই ? 'সেলার' মানে বাপের সুপুত্তুর নয়। আমিও দেখতে মন্দ না। 'পাব'ও নির্জন। ওরা 'বারে' দাঁড়িয়ে গাল-গল্প এমন কি ফষ্টি-নষ্টির কথা বলবেই বলবে। তখন কি মা এসে আমার চরিত্তরক্ষা করে ?'

আমি আমতা আমতা করে বললুম, 'তা বটে, তা বটেই তো। কিন্তু বল তো, ওরা যদি বিয়ার খেয়ে পয়সা না দিয়ে চলে যেতে চায় তখন তুমি কি করো ?'

হেসে বললে, 'দেখবে ?' তারপর উঠে গিয়ে ঘরের দরজা একটুখানি ফাঁক করে আস্তে আস্তে মাত্র একবার শিস দিলে। অমনি কাঠের সিঁড়িতে কিসের যেন শব্দ শুনতে পেলুম। আর সঙ্গে সঙ্গে দরজা ধাক্কা দিয়ে ঘরে ঢুকলো ভীষণদর্শন বিকটের চেয়েও বিকট ইয়া লাশ এক আলসেশিয়ান। আমার দিকে যে ভাবে তাকালে তাতে আমি লাফ দিয়ে জুতোসুদ্ধ উঠে দাঁড়িয়েছি খাটের উপর। ভয়ে আমার মুখ দিয়ে কথা ফুটছে না যে বলবো, ওকে দয়া করে বের করো। ক্যেটের তবু দয়া হল। কুকুরটাকে আদর করতে করতে বললে, 'না, ব্রুনো ইনি আমাদের আত্মীয়। বুঝলি ?' এবারে আরো বিপদ। ব্রুনো ন্যাজ নাড়তে নাড়তে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন আমার 'প্যার' নেবার জন্য। আমি হাতজোড় করে বললুম, 'রক্ষে করো, নিষ্কৃতি দাও।'

ক্যেটে বললে, 'কিচ্ছু না। শুধু ব্রুনোকে বলতে হয়, ঐ তিনটে লোককে ঠেকা তো। ব্যাস্! সে তখন দরজায় দাঁড়িয়ে তিনটে বেহেড সেলারকে ঠেকাতে পারে। অবশ্য এরকম ঘটনা অতিশয় কালে-কস্মিনে ঘটে। বাপের সুপুত্তুররা তখন সুড়সুড় করে পয়সা দিয়ে পালাবার পথ পায় না। অবশ্য রাইন নদীর প্রায় সব সেলারই পুরুষানুক্রমে এ 'পাব' চেনে। নিতান্ত ডাচ-ম্যান কিংবা ঐ ধরনের বিদেশী হলে পরে আলাদা কথা—তাও তখন 'পাবে' অন্য খদ্দের থাকলে কেউ ওসব করতে যায় না।'

তারপর বললে, 'তুমি এখন একটু ঘুমুবার চেষ্টা করো। আমি তোমাকে একটা নাইট-শার্ট দিচ্ছি।' ঘরের আলমারিতেই ছিল। বললে, 'আমি এখ্-খুনি আসছি।' আমি আর লৌকিকতা না করে কোট-পাতলুন ছেড়ে সেই শেমিজ-পারা নাইট শার্ট পরে লেপের ভিতর গা-ঢাকা দিলুম।

হে মা মেরি! এ কি ? ক্যেটে আরেক জাগ্ বিয়ার নিয়ে এসেছে!

আমি করুণ কণ্ঠে বললুম, 'আর কত খাবে ?'

বিরক্তির সুরে বললে, 'তুমিও ওর সঙ্গে ভিড়লে নাকি?'

আমি বললুম, 'না, বাপু, আমি আর কিছু বলবো না। একদিন, না হয় দুদিনের চিড়িয়া, আমার কোথায় বা সুযোগ কীই বা শক্তি! কিন্তু এবারে তুমি ওর সঙ্গে ভিড়লে নাকি' বললে—সেই ও-টি কে ?'

'অটো। যাকে ভালোবাসি, না বাসি নে বুঝতে পারছি নে। তাই বলেছিলুম, সে আছে কি নেই জানি নে।'

আমি বললুম, 'তুমি বড় হেঁয়ালিতে হেঁয়ালিতে কথা বলো।'

'আঁৎপেই না। আসলে তুমি বিদেশী বলে আমাদের আচার-ব্যবহার সামাজিকতা-লৌকিকতা জানো না। তাই তোমার অনেক জিনিস বুঝতে অসুবিধে হয়, যেগুলো আমাদের দশ বছরের বাচ্চার কাছেও জলের মত তরল। যেমন তুমি হয়তো মনে করেছ আমি 'বার'-এর পিছনে দাঁড়িয়ে বিয়ার বিক্রি করি বলে আমি 'বার-মেড্'। এবং 'বার-মেড'রা যে সচরাচর খদ্দেরকে একাধিক প্রকারে তুষ্ট করতে চায়—প্রধানত অর্থের বিনিময়ে—সেটাও কিছু গোপন কথা নয়। বিশেষত শহরে। গ্রামে ঠিক ততখানি নয়। আমি যদি এখানে কাজের সাহায্যের জন্য ঠিকে নিই, তবে সে আমাদের চেনাশোনারই ভিতরে বলে অতখানি বে-এক্তেয়ার হতে সাহস পাবে না। আর আমি, আমার মা-বোন, দাদামশাই আমরা 'পাব'-এর মালিক। আমরা যদি মুদি, দরজী বা গারাজের মালিক হতুম তা হলে আমাদের সমাজ আমার কাছ থেকে যতখানি সংযম আশা করতো এখনো তাই করে। অবশ্য বাড়িতে ব্যাটাছেলে থাকলে সে-ই 'বার'-এর কাজ করতো, ভিড়ের সময় মা-বোনেরা একটু-আধটু সাহায্য করতো। মুদি কিংবা কসাইকে যেমন তার বউ-বেটি সাহায্য করে থাকে।' তারপর হঠাই এক ঝলক হেসে নিয়ে বললে, 'তুমি ভাবছো, আমি স্নব,—না? জাতের দেমাক করছি! আমি 'বার-মেডের' মত ফ্যালনা নই—রীতিমত খানদানী মনিষ্যি,—না?'

॥ ১৬ ॥

আমি চুপ। যে-মেয়ে মাতাল সেলারদের সামলায় আমি তার সঙ্গে পারবো কেন?

ক্যেটে বললো, 'তবে শোনো,—

আচ্ছা বলো তো, তোমার কখনো এমনধারা হয়েছে, যে-জিনিস দেখে দেখে সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলে সে হঠাৎ একদিন দেখা দিল অপরূপ নবরূপ নিয়ে? এই যে দিক্‌ধেড়েঙ্গে অটো-টা, চুল ছাঁটা যেন পিনকুশনের মাথাটা, হাত দু'খানা যেমন বেঢপ বেঁটে—থাক গে, বর্ণনা দিয়ে কি হবে—একে দেখে আসছি যবে থেকে জ্ঞান হয়েছে, ইস্কুলে গিয়েছি ফিরেছি একসঙ্গে, কখনো মনে হয় নি পাড়ার আর পাঁচটা বাঁদর আর এ বাঁদরে কোনো তফাত আছে, অথচ হঠাৎ একদিন তার দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল, এ কাকে দেখছি? সে সুন্দর কিনা, কুশ্রী কিনা, কিছুই মনে হল না, শুধু মনটা যেন মধুতে ভরে উঠলো আর মনে হল, এ আমার অটো, একে আরো আমার করতে হবে।

তুমি বিশ্বাস করবে না, ঠিক সেই মুহূর্তেই সেও আমার দিকে এমন ভাবে তাকালে যে আমি নিঃসন্দেহে বুঝতে পারলুম, সেও ঠিক ঐ কথাটিই ভেবেছে।

আর এমন এক নতুন ভাবে তাকালো যে আমার লজ্জা পেল। আমার মনে

হল, পুলওভারটার উপর কোটটা থাকলে ভাল হত।

আচ্ছা, বলো তো, এ কি একটা রহস্য নয়! যেমন মনে করো, তুমি আমার একখানা বই দেখে মুগ্ধ হয়ে বললে, 'চমৎকার বই!' আমি কি তখন তোমাকে সেটি এগিয়ে দেব না, যাতে করে তুমি আরো ভালো করে দেখতে পার?'

চুপ করে উত্তরের প্রতীক্ষা করছে বলে বললুম, 'আমি কি করে বলবো? আমি তো ব্যাটাছেলে।'

বললে, 'অন্য দিন ইস্কুল থেকে ফিরে বাড়ির কাজে লেগে যাই, আজ বারবার মনে হতে লাগল, যাই একবার অটোকে দেখে আসি। যাওয়া অত্যন্ত সোজা। কোনো অছিলারও প্রয়োজন নেই। তার দু দিন আগেই তো এক বিকেলের ভিতর মা আমায় অটোদের বাড়িতে পাঠিয়েছে তিন-তিনবার—এটা আনতে, সেটা দিতে। তা ছাড়া ইস্কুলের লেখাপড়া নিয়ে যাওয়া-আসা তো আছেই। কিন্তু তবু কেন, জানো, যেতে পারলুম না। প্রতিবারে পা বাড়িয়েই লজ্জা পেল। খুব ভাল করেই জানি মা কিছু জিজ্ঞেস করবে না, তবু মনে হল, মা বুঝি শুধোবে, 'এই! কোথা যাচ্ছিস?' আর জিজ্ঞেস করলেই বা কি? কতবার বেরোবার সময় নিজের থেকেই তো বলেছি, 'মা, আমি ঝপ করে এই অটোদের বাড়ি একটুখানি হয়ে আসছি।' মা হয়তো শুনতেই পেত না।

তবু যেতে পারলুম না। আর সর্বক্ষণ মনে হল, মা যেন কেমন এক অদ্ভুত নূতন ধরনে আমার দিকে তাকাচ্ছে।

অন্য দিন বালিশে মাথা দিতে না দিতে আমার ঘুম বেঘোর। আজ প্রহরের পর প্রহর গির্জে-ঘড়ির ঘণ্টা শুনে যেতে লাগলুম রাত বারোটা পর্যন্ত। আর মনে হল সুস্থ মানুষ বিনিদ্রদের কথা চিন্তা করে ঘড়ির ঘণ্টা বানায় নি। সন্ধ্যাটা ছ'টা ঘণ্টা দিয়ে শুরু না করে যদি একটা ঘণ্টা দিয়ে শুরু করতো তবে রাত বারোটায় তাকে শুনতে হত মাত্র ছ'টা ঘণ্টা। এখন পৃথিবীতে যা ব্যবস্থা তাতে যাদের চোখে ঘুম নেই তাদের সেই ঠ্যাং-ঠ্যাং করে বারোটার ঘণ্টা না শোনা অবধি নিষ্কৃতি নেই।

তারপর আরম্ভ হল জোর ঝড়-বৃষ্টি। ঝড়ের শোঁ-শোঁ আওয়াজ আর খড়-খড়ি জানলার ঝড়ঝড়ানি আমার শুয়ে শুয়ে শুনতে বড় ভালো লাগে, কিন্তু আজ হল ভয়, কাল যদি এরকম ঝড় থাকে তবে মা তো আমাকে ইস্কুলে যেতে দেবে না। অটোকে দেখতে পাবো না। পরখ করে নিতে পারবো না, সে আবার তার পুরনো চেহারায় ফিরে গিয়েছে, না আজ যে-রকম দেখতে পেলুম সেই রকমই আছে।

সব মনে আছে, সব মনে আছে, প্রত্যেকটি কথা আমার মনে আছে।'

ক্যেটে বোধ হয় আমার মুখে কোনো অবিশ্বাসের চিহ্ন দেখতে পেয়েছিল তাই এ-কথা বললো। আমি ভাবছিলুম, বেশী বিয়ার খেলে মানুষের স্মৃতি-শক্তি তো দুর্বল হয়ে যায়, এর বেলা উল্টোটা হল কি করে? হবেও বা। পায়ে কাঁটা ফুটলে বড্ড লাগে, কিন্তু পাকা ফোড়াতে সেই কাঁটা ফুটিয়ে দিয়েই তো মানুষ আরাম পায়। বললুম, 'তুমি বলে যাও। প্রেম বড় অদ্ভুত জিনিস!'

ক্যেটে অনেকক্ষণ ধরে বিয়ারে চুমুক দেয় নি, সিগারেটও ধরায় নি। প্রেমে তো নেশা আছে বটেই, প্রেমের স্মরণেও নেশা—অন্য নেশার প্রয়োজন হয় না!

ক্যেটে বললে, 'আশ্চর্য', এবং তুমিও বিশ্বাস করবে না, আমি তখনো বুঝতে পারি নি, কবিরা একেই নাম দিয়েছেন প্রেম। প্রেমের যা বর্ণনা কবিরা দিয়েছেন তাতে আছে, মানুষের সর্বসত্তা নাকি তখন বিরাটতর চৈতন্যলোকে নিমজ্জিত হয় এবং পরমুহূর্তেই সে নাকি নভোমণ্ডলে উড্ডীয়মান হতে হতে দ্যুলোক সুরলোক হয়ে হয়ে ব্রহ্মাণ্ডাতীত লোকে লীন হয়ে যায়; আর আমি ভাবছি, কাল যদি ঝড় হয় তবে আমি ইস্কুল যাব কী করে? দুটো যে একই জিনিস জানবো কি করে?

পরদিন দেখি, আকাশ বাতাস সুপ্রসন্ন। আসন্ন বর্ষণেরও কোনো আভাস নেই।

অন্যদিন মায়ের তাড়া খেতে খেতে হন্ত-দন্ত হয়ে শেষ মুহূর্তে বাড়ি থেকে বেরোতুম, ইস্কুল যাবার জন্যে ছোট বোন বিরক্ত হয়ে আগে বেরিয়ে যেত, আজ আমি এক ঘণ্টা আগে থেকে তৈরী। অন্য দিন জুতোতে কালি-বুরুশ লাগাবার ফুরসৎ কোথায়? আজ ফিটফাট। আমি জামা-কাপড় সম্বন্ধে চিরকালই একটু উদাসীন—অন্য মেয়েদের মত নই—আর ওয়ার্ডরোবের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হল এ যেন সার্কাসের সঙের ওয়ার্ডরোব খুলেছি।'

আমি বললুম, 'তোমাকে সাদা-মাটা কাপড়েই এত সুন্দর দেখায় যে বাহারে জামা-কাপড় পরলে যে আরো শ্রীবৃদ্ধি হবে তা আমার মনে হয় না। এক লিটার বিয়ারের মগে এক লিটারই ধরে। সস্তা বিয়ার দিয়ে না ভরে দামী শ্যাম্পেন দিয়ে ভরলেও তাই।'

ক্যেটে বললে, 'থ্যাংকস্।' সুন্দরী বলাতে ইতিমধ্যে দুবার তাড়া খেয়েছি। এবার দেখি, সে মোলায়েম হয়ে গিয়েছে।

বললে, 'অটোও এখন বলে আমাকে সাদা-মাটাতেই ভালো দেখায়।' একটু করুণ হাসি হাসলে।

ক্যেটে যে 'এখন' কথাটাতে বেশ জোর দিয়েছে সেটা আমায় এড়িয়ে যায় নি। তাই শুধালুম, 'অটো 'এখন' বলে, কিন্তু আগে কি অন্য কথা বলতো?'

'সেই 'তখন' আর 'এখনের' কথাই তো হচ্ছে। সেটাই প্রায় শেষ কথা। একটু সবুর করো। না, তাড়াতাড়ি শেষ করে দেব?'

আমি বললুম, 'দোহাই তোমার সেটি ক'রো না। পরের দিন সকালবেলা কি হল, তাই বলো।'

'এক ঘণ্টা আগের থেকে তৈরী অথচ বেরোবার সময় যতই এগিয়ে আসতে লাগল, আমার পা যেন আর নড়তে চায় না। এদিকে বোন খুশী হয়েছিল, আজ আমার সঙ্গ পাবে বলে। সে বার বার বলে, "চলো, চলো," আর আমি তখন বুঝতে পেরেছি, কি ভুলটাই না করেছি! বোন সঙ্গে থাকবে—ওদিকে অটোকে একা পেলেই ভালো হত না? অত সাততাড়াতাড়িতে তৈরী না হলে বোন বেরিয়ে গেলে অটোতে আমাতে, শুদ্ধ আমরা দুজনাতে একসঙ্গে যেতে

পারতুম। অবশ্য এমনটাও আগে হয়েছে যে আমার দেরি দেখে বোন বেরিয়ে গিয়েছে, এবং তারপর আরো দেরি হওয়াতে অটোও আমার জন্য অপেক্ষা করে নি। কিন্তু তখন তো আমি অটোর জন্য থোড়াই পরোয়া করতুম!

শেষটায় বোনের সঙ্গেই বেরুতে হল। ঘরে বসে থাকবার তো আর কোনো অছিলা নেই। ওদিকে আবার ভয়, বেশী দেরি দেখে অটো যদি একা চলে যায়।

দূর থেকে দেখি, অটো রাস্তায় দাঁড়িয়ে।

এবং আশ্চর্য! পরেছে রবিবারে গির্জে যাবার তার ব্লু সার্জের পোশাকী স্যুট। এটা এতই অস্বাভাবিক যে বোন পর্যন্ত চেঁচিয়ে শুধোলে, 'এ কি অটো, রব্বারের স্যুট কেন?'

'অটোর রব্বারের স্যুট পরা নিয়ে সেদিন কী হাসাহাসি! অটোটাও আকাট। কাউকে বলে ইস্কুলে ছুটির সঙ্গে সঙ্গে সোজা মামাবাড়ি যাবে, কাউকে বলে পাদ্রী সায়েবের কাছে যাবে। আরে বাপু, যা বলবি একবার ভেবে-চিন্তে বলে নে না।

আমি কিন্তু হাসি নি। অটো রাজবেশে সেজেছিল, তার রাজরানীর সঙ্গে দেখা করার জন্যে—আর আমি রাজরানী সেজেছিলুম, আমার রাজার সঙ্গে দেখা হবে বলে।'

আমি বললুম, 'ক্যেটে, এটা ভারী সুন্দর বলেছ।'

ক্যেটে বললে, 'শীতকালে যখন দিনের পর দিন অনবরত বরফ পড়ে, রাইনেও জাহাজ আঁধা-বোটের চলাচল কমে যায়, খদ্দের প্রায় থাকেই না, তখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা দিনের পর দিন কাটে 'পাবে'র কাউণ্টারের পিছনে বসে বসে। তখন মন যে কত আকাশ-পাতাল হাতড়ায়, কত অসম্ভব অসম্ভব স্বপ্ন দেখে, অটোকে বলার জন্য সুন্দর সুন্দর নূতন নূতন তুলনা ছলনা খোঁজে, সেটা বলতে গেলে দশ মিনিটের ভিতরেই শেষ হয়ে যাবে, অথচ আমি ভেবেছি, দুই আড়াই তিন বছর ধরে।'

আমি বললুম,

'কেটেছে একেলা বিরহের বেলা
আকাশ কুসুম চয়নে
সব পথে এসে মিলে গেল শেষে
তোমার দু'খানি নয়নে॥'

ক্যেটে পড়াশুনোয় বোধ হয় এককালে ভালোই ছিল, অন্তত লিরিকে যে তার স্পর্শকাতরতা আছে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আর এ-জিনিসটা তো লেখাপড়া শেখার উপর খুব একটা নির্ভর করে না। রাগরাগিনী-বোধ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সাড়া দেওয়া এসব তো ইস্কুল শিখিয়ে দিতে পারে না, যার গোড়া থেকে কিছু আছে তারই খানিকটে মেজেঘষে দিতে পারে মাত্র।

সব চেয়ে তার ভাল লাগল এ আকাশ-কুসুম-চয়ন ব্যাপারটা।

আমি বললুম, 'জানো, ঐ সমাসটা আমার মাতৃভাষায় এমনই চালু যে

ওটা দিয়েও নূতন করে রসসৃষ্টি করা যায়, এ রকম আকাশ-কুসুম-চয়ন মহৎ কবিই করতে পারেন। এই যে রকম সকলের কাছে সাদা-মাটা অটো হঠাৎ একদিন তোমার কাছে নবরূপে এসে ধরা দিল।

'তারপর ?'

'ইস্কুল ছাড়ি আমি দুজনাতে একসঙ্গেই। আমি পাবে ঢুকলুম। অটো রেমাগেনে এপ্রেন্টিসিতে।

সময় পেলেই 'পাবে' ঢু মেরে আমাকে দেখে যেত। আর শনির সন্ধ্যা থেকে সোমের সকাল অবধি ছিল আমাদের ছুটি—মা তখনো 'পাবে'র কাজ সম্পূর্ণ ছেড়ে দেয় নি। সে সময় পায়ে হেঁটে, বাইসিক্লে, ট্রেনে বাসে আমরা এদেশটা ইঞ্চি ইঞ্চি করে চষেছি। শেষটায় অটো কিনলো একটা ক্যাম্বিসের পোর্টেবল, কলাপসিবল্ নৌকো। তাতে চড়ে উজানে লিন্‌ৎস থেকে ভাটিতে কলোন পর্যন্ত কত বারই না আসা-যাওয়া করেছি। শুধু আমরা দুজনা, আর কেউ না। গরমের দুপুরে ননেন্‌বের্ট দ্বীপে—ঐ তো রাইন দিয়ে একটু ভাটার দিকে—গাছতলায় শুয়ে শুয়ে, পোকার উৎপাতে মুখ রুমাল দিয়ে ঢেকে, জ্যোৎস্নারাতে নৌকো স্রোতের হাতে ছেড়ে দিয়ে, বরফের ঝড়ে আটকা পড়ে গ্রামের ঘরোয়া 'পাব' বা 'ইনে' কাটিয়েছি রাত। দুজনাতে নিয়েছি দুটি ছোট কামরা। শেষরাতে ঘুম ভাঙলে মাঝখানের দেয়ালে টোকা দিয়ে অটোকে জাগিয়েছি, কিংবা সে আমাকে জাগিয়েছি। জেলের কয়েদীরা যে রকম দেয়ালে টোকা দিয়ে সাংকেতিক কথা কয়, আমরাও সেই রকম একটা কোড্ আবিষ্কার করেছিলুম। আর সমস্তক্ষণ মনে মনে হাসতুম, সে অনায়াসে আমার ঘরে আসতে পারে, আমি তার ঘরে যেতে পারি—তবু বড় ভালো লাগত এই লুকোচুরি।

ইস্কুলে থাকতে অটো কালেকস্মিনে একটু-আধটু বিয়ার খেত—সে কিছু ধর্তব্যের মধ্যে নয়। চাকরি পেয়ে সে আস্তে আস্তে মাত্রা বাড়ালো। আমিও সঙ্গে সঙ্গে খেতে লাগলুম। তারপর একদিন তার মাত্রা এমন জায়গায় গিয়ে পেঁছিল যার তুলনায় আমার আজকের বিয়ার খাওয়া নিতান্ত 'জলযোগ'ই বলা যেতে পারে। অর্থাৎ শনির সন্ধ্যা থেকে সোমের সকাল অবধি সর্বদাই ঢুলুঢুলু নয়ন।

আমি মন্তব্য করি নি, বাধাও দিই নি। যতখানি পারি তাকে সঙ্গ দিতুম।

তারপর একদিন হল এক অদ্ভুত কাণ্ড। পড়ল কোন্ এক টেম্পারেন্স না কিসের যেন পাদ্রীর পাল্লায়। তাদের নাকি সব রকম মাদক দ্রব্য বর্জন করা ধর্মেরই অঙ্গ! আমরা ক্যাথলিক। মদ খাই—বাড়াবাড়ি না করলেই হল। আর ফ্রান্‌ৎসিস্‌কানর, বেনেডিক্‌টিনার এসব ভালো ভালো লিক্যোর তো আবিষ্কার করেছে পাদ্রী সায়েবরাই। আমাদের গাঁয়ের পাদ্রী সায়েবের 'সেলারে' যে মাল আছে তা আমার 'পাবে'র চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

অটো দুম্ করে মদ ছেড়ে দিল। আমি খেলে আমার দিকে আড়নয়নে তাকায়। এ আবার কী!

মদ সিগরেট কোন-কিছু একটা হঠাৎ ছেড়ে দিলে মানুষ খিটখিটে হয়ে যায়। অটো আমাকে ভালোবাসতো বলে সেটা যতদূর সম্ভব চাপবার চেষ্টা করতো। আমি টের পেতুম।

জানি নে পুরোনো অভ্যাসবশত, না কর্তব্যজ্ঞানে সে তখনো আমার সঙ্গে শনি রবি বাইরে যায়, কিন্তু কেমন যেন আর জমতে চায় না। একদিন তো বলেই ফেললে, আমার মুখে বিয়ারের গন্ধ।

শোন কথা! দুদিন আগেও দুদণ্ড চলতো না তোমার যে বিয়ার না খেয়ে, সেই বিয়ারে তুমি পাও এখন গন্ধ!

তখন—এখন না—তখন ইচ্ছে করলে আমি বোধ হয় বিয়ার ছাড়তে পারতুম, কিন্তু আমার মনে হল, এ তো বড় এক অদ্ভুত ন্যাকরা। আমাকে তুমিই খেতে শেখালে বিয়ার, আর এখন তুমি হঠাৎ বনে গেলে বাপের সুপুত্তুর! এখন বিয়ারের গন্ধে তোমার বাইবেল অশুদ্ধ হয়!'

আমি বললুম,

'জাতে ছিল কুমোরের ঝি,
সরা দেখে বলে "এটা কি"?'

ক্যোটেকে প্রবাদটা বোঝাতে বেশীক্ষণ লাগে নি।

ক্যেটে বললে, 'ভুল করলুম না ঠিক করলুম জানি নে—আমি ভাবলুম, এ রকম ন্যাকামোকে আমি যদি এখন লাই দিই, তবে ভবিষ্যতে কত-কিছুই না হতে পারে! একদিন সে ন্যুডিস্ট কলোনিতে মেম্বার হতে চেয়েছিল, আমি বাধা দিয়েছিলুম—কেমন যেন ও জিনিসটা আমার বাড়াবাড়ি বলে মনে হয় —পরে সে বলেছিল, আমি বাধা দিয়ে ভালোই করেছিলুম। এখন যে তাই হবে না, কে জানে?

ইতিমধ্যে এল আরেক গেরো।

বলা-নেই, কওয়া-নেই হঠাৎ একদিন এসে বলে, সে পাদ্রী হবে, সে নাকি ভগবানের ডাক শুনতে পেয়েছে। আমি তো গলাভর্তি বিয়ারে হাসির চোটে বিষম খেয়ে উঠেছিলুম। শেষটায় ঠাট্টা করে শুধিয়েছিলুম, 'পৃথিবীতে কত শত অটো আছে। তুমি কি করে জানলে, আকাশবাণী তোমার জন্যই হয়েছে!'

রাগে গরগর করতে করতে অটো চলে গেল।

অর্থাৎ তা হলে আমাদের আর বিয়ে হতে পারে না।

সেই থেকে এই তিন মাস ধরে চলেছে টানপোড়েন। পর পর দুই শনি যখন এটা ওটা অছিলা করে আমার সঙ্গে এক্‌সকার্শনে বেরলো না, তখন আমিও আর চাপ দিলুম না। এখন মাঝে মাঝে রাত দশটা-এগারোটাই 'পাবে' এসে এক কোণে বসে, আর বিশ্বাস করবে না, লেমনেড—হ্যাঁ হ্যাঁ, লেমনেড খায়! আমি বিয়ার হাতে তার পাশে গিয়ে বসি।

ধর্ম আমি মানি। খৃষ্টে আমার বিশ্বাস আছে। কিন্তু ধর্মের এ কী উৎপাত আমার উপর! আমি 'পাব'-ওয়ালীর মেয়ে। আমার ধর্ম বিয়ারে ফাঁকি না দেওয়া, যে বানচাল হবার উপক্রম করছে তাকে আর মদ না বেচে বাড়িতে

পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা, মা-বোনের দেখ-ভাল করা—আমি নান্ হতে যাব কোন দুঃখে !

তবু জানো, এখনো আমি তার পদধ্বনির প্রতীক্ষা করি।'

ক্যেটের গলায় কি রকম কি যেন একটা জমে গেছে। 'তুমি ঘুমোও' বলে আলো নিবিয়ে দিয়ে হুট্ করে চলে গেল।

॥ ১৭ ॥

পড়ল পড়ল বড় ভয়
পড়ে গেলেই সব সয়।

ভোরের দিকে ভয় হয়েছিল, বৃষ্টিতে ভেজার ফলে যদি আরো জ্বর চড়ে ! চড়লোও। তখন সর্ব দুর্ভাবনা কেটে গেল। এবার যা হবার হবে। আমার কিছু করবার নেই।

সকালে ঘুম ভাঙতেই কিন্তু সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেছিলুম, খাটের পাশের চেয়ারে আমার সব জামা-কাপড় পরিপাটি ইস্ত্রি করে সাজনো, ড্রাইক্লিনিঙেরও পরশ আছে বোঝা গেল। ধন্যি মেয়ে ! কখনই বা শুতে গেল, আর কখনই বা সময় পেল এ-সব করবার ?

কিন্তু আমার টেম্পারেচার দেখে সে যায় ভিরমি। আমি অতি কষ্টে তাকে বোঝালুম, এ-টেম্পারেচার জর্মানিতে অজানা, কারণ এটা খুব সম্ভব আমার বাল্য-সখা ম্যালেরিয়ার পুনরাগমন।

এবারে ক্যেটে সত্যিই একদম ফ্যাকাশে হয়ে গেল। 'ম্যা—লে—রি—য়া ? ওতে শুনি পুবের দেশে প্রতিদিন হাজার হাজার লোক মরে !'

আমি ক্যেটের হাত আমার বুকের উপর রেখে বললুম, 'তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, আমি মরবো না। তদুপরি, আমাদের এতে কিছু করবার নেই। বন, কলোন্ কোথাও কুইনিন পাওয়া যায় না। বন্-এ আমার এক ভারতীয় বন্ধুর ম্যালেরিয়া হয়েছিল ; তখন হলাণ্ড থেকে কুইনিন আনাতে হয়েছিল, কারণ ডাচদের কাজকারবার আছে জ্বরে-ভর্তি ইণ্ডোনেসিয়ার সঙ্গে।'

ক্যেটে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, 'তাহলে হলাণ্ডে লোক পাঠাই !'

আমার দেখি নিষ্কৃতি নেই। বললুম, 'শোনো, ক্যেটে, আমার ডার্লিং, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, আজ না হোক, কাল সকালেই আমার জ্বর নেবে যাবে। তখন তুমি যাবে সত্যসত্যই ভিরমি। কারণ টেম্পারেচার অতখানি নামেও না এদেশে কখনো—৩৬ সেণ্টিগ্রেড। যদি না নামে তবে কথা দিচ্ছি, তুমি হলাণ্ডে লোক পাঠাতে পারো।'

'তাহলে ওঠো, ব্রেক-ফাস্ট খাও।'

এই জর্মনদের নিয়ে মহা বিপদ। প্রথমত, এদের অসুখ বিসুখ হয় কম। পেটের অসুখ তো প্রায় সম্পূর্ণ অজানা—যেটা কি না প্রত্যেক বাঙালীর বার্থ-

রাইট—! আর যদি বা অসুখ করলো, তখন তারা খায় আরো গোগ্রাসে। ডায়েটিং বলে কোন প্রক্রিয়া ওদেশে নেই, উপোস করার কল্পনা ওদের স্বপ্নেও আসে না। ওদের দৃঢ়তম বিশ্বাস, অসুখের সময় আরো ঠেসে খেতে হয় যাতে করে রোগা গায়ে গত্তি লাগে!

একেই কোনো মেয়ে ছলছল নয়নে তাকালে আমি অস্বস্তি বোধ করি, তদুপরি এ মেয়ে অপরিচিতা, বিদেশিনী। এবং সব চেয়ে বড় আশ্চর্য লাগলো, যে মেয়ে রায়বাঘিনীর মত মাতাল 'সেলার'-দের ভেড়ার বাচ্চার মত গণনা করে, তার এই এত সুকোমল দিকটা এল কোত্থেকে? তখন মনে পড়ল, কে যেন বলেছিল, 'কাঁসুড়ের ছেলের পায়ে কাঁটা ফুটলে সে কি বিচলিত হয় না?'

ক্যেটেকে বললুম, 'তুমি দয়া করে তোমার 'পাব্' সামলাও গে। আর শোনো, যাবার পূর্বে আমাকে একটি চুমো খাও তো!'

এবারে ক্যেটের মুখে হাসি ফুটলো। আমার দুই গালে দুটি বমু-শেল ফাটাবার মত শব্দ করে দুটি চুমো খেয়ে যেন নাচতে নাচতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রুচিবাগীশ পাঠকদের বলে রাখা ভালো, এদেশে গালে চুমো খাওয়াটা স্নেহ হৃদ্যতার প্রতীক। ঠোঁটের ব্যাপার প্রেম-ট্রেম নিয়ে। যস্মিন্ দেশাচার। ক্যেটে নিশ্চিন্ত হয়ে কাজে গেল—আমি বিদেশী নই, আমি ওদেরই একজন। এই যে-রকম কোনো সায়েব যদি আমাদের বাড়িতে খেতে খেতে হঠাৎ বলে ওঠে, 'দুটো কাঁচা লংকা দাও তো, ঠাকুর'—তা হলে আমরা যেরকম নিশ্চিন্ত হই।

* * *

জ্বর কমেছে। পাবে এসে বসেছি। জামাকাপড় ইস্ত্রি করা ছিল বলে ভদ্রলোকের মতই দেখাচ্ছিল। ক্যেটে 'পাব্-কীপারের' মত কেতা-দুরুস্ত কায়দায় আমাকে শুধোলে, 'আপনার আনন্দ কিসে!' সঙ্গে আবার মৃদু হাস্য—'আপন-প্রিয়' বান্ধবীর মত।

আমি বললুম, 'বুইয়োঁ—বুইয়োঁ' ঘনচর্বির শুরুয়া। ওতে আর কিছু থাকে না। ক্যেটে আরো পুরো-পাক্কা নিশ্চিন্ত হল—আমি খাঁটি জর্মন হয়ে গিয়েছি। আশ্চর্য, সর্বত্রই মানুষের এই ইচ্ছা—বিদেশীকে ভালো লাগে, কিন্তু তার আচার-ব্যবহার যেন দিশীর মত হয়।

বুইয়োঁ দিতে দিতে বললে, 'অটোকে খবর দিয়েছি।'

খানিকক্ষণ পরেই অটো এল।

স্বীকার করছি, প্রথম দর্শনেই ওকে আমার ভাল লাগে নি। জর্মনে যাকে বলে 'উন-আপেটীটলিষ্'—অর্থাৎ 'আন-এপিটাইজিং'। পাঠক চট করে বলবেন, 'তা তো বটেই। এখন তুমি ক্যেটেতে মজেছ! সপত্নীকে আনএপিটাইজিং মনে হবে বইকি।' আমি সাফাই গাইব না, কিন্তু তবু বলি, এটুকু ছোকরার মুখে 'ধর্ম-ধর্ম' ভাব আমার বেখাপ্পা বেমানান, এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে সিফ ভণ্ডামি বলে মনে হয়। অটো ফ্রন্টাল এটাক করলে। পাদ্রীরা যা আকছারই করে থাক। খুব সম্ভব, আমিই তার পয়লা শিকার। অন্য জর্মন যেখানে

ব্যক্তিগত প্রশ্ন শন্ধোয় না, সেখানে পাদ্রীদের চক্ষনলজ্জা অল্পই। পরে অবশ্য অনেকেই পোড় খেয়ে শেখে। শন্ধালে, 'আপনি খৃষ্টান নন?'

বললন্ম, 'আমি খৃষ্টান নই, কিন্তু খৃষ্টে বিশ্বাস করি।'

সাত হাত পানিমে'। শন্ধালে, 'সে কি করে হয়?'

আমি বললন্ম, 'কেন হবে না? খৃষ্টান বিশ্বাস করে, প্রভু যীশন্ই একমাত্র ত্রাণকর্তা। সেই একমাত্র ত্রাণকর্তাকে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ না করলে মানন্ষ অনন্তকাল নরকের আগন্নে জবলবে। আমি বিশ্বাস করি, প্রভু বন্দ্ধ, হজরৎ মহম্মদে বিশ্বাস করেও ত্রাণ পাওয়া যায়। এমন কি কাউকে বিশ্বাস না করে আপন চেষ্টাতেও ত্রাণ পাওয়া যায়।'

গিলতে তার সময় লাগলো। বললে, 'প্রভু যীশন্ই একমাত্র ত্রাণকর্তা।'

আমি চুপ করে রইলন্ম। এটা একটা বিশ্বাসের কথা। আমার আপত্তি করার কি আছে।

কিন্তু এর পর যা আরম্ভ করলো সেটা পীড়াদায়ক। সর্ব ধর্মের মিশনারিই একটুখানি অসহিষ্ণু হয়। তাদের লেখা বইয়ে পরধর্মের প্রচুর নিন্দা থাকে। মিস মেয়োর বইয়ের মত। অতি সামান্য অংশ সত্য, বেশীর ভাগ বিকৃত সত্য, কেরিকেচার। গোড়ার দিকে আমি এ-সব জানতুম না। আমি বন্-এ যে পাড়াতে থাকি তারই গির্জাতে প্রতি রববারে যেতুম বলে গির্জার পাদ্রী আমাকে একখানা ধর্মগ্রন্থ দেন। তাতে পরধর্ম নিন্দা এতই বেশী যে মনে হয় মিস মেয়ো এ-বইখানাও লিখেছেন। অবশ্য এ-কথাও সত্য মানন্ষের ভদ্রতা জ্ঞান যত বাড়ছে এ-সব লেখা ততই কমে আসছে। একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারি; ষাট সত্তর বছর আগে আমাদের দেশের খবরের কাগজে, মাসিকে তর্কাতর্কির সময় যে সৌজন্য দেখানো হত আজ আমরা তার চেয়ে অনেক বেশী দেখাই। এবং এ-কথাও বলে রাখা ভালো যে এ-সংসারে হাজার হাজার মিশনারি আছেন, যাঁরা কখনো পরনিন্দা করেন না। শত শত মিশনারি পরধর্মের উত্তম উত্তম গ্রন্থ আপন মাতৃভাষায় অনন্বাদ করে আপন আপন ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে-ছেন, দন্ই ধর্মকে একে অন্যের কাছে টেনে এনেছেন।

কিন্তু এই গ্রামের ছেলে অটো এসব জানবে কোথা থেকে? সে কখনো নিগ্রোদের নিন্দা করে, কখনো পলিনেশিয়াবাসীর, কখনো, বা হিন্দন্-মন্সলমানের। এ সবই তার কাছে বরাবর।

আমি এক জায়গায় বাধা দিয়ে বললন্ম, হ্যের অটো! অন্যের পিতার নিন্দা না করে কি আপন পিতার সন্খ্যাতি গাওয়া যায় না?'

বেশ গরম সন্রে বললে, 'আমি অসত্যের নিন্দা করছি।'

আমি বিনীত কণ্ঠে বললন্ম, 'প্রভু যীশন্ বলছেন, ভালোবাসা দিয়ে পাপী-তাপীর চিত্ত জয় করবে।'

ক্যেটে লম্বা এক ঢোক বিয়ার গিলে, গেলাসটা ঠক করে টেবিলে রেখে বললে, 'হক্ কথা।'

'স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে ঘটেছে সংগ্রাম'—কিন্তু যখন সংগ্রামটা স্বার্থে স্বার্থে না হয়ে আদর্শে আদর্শে হয় তখন সেটা হয় আরো দীর্ঘস্থায়ী এবং প্রাণঘাতী। কারণ খাঁটি মানুষ অনায়াসে স্বার্থ ত্যাগ করতে রাজী হয় কিন্তু আদর্শ বর্জন করতে রাজী হয় না।

অটোকে যদিও প্রথম দর্শনে আমার ভালো লাগে নি, তবু তর্ক করতে করতে স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, সে খাঁটি। সে স্থির করেছে, সর্বস্ব ত্যাগ করে ধর্মপ্রচার করবে। সেটা যে ক্যেটের স্বার্থের সঙ্গে সংঘাতে এসেছে তা নয়—ক্যেটেও খাঁটি মেয়ে, স্বার্থত্যাগ করতে প্রস্তুত—ক্যেটে দেখছে, তার মার বয়েস হয়েছে, তার ছোট বোনকে ভালো যৌতুক দিয়ে বিয়ে দিতে হবে, পরিবারের মঙ্গল কামনা তার আদর্শ। দুই আদর্শ-সংঘাত! এ সংগ্রামে সন্ধি নেই, কম্প্রমাইস হতেই পারে না।

অটোকে বোঝানো অসম্ভব, খৃষ্টধর্মের প্রতি তার যে রকম অবিচল নিষ্ঠা, দৃঢ় বিশ্বাস ঠিক তেমনি বৌদ্ধ শ্রমণ রয়েছেন, মুসলমান মিশনারি আছেন—আপন আপন ধর্মের প্রতি এঁদের নিষ্ঠা, এঁদের বিশ্বাস কিছুমাত্র কম নয়। অটোর কেমন যেন একটা আবছা-আবছা বিশ্বাস, এরা সব কেমন যেন একটা মোহাচ্ছন্ন অবস্থায়, একটা মায়ার ঘোরে আছে—খৃষ্টের বাণী তাদের সামনে একবার ভালো করে তুলে ধরতে পারলেই ওরা তৎক্ষণাৎ সত্য ধর্মে আশ্রয় নেবে।

ততক্ষণে আমি বিলক্ষণ বুঝে গিয়েছি, অটোর সঙ্গে তর্কাতর্কি বা আলোচনা করা নিষ্ফল। সে তার পথ ভালো করেই ঠিক করে নিয়েছে। এবং সেটা যখন খৃষ্টের পথ, তবে চলুক না সে সেই পথে।

আমি বললুম, 'হ্যার অটো! আমার একটি নিবেদন শুনুন। আমি ছেলেবেলায় গিয়েছি পাদ্রী ইস্কুলে, আমার প্রতিবেশীরা ছিল সব হিন্দু। ভিন্ন ধর্মের খুব কাছে আপনি কখনো আসেন নি—কাজেই আমার মনের ভাব আপনি বুঝতে পারবেন না আপনারটাও আমি বুঝতে পারবো না। আমার শুধু একটি অনুরোধ—যেখানেই ধর্মপ্রচার করতে যান না কেন, প্রথম বেশ কিছুদিন সে দেশবাসীর শাস্ত্র, আচার-ব্যবহার, সামাজিক প্যাটার্ন ভালো করে দেখে নেবেন, শিখে নেবেন, তার পর যা করবার হয় করবেন।'

অটোর চোখ-মুখের ভাব থেকে অনুমান করতে পারলুম না, আমার পরামর্শটা তার মনে গিঁথেছে কি না। এতক্ষণ আমি তক্কে তক্কে ছিলুম, কি করে এ-আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে অন্য দিকে চলে যাওয়া যায়। তাই শুধালুম, 'আপনি কোন্ দেশে ধর্মপ্রচার করতে যাবেন?'

অটো বললে, 'এখনো ঠিক করি নি।'

আমি তৎক্ষণাৎ আলোচনার মোড় নেবার সুযোগ পেয়ে গেলুম—বললুম, 'ভারতবর্ষ, ইরান, আরব এ সবের কোনো একটা দেশে যাবেন। অর্থাৎ যেখানকার লোকের রঙ আমার মত বাদামী। এরাই ভগবানের সর্বোত্তম সৃষ্টি।'

অটো বুঝতে না পেরে বললে, 'কেন ?'

ক্যেটে বলল, 'আমরা জর্মনরা চামড়ার বাদামী রঙ পছন্দ করি বলে ?' অটো কেমন যেন একটু ঈর্ষার নয়নে আমার দিকে তাকালে। বাঁচালে! ক্যেটের প্রতি তার সর্ব দুর্বলতা তা হলে এখনো যায় নি।

আমি বললুম, 'বুঝিয়ে বলি। সৃষ্টিকর্তা যখন মানুষ গড়তে প্রথম বসলেন, তখন এ বাবদে তাঁর বিলকুল কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না। প্রথম সেট্ বানানোর পর সেটা 'বেক' করার জন্য ঢোকালেন "বেকিং বক্সে"। যতখানি সময় বেক করার প্রয়োজন তার আগেই বাক্স খোলার ফলে সেগুলো বেরোল 'আণ্ডার-বেক্ট্' সাদা সাদা। অর্থাৎ তোমরা, ইয়োরোপের লোক। পরের বার করলেন ফের ভুল। এবারে রাখলেন অনেক বেশী সময়। ফলে বেরোল পুড়ে-যাওয়া কালো কালো। এরা নিগ্রো। ততক্ষণে তিনি টাইমিংটি ঠিক বুঝে গেছেন। এবারে বেরুল উত্তম 'বেক্ড্'-করা সুন্দর ব্রাউন-ব্রেড। অর্থাৎ আমরা, ইরানী, আরব জাত।'

ক্যেটে হাসতে হাসতে তখন পুনরায় আরম্ভ করলো ভারতীয় নর্তকী-সৌন্দর্য-কীর্তন। এবারে অটোর হিংসা করার কিছু নেই—কারণ প্রশংসাটা হচ্ছে মেয়েদের। কিন্তু মানব-সৃষ্টিরহস্যের গল্পটা শুনে সে প্রাণভরে হাসলে না। নিছক ভদ্রতা রক্ষা করার জন্য কেমন যেন শুকনো শুকনো।

আমি বললুম, 'আর প্রভু খৃষ্টও তো ছিলেন বাদামী। তাঁর আমলের কিছু কিছু ইহুদী এখনো প্যালেস্টাইনে আছে। তাদের বর্ণসংকর দোষ নেই। এখনো ঠিক সেই সুন্দর বাদামী রঙ, মিশমিশে কালো-নীল চুল। ইণ্ডিয়া যাবার পথে প্যালেস্টাইনে দেখে নেবেন।'

ক্যেটে অভিমান-ভরা সুরে বললে, 'তুমি দেখি অটোকে দেশছাড়া করার জন্য সাত-তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে লেগেছো!'

আমি সপ্রতিভ কণ্ঠে উত্তর দিলুম, 'কেন, তুমি কি ওর সঙ্গে যাচ্ছো না ?'

অটো বললে, 'ওর অভাব কি ? সৌন্দর্যদানে তো ভগবান ওর প্রতি কার্পণ্য করেন নি।'

ক্যেটে রোষ-কষায়িত লোচনে অটোর দিকে তাকালো। মন্তব্যটা আমারও মনে বিরক্তির সঞ্চার করলো। এতক্ষণ ধর্ম নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল বলে ওকে কোনো প্রকারের আঘাত না দেবার জন্য টাপে-টোপে কথা বলছিলুম, এখন আর সে পরোয়া নেই। বাঁকা হাসিটাকে প্রায় চক্রাকারে পরিবর্তিত করে বললুম, 'আপনি বুঝি ধরে নিয়েছেন, প্রত্যেক পরিবর্তনই প্রগতি, এবং পরিবর্তনটা করা হবে ঝটপট! আজ আছ মুসলমান, কাল হয়ে যাও খৃষ্টান; আজ ভালবাসো অটোকে, কাল ভালবেসে ফেলো ডাভিড্ কিংবা ফ্রীডরিষকে! যেমন এখন খাচ্ছো বিয়ার, পরে গেলাস ভরে নাও লেমনেড দিয়ে! না ?'

অটোর আঁতে খানিকটে লেগেছে। তাই শুষ্ককণ্ঠে বললে, 'মিথ্যা প্রতিমা (ফল্স্ আইডল্স্) যতদূর সম্ভব শীঘ্র বর্জন করে সত্যধর্মে আশ্রয় নেওয়া উচিত।'

আমি রীতিমত রাগত কণ্ঠে বললুম, 'মিথ্যা প্রতিমা! নরনারীর প্রেম মিথ্যা, আর কোথায় কোন্ আফ্রিকার জঙ্গলে পড়ে আছে নিগ্রো তার মাম্বো জাম্বো নিয়ে—হয়তো সুখেই আছে, শান্তিতেই আছে—তাকে তার 'অজ্ঞতা', 'কুসংস্কার', 'পাপ' সম্বন্ধে সচেতন করাই সব চেয়ে বড় সত্য!

শুনুন হ্যার অটো। আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই, যে লোক ঐশীবাণীর স্পন্দন তার হৃদপিণ্ডে অনুভব করেছে তার 'কিছু বাকি থাকে না'—আমাদের দেশের গ্রাম্য সাধক পর্যন্ত গেয়েছে, 'যে জন ডুবলো সখী তার কি আছে বাকি গো'?

কিন্তু ধর্মের দোহাই, নরনারীর প্রেম অবহেলার জিনিস নয়। আপনি রাগ করবেন না, আমি জিজ্ঞেস করি, আজ যে আপনি প্রভু যীশুকে ভালবাসতে শিখেছেন, তার গোড়াপত্তন কি ক্যেটের প্রতি আপনার প্রথম প্রেমের উপর নয়?

টায়-টায় মিলবে না, তবু একটি উদাহরণ দিই। আমার একজন আত্মীয়া উনিশ-বিশ বৎসর অবধি তার মাকে বড্ড অবহেলা এমন কি তাচ্ছিল্য করতো। তার-পর তার বিয়ে হল, বাচ্চা হল। তখন সে জীবনে প্রথম বুঝতে পারলো বাচ্চার প্রতি মা'র ভালোবাসা কি বস্তু। তখন সে ভালোবাসতে শিখল আপন মাকে।

বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে আপনার ধর্মের অনেকখানি মিল আছে। সংসারাশ্রম ত্যাগ করে, সন্ন্যাসী হয়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করাই সে ধর্মের অনুশাসন। অথচ জানেন, সে ধর্মেও মায়ের আসন অতি উচ্চ। বুদ্ধদেব যখন তাঁর প্রধান প্রধান শিষ্যদের নিয়ে ধর্মালোচনা করতেন তখন তাঁর একমাত্র কিশোর পুত্র রাহুল অত্যন্ত বিমর্ষ বদনে এক কোণে বসে থাকতো—সে তো শ্রমণ নয়, তার তো কোনো আসন নেই সেখানে। আপন পিতা বুদ্ধদেব পর্যন্ত শিষ্য মহামৌদ্গল্যায়ন, সারিপুত্তের সঙ্গে যে রকম সানন্দে কথা বলেন, তার সঙ্গে সে রকম ব্যবহার করেন না। তখন রাহুল স্থির করলেন, সন্ন্যাস নেবেন বলে। সে-কথা শুনতে পেয়ে রাহুল-জননী যশোধারা নিরাশকণ্ঠে বলেছিলেন, 'আর্য-পুত্র আমাকে বর্জন করেছেন, আমি তাঁকে পেলুম না। তিনি সিংহাসন গ্রহণ করলেন না, আমিও পট্ট-মহিষী হওয়ার গৌরব থেকে বঞ্চিত হলুম। এখন বুঝি তিনি আমার শেষ-আশ্রয়ের স্থল যুবরাজ রাহুলকেও আমার কোল থেকে কেড়ে নিতে চান!" একথা শুনতে পেয়ে বুদ্ধদেব অনুশাসন করেন, "মাতার অনুমতি ভিন্ন কেউ শ্রমণ হতে পারবে না।" আড়াই হাজার বছর হয়ে গেছে—এখনও সে অনুশাসন বলবৎ। আমার আশ্চর্য বোধ হয়, হ্যার অটো! মাতা হয়তো নিরক্ষরা, কুসংস্কারাচ্ছন্না। কিন্তু তারই উপর নির্ভর করছে, পুত্রের আদর্শবাদ, সদ্ধর্ম গ্রহণ, সব কিছু। সেই মূর্খা মাতা অনুমতি দিলে সে সব চেয়ে মহৎ কর্ম প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে পারবে না—আজ আপনি যে রকম করতে পারছেন। আর এ তো আবার প্রেম।

"ভগবান কোথায়?"—নাস্তিক জিজ্ঞেস করেছিল সাধুকে, আমার যতদূর মনে পড়ছে খৃষ্টান সাধুকেই। কৃচ্ছ্রসাধনাসক্ত, দীর্ঘ তপস্যারত চিরকুমার সাধু বলেছিলেন, "তরুণ-তরুণীর চুম্বনের মাঝখানে থাকেন ভগবান"।'

'আমি বললুম, 'শ্রীমতী ক্যেটে, কাল ভোরে আমি বেরবো।'

ইতিমধ্যে তিনটি দিন কেটে গিয়েছে। ফিল্‌ম-স্টারের আদরে কদরে। শরীর একটু দুস্থ বোধ হলেই নিচের পাবে এসে বসেছি, ক্যেটের কাউণ্টারের নিকটতম সোফায়। তারও বোধ হয় মনে রঙ ধরেছে। কিংবা তার কপাল ভালো,—কি করে যেন 'বারে'র একটা ঠিকে জুটে গিয়েছে বলে অধিকাংশ সময় তার বিয়ারের মগসহ আমার সামনে বসে। আর যখন মৌজে ওঠে তখন সোফায় এসে আমার গা ঘেঁষে। অটোও প্রতি রাত্রে এসেছে। আমাদের যতখানি ভাব জমেছে ক্যেটে সেটা অটোর কাছ থেকে লুকোবার চেষ্টা করে নি। অটোর হাব-ভাব দেখে অনুমান করলুম, সে পড়েছে ধন্দে। অস্কার ওয়াইল্‌ড্‌ বলেছেন, 'আমাদের প্রত্যেকের কাছে এমন একাধিক জিনিস আছে যেগুলো আমরা স্বচ্ছন্দে পথের ধুলোয় ছুঁড়ে ফেলে দিতুম, যদি না জানতুম, অন্য লোকে সেগুলো তৎক্ষণাৎ কুড়িয়ে নেবে।' অটো ভাবছে সে ক্যেটেকে কবুল জবাব দেওয়া মাত্রই আমি তাকে লুফে নিয়ে বটন-হোলে বসরাই গোলাপের মত গুঁজে নেব।

একবার শুধু অটোকে বলেছিলুম, 'আপনাদের কবি গ্যোটে অতুলনীয়। সুদূর ভারতের আমরা যে হীদেন, আমরাও তাঁকে সম্মান করি। তিনি বলেছেন,

> 'দূরে দূরে তুমি কেন খুঁজে মরো
> হেরো প্রেম সে তো হাতের কাছে,
> শিখে নাও শুধু তারে ধরিবারে
> সে তো নিশিদিন হেথায় আছে।'
> 'Willst du immer weiter schweifen ?
> Sieh, das Gute liegt so nah.
> Lerne nur das Glueck ergreifen,
> Denn das Glueck ist immer da.'

অটো এর উত্তরে কিছু না বলে শুধু অন্য কথা পেড়ে আমাকে বলেছিল, "আপনি এখানে আরো কিছুদিন থাকুন। আস্তে আস্তে সব কথাই বুঝতে পারবেন।'

এ আরেক প্রহেলিকা!

ক্যেটে চালাক মেয়ে। আমার উড়ুক্কু ভাব বুঝতে পেরে আমাকে কিছুতেই বিদায় নেবার প্রস্তাব পাড়তে দেয় না। কী করে যে বুঝে যায়, কথার গতি ঐদিকে মোড় নিচ্ছে আর অমনি দুম্‌ করে ভারতবর্ষের ফকীরদের কাহিনী শুনতে চায়, আমার মা বছরে ক'বার তার বাপের বাড়ি যায়—অতিশয় ধূর্ত মেয়ে, কি করে যে বুঝে গেছে আমি আমার মায়ের গল্প বলতে সব সময়ই ভালোবাসি, আমিও একবার মুর্খের মত বলেছিলুম, মায়ের গল্প সব গল্পের মা—মা চলে গেলে বাড়ি চালায় কে, আরো কত কী?

আর আমিও তো অতটা নিমক-হারাম নই যে এতখানি স্নেহ-ভালবাসা পাওয়ার পর হঠাৎ বলে বসবো, 'আমি চললুম।' যেন পচা ডিমের ভাঙা খোসাটা জানালা দিয়ে ফেলে দেবার মত ওদের বাড়ি বর্জন করি!

শেষটায় মরীয়া হয়েই প্রস্তাবটা পাড়লুম।

ক্যেটে বললে, 'কেন? এখানে আরো কয়েকটা দিন থাকতে আপত্তি কি? তুমি যে ঘরটায় আছো সেটা সাড়ে এগারো মাস ফাঁকা থাকে, খদ্দেরদের জন্য এখানে প্রতিদিন রান্না হয় অন্তত তিরিশটা লাঞ্চ-ডিনার। একটা লোকে বেশী খেল কি কম খেল তাতে কি যায় আসে?'

আমি বললুম, 'আমি আর তিনদিন থাকলেই তোমার প্রেমে পড়ে যাব।'

আমি ভেবেছিলুম, ক্যেটে বলবে, 'তাতে ক্ষেতিটা কি?' সে কিন্তু বললে অন্য কথা। এবং অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে। বললে, 'কোনো ভয় নেই তোমার। তোমার স্বভাব প্রেমের লক্ষণে দীন (যেন, হুবহু রবীন্দ্রনাথের ভাষা)। মানুষ হঠাৎ একদিন প্রেমিক হয় না। যে প্রেমিক, সে প্রেমিক হয়েই জন্মায়। কিংবা যেমন কেউ বাঁকা নাক নিয়ে। যাদের কপালে প্রেমের দুর্ভোগ আছে তাদের জন্ম থেকেই আছে। তোমার সে ভয় নেই।'

আমি চুপ করে রইলুম।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, 'অটো যত দূরে চলে যাচ্ছে আমার জীবনটা ততই ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। এই যে তোমার প্রিয় কবি হাইনরিষ হাইনে তাঁরই একটি কবিতা আছে—

> গোলাপ, কমল, কপোত, প্রভাত রবি—
> ভালবাসিতাম কত যে এসব আগে,
> সে সব গিয়েছে, এখন কেবল তুমি,
> তোমারি মূর্তি পরাণে কেবল জাগে!
> নিখিল প্রেমের নিঝর—তুমি, সে সবি—
> তুমিই গোলাপ, কমল, কপোত, রবি।[১]

কবি একদিন তাঁর প্রিয়াতেই গোলাপ, কমল, কপোত সবই পেয়ে গেলেন। কিন্তু তারপর আরেকদিন যখন তাঁর প্রিয়া তাঁকে ছেড়ে চলে গেল তখন কি তিনি সঙ্গে সঙ্গে আবার গোলাপ কমলকে ভালোবেসে সে অভাব পূর্ণ করতে পারলেন? আমার হয়েছে তাই। এ তো আর চটিজুতো নয় যে, যখন খুশী পরলে যখন খুশী ছুঁড়ে ফেলে দিলে। এ যেন নির্জন দ্বীপে পেঁছে নৌকোটাকে পুড়িয়ে দেওয়া। তারপর একদিন যখন ভূমিকম্পে দ্বীপটি সমুদ্রে বিলীন হয়ে গেল তখন তুমি যাবে কোথা?'

এর উত্তর আমার ঘটে নেই। তাই অন্য পন্থা ধরে বললুম, 'তোমার বয়স আর কতটুকু? এত শিগগির নিরাশ হয়ে গেলে চলবে কেন?'

ইতিমধ্যে অটো এসে পড়াতে আমাদের এ আলোচনা বন্ধ হল। অটোকে

১ যতীন্দ্রমোহন বাগচীর অনুবাদ।

অশেষ ধন্যবাদ। তাকে বললুমও, 'অটো, আপনি অনেক লোকের বহু উপকার করবেন।'

অটো বুঝতে না পেরে বললে, 'কি রকম?'

আমি বললুম, 'পরে বলবো। আমি কাল চললুম।'

অটো কিছু বলার পূর্বেই ক্যেটে আমাকে বললে, 'কিন্তু তুমি তো এখনো আমার গান শোনো নি।'

অটো বললে, 'ও সত্যি খুব ভাল গাইতে পারে।'

আমি বললুম, 'ক্যেটে, ডার্লিং, একটা গাও না।'

'পাবে'র এক প্রান্তে গ্র্যান্ড পিয়ানো। প্রায়ই দেখেছি, সেলারদের একজন কিংবা ক্যেটে স্বয়ং সেটা বাজায়, আর বাকিরা নাচে।

ক্যেটে স্টুলে বসে মুহূর্তমাত্র চিন্তা না করে বাজাতে আরম্ভ করলে। তার পরেই গান,

তুমি তো আমার
আমি তো তোমার
এই কথা জেনো,
দ্বিধা নাহি আর।
হিয়ার ভিতরে
তালা চাবি দিয়ে
রাখিনু তোমারে
থাকো মোরে নিয়ে
হারায়ে গিয়েছে
চাবিটি তালার
নিষ্কৃতি তব
নাই নাই আর।[১]

গান শেষ হলে ক্যেটে দৃপ্তপদে ফিরে এসে অটোর মুখোমুখি হয়ে তাকে শুধালে, 'অটো, এ গানটা তুমিই আমাকে শিখিয়েছিলে না?'

---

১ Du bist min, ich bin din :
des solt du gewis sin.
du bist beslozzen
in minem herzen :
verlorn its daz sluezzelin :
du most immer drinne sin.
(দ্বাদশ শতাব্দীর লোকসঙ্গীত)

॥ ২০ ॥

'বলা বাহুল্য' যে কতখানি বলা বাহুল্য এই প্রথম টের পেলুম। ক্যেটের কাছ থেকে বিদায় নেওয়াটা যে উভয়ের পক্ষেই বেদনাদায়ক হয়েছিল সেটা বলা বাহুল্য, না বলাও বাহুল্য।

ধোপার কালি দিয়ে সে আমার শার্টটার ঘাড়ের ভিতরের দিকে তাদের বাড়ির ফোন নম্বর ভালো করে লিখে দিয়ে বলল, 'দরকার হলে আমাকে ফোন করো।'

আমি শুধালুম, 'আর দরকার না হলে?' এটা ইডিয়টের প্রশ্ন। কিন্তু আমি তখন আর কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছিলুম না। ক্যেটে কোনো উত্তর দিলে না। ইতিমধ্যে ক্যেটের মা বোন এসে পড়াতে আমি যেন বেঁচে গেলুম।

ক্যেটের মা আমার গলায় একটি ক্রুশবিদ্ধ যীশুর ক্ষুদ্র মূর্তি ঝুলিয়ে দিলেন। চমৎকার সূক্ষ্ম, সুন্দর কাজ করা। এখনো আছে।

* * *

প্রথমটায় রাইনের পাড়ে পাড়ে সদর রাস্তা দিয়েই এগিয়ে চললুম।

এদেশের লোক বিদেশীর প্রতি সত্যই অত্যধিক সদয়। পিছন থেকে যে সব গাড়ি আসছে তাদের ড্রাইভার সোওয়ার আমার ক্ষুদ্রাকৃতি, চামড়ার রঙ আরে বিশেষ করে চলার ধরন দেখে বুঝে যায় আমি বিদেশী আর অনেকেই—কেউ হাত নেড়ে, কেউ গাড়ি থামিয়ে জিজ্ঞেস করে লিফট চাই কিনা। আমি মৃদু হাসির ধন্যবাদ জানিয়ে হাত নেড়ে ওদের এগোতে বলি।

মনে মনে বলি, এও তো উৎপাত। আচ্ছা, এবারে তা হলে গাঁয়ের রাস্তা পাওয়া মাত্রই মোড় নেব। এমন সময় একখানা ঝাঁ-চকচকে মোটর আমার পাশে এসে দাঁড়াল। ওনার ড্রাইভার। দরজা খুলে দিয়ে আমার দিকে তাকালে। আমি যতই আপত্তি জানাই সে ততই একগুঁয়েমির ভাব দেখায়। শেষটায় ভাবলুম, 'ভালোই, ক্যেটের থেকে যত তাড়াতাড়ি দূরে যাওয়া যায় ততই ভালো।' গাড়ীতে বসে বললুম, 'ধন্যবাদ।'

ভদ্রলোক বললেন, 'মোটেই না। এই হল বুদ্ধিমানের কাজ।' তারপর শুধোলে, 'ইণ্ডার?'

এই প্রথম একটা বিচক্ষণ লোক পেলুম যে প্রথম দর্শনেই ধরে ফেলেছে, আমি কোন্ দেশের লোক। এস্কিমো বা মঙ্গলগ্রহবাসী কিনা, শুধলো না।

বললে, 'কোথা যাবে।' ভদ্রতার খুব বেশী ধার ধারে না।

'ইণ্ডিয়া।'

আদপেই বিচলিত না হয়ে বললে, 'তাহলে তো অনেকখানি পেট্রল নিতে হবে। ঠিক আছে। সামনের স্টেশনেই নিয়ে নেব। তা আপনি বন্ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পড়েন—না?'

শার্লক হোম্সের জর্মন মামা ছিল নাকি? পরিষ্কার ভাষায় সেটা শুধালুমও।

হেসে বললে, 'না। শুনুন। আচ্ছা, আপনি লেফারকুজেন ফার্বেন

ইনডুস্ট্রির নাম শুনেছেন ? দুনিয়ার সব চেয়ে বড় না হোক—দুসরা কিংবা তেসরা, রঙ আর ওষুধ বানায় ?

আমি অজ্ঞতা স্বীকার করলুম।

বললে, 'আমি সেখানে কাজ করি। এখন হয়েছে কি, আমরা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই বহুত কিছু বেচি। ইণ্ডিয়াও আমাদের বড় মার্কেট। একটা ওষুধের বিজ্ঞাপন ছাপতে গিয়ে দেখি তাতে ইণ্ডিয়ার যা খরচা পড়বে তার চেয়ে অনেক কম খরচায় হবে এখানে। ইণ্ডিয়া থেকে ছবি ক্যাপশন আনিয়ে এখানে জোড়াতালি লাগিয়ে ছাপতে গিয়ে হঠাৎ মনে হল, এ জোড়াতালি লাগানোতে যদি উল্টো-পাল্টা হয়ে গিয়ে থাকে তবেই তো সর্বনাশ। ছাপা হবে তিন লক্ষখানা—তদুপরি মেলা রঙ-বেরঙের ছবি। খরচাটা কিছু কম হবে না—যদিও ঐ যা বললুম, ইণ্ডিয়ার চেয়ে অনেক কম। তাই ভাবলুম, ওটা কোন ইণ্ডিয়ানকে দেখিয়ে চেক আপ করে নিই। আমাদের লেফারকুজেন শহরে কোনো ভারতীয় নেই। কাছেই কলোন বিশ্ববিদ্যালয়। গেলুম সেখানে। তারা তাদের নথিপত্র ঘেঁটে বললে, ভারতীয় ছাত্র তাদের নেই, তবে পাশের বন্ শহরে থাকলে থাকতেও পারে—সেখানে নাকি বিদেশীদের ঝামেলা। কি আর করি, গেলুম সেখানে। সেখানেও গরমের ছুটির বাজার। সবাই নাকে কানে ক্লোরোফর্ম—আমাদের কোম্পানীরই হবে—ঢেলে ঘুমুচ্ছে। অনেক কষ্ট করে একজন ইণ্ডারের নাম বাড়ির ঠিকানা বের করা গেল। তার বাড়ি গিয়ে খবর নিতে জানা গেল সে মহাত্মাও বেরিয়েছেন হাইকিঙে। লাও! বোঝো ঠ্যালা! এসেছিস তো বাবা তিন হাজার না পাঁচ হাজার মাইল দূরের থেকে! তাতেও মন ভরলো না। এবার বেরিয়েছেন পায়ে হেঁটে আরো এগিয়ে যেতে। আমার আরো কাজ ছিল মানহাইমে। ভাবলুম রাস্তায় যেতে যেতে নজর রাখবো ইণ্ডারপানা কেউ চোখে পড়ে কি না। তারপর এই আপনি।'

আমি বললুম, 'আমি ইণ্ডার নিশ্চয়ই, কিন্তু তাতে আপনার সমস্যার সমাধান হবে কি না বলা কঠিন। ইণ্ডিয়াতে খান তেরো-চোদ্দ ভাষা। তার সব কটা তো আর আমি জানি নে।'

বললে, 'সর্বনাশ! তা হলে উপায় ? সেই জোড়াতালির মাল ইণ্ডিয়া পাঠাব, সেটা ফিরে আসবে, তবে ছাপা হবে, ওতে করে যে মেলা দেরি হয়ে যাবে।'

আমি শুধালুম, 'ইণ্ডিয়ার কোন্ জায়গাতে সেটা তৈরি করা হয়েছে মনে পড়ছে কি ?

বললে, 'বিলক্ষণ! কালকুট্টা।'

আমি বললুম, 'তা হলে বোধ হয় আপনার মুশকিল আসান হয়ে যাবে। অবশ্য জোর করে কিছু বলা যায় না। কারণ কলকাতার শহরেও সাড়ে বত্রিশ রকম ভাষায় কাগজপত্র ছাপা হয়।'

বেশ সপ্রতিভ কণ্ঠেই বললে, 'আর শুনুন। আমরা কোনো কাজই বা করাই নে। আপনি বললেও না।'

আমি বললুম, 'আপনি কিছুমাত্র দুশ্চিন্তা করবেন না। আপনাদের মহাকবি হাইনরিষ হাইনের আমি অন্ধ ভক্ত। তাঁর সর্বক্ষণই লেগে থাকতো টাকার অভাব। পেলেই খরচা করতেন দেদার এবং বে-এক্তেয়ার। তিনি বলেছেন, "কে বলে আমি টাকার মূল্য বুঝি নে? যখনই ফুরিয়ে গিয়েছে, তখনই বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছি।" আমার বেলাও তাই। আপনি নির্ভয়ে আপনার মাল বের করুন।'

জর্মন বললে, 'ঐ তো ডবল সর্বনাশ! আমি সেটা সঙ্গে আনি নি। মোটরে তেল-মেলের ব্যাপার, জিনিসটা জখম হয়ে যেতে পারে সেই ভয়ে। তার জন্য কোনো চিন্তা নেই। সামনের কোবলেনৎস্ শহরে সব চেয়ে দামী হোটেলের ম্যানেজার আমার বন্ধু, অতিশয় পণ্ডিত এবং সজ্জন। আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। তার সঙ্গে দু' দণ্ড রসালাপ করে সত্যিই আপনি আনন্দ পাবেন। আপনার হোটেল খরচা অতি অবশ্য আমাদের কোম্পানিই দেবে। আমিও প্রতিবার মানহাইম যাবার সময় সেখানে দু রাত্তিরই কাটিয়ে যাই। আপনাকে তার কাছে বসিয়ে আমি লেফারকুজেন যাবো আর আসবো।'

মোটর থামলো।

বাপস! রাজসিক হোটেল। ম্যানেজারটির চেহারাও যেন রাজপুত্তুর।

আরামসে বসেছি। হোটেল খরচা দিতে হবে না। পকেটে একশ মার্ক।

ম্যানেজারের সঙ্গে গালগল্প করলুম। রাত এগারোটায় সেই জর্মন ফিরে এল। কাজকর্ম হল। আরো একশ টাকা পেলুম।

কিন্তু বাধ সাধল পাশের ঐ টেলিফোনটা। বার বার লোভ হচ্ছিল কোটেকে একটা ফোন করি।

মুসাফির

কৈফিয়ৎ

এ পুস্তকের একটি ক্ষুদ্র মুখবন্ধের প্রয়োজন আছে।

একাধিক খ্যাতনামা ভূপর্যটক পরিণত বয়সে নাকেখৎ দিয়ে অসঙ্কোচে স্বীকার করেছেন, উঠান-সমুদ্র পেরিয়ে বাড়ির বাইরে বেরনোটাই মূর্খামির চূড়ান্ত নিদর্শন। খ্যাতনামা লেখক না হয়েও আমি এ-সব প্রাতঃস্মরণীয়দের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলছেন কি, ভ্রমণ-কাহিনী লিখে সে মূর্খামির চূড়ান্ত পরিচয়টি তাঁরা দিতে গেলেন কেন?

১৯২৭ থেকে আপনাদের বংশবদ এ-লেখক ঘরছাড়া। মাঝে-মধ্যে দু'চার বছরের জন্য হেথা হোথা সে আশ্রয় পেয়েছিল বটে কিন্তু গৃহনির্মাণ করার সুযোগ সে কখনো পায় নি। ফের পথে নামতে হয়েছে। সে নিয়ে ফরিয়াদ করি নে। একদা নাবিকজনের অধিকাংশই সমুদ্রে মারা যেত। তাদের যে-সব ভীতু ছেলে ভাইপো সমুদ্রযাত্রা করতো না তারা মরতো বাড়িতে। ফল তো একই। আমার বেলা আরো একটা ভয় আছে। উঠান-সমুদ্র পেরিয়ে অপকর্ম করেছি সে পাপ তো এইমাত্র স্বীকার করলুম, কিন্তু বাড়ি থেকে না বেরুলে যে আরো মেলা জব্বর জব্বর ব্রহ্মহত্যা করতুম না সে ভরসা দেবেন কোন গোসাঁই? অর্বাচীন জনই মন্তব্য করে, হিটলার যদি অমুক ভুলটা না করতেন তবে তিনি আখেরে বিজয়ী হতেন—ঐ ভুলটা না করলে তিনি যে পরে গণ্ডা দশেক ততোধিক মহামারাত্মক ভুল করতেন না সে আশ্বাস দেবেন কোন বিধানরাজ!

তবে এ-সত্য আমি বারবার বলবো, আমি বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছি অতিশয় অনিচ্ছায়—গত্যন্তর ছিল না বলে। প্রতি আশ্রয় লাভের পর ফের যে বেরিয়েছি সেটা আরো বেশী অনিচ্ছায়—নিতান্ত বাধ্য হয়ে।

এবং শেষ মোক্ষম পাপাচার স্বীকার করছি, যে-পাপ কৃতী পর্যটককে আদৌ স্বীকার করতে হয় নি, কারণ তাঁরা আপন আপন সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে পুনরায় অপাপবিদ্ধ হতে পেরেছিলেন, আমার তরে সে-দুয়ার বন্ধ। আমার মোক্ষমতম গুরুপাপ—আমি ভ্রমণকাহিনী (তথা অন্যান্য সর্ববিধ রচনা) লিখেছি সর্বাধিক অনিচ্ছায়।

অসহিষ্ণু পাঠক শুধোবেন, আমরা ক্যাথলিক পাদ্রী নাকি যে বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ তুমি আপন পাপ কনফেস্ করতে আরম্ভ করলে?

না, আপনারা অতি অবশ্যই পাদ্রী নন। কারণ শুধু পাদ্রী কেন, সর্ব সম্প্রদায়ের আচার্যগণকেই ধর্মাদর্শ অক্ষত রাখবার জন্য প্রায়ই কঠোর কঠিন হতে হয়। পক্ষান্তরে, যে-সব পাঠক এতদিন ধরে আমার রচনা বরদাস্ত করে এসেছেন তাঁরা অকরুণ হবেন কি প্রকারে? আর আমি মোল্লা পুরুত পাবই বা কোথায়? এবং অতিশয় শ্লাঘাভরে উচ্চকণ্ঠে স্বীকার করছি আমার পাঠকই আমার মোল্লা, আমার পুরুৎ। একমাত্র তার কাছেই আমার সর্ব অক্ষমতার ভার নামানো যায়।

পূর্বেই নিবেদন করেছি, ১৯২৭-এ আমি গৃহহারা হই। প্রথম দু'বৎসরের কাহিনী আমি সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় কীর্তন করি নি। সে-ইচ্ছাটার পিছনে যে ছিল সে বহুকাল হল জিন্নৎবাসিনী। সে কর্ণ কাহিনী থাক্।

তার পরের দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর বৎসরের প্রতিবেদন আমারই মত ছন্নছাড়া দেশকালপাত্র মেনে নিয়ে সেটা মিষ্ট এবং সংক্ষরিত হয় নি কারণ, চিরাচরিত আপ্ত বাক্য আছে "যাহা অল্প তাহাই মিষ্ট"—কাজেই সংক্ষিপ্ত না হয়ে সে হয়েছে ক্ষিপ্ত।

সে সম্বন্ধে অল্পবিস্তর সবিস্তর আলোচনা করেছি—এ-পুস্তকের ত্রেতাপর্বে যাঁরা আমার নতিস্বীকার, অর্ধসিদ্ধ কনফেশন সম্বন্ধে উদাসীন তাঁরা সে যুগটি অবহেলাভরে বর্জন করলে ধূলিপরিমাণও ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। আর যাঁরা ক্ষিপ্তের তাণ্ডবে কোনো সঙ্গতি আছে কিনা (মেথড্ ইন্ ম্যাড্নেস্) সেটা নিজের মুখে ঝাল খেয়ে রগড় দেখতে চান, কিম্বা যারা আমার অসংলগ্ন খণ্ড-প্রতিবেদন সমষ্টিকে শ্রেণীবদ্ধ করার বন্ধ্যাগমনসুলভ নিষ্ফল প্রয়াস লক্ষ্য করে তথাকথিত রূঢ় কণ্ঠে, ন্যায়সঙ্গত কটুবাক্য শুনিয়ে পত্রাঘাত করেছেন, অপরন্তু যাঁরা বার্লিনী দ্বিরদরদস্তম্ভোপরি সিংহাসন থেকে কিংবা যাঁরা নেটিভ বিদ্যালয়ের গো-অন্বেষণ কর্মে লিপ্তাবস্থায় গলদঘর্ম কলেবরে অশেষ ক্লেশস্বীকার করে আমা হেন দীনহীনজনোপরি মহামূল্যবান উপদেশ অকৃপণভাবে বর্ষণ করেছেন, তাঁরা এ পুস্তকের দ্বিতীয় উল্লাসে আমার অকৃপণতর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভুরিভুরি স্বর্ণোজ্জ্বল নিদর্শন পাবেন।

ভগবৎকৃপায় অব্যবহিত প্রত্যাদেশ লাভ করেছি, আমার ভবলীলা সংহরণ প্রত্যাসন্ন। ঈদৃশ মুখবন্ধের প্রতি রুদ্রের দক্ষিণ মুখ পুনর্বার প্রসন্ন হবেন সে-আশা দুরাশা।

কিমধিকমিতি
সৈয়দ মুজতবা আলী

প্লেন যখন ইংলিশ চ্যানেলের উপর দিয়ে যাচ্ছে তখন ছোকরা মুখুজ্যে শুধালে, 'চাচা, লণ্ডনে গিয়ে উঠবো কোথায়, চিন্তা করেছেন কি?' ছোকরা এই প্রথম বিলেত যাচ্ছে, প্রশ্নটা অতিশয় স্বাভাবিক। আমি বললুম, 'বাবাজী, কিছুটি ভাবতে হবে না। রসুই বামুন না হলেও তুমি তো ব্রাহ্মণসন্তান বটে। হাটে গিয়ে চাল-ডাল কিনে নিয়ে আসবে; আমি ততক্ষণে বটগাছতলায় ইঁটের উনুন জ্বালিয়ে রাখবো। শুনেছি লণ্ডনের উপর বিস্তর বোমা পড়েছিল, ইঁট পেতে অসুবিধে হবে না।'

এ্যার পোর্ট থেকে বেরিয়ে বিস্তর খোঁজাখুঁজির পরও যখন বটগাছ পাওয়া গেল না, তখন বাধ্য হয়ে হোটেলে উঠতে হল।

রসিকতা নয়, একটুখানি সবুর করুন।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায়ই মুখুজ্যের বয়েসীই তার এক ইংরেজ বন্ধু এসে উপস্থিত। ছোকরা খাঁটি ইংরেজ, লড়াইয়ের সময় ভারতবর্ষে এসেছিল, এ-দেশটাকে এতই ভালোবেসে ফেললে যে শেষ পর্যন্ত দিশী মেম নিয়ে বিলেত গেল। বললে, 'এদেশের লোক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এমনি অগা যে, সেদিন এক গবেট বিবিসিতে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বললে, "ভারতবর্ষের এক-তৃতীয়াংশ লোক বাইরে শোয়।" আমি ভয়ংকর চটে গিয়ে বিবিসিতে কড়া চিঠি লিখেছি।'

আমি বললুম, 'এতে চটবার কি আছে? কথাটা তো সত্যি। গরমের দেশের লোক ১১৪ ডিগ্রীতে সর্বাঙ্গে কম্বল জড়িয়ে ঘরের ভেতর শোবে নাকি? তোমাদের দেশের লোক মাইনাস দশ ডিগ্রীতে যদি বাইরে শোয় তবে মরে যাবে। আমাদের দেশের লোক গরমে ঘরের ভিতর দমবন্ধ হয়ে মারা যাবে না বটে, কিন্তু সারারাত এপাশ ওপাশ করে কাটাতে হবে। হীট হার্টস্, কোল্ড কিল্স্।'

এই কোল্ড কিল্স্ নিয়ে প্রাচ্য-প্রতীচ্য সভ্যতার পার্থক্য। বটগাছতলা আর হোটেলের পার্থক্য।

গরমের দেশে জীবনধারণের জন্য অত্যধিক সাজ-সরঞ্জাম আসবাবপত্রের প্রয়োজন হয় না; পক্ষান্তরে শীতের দেশে পাকা-পোক্ত ঘর-বাড়ি চাই, মেঝেতে শোওয়া যায় না; লেপ-কম্বল গদি-বালিশ চাই। শীতের ছ'মাস শাক-সব্জী ফলমূল কিছুই ফলে না, ছ'মাসের তরে মাংসের শুঁটকি জমিয়ে রাখতে হয়; আমরা দিন আনি দিন খাই, ছ'মাসের খাবার-দাবার জমিয়ে রাখার কথা শুনলে নাভিশ্বাস ওঠে। ছ'মাসের খাবার কিনতে গেলে বেশ কিছু রেস্তোর প্রয়োজন।

তাই বোধ হয় ইয়োরোপীয়রা একদিন ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ডাকাতি করতে প্রাচ্য দেশে এসেছিল। আজ ডেনমার্ক, জর্মনি, নরওয়ে, সুইডেনের খাবার-দাবার ব্যবসা-বাণিজ্য করেই চলে। ডাকাতিতে জিতেছিল ইংরেজ। আজ সে-সব লুণ্ঠন-ভূমি কব্জা থেকে খসে পড়ে যাচ্ছে। চার্চিল ব্রিটিশ রাজত্বের লিকুইডেটর হতে চান নি; আজকের শাসনকর্তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় হতে হচ্ছে। ওদিকে খাওয়া-দাওয়া থাকা-পরার মান অনেকখানি উঁচু হয়ে গিয়েছে—

সেটাকে বজায় রাখা যায় কি প্রকারে ? আজ না হয় রইল, ভবিষ্যতে হবে কি ? সেকুরিটি কোথায় ?

এই সেকুরিটি নিয়েই যত শিরঃপীড়া।

সমসাময়িক ইংরিজী সাহিত্যের সঙ্গে আমার পরিচয় অল্প। তবে সমঝদারদের মুখে শুনেছি, সেখানেও নাকি গুণীজ্ঞানীরা প্রাণপণ সেকুরিটি খুঁজছেন। ধর্মে বিশ্বাস নেই, আদর্শবাদ গেছে, চরম মূল্য পরম সম্পদ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, আদৌ আছে কি না তাই নিয়ে গভীর সন্দেহ—সেই প্রাচীন 'ওয়েস্টল্যান্ড' নাকি আরো বিস্তীর্ণ হয়ে সর্বব্যাপী সর্বগ্রাসী হয়ে উঠছে।

তবে কি কার্ল মার্কসের নীতিই ঠিক ? দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় অভাব-অনটন উপস্থিত হলে সাহিত্যে সেটা প্রতিবিম্বিত হবেই হবে ?

তা সে যা হয় হোক, কিন্তু এই সেকুরিটির ব্যাপার আরেক সূত্রে উঠলো।

৺বিদ্যাসাগরকে যে ইংরেজ মহিলা স্ত্রী-শিক্ষার প্রচার প্রসারে প্রচুর সাহায্য করেন, তাঁরই এক নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে আমাদের আবার দেখা হল লন্ডনে। নাম কার্পেন্টার। ইনি জীবনের অধিকাংশ ভাগ কাটিয়েছেন ভারতবর্ষে। আমি তাঁকে যখন একবার কলকাতাতে শুধাই তিনি কি মিস কার্পেন্টারের কোনো আত্মীয় হন, তখন উত্তরে তিনি বলেন, 'আমার ঠাকুরদার বোন।' তারপর হেসে বলেছিলেন, 'আমি কিন্তু তাঁর মত টাকা ছড়াতে আসি নি; তারই কিছুটা কুড়িয়ে নিতে এসেছি।'

তিনি নিমন্ত্রণ করে স্প্যানিশ রেস্তোরাঁয় মুর পদ্ধতিতে তৈরী বিরয়ানী (সে কথা পরে হবে) খাওয়াচ্ছিলেন। কথায় কথায় তাঁকে শুধালুম, 'এই যে সাদায় কালোয় দ্বন্দ্ব লেগেছে এদেশে, তার মূল কারণ কি ?'

তিনি এক কথায় বললেন, 'গার্লস।'

আমি অন্যত্র শুনেছিলুম চীপ লেবার অর্থাৎ কালারা কম মজুরীতে কাজ করতে তৈরী। ম্যানেজাররা তাই তাদের চায়। ইংরেজ মজুর তাই চটে গেছে।

তাহলে 'গার্লস' এল কোত্থেকে ?

আসলে দুটোই এক জিনিস।

নিগ্রোদের কথা বলতে পারবো না—সিলেট-নোয়াখালির খালাসীদের কথা জানি। তাদের অনেকেই লন্ডনে এসে অন্য খালাসীদের জন্য রাইস-কারির দোকান খোলে। বাঙালী ছাত্রেরাও সেখানে মাঝে মাঝে গোয়ালন্দ-চাঁদপুরী জাহাজের রাইস-কারি খাবার জন্য যায়।

গিয়ে দেখবেন মিশকালো খালাসীর ইংরেজ বউ। দু'জনাই খদ্দেরকে খাবার দিচ্ছে। মাঝে মাঝে সেই সিলেটি আছমৎ উল্লা বউকে ডেকে খাস সিলেটিতে বলছে, 'ওগো ডুরা (ডোরা), সাবরে আরক কট্টা মুর্গীর সালন দে (সায়েবকে আরেক কটোরা-বাটি মুর্গীর ঝোল দে)!'

মেমসাহেব সিলেটি শিখে নিয়েছে! কারণ আছমৎ উল্লা ইংরিজিটা রপ্ত করতে পারেন নি।

এখন প্রশ্ন, এই মেমটি আছমৎ উল্লাকে বিয়ে করলো কেন ?

সেকুরিটি।

আছমৎ উল্লা মদ খায় না। তাই মাতাল হয়ে বউকে মারপিট করে না—এবং তার চেয়েও বড় কথা মদ খেয়ে টাকা ওড়ায় না। রেসে যায় না, তিন পাত্তি তাস খেলেও সর্বস্বান্ত হয় না। সন্ধ্যার পর বাড়িতেই থাকে। এই হল এক নম্বর।

দুই নম্বর—বিয়ের পর (আগেও ডোরা ছাড়া) অন্য রমণীর দিকে প্রেমের বাণ হানে না।

এই দুটি সেকুরিটি রমণী মাত্রই খোঁজে। অন্যান্য ছোটোখাটো কারণের উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই—বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করে, কান্নাকাটি করলে বউকে ধমকে দিয়ে ড্রইংরুমে লেপকম্বল নিয়ে শুতে চলে যায় না। আছমৎ উল্লার দেশের কুঁড়েঘরে তারা দশজন শুতো,—তার দাদার কাচ্চা-বাচ্চা সে সামলেছে, পরিবার বেসামাল বড় ছিল বলেই তো দু'মুঠো ভাতের জন্য সে এদেশে এসেছে।

যদি বলেন, কালচারল লেভেল কি এক ? নিশ্চয়ই। ডোরা খানদানী ডিউকের মেয়ে নয়, সে এগজিজটেনশিয়ালিজম নিয়ে মাথা ঘামায় না, আর আমাদের আছমৎ উল্লাও জমিদারবাড়ির ছেলে নয়, সে 'যোগাযোগ' পড়ে নি।

যদি বলেন, 'সাদা মেয়ে কি কালোকে পছন্দ করে ?' উত্তরে বলি, 'আমাদের ভিতরে যে যত কালা সে-ই তো তত ফর্সা বউ খোঁজে।' (এই সাদার তরে পাগলামি এদেশে খুব বেশী দিন হল আসে নি। দুশ' বছর আগেকার লেখা বইয়ে ইয়োরোপীয় পর্যটকরা লিখেছেন, 'ভারতীয়রা আমাদের ফর্সা রঙ দেখে বেদনা ভরা কণ্ঠে শুধোয়, "হায়, ভগবান এদের সবাইকে ধবলকুষ্ঠ দিয়েছেন কেন ?" কথাটা ঠিক। এদেশের দুই মহাপুরুষ কৃষ্ণ এবং রামের একজন কালো, অন্যজন নবজলধরশ্যাম।)

সেই সেকুরিটির অভাবই মদ্যপানের অন্যতম কারণ।

ইংলণ্ডে যে মদ্যপান বেড়েছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কোনো দেশের জ্ঞাণীগুনীরা কি ভাবেন, কি চিন্তা করেন, সে-কথা জানবার জন্য সে-দেশে যাবার কোনো প্রয়োজন আমি বড় একটা দেখি নে! আপন দেশে বসে বসে সে দেশের উত্তম অধম পুস্তক, মাসিক, খবরের কাগজ পড়লেই সে সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা জন্মে! কিন্তু সে দেশের টাঙ্গাওলা বিড়িওলা ড্রাইভার কারখানার মজুর কি ভাবে, কি চিন্তা করে সেটা জানতে হলে সে দেশে না গিয়ে উপায় নেই। কারণ তারা বই লেখে না, খবরের কাগজে সম্পাদককে চিঠি লিখে নালিশ ফরিয়াদ জানায় না। তাদের কান্নাকাটি গালমন্দ যা-কিছু করার সব কিছুই তারা করে এদেশে চায়ের দোকানে, ওদেশে 'পাবে' অর্থাৎ শরাবখানায়। আর শরাবখানায় মস্ত বড় একটা সুবিধা—আমাদের চায়ের দোকানেও তাই—করো সঙ্গে দু'দণ্ড রসালাপ করতে চাইলে সে খেঁকিয়ে ওঠে না, গুণীজ্ঞানীদের সঙ্গে দেখা করতে হলে বিস্তর বয়নাক্কা, আত্মাবমাননাও

তাতে কিঞ্চিৎ আছে কিংবা এ-চিন্তাও মনে উদয় হওয়া অসম্ভব নয়, 'আমি কে যে তার মূল্যবান সময় নষ্ট করতে যাব ?'

কেনসিংটন গির্জার পাশে ছোট্ট একটি শরাবখানাতে এক কোণে বসেছি। প্রচণ্ড ভিড়। এমন সময় একটি বুড়ী বার থেকে এক গেলাস জিন কিনে এনে আমার পাশে বসতে গেলে তাঁর হ্যাণ্ডব্যাগটি মাটিতে পড়ে গেল। সেটি কুড়িয়ে টেবিলের উপর রাখলুম। বুড়ী গলে গিয়ে 'থ্যাংকয়্যু, থ্যাংকয়ু' বলে চেয়ারে বসে খানিকটে আমাকে শুনিয়ে খানিকটে আপন মনে বিড়বিড় করতে লাগলেন, 'আজকালকার ছোঁড়াদের ভদ্রতা বলে কোন জিনিস নেই, তবু—' বাকিটা তিনি আর শেষ করলেন না। আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না তিনি কি বলতে চান। ছোঁড়াদের ভদ্রতা নেই কিন্তু আমার আছে, এ কি করে হয়, কারণ আমি ছোঁড়া নই। তবে বোধ হয় বলতে চান ছোঁড়াদের নেই, কিন্তু এ বুড়োর (অর্থাৎ আমার) আছে। সেটা অনুমান করেও উল্লাস বোধ করি কি প্রকারে? আমি বুড়ো ঘাটি কিন্তু থুথুড়ে বুড়ীর কাছ থেকে সে তত্ত্ব শুনে তো আনন্দিত হওয়ার কথা নয়।

তা সে যাক্ গে। আমি তখন অবাক হয়ে 'বারে'র দিকে তাকিয়ে বার বার তাজ্জব মানছি। হরেক রকম চিড়িয়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝপাঝপ বিয়ার, 'এল', জিন খাচ্ছে এ কিছু নয়া তসবীর নয়, কিন্তু আশ্চর্য, চব্বিশ-ছাব্বিশ বছরের মেয়েরা পর্যন্ত 'বারে' কটাশ্ করে শিলিঙ রেখে অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে ঢকাঢক বিয়ার খেয়ে হুট করে বেরিয়ে যায়। যৌবনে যখন লণ্ডন গিয়েছি, তখন দুপুরবেলা 'বারে' একা একা খাওয়া মাথায় থাকুন রাত্রে ডিনারের সময়ও কোনো ভদ্র মেয়ে তার বন্ধু বা আত্মীয়ের সঙ্গেও এসব জায়গায় আসতে ইতস্তত করতো। নিতান্ত যেতে হলে যেত রেস্তোরাঁয় অর্থাৎ খাবারের জায়গায় যেখানে মদ্যপান করা হয় খাদ্যের অত্যাবশ্যক অঙ্গরূপে—আমাদের গ্রামাঞ্চলে যে রকম শুধ জল খেতে দেয় না, সঙ্গে দুটি বাতাসা দেয়।

বুড়ো-বুড়ীদের দৃষ্টিশক্তি কমে গেলেও সঙ্গে সঙ্গে এ তত্ত্বটাও সত্য যে, যা দেখে তার থেকে অর্থ বের করতে পারে সেই অনুপাতে অনেক বেশী। তাই সেই বুড়ী এক ঢোক জিন খেয়ে আমাকে শুধালে—(এ সব জায়গায় ইংরেজ লৌকিকতার বজ্রবাঁধন কিঞ্চিৎ ঢিলে হয়ে যায়) 'বাবাজী কি এদেশে এই প্রথম এলে ?'

বুঝলুম, বাঙালের হাইকোর্ট-দর্শন দর্শন করে ঘটি যে রকম পত্রপাঠ ঠাহর করে নেয়, লোকটা বাঙাল ; আর আমি তো আসলে বাঙাল ; কলকাতায় যে-রকম প্রথম হাইকোর্ট দেখেছিলুম এখানেও ঠিক তেমনি ক্যাবলাকান্তের মত সব কিছু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছি। যতই পলস্তরা লাগাই না কেন সে বাঙালত্ব যাবে কোথায়। প্রতিজ্ঞা করলুম সাবধান হতে হবে। শহুরের মত সব কিছু দেখব আড়নয়নে শিব্রামদার মত 'বাঁকা চোখে'।

অপরাধীর সুরে বললুম,'তা ম্যাডাম, প্রায় তাই। ত্রিশ বছর পূর্বে এসে-ছিলুম, আর এই। লণ্ডন ইতিমধ্যে পুনর্জন্ম না হোক অর্ধজন্ম তো লাভ

করেছে !'

বুড়ী মহা উত্তেজিত হয়ে উঠলো। বলে কি? ত্রিশ বছর পরে! তাহলে তো এর কাছ থেকে অনেক-কিছু শোনা যাবে। অবশ্য উত্তেজনার কারণ জিন্‌ও হতে পারে।

'সবে দাড়ি-গোঁপ-কামাতে-শিখেছে এক স্কচ ছোকরা বাড়ি থেকে পালিয়ে মার্কিন মুল্লুকে উধাও হয়।

বহু পয়সা কামিয়ে ত্রিশ বছর পরে সে ফিরছে দেশে। বাড়ি ফেরার সময় এত দিন বাদে এই সে প্রথম চিঠি লিখেছে। স্টেশনে বাপ-চাচা-দাদা সবাই উপস্থিত, সবাই খুশী, প্রচুর পয়সা কামিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসছে।

চুমোচুমি আলিঙ্গনের পর ছোকরা শুধোলে, "তোমরা সবাই এ-রকম লম্বা লম্বা দাড়ি রেখেছ কেন? এই বুঝি ফ্যাশান!"

জ্যাঠা বিড়বিড় করে বললেন, "ফ্যাশান না কচু! তুই যে পালাবার সময় ব্লেডখানা সঙ্গে নিয়ে গেলি!"

বুড়ী আরেক ঢোক জিন্ খেয়ে হেসে বললেন, "আমার পিতৃভূমি স্কট-ল্যাণ্ডে; কাজেই আমার অজানা নয় যে সেখানে কুল্লে পরিবার এক ব্লেডে দাড়ি কামায়। কিন্তু ত্রিশ বছর—?

আমি বললুম, 'ঠিক বলেছেন, ম্যাডাম। আমি ত্রিশ বছর পূর্বে লণ্ডন ছাড়ার সময় আমার ব্লেডখানা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলুম কিন্তু তাই বলে লণ্ডনের লোক দাড়ি কামানো বন্ধ করে দেয় নি। ইস্তেক গোঁফ পর্যন্ত কামিয়ে ফেলেছে।'

'মানে?'

'মানে মেয়েদের রাজত্ব। আমার ভাইপো এই প্রথম লণ্ডনে এসেছে। তার কাছে সব কিছুই নূতন ঠেকছে। সে আজ সকালে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ চিন্তা করার পর বলল, "ফোর টু ওয়ান" অর্থাৎ রাস্তা দিয়ে যদি চারটে মেয়ে চলে যায়, তবে একটা ছেলে। আমি অবশ্য বললুম, "এখন আপিস, আদালত, দোকানপাট খোলা, সেখানে পুরুষেরা কাজ করছে। অন্য সময় গুনলে হয়তো অন্য রেশিয়ো বেরোবে।" সে বলল, "ওসব জায়গায়ও তো মেয়েরাই বেশী। নিতান্ত বাস আর ট্যাক্সি মেয়েরা চালাচ্ছে না।" (পরে অবশ্য ফ্রান্স না জর্মনি কোথায় যেন তাও দেখেছি)।'

তারপর বললুম, 'এক একটা লড়াই লাগে আর মেয়েদের পায়ের শিকলি খোলার সঙ্গে সঙ্গে মনের শিকলিও খুলে যায়।'

'মানে?'

আমি বললুম, বেশী দূরে যাবার কি প্রয়োজন? ঐ 'বারে'র দিকে তাকিয়ে দেখুন না। ত্রিশ বছর আগে উড়ুক্কু বয়সের মেয়েদের দুপুরবেলা 'বারে' মাল গিলতে দেখেছেন?

বুড়ী একটু লজ্জিত নয়নে আমার দিকে তাকালেন।

আমি তাতে পেলুম আরো লজ্জা। আবার বাঙাল-পনা করে ফেলেছি।

তাড়াতাড়ি বললুম, 'না, না, এতে আমার কোন আপত্তি নেই।' তারপর অস্বস্তির কুয়াশা কাটাবার জন্য হাসির রোদ ফুটিয়ে বললুম, 'সবাই কি ত্রিশ বছরের দাড়ি নিয়ে বসে থাকবে? সময়ের সঙ্গে কদম কদম এগিয়ে যেতে হয়।'

বুড়ি যেন আমার কথায় কান না দিয়ে বললেন, 'এর জন্য আমরাই দায়ী। তবে শুনুন।'

'এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যে লণ্ডনের উপর কি রকম বোমা পড়েছে তার বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। কয়েক বছর আগে এলেও দেখতে পেতেন লণ্ডনের সর্বাঙ্গে তার জখমের দাগ। এখনো কোন কোন জায়গায় আছে—নিশ্চয়ই দেখেছেন। কিন্তু ওসব বাইরের জিনিস। আজ যদি ভূমিকম্পে লণ্ডনের আধখানা তলিয়ে যায় তবে তাই নিয়ে বাকী জীবন মাথা থাবড়াবো নাকি?'

'কিন্তু মাটির তলার ঘর "সেলারে" বসে প্রতি বোমা পড়ার সময় ভয়ে-আতংকে যে রকম কেঁপেছি সেটা হাড়গুলোকে নরম করে দিয়ে গিয়েছে,—সে আর সারবার নয়। বম্বিং-এর পর রাস্তায় বেরিয়ে মড়া দেখেছি, জখমীদের কাতর আর্তনাদ শুনেছি—বুকের উপর তার দাগ সেও কখনো মুছে যাবে না। আমার ফ্ল্যাটটা বহুদিন টিঁকে ছিল—অনেককে তাতে আশ্রয় দেবার সুযোগ পেয়েছি, দু'চার দিন থেকে তারা অন্য জায়গায় চলে গিয়েছে, কেউ বা বেশী দিন থেকেছে। একদিন এক মর-মর বুড়োকে আশ্রয় দিলুম। তাকে নিয়ে কি করবো সেই কথা ভাবতে ভাবতে যখন বাড়ি ফিরছি তখন জর্মন 'বমারে'র বাঁশী বাজলো। ঘণ্টাখানেক মাটির নিচের আশ্রয়ে কাটিয়ে যখন বাড়ি ফিরলুম তখন দেখি স্বয়ং ভগবান আমার সমস্যাটির শেষ সমাধান করে দিয়েছেন। বাড়িটি নেই। সঙ্গে সঙ্গে বুড়োও গেছে।' একটুখানি থেমে বললেন, 'পরে অবশ্য লাশটা পাওয়া গিয়েছিল।'

বুড়ীর জিন ততক্ষণে ফুরিয়ে গিয়েছে। কাপড়-চোপড় দেখে মনে হল অবস্থাও খুব ভালো নয়। ফ্রকে হাঁটুর কাছটায় আনাড়ি কিম্বা বুড়ো হাতের একটুখানি রিপুও দেখতে পেলুম। এবার কিন্তু বাঁকা চোখে।

'এখখুনি আসছি' বলে বারে গিয়ে একটা জিন নিয়ে এলুম।

মনে মনে বললুম, সদাশয় ভারত সরকার যে কটি পাউণ্ড ভারতীয় মুদ্রা মারফৎ কিনতে দিয়েছেন তা দিয়ে এ রকম করলে আর কদিন চলবে? কিন্তু তাই বলে তো আর ছোটলোকমী করা যায় না। আমার ক্যাশিয়ার মুখুজ্যেও পই পই করে বলেছে, 'কিপ্টেমি করা চলবে না; পাউণ্ড যদি ফুরিয়ে যায় তবে তন্দণ্ডেই দেশে ফিরে যাবো—ফিরতি টিকিট তো কাটাই আছে।'

বুড়ী বললেন, 'না, না। আপনি আবার কেন—? আমি এমনিতেই অনেকগুলো খাই।'

আমি হেসে বললুম, 'ত্রিশ বছর পরে এসেছি; একটুখানি পরব করবো না। যদিও স্কচ ছোঁড়ার মত মিলিয়ন নিয়ে আসি নি।'

বুড়ী বললেন, 'তখনই আমার নার্ভস যায়। অনেকেরই যায়।' তারপর ফিসফিস করে বললেন, 'চারদিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখুন না, আমার

বয়েসী কুঁগুড়া বুড়ী মদ গিলছে !

'খাবার জোটে না, অহরহ বোমা পড়ছে, কানের পর্দা শব্দের হাতুড়ী পেটা খেয়ে খেয়ে যেন অসাড় হয়ে গিয়েছে—লক্ষ্য করেন নি, অনেকেরই কান খারাপ হয়ে গিয়েছে, সবাই একটুখানি চেঁচিয়ে কথা কয় (আমি অবশ্য করি নি—তবে কথাটা সম্পূর্ণ ভুল নাও হতে পারে)—দিনরাত কেটে যাচ্ছে, চোখের পাতায় ঘুম নেই, এমন সময় পাশের বাড়ি উড়ে যাওয়ার পর তাদের "সেলার" থেকে বেরুলো এক গুদোম মদ।

'আগের থেকেই নার্ভস ঠাণ্ডা করার জন্য ধরেছিলুম সিগারেট, এখন পেলুম ফ্রী মদ। মদ খেলে আরেকটা সুবিধে। খিদেটা ভুলে থাকা যায়, আর নেশাটা ভালো করে চড়লে দিব্য ঘুমনোও যায়—বোমা ফাটার শব্দ সত্ত্বেও।

'খাবার নষ্ট হয়ে যায় সহজেই, কিন্তু মদ একবার বোতলে পুরলেই হল। তাই খাবারের চেয়ে মদ জুটতো সহজে—অন্তত আমার বেলা তাই হয়েছে। সেই যে অভ্যাসটা হয়ে গেল সেটি আর গেল না। এই দেখুন হাত কাঁপছে। গণ্ডখানেক খাওয়ার পর হাত দড়ো হবে। আর নাই বা হলো দড়ো। কদিনই বা বাঁচার আর বাকি আছে !

'কিন্তু যে কথা বলছিলুম। আমাদের মত বুড়ীদের দেখে দেখে ছুঁড়ীরাও মদ খেতে শিখেছে। দোষটা তো আমাদেরই।'

বুড়ী থামলেন। খোলা দরজা দিয়ে চোখে পড়ল বৃষ্টি নেমেছে। দেশের মত গামলা-ঢালা বর্ষণ নয়—সে-বস্তু এদেশে কখনো দেখি নি। ঝিরঝিরে ফিন-ফিনে। তারই ভেতর দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া আরো যেন ঠাণ্ডা হয়ে 'পাবে' ঢুকে আমার হাড়ের ভিতর সেঁধিয়ে গিয়ে কাঁপন ধরিয়ে দিল। ওদের অভ্যাস আছে, বুড়ী পর্যন্ত বিচলিত হল না, কেউ দরজা বন্ধ করে দেবার কথা চিন্তাও করলে না।

পূর্বেই বলেছি বুড়ীরা দেখে কম, বোঝে বেশী। বললেন, 'বাবাজী এদেশে এলেন অক্টোবর মাসে, যেটা কিনা ইংলণ্ডের ওয়েটেস্ট্ মন্থ্, বৃষ্টি হয় সব চেয়ে বেশী। অবশ্য এ বছর আবহাওয়ার কোনো জমা-খরচ পাওয়া গেল না—তেষট্টি বছরের ভিতর এ-রকম ধারা কখনো হতে দেখি নি! যখন বৃষ্টি হওয়ার কথা, তখন ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর, আর যখন রোদ্দুর হওয়ার কথা, ফসল কাটার সময়, তখন হল বৃষ্টি। এ-রকম হলে এদেশ থেকে চাষবাসের যেটুকু আছে তাও উঠে যাবে।'

আমি বললুম, 'এই অনিশ্চয়তার জন্যই গত একশ' বছর ধরে এদেশে গমের চাষ কমে গিয়েছে—কোথায় যেন পড়েছি।'

বুড়ী বললেন, 'এবারের সঙ্গে কিন্তু আদপেই তার তুলনা হয় না। সবাই বলে এটম বম নিয়ে মাতামাতি করার ফলে। হবেও বা। আপনাদের দেশেও তো শুনেছি একেবারে তুলকালাম কাণ্ড হয়েছিল—বিস্তর গর্মী, অল্প বৃষ্টি।'

একটু আরাম বোধ করলুম। তাহলে বুড়ী এখনো খবরের কাগজটা অন্তত পড়ে। জীবনে আঁকড়ে ধরার মত অন্তত কিছু একটা আছে। বললুম,

'সেকথা আর তুলবেন না, ম্যাডাম। দিনের পর দিন ঝাড়া দুটি মাস ধরে ১১৪ ডিগ্রীর ১১৪ ন্যজাওলা ক্যাট অ নাইন টেলসের চাবুক খেয়ে পিঠে ঘা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখন ঠাণ্ডায় সে-কথা ভাবতে চিত্তে পুলক লাগে, দেহ কদম ফুলের মত—'

'সে আবার কি ফুল?'

খাইছে! এ যেন লণ্ডন শহরে মুখুজ্যের বটগাছ সন্ধান করার মতো। বললুম, 'ম্যাডাম, সে তো বোঝানো অসম্ভব। এদেশের কোনো ফুল তার কাছ ঘেঁষেও যায় না। বোঝাতে গেলে সেই অন্ধের বক খাওয়ার মতো হবে। অন্ধকে শুধালে "দুধ খাবে?" "দুধ কি রকম?" "সাদা।" "সাদা কি রকম?" "বকের মতো।" "বক কি রকম?" লোকটা তার কনুই থেকে বক-দেখানোর বাঁকানো হাতের আঙ্গুল পর্যন্ত অন্ধের হাতে বুলিয়ে দিল। অন্ধ ভয় পেয়ে বললে, "বাপ্‌স্‌! ও আমি খেতে পারবো না—আমার গলা দিয়ে ঢুকবে না।"

তারপর বললুম, 'কিন্তু ম্যাডাম, আপনি যে বললেন, ছুঁড়ীরা আপনাদের অনুকরণে মদ খেতে শিখেছে এ কথাটা আমার মনকে সাড়া দিচ্ছে না। আমার মনে হয়, যারা মদ খায় তাদের অধিকাংশই দুরন্ত দৌড়ঝাপটার কাজ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যই ঐ কর্ম করে। চাষাবাদের কাজ ঢিমেতেতালা; তারা মদ খায় কম। কারখানার কাজ জলদ তেতাল; তারা খায় বেশী। আগে শুধু পুরুষেরা যে-সব ধুন্দুমারের কাজ করতো এখন মেয়েরাও সে সব কাজ করছে বলে তাদেরও একটু-আধটু পান করতে হচ্ছে। কিন্তু এটাও বলে রাখছি এ রেওয়াজ বেশীদিন থাকবে না।'

'কেন?'

আমি বিজ্ঞের ন্যায় বললুম, 'পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও পড়িনি, আমি নিজে কোথাও দেখিনি মদ নিয়ে মেয়েদের বাড়াবাড়ি করতে—ও বস্তু যেখানে জলের মত সস্তা সেখানেও। তার কারণ মেয়েদের বাচ্চা প্রসব করতে হয়। প্রকৃতি চায় না মদের বাড়াবাড়ি করে মেয়েরা স্বাস্থ্য নষ্ট করুক। এবং শেষ কথা পুরুষের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের আবার ঘরকন্নার দিকে ফিরে যেতে হবে।'

বুড়ী বললেন, 'কি জানি! প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তাই হয়েছিল বটে, কিন্তু এবার কি তারা যে স্বাধীনতা পেয়েছে সেটা আর ছেড়ে দেবে? সেবারে শুধু তারা পুরুষের কাজ করার অধিকার পেয়েছিল, এবারে তার টাকা ওড়াবার অধিকারও তারা পেয়েছে যে। এই যে তারা "পাবে" আসে, সেটা কেন? পুরুষের মত আড্ডা জমাতে তারাও শিখে গিয়েছে।'

আমি শুধালুম, 'বাড়িতে মদ খাওয়া অনেক সস্তা!'

বুড়ী আনমনে বললেন, 'অনেক। কিন্তু বাড়িতে আমার আর কে আছে? কর্তা তো আগেই গেছেন। ছেলেটাও ফ্রান্সের আণ্ডার গ্রাউণ্ডে কাজ করতে গিয়ে নিখোঁজ হল।'

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—গলায় নেশার চিহ্নমাত্র নেই—"কিন্তু জানেন, আমি তার আশা এখনো ছাড়তে পারি নি। হঠাৎ পেছন থেকে ডাক শুনতে পাবো—"মা"।'

শেষে ঘুম ভাঙতেই শুনি, পাশের বাড়ির লক্ষ্মীছাড়া রেডিয়োটা 'ধর্ম-সঙ্গীত' গাইছে।

মনে করো শেষের সে দিন ভয়ংকর
অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।

কোথায় ব্রাহ্মমুহূর্তে প্রসন্নমনে জানলা দিয়ে সবুজ গাছটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সবুজ প্রাণশক্তি আহরণ করব, তা না, তখন স্মরণ করিয়ে দিলে শেষের দিনের কথা। ঘুম তো এক রকমের মৃত্যু, সেই মৃত্যুর থেকে উঠে শুনতে হয় বিভিষীকাময় আরেক মৃত্যুর কথা—তাও বিটকেল 'গানে গানে'!

এখানে সকালবেলা খাটের পাশে রেডিয়োটা চালিয়ে দিই আবহাওয়ার ভবিষ্যৎবাণী শোনার জন্য। এ-দেশে সেটা জানার বড্ডই প্রয়োজন। বৃষ্টি হলেই গেছি—বুড়ো হাড় নিয়ে রাস্তাঘাটে ফ্লু, নিউমোনিয়া কুড়োতে ভয় করে। রোদের সামান্যতম আশা পেলে মনটা চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

এ-দেশের আলিপুর কতখানি নির্ভরযোগ্য! দেশে থাকতে আবহাওয়ার বিলিতি এক ওস্তাদের এক বিবৃতি পড়েছিলুম। তিনি কলকাতায় এসে বেশ মুরুব্বিয়ানার সুরে বললেন, 'তোমাদের দেশে এখনও আবহাওয়া যথেষ্ট পর্যবেক্ষণ করার মত ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে দফতর নেই বলে প্রায়ই ভবিষ্যৎবাণী করতে পার না। আমরা কিন্তু এখন বিলেতে মোটামুটি পারি।'

এর পরীক্ষা হাতেনাতে হয়ে গেল।

একদিন ঘুম দেরীতে ভাঙায় বেতার-রিপোর্টটা শুনতে পাই নি। সিঁড়ি দিয়ে নামাবার সময় বাড়ির বুড়ী ঝিয়ের সঙ্গে দেখা—তার এক হাতে ভ্যাকুয়াম ক্লীনার অন্য হাতে বালতি। শুধালাম, 'বেতারে আবহাওয়ার বাণী কিছু শুনেছ?'

একগাল হেসে বললে, 'এবারে যা আবহাওয়া—' বলে সেই 'পাবে'র বুড়ীর মতো অনেক কথাই বললে—ইস্তেক এটম বম্ যে এ-সব গড়বড়ের প্রধান কারণ সেটা বলতেও ভুলল না।

সর্বশেষে বললে, 'যেন সব কিছু যথেষ্ট বরবাদ হয় নি বলে শেষমেষ এলেন ঝড়, 'গেল্'! ওঃ, তার কী দাপট!'

আমি শুধালাম, 'আবহাওয়া দফতর সতর্ক করে নি, ওয়ার্নিং দেয় নি?'

গম্ভীরভাবে বললে, 'ইয়েস, সার, আফটারওয়ার্ডস, ঝড়ের পরে দিয়েছিল।'

রসবোধ আছে বৈকি।

কিন্তু মোদ্দা কথায় ফিরে যাই। আবহাওয়ার ভবিষ্যৎবাণী করার পূর্বে বেতারে হয় ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা উপাসনা। সাতসকালে ওটাও সেই 'অন্যলোকে কবে কথা তুমি রবে নিরুত্তর' গোছ। কিন্তু পাছে আবহাওয়া মিস্ করি তাই সেটা শুনতে হত।

সর্বপ্রথম যেটা কানে ঠেকে সেটা পাদরী সায়েবের ভাষা।

একদা ধর্ম প্রভাব করতো সাহিত্য, কলা, সঙ্গীত তাবৎ রসপ্রকাশ-প্রচেষ্টাকে —এখনোও করে। এ কথা ফলাও করে বোঝাবার কিছুমাত্র দরকার নেই— কারণ বহু শতাব্দী ধরে রিলিজিয়াস আর্টের সাধনা করার পর মানুষ এই সবে সেকুলার আর্ট আরম্ভ করেছে।

এখন আরম্ভ হয়েছে উল্টো টান। এখন ধর্মযাজকরা আপন-আপন ভাষা সরল, প্রাঞ্জল, ওজস্বিনী, মর্মস্পর্শী করার জন্য ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য থেকে বচনভঙ্গী ধার নিচ্ছেন। আজকের দিনের জীবন যে চরম মূল্যে বিশ্বাস হারিয়ে দেউলে হয়ে গিয়েছে তারই বর্ণনা দিতে গিয়ে এক পাদরী সায়েব যখন ভোরবেলা বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন আমার কেমন যেন আবছা-আবছা মনে পড়তে লাগল, কোথায় যেন এটা পড়েছি। তারই সন্ধানে যখন আমার মন আর স্মৃতিশক্তি লুকোচুরি খেলছে তখন, ও হরি, পাদরী সায়েবই মাইকের উপর হাঁড়ি ফাটালেন। বললেন, আজকের দিনের দুনিয়া দেউলে ; সর্বভুবন এখন এক বিরাট 'ওয়েস্টল্যান্ড'।

কবিতাটি আমি মাত্র একবার পড়েছি, তাও বহু বৎসর পূর্বে এবং সেও থামচে থামচে, অর্থাৎ ইংরেজীতে যাকে বলে স্কিপ্ করে করে, কারণ ও-কবিতায় একাধিক ভাষার যে জগা-খিচুড়ি পাকিয়ে ভাষা-শেখাতে-অগা এক-ভাষা-নিষ্ঠ (মনোগ্লট্) ইংরেজকে তাক লাগাবার কিশোরসুলভ প্রচেষ্টা আছে, তা দেখে আমি বে-এক্তেয়ার হব কেন—আমি তো এ সব কটা ভাষা এলিয়টের মতই বিলক্ষণ মিসান্ডারস্টেন্ড করতে পারি।[১] কাজেই কবিতাটি স্মরণ করতে যদি সময় লেগে থাকে তাহলে আশা করি, যাঁদের কাছে ঐ 'কবিতা' রামায়ণ-মহাভারতের চেয়েও প্রণম্য তাঁরা অপরাধ নেবেন না।

ইংলন্ডের প্রার্থনার কথা ওঠাতে যদি ইংরেজী সাহিত্য নিয়ে এস্থলে কিঞ্চিৎ বাক্যবিন্যাস করি, তবে বিবেচনা করি, সেটা নিতান্ত বেখাপ্পা শোনাবে না, এবং সে-বাসনা যে আমার কিঞ্চিৎ আছেও, সেটা অস্বীকার করব না, কিন্তু তাহলে মূল বক্তব্য থেকে অনেকখানি দূরে চলে যাব বলে পাঠক হয়ত ঈষৎ অসহিষ্ণু হয়ে উঠবেন। তাই শুধু এই প্রশ্নই শুধাই, ভোরবেলায় পাদরী সায়েব বেছে বেছে আমাদের এলিয়ট সায়েবকেই স্মরণ করলেন কেন ?

মার্কিন মুল্লুকের লেখককে ইংরেজ সহজে কল্কে দেয় না কাজেই এই কল্কে পাওয়ার জন্য এলিয়টকে বিস্তর কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। বহু জায়গায় বিস্তর কল্কে পাওয়ার পর ইংলন্ডের

১। "…they are simply the kind of thing that goes on in the head of a troubled man who has drunk at the best universities and is half-drugged with literature, who has studied a little Sanskrit at Harvard and done a certain amount of travelling in Europe……"—E. Wilson.

কনসারভেটিভ পার্টিতেও তো জাতে ওঠবার জন্য তিনি লিখলেন "দি লিটারেচার অব পলিটিক্স" —"টিএস্ এলিয়ট ও এম কর্তৃক লিখিত; রাইট অনরেবল স্যার এণ্টনি ঈডন, কে জি; এম সি; এম্ পি কর্তৃক ভূমিকা সম্বলিত"। এরকম ব্যাপার যে ইংলণ্ডে হতে পারে আমি জানতুম না। আজ যদি শ্রদ্ধেয় পরশুরাম "শ্রীরাজশেখর বসু রায়সায়েব কর্তৃক লিখিত এবং শ্রীযুত ভূতনাথ ভড় রায়বাহাদুর, বিধানসভারসদস্য, কাইসার-ই-হিন্দ দ্বিতীয় শ্রেণী মেডলপ্রাপ্ত কর্তৃক ভূমিকা সম্বলিত" পুস্তক প্রকাশ করেন তবে যে-রকম বিস্মিত এবং বিরক্ত হব। সাহিত্যজগতে (এলিয়ট যে পলিটিশিয়ান নন, সে সবাই জানে) তিনি তার ও. এম উপাধিটি উল্লেখ করতে ভুলবেন না, আর ঈডন তো সালঙ্কার থাকবেনই। মুসলমান বলে আমি ঠিক বলতে পারবো না, তবে অনুমান করি চাঁড়াল যদি পৈতে পেয়ে যায়, (স্বগুণেই বলছি) তবে বোধ হয় সে সেটা সর্বক্ষণ মাথায় জড়িয়ে পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরে বেড়ায়! আশা করি, এর পর যখন বাঙলার সাহিত্যিকরা রাজনীতিকদের দাওয়াত করে সভাপতি বানিয়ে, তাদের দিয়ে সাহিত্য অথবা সাহিত্যিকদের চরিত্রের আনাড়ি সমালোচনা করাবেন, তখন শ্রীযুত প্রমথনাথ বিশী প্রমুখ অনাদৃত খাঁটি সাহিত্যিকরা অহেতুক উষ্ণ-গোস্সা প্রদর্শন করবেন না। এঁদের গুরুঠাকুর মহামান্যবর এলিয়ট সাহেব—এঁরা তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন মাত্র।

সাহিত্যজগতে কল্কে পেয়েই এলিয়ট সন্তুষ্ট নন। তিনি আরও বহু কল্কে বহু জায়গায় পেয়েছেন।[১] কিন্তু ইংলণ্ডের সর্বোচ্চ এবং সর্বশেষ কল্কে ধর্মচক্রে —কে না জানে সে দেশের রাজা এবং রানীর অন্যতম জাঁদরেল উপাধি "ডিফেণ্ডার অব ফেৎ'? স্বয়ং পোপ ইটি অষ্টম হেনরিকে দিয়েছিলেন। সেখানে কল্কে পাওয়া চাই-ই-চাই।

এলিয়ট তাঁর ধর্মবিশ্বাস পরিষ্কার ভাষাতেই প্রকাশ করেছেন—সেটা তাঁর কবিতার মত তের্ষাট্টি রকমে বোঝা এবং বোঝানো যায় না, এই রক্ষে। পাস্কাল সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'ধর্মগুলোর ভিতর খ্রীষ্টধর্ম, এবং তার ভিতরে ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্মই জগৎ এবং বিশেষ করে অধ্যাত্মজগতের সমস্যা এবং কার্যকারণ সর্বোত্তমভাবে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে ('টু অ্যাকাউণ্ট মোস্ট্ সেটিসফেকটরিলি ফর দি ওয়ার্লড অ্যাণ্ড স্পেশালি দি

১ "Who is who"-তে আছে D. Litt of Oxford, a Litt. D. of Harvard, Yale, Princeton, Columbia, Bristol, Leeds and Washington; an LLD. of Edinburgh and St. Andrews, a D. es L. of Paris: Aix-Marseille, and Rennes, a D. Phil of Munich; an Honorary Fellow of Merton College and of Magdalene College, an offer de la Legion d' Honneur, and a foreign Member of the Accademia dei Lincei of Rome.

এ ছাড়া নোবেল প্রাইজ তো আছেই।

মরাল ওয়ার্ল্ড উইদিন')। যীশুখ্রীষ্ট যে জলকে মদ্যরূপে পরিবর্তিত করেছিলেন, 'মৃতজনে প্রাণ' দিয়েছিলেন এসব অলৌকিক কার্যকলাপে তিনি বিশ্বাস করেন।[২] তিনি অ্যাংলো ক্যাথলিক গির্জায় (বিলাতের সরকারী, রাজরানীর প্রতিষ্ঠান) গিয়ে পুজোপাট করেন, মন্ত্রপূত রুটি এবং মদের মাধ্যমে খ্রীষ্টের সঙ্গে অশরীরী ভাবে 'হরিহরাত্মা' হন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

তাতে কারও কোনও আপত্তি থাকার নয়। আমাদের মডার্ন কবিরাও হয়ত ইতু ঘেঁচুর পুজো করেন, নজরুল ইসলাম আজ যদি মোল্লার কাছ থেকে পানি-পড়া তাবিজ-কবজ নিয়ে ব্যামো সারাতে চান তবে আমরা উল্লাস অনুভব করব—ডাক্তার-কবরেজ তো হার মেনেছেন—কিন্তু এ-বাবদে একটা প্রশ্ন স্বভাবতই উদয় হয়।

গোঁড়া ক্যাথলিকরা বিশ্বাস করেন, অ-খ্রীষ্টানরা অন্তত নরকের আগুনে জ্বলবে। গোঁড়া মুসলমানরা অতখানি ঠিক করেন না—তাঁদের মতে কোনও অনৈসলামিক ধর্মের মূলতত্ত্ব (ফাণ্ডামেণ্টলস্) যদি ইসলামের সঙ্গে মেলে তবে সে-ধর্মের লোক স্বর্গে না গেলেও অনন্ত নরকে জ্বলবে না। এখন প্রশ্ন এলিয়ট কি বিশ্বাস করেন, তাঁর বাঙালী হিন্দু-মুসলমান চেলারা অনন্ত নরকের আগুনে রোস্ট মটন্ কিংবা তন্দুরী মুর্গীভাজা হবে? যাঁরা তাঁর সঙ্গরস পেয়েছেন তাঁরা যদি বাৎলে দেন, তবে উপকৃত হব।

কিন্তু ইহুদীদের সম্বন্ধে এলিয়ট তাঁর বক্তব্য সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন। পাঠক স্মরণ রাখবেন, ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ 'প্রাচীন নিয়ম' (ওল্ড টেস্টামেণ্ট) খ্রীষ্টানদের ধর্মগ্রন্থও বটে এবং খ্রীষ্টানদের একেশ্বরবাদ, প্রতিমাবর্জন, স্বর্গ-নরক, শেষ বিচার, গির্জার প্রার্থনা-পদ্ধতি ইহুদীদের কাছ থেকে নেওয়া, এবং সব চেয়ে বড় কথা স্বয়ং যীশুখ্রীষ্ট ইহুদী-সন্তান—মথিলিখিত সুসমাচারে আরম্ভই যীশুর কুলজি নিয়ে; তিনি ইহুদীদের বংশপিতা আব্রাহামের (ইব্রাহিমের) বংশধর।

এলিয়ট আদর্শ সমাজব্যবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'যে সে আদর্শ সমাজে 'রক্ত ও ধর্ম' এই দুয়ে মিলে মুক্তচিন্তাশীল ইহুদীদের (আদর্শ সমাজে) বেশী সংখ্যায় থাকা অবাঞ্ছনীয়।'

(Reasons of race and religion combine to make any large number of free-thinking Jews undesirable)

সোজা বাঙলায় প্রকাশ করতে গেলে দাঁড়ায়ঃ—যেমন মনে করুন রবীন্দ্রনাথ যদি বলে যেতেন, 'পার্সীদের ধর্ম এবং রক্ত আলাদা (এবং এটাও লক্ষণীয় যে, ইহুদী ও পার্সী উভয় সম্প্রদায়ই বিত্তশালী) এ দু'য়ে মিলে গিয়ে এমনই

---

২ এ বাবদে বার্নার্ড শ'র ধারণা (ব্লাক গার্ল) তুলনীয়। তিনি খ্রীষ্টকে 'ক্লেভার কনজিয়োরার' বা 'ঘড়েল ম্যাজিশিয়ান' বলে উল্লেখ করেছেন। রামমোহন রায় খ্রীষ্টের মহত্ত্ব স্বীকার করেও তাঁর অলৌকিক কার্যকলাপে (মিরাকল্) বিশ্বাস করতেন না বলে পাদরী বন্ধুগণ কর্তৃক বর্জিত হন।

এক বিপর্যয় ঘটেছে যে এদের থেকে বেশী লোক ভারতীয় সমাজে থাকুক এটা বাঞ্ছনীয় নয়।' !!!

অ্যান্টনি ঈডনের ভূমিকাসম্বলিত এলিয়টের যে 'লিটরেচার অব্ পলিটিক্‌স্' বইয়ের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি তাতে এলিয়ট চারজন কনসারভেটিভ সাহিত্যিকের উল্লেখ করেন ; বলিংব্রুক্, বার্ক, কোলরিজ্ এবং ডিজ্‌রেলি। ডিজ্‌রেলির কথা বলতে গিয়ে এলিয়ট বলেছেন, 'হ্যাঁ, ইনি (এখানে বোধ হয় এলিয়ট একটু থেমে গিয়ে মৃদু গলাখাঁকারি দিয়েছিলেন) একটা সাদামাটা পাস পেতে পারেন মাত্র ; আমি অবশ্য গির্জার সদস্য গ্ল্যাডস্টনকেই পছন্দ করি বেশী।'

সমালোচক উইলসন কাষ্ঠহাসি হেসে এস্থলে বলেছেন, 'হ্যাঁ, একজন মুক্ত-চিন্তাশীল ইহুদী চললেও চলতে পারে, অবশ্য তিনি যদি কনসারভেটিভের স্বার্থে কাজ করেন।'

অনেকটা রবি ঠাকুর যেন বলেছেন, 'নৌরজী চললেও চলতে পারেন ; আমি কিন্তু গোঁড়া টিলককেই পছন্দ করি।'

এ-আলোচনা উঠেছিল যখন বিবিসি দর্শনে যাই—হাজার হোক এ-জীবনের চারটি বছর দিশী বেতারে নষ্ট করেছি তো !

পারস্যে প্রখ্যাত কবি মুশররফ্ উদ্দীন বিন্ মুস্লিহ উদ্দিন শেখ সাদীকে একদিন দেখা গেল ভরসন্ধ্যেবেলা গোরস্তানের দেউড়ির সামনে। এ সময়টা মৃতের সদগতি-প্রত্যাশাকামী উপাসনার জন্য প্রশস্ত নয় ; তাই রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে কবির এক বন্ধু তাঁকে দেখতে পেয়ে শুধালেন, 'অবেলায় এখানে কি করছেন, শেখসাহেব ?'

দীর্ঘ দাড়ি দুলিয়ে, দীর্ঘতর নিঃশ্বাস ফেলে বৃদ্ধ বললেন, 'আর বলো না ভাই, গেরো গেরো। জানো তো অমুককে। আমার কাছ থেকে একশ' তুমান ধার নিয়েছিল বছরটাক হয়ে গেল। ফেরৎ পাই নে। পাড়ায় পাড়ায় খেদিয়ে বেড়িয়েও তাকে ধরতে পাই নে। তখন আমার এক গুরুভাই আমাকে পরামর্শ দিয়েছে এখানে এসে অপেক্ষা করতে। গোরস্তানে নাকি সবাইকে একদিন আসতে হয়।'

বিবিসি লণ্ডন তথা ইংলণ্ড, এমন কি লণ্ডনাগত বিদেশী গুণী-জ্ঞানীরা জ্যান্ত গোরস্তান। গাইয়ে, বাজিয়ে, নাট্যকার, বক্তৃতাবাজ, পাহাড়-চড়নে-ওলা, চোরের সেরা, ডাকাতের-বাড়া (এরাও ইন্টারভু দেয়) হেন প্রাণী নেই যে সেখানে একদিন না একদিন না-আসে।

আমার জন্মভূমি সোনার দেশ ভারতবর্ষে অবশ্য ভিন্ন ব্যবস্থা। তার সম্বন্ধে অন্য গল্প আছে। সেটা কিন্তু বাজারে চালু হয় নি। 'আকাশবাণী'তে সামান্য যেটুকু প্রোগ্রামে পায় তাও কাটা যাবার ভয়ে সে গল্পই কেউ বলতে চায় না, শুনলেও ভুলে যেতে চায়।

এটম্ বম্ পড়লে কি কি কাণ্ড হতে পারে তারই রগরগে বর্ণনা শুনে এক নিরীহ বঙ্গসন্তান তার বৈজ্ঞানিক বন্ধুকে শুধালে, 'এ সব কি সত্যি ?'

'এক দম্ ! বরঞ্চ কমিয়ে সমিয়ে বলেছে।'

'তা হলে উপায় ? দূরদূরান্তে, লড়াইয়ের আওতার বাইরে কোনো নির্জন দ্বীপে চলে গেলে হয় না ?'

'হয়। কিন্তু এদেশের সরকার এটম বমের বিরুদ্ধে উত্তম ব্যবস্থা করেছেন। বম ফাটার সম্ভাবনা দেখলেই, আকাশবাণীর কোনো স্টুডিয়োতে ঢুকে পড়ো। সেখানে কোনো রেডিও-এ্যাক্‌টিভিটি নেই।'

আমি অবশ্য মৌলানা সাদীর মতো দেনাদারকে পাকড়াবার জন্য বিবিসেতে যাইনি। আমি গিয়েছিলুম আপন ঋণ শোধ করতে। পূর্বেই বলেছি, এক্দা আমি বেতারে বাঁধা ছিলুম। সে সুবাদে দু'একজন কর্মীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা এমন কি দহরম-মহরম হয়। দেশে নিষ্কর্মা বিবেচিত হওয়ার পর বিবিসি এদের লুফে নিয়েছে—পাড়ার মেধো ওপাড়ার মধুসূদন তুচ্ছার্থে বলা হয়, এখানে কিন্তু সত্যই।

জর্মনির জন্য বিবিসি যে জর্মন প্রোগ্রাম করে তারই বড় কর্তা আসলে ভিয়েনাবাসী জর্মনভাষী ডঃ ভল্‌ফের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে আমাদের সিন্‌হা (আসলে সাদামাটা কায়েতের পো 'সিঙ্গি', নিতান্ত সম্মানার্থে 'সিংহ', কিন্তু ছোকরা হামেশাই একটু সায়েবী ঘেঁষা ছিল বলে আমরা বাঙলাতে কথা কইবার সময়ও সিন্‌হা' বলতুম)। লোকটি অসাধারণ পণ্ডিত এবং সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর দৈনন্দিন সর্ব সমস্যা সম্বন্ধে অহরহ সচেতন। এ সমন্বয় সচরাচর চোখে পড়ে না।

আশ কথা পাশ কথার পর আমিই বললুম, বিবিসির জর্মন কর্মচারীদের উচ্চারণ জর্মনি থেকে সম্প্রসারিত খাস জর্মন বেতার বাণীর চেয়ে ভালো। প্রিয় অসত্য আমি যে একেবারেই বলি নে তা নয়, কিন্তু প্রিয় সত্য বলবার সুযোগ পেলে আত্মপ্রসাদ হয় ঢের ঢের বেশী।

হিটলার বরিশালের লোক। অর্থাৎ বরিশালের লোক কলকাতার ভাষা বলতে গেলে যে রকম তার কথায় আড় থেকে যায়, হিটলারের পোশাকী জর্মনে তেমনি শুধু আড় নয়, তাঁর জন্মভূমি অস্ট্রীয় উপভাষার বোটকা গন্ধ পাওয়া যেত। হিটলার কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কখনো যান নি, শিক্ষিত আচার্য পণ্ডিতদের তিনি দু'চোক্ষে দেখতে পারতেন না, তদুপরি নূতন ভাষা শেখা বাবদে তিনি ছিলেন ষোল আনা অগা। (মুসসোলীনি চমৎকার জর্মন বলতে পারতেন এবং একমাত্র তাঁর সঙ্গেই কথা কইতে তাঁর দোভাষীর প্রয়োজন হত না। ওদিকে আবার স্তালিনের রুশ উচ্চারণে ককেসাসের গুরুভার ছিল বলে তিনি লেকচর বাজী করতে ভালবাসতেন না কিন্তু ট্রটস্কি ছিলেন বহু ভাষায় অসাধারণ পণ্ডিত। কাজেই এসব উল্টোপাল্টা নমুনা থেকে আমি কোনো সূত্র আবিষ্কার করতে পারি নি।) হিটলার যখন রাজ-রাজেশ্বর হয়ে গেলেন তখন যে তাঁর চেলাচামুণ্ডারা শুধু তাঁর উচ্চারণ নকল করতে আরম্ভ করলেন তাই নয়, তাঁরই

মত কর্কশ গলায় (হিটলার টনসিলে ভুগতেন) দাবড়ে দাবড়ে কথা বলতে আরম্ভ করলেন—এক গ্যোবেলস্ ছাড়া। জর্মনির খানদানী শিক্ষিত পরিবারে যে ঋজু, স্বচ্ছ, চাঁচাছোলা উচ্চারণ প্রচলিত ছিল, অধ্যাপকরা যে ভাষায় কথা বলতেন, থিয়েটার অপেরাতে যে উচ্চারণ আদর্শ বলে ধরা হত, সেটা প্রায় লোপ পাবার উপক্রম করলো। যুদ্ধ লাগার পূর্বে এবং পরে যারা লণ্ডনে পালিয়ে গিয়ে বিবিসির জর্মন সেকশনের ভার নিলো তারা প্রধানতঃ ঐ সব শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী। আজকের দিনে যারা বিবিসিতে জর্মন বলে তারা ওদেরই ঐতিহ্যে চলে। ওদিকে যদিও জর্মনরা হিটলারী রাজত্বের বারো বৎসরের দুঃস্বপ্ন যত তাড়াতাড়ি পারে ভুলে যেতে চায় তবু পুরনো দিনের অভ্যেস অত সহজে যাবে কেন ?

তাই বিবিসির জর্মন উচ্চারণ এমন খাস জর্মনীর থেকে খানদানী।

অভ্যাস যে সহজে যেতে চায় না তার উদাহরণ যত্রতত্র সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। বাঙলা দেশ থেকেই তার একটা অতি সাধারণ উদাহরণ দিয়ে আরম্ভ করি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এদেশে কাপড়ের কি অনটন পড়েছিল সে-কথা আমরা ভুলি নি। তারই ফলে পাঞ্জাবির ঝুল কমে কমে প্রায় গেঞ্জির মতো কোমরে উঠে গিয়েছিল ! তারপর লড়াই শেষ হওয়ার পর যখন বাজারে আর আদ্দির অভাব রইল না, তখনো কিন্তু ঝুল আর নামে না। ইতিমধ্যে ঐটেই হয়ে গিয়েছে ফ্যাশান !

ইংলণ্ডেও তাই। সেই যে যুদ্ধের সময় কাপড়ের অভাবে মেয়েরা অল্প ঘেরের স্কার্ট বানাতে বাধ্য হয়েছিল আজ সেটা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং তার ঘের এতই মারাত্মক রকমের অল্প যে বাসের পাদানিতে পা তোলা যায় না। বাসের হ্যাণ্ডিল ধরে মেমসায়েবদের লাফ দিয়ে একসঙ্গে দু'পা তুলে বাসে উঠতে হয়। আমারই চোখের সামনের একদিন একটা কেলেংকারি হয়ে গেল। একটি 'ফুল্ স্লিম' (আজকাল 'মোটা' বলা অসভ্যতা—সেটা সংস্কৃত পদ্ধতিতে 'ফুল-স্লিম' বলাটা যে আইনস্টাইন আবিষ্কার করেছেন তাঁকে বার বার নমস্কার !) মহিলা বাসে উঠতে গিয়ে লাফ না দিয়ে পুরুষদের মতো পা তুলতেই চড় চড় করে স্কার্টটি প্রায় ইস-পার উস্-পার !

যাদের কম ঘেরের লুঙ্গি পরার অভ্যাস আছে তাদের নিশ্চয়ই এ অভিজ্ঞতাটি একাধিকবার হয়েছে—প্রধানত লুঙ্গীর বার্ধক্যে।

ঘটনাটা নিত্য নিত্য এ-দেশে হয় কি না বলতে পারবো না, কারণ যে কটি লোক কাণ্ডটা দেখলে তারা মৃদু হাস্য করা দূরে থাক, তাদের নয়নের উদাস দৃষ্টি যেন সঙ্গে সঙ্গে উদাসতর হয়ে গেল। আমিও ইতিমধ্যে কিঞ্চিৎ শহুরে হয়ে গিয়েছি। মাথা নিচু করে গভীর মনোযোগ সহকারে খবরের কাগজে বভরিলের বিজ্ঞাপন—বিজ্ঞাপন তো বিজ্ঞাপনই সই—পড়তে লাগলুম।

ঘটনাটি প্রচুর 'ধ্বনি' ও ব্যঞ্জনা সহকারে এক ইংরেজ বন্ধুকে যখন বাখানিয়া বললুম, তখন তিনি বললেন, 'কেন, এ ব্যাপার তো এখন ক্লাসিক্সের পর্যায়ে উঠে গেছে ! শোনো। এক কক্নি আর এক কক্নিতে উপদেশ দিচ্ছে, মিলের

শেয়ার না কিনতে। "কি হবে কিনে? কাপড়ের এখন আর কতখানি প্রয়োজন? এই দেখ না, আমি আমার স্ত্রীর গেল বছরের স্কার্ট দিয়ে নেকটাই বানিয়েছি, আর তিনি আমার গেল বছরের টাই দিয়ে এ বছরের স্কার্ট বানিয়েছেন।'

কিন্তু এহ বাহ্য। এসব জিনিস দিয়ে ইংরেজ চরিত্রের অদল-বদল হয়েছে কি না সে-কথা বলা অসম্ভব না হলেও কঠিন। এক মার্কিন সেপাই যুদ্ধের সময় দেশের ভিতর দিয়ে যাবার সময় দেখে, যেখানেই পুকুর কাটা হয়েছে সেখানেই পুকুরের মাঝখানে মাটির কোনিকাল থাম রাখা হয়েছে—আসলে এটা কতখানি মাটি কাটা হয়েছে তার মাপ রাখার জন্য এবং মাটি-কাটাদের মজুরী চুকিয়ে দেবার পর এ থামগুলোও কেটে ফেলা হয়—কিন্তু মার্কিন ত র ভ্রমনকাহিনীতে লিখলে, 'বাঙলা দেশের লোকই সব চেয়ে বেশী শিবলিঙ্গ পুজো করে। এন্তের পয়সা খরচ করে বিরাট বিরাট পুকুর খুঁড়ে মাঝখানে শিবলিঙ্গ স্থাপন করে।'

এটা শুনে আমার শিক্ষা হয়ে গিয়েছে। না হলে ক্লিয়োপাত্রার নীড্‌ল্ (আবিলিস্ক) ইয়োরোপের যে সম্মানের সঙ্গে রাখা হয়েছে তার থেকে মীমাংসা করে আমিও বলে দিতাম, ইয়োরোপেও লিঙ্গ-পুজা হয়।

যতই খবরের কাগজ পড়ি, রেডিয়ো শুনি, টেলিভিজন্ দেখি, 'পাবে' কথা-বার্তা কই, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে লণ্ড-ডিনার খাই, মোটরে করে গ্রামাঞ্চলে বেড়াতে যাই, ট্যাক্সি-ড্রাইভারের সঙ্গে অবরেসবরে রসালাপ করি (তার সুযোগ বিস্তর, কারণ ট্রাফিক জামের ঠেলায় ঘাটে ঘাটে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়) বাঁকা নয়নে সব কিছু দেখি, খাড়া কানে অর্ধমাচরণে অন্য লোকের কথা-বার্তা শুনি ততই মনে হয়, সেই পুরনো ফরাসী প্রবাদ, প্ল্যু সা শাঁজ, প্ল্যু সে লা মেম্ শোজ (দি মোর ইট চেঞ্জেস, দি মোর ইট ইজ দি সেম্ থিং) খোলনলচে বদলেও সেই পুরনো হুঁকো।

এই যে জর্মনির হাতে ইংরেজ বেধড়ক বম্ খেল, কই, কথায় কথায় তো জর্মনকে কটুকাটব্য করে না; দু'এক জায়গায় যে কালোয়-ধলায় মারামারি হচ্ছে, কই সাধারণ ইংরেজ তো সাদার পিছনে দাঁড়ায় নি, উল্টে প্রতিবাদ জানাচ্ছে, এমন কি শুনতে পেলুম পার্লিমেণ্টে নাকি কে যেন বিল আনবেন, যে সব হোটেলওলা কালো-ধলায় ফারাক করে তাদের সায়েস্তা করবার জন্য; নানা প্রকার আমদানি রপ্তানির উপর যদিও বাধ্য হয়ে কিছু কিছু আইন-কানুন জারি করতে হচ্ছে তবু তো ইংরেজ আরো কয়েকটা জাত নিয়ে একটা 'খোলা বাজার' তৈরী করার চেষ্টায় উঠেপড়ে লেগেছে। ত্রিশ বছর আগেও মনে হয়েছে, এখনো মনে হলো, ইংলণ্ডে কনসারভেটিভও লিব্রেল লেবারও লিব্-রেল হয়ে গিয়েছে। তাই বোধ হয় খাস লিব্রেল দলের জেল্লাই সেখানে কমে গিয়েছে। যে দেশের সবাই ভাত খায় সেখানে তো আর ভাতখেকোদের আলাদা হোটেল হয় না।

তাই তাজ্জব মানি, এলিয়ট এত অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন কি করে ?

সিন্‌হা না ভলফ্‌ শুধিয়েছিলেন সে কথাটা মনে নেই।

আজ যখন এ্যারোপ্লেনে করে অষ্টপ্রহরই অষ্টপ্রহরে কলকাতা থেকে লণ্ডনে যেতে পারি, প্যারিসের লোক আর কয়েকদিনের ভিতরেই দেশে খাবে ব্রেকফাস্ট —নিউ ইয়র্কে খাবে লাঞ্চ, সর্বদেশের ভৌগোলিক গণ্ডি যায়-যায়, শঙ্কর-দর্শন আলোচনা করতে হলে প্লাতোর উল্লেখ না করলে সমালোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, ক্রোচের সমালেচেনায় অভিনব গুপ্তের নামোল্লেখ অভিনব বলে মনে হয় না, লণ্ডন পৌণ্ডের দাম কমালে আর পাঁচটা দেশ পড়িমরি হয়ে সেই কর্ম করে, জর্মনিতে নতুন দাওয়াই বেরোলে সেটা কলকাতার কালোবাজারে ঢোকে সাত দিনের ভিতর, বিলিতি ফিল্মের 'মরমিয়া' কেঁই কেঁই সুরের দিশী ভেজাল 'হণ্টরওয়ালীতে' শোনা যায় পক্ষাধিক কালে, তখন শুনতে হবে খৃষ্টধর্মের, একমাত্র খৃষ্টধর্মের, তাও চর্চ অব ইংলণ্ডের খৃষ্টধর্মের জয়গান ? সেইটে বরণ না করলে পৃথিবীর আদর্শ সমাজে আমাদের স্থান নেই ? কারণ এলিয়ট অতি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'আমাকে যদি ধর্মান্ধ বলা হয় তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। যদি খৃষ্টীয় সমাজই চাও তবে তাতে মেলা স্বাধীন পন্থা, স্বাধীন মতবাদের ঝামেলা লাগলে চলবে না (ইউ ক্যানোট এলাও কনজেরীজ অব ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট সেক্‌টস্‌)। ইংলণ্ডের নৈতিক পন্থা এবং বৈদেশিক নীতি ঠিক করে দেবে চার্চই।' আর তার আদর্শ রাষ্ট্রে ইহুদীদের সংখ্যা যে অতিশয় সীমাবদ্ধ থাকবে সে-কথা তো পূর্বেই নিবেদন করেছি। (এখানে বলে দেওয়া ভালো আমি পাপী, সে আদর্শ সমাজে স্থান চাই নে, আমি শুধু তাঁর বাঙালী শিষ্যদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিলুম।)

আমি তো আশা করেছিলুম, ভৌগোলিক গণ্ডি যখন জেরিকোর দেয়ালের মত ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে তখন শিক্ষিত মানুষ সেই ধর্মেরই অনুসন্ধান করবে যে ধর্ম তার 'বিরাট বাহু মেলে' সবাইকে আলিঙ্গন করতে চায়। আমার তো মনে হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ যখন ইংলণ্ডে 'মানবধর্মের' জয়গান গেয়েছিলেন তখন তিনি বলদের সামনে বেদপাঠ কিম্বা মোষের সামনে বীণা বাজান নি।

'ইংরেজের বাড়ি, হিন্দুর শাড়ি, মুসলমানের হাঁড়ি'—অর্থাৎ ইংরেজ বাড়ি-ঘর ছিমছাম রাখে, হিন্দু মেয়েরা জামাকাপড় (বিশেষ করে গয়নাগাঁটি) পরে ভালো, আর মুসলমানের কুল্লে পয়লা যায় তার হাঁড়িতে, উত্তম আহারাদি করে তার দিন কাটে। তাই শিব্রামদা একদিন আপন মনে প্রশ্ন শুধিয়েছিলেন, 'মুসলমানদের ভিতর এত শিক্ষাভাব কেন ?' তারপর আপন মনেই উত্তর দিয়েছেন, 'যেখানে শিক্‌-কাবাব বেশী সেখানে শিক্ষাভাব তো হবেই।'

বিবিসির অন্যতম বাঙালী মুসলমান কর্মী আমাকে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের দর্শন সম্বন্ধে প্রশ্ন শোধান নি, জর্মন প্রেসিডেণ্ট হয়েসের আসন্ন লণ্ডনাগমনের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আমার সুপক্ক মতামত জানতে চান নি, এমন কি

ইংরেজ নারীর নমনীয়তা কমনীয়তা সম্বন্ধেও তিনি উদাসীন। আমাকে শুধোলেন, 'আহারাদি ?'

আমি বললুম, 'ইংরেজের তো বাড়ি, দুনিয়ার "হাঁড়ির খবর" রেখেও তার হাঁড়ি শূন্যই থেকে গেছে।'

তারপর বিজ্ঞভাবে মাথা নেড়ে জর্মন অধ্যাপকদের বক্তৃতা দেওয়ার ভঙ্গীতে আরম্ভ করলুম, 'নরমানরা আলবিয়ন ভূমি জয় করার ফলে ধর্ম, রাজনীতি তথা সাহিত্যজগতে যে সব বহুবিধ ঘূর্ণিবার্তা, ভূমিকম্প, প্লাবনান্দোলন আরম্ভ হয়েছিল তদ্বিষয়ে বহুতর পুস্তক, সংখ্যাতীত প্রবন্ধ এবং ভূরি ভূরি গবেষণামূলক কোষ লিপিবন্ধ হয়েছে, কিন্তু ওহো হতোস্মি, ইহলোক পরলোক উভয় লোকের সঙ্গমভূমি এই যে উদর (পিতৃলোকের একমাত্র কাম্য পিন্ড, এ তথ্য কুলাঙ্গারও স্মরণ রাখে !) তদ্বিষয়ে অতিশয় যৎসামান্য স্মৃতিশ্রুতি বর্তমান। পরম মনস্তাপের বিষয় অদ্যাবধি আলবিয়ন ভূমির শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় এই সর্বোত্তম সনাতন মার্গ সম্বন্ধে সম্যক সংবিদিত হয় নি।'

কর্মী বললেন, 'বাংলা অভিধান হাতের কাছে নেই।'

ত্রিতাল থেকে একতালে যাওয়া অশাস্ত্রীয়। কিন্তু শাস্ত্র মেনে কি হবে ? পূর্বেই নিবেদন করেছি, রবীন্দ্রনাথের সর্বশাস্ত্রসম্মত 'মানবধর্ম' শ্বেতভূমিতে অনাদৃত।

আমি বললুম, 'নরমানরা আসার পূর্বে এদেশের লোক বোধ হয় কাঁচা মাংস খেত। এই দেখুন জ্যান্ত ভেড়ার নাম ইংরিজীতে 'শীপ', তার মাংস রান্না করে খেতে হলে সেটা হয়ে যায় 'মটন'। 'শীপ' শব্দ খাস ইংরিজী, 'মটন' শব্দ ফরাসী, নরমান যা খুশী বলতে পারেন ; 'কাউ' ইংরিজী কিন্তু খেতে হলে (তোবা, তোবা !) ফরসী শব্দ বীফ ; 'কাফ' ইংরিজী কিন্তু খেতে হলে ফরাসী শব্দ 'ভীল' ; ঠিক সেইরকম 'সুয়াইন' ইংরিজী কিন্তু খেতে হলে (রাম রাম !) ফরাসী শব্দ 'পোর্ক' ; ইংরিজী 'ডয়ার' ফরাসী 'ভেনজন' ইত্যাদি ইত্যাদি। এমন কি যে সব রসবস্তু দিয়ে এগুলোকে সুস্বাদু করা হয়, যথা 'সস', সেভারি', ভিনিগার', 'মায়োনেজ', সেগুলোও ফরাসী শব্দ। খাবার 'মেনু' ফরাসী ; তার প্রধান প্রধান ভাগ 'অরদ্যভ্র' (অবতরণিকা) 'কঁসমে-পতাজ' (শুরুয়া বিভাগ), আঁত্রে (প্রবেশ), পিয়েস দ্য রেজিসতাঁস (পীস্ অব রেজিসটেনস্ অর্থাৎ প্রধান খাদ্য, যা দিয়ে পেট ভরাবে), 'স্যালাড', 'ডেসের' (ফলমূল, মিষ্টি), 'সেভরি' (শেষ চাট) সবই ফরাসী। আর পদগুলোর নাম, 'কঁসমে জুলেয়্যন', 'পটাজ ও ফেরমিয়ে' (চাষাদের (!) সুপ), 'অমলেট ওর্জের্ব' (পেঁয়াজ পুদিনার অমলেট) এখানেও দেখুন 'এগ' ইংরিজী শব্দ কিন্তু 'অমলেট' ফরাসী। এসব আরম্ভ করলে তো রাত কাবার হয়ে যাবে। (আশু ইংলন্ডগামী এর কাটিঙ্টা রাখলে উপকৃত হবেন ; আমাকে নিমন্ত্রণ করে সঙ্গে নিয়ে গেলে আরো বেশী উপকৃত হবেন। কারণ যেগুলোর নাম করলুম এগুলো ভোজনতীর্থের বিখ্যাত কাশী বৃন্দাবন—'হিংলাজ'। 'গোটাটিকরে' নিয়ে যেতে হয় হাতে ধরে)।

এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। মহানগরী কলকাতার হিন্দুসন্তান যখন পোশাকী মাংস খায় তখন সে 'ভাত খায়' না, সে তখন বেরোয় 'খানা খেতে' এবং 'যবনের হাতে' কিন্তু স্বেচ্ছায়। কোর্মা, কালিয়া, বিরয়ানি, কাবাব, দোলমা এ সব কটি শব্দই বিদেশী; বাঙলা প্রতিশব্দ নেই। চপ, কাটলেট, মমলেটও বিদেশী শব্দ। তফাত এই যে ইংরিজীগুলো হিন্দু হেঁসেলে ঢুকেছে, মুসলমানীগুলো ঢুকতে পারে নি। তার কারণ, মুসলমানীগুলোর রান্না একটু বেশী শক্ত।

শেষোক্তগুলো কলকাতার মুসলমানরাও খেতে শিখেছেন।

এক মুসলমান গেছেন হোটেলে। 'বয়, এক কাটলেস লে আও।'

'হুজুর আজ মীট-লেস।'

সায়েব বললেন, 'কুছ পরোয়া নাহী; সো হী লাও।'

সায়েব ভেবেছেন 'মীট-লেস' (দিন) বুঝি কাটলেসের এক নবীন সংস্করণ।

মূল কথায় ফিরে যাই।

নরমান জয়ের পর ক্রমে ক্রমে যেসব বিদেশী খাদ্যরাজি বিলাতে প্রবর্তিত হল, তার ইতিহাস এখনো আমার চোখে পড়ে নি—পক্ষান্তরে ফরাসী খাদ্যের সর্বাঙ্গসুন্দর উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে উত্তম উত্তম পুস্তক দেখেছি। শুনেছি, মহামান্যবর স্বর্গীয় আগা খান এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ভোজনরসিক ছিলেন। তাঁর নাকি একখানি বিশাল বিরাট এটলাস ছিল—তাতে পৃথিবীর কোন্ জায়গায় কোন্ সময় কোন্ খাদ্য উত্তমরূপে প্রস্তুত হয় সেগুলো চিহ্নিত ছিল। এ পৃথিবীর সব খাদ্যই যখন তিনি একাধিকবার খেয়ে পরিতৃপ্ত হলেন তখন নূতন রসের সন্ধানে অন্যলোকে চলে গেলেন। আমার হাজার আপসোস তাঁর সঙ্গে কখনো দেখা হয় নি বলে।

তা সে যাই হোক, এ কথা মোটামুটি বলা যেতে পারে বর্বর ইংরেজী রান্নার প্রতীক ছিল 'ক্রুয়েট স্ট্যাণ্ড' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবধি। এতে থাকতো সিরকা, অলিভতেল, উস্টার সস আর সরষে। নুন গোলমরিচ তো আছেই। বস্তুত এর কোনো একটা কিংবা একাধিক বস্তু না মিশিয়ে অধিকাংশই খাওয়া যেত না। নিতান্ত খরগোশ গোত্রজাতরাই ইংরেজের স্যালাড কচর কচর করে চিবুতে পারতো। পার্ক সার্কাসের রদ্দিতম ধনে কিংবা পুদিনা স্যালাড এর তুলনায় অমৃতগন্ধী মধুমঞ্জরী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সেপাইরা ট্রেঞ্চে শুয়ে শুয়ে অখাদ্য খেয়ে খেয়ে স্বপ্ন দেখতো, ছুটিতে প্যারিসে ছিমছাম রেস্তোরাঁয় করকরে টেবিলক্লথওলা ছোট্ট টেবিলের উপর 'মেডফুড'—অর্থাৎ তৈরী খাবারের; ইংরিজী ধরনে নুন লঙ্কা তেল সস মিশিয়ে খেতে হয় না, ফরাসী শেফ্ এসব বস্তু রান্নাঘরেই পরিপাটিরূপে 'তৈরী' করে দিয়েছে—আমাদের মা-মাসীরা যেরকম মাছের ঝোল কিংবা চালতের অম্বল করে দেন। তারই ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইংরিজী রান্নার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন হয়। সেইটে আমি চোখে দেখি ১৯৩০ সনে। অখাদ্য লেগেছিল কারণ, সদ্য গিয়েছি লণ্ডনে—প্যারিস থেকে।

ইনভেশনের জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিশ্বসংসারের জাত-বেজাত জড়ো করা হল ইংলণ্ডে—আলেকজাণ্ডারের সময় মেসিডোনিয়ায় কিংবা রোমের মধ্যাহ্ন দীপ্তির সময়ও ঐ শহরে বোধ হয় এরকম সাড়ে বত্রিশ ভাজা কখনো হয় নি। ফলে লণ্ডনের রান্না আপাদমস্তক বদলে গিয়েছে।

সেইটে চাখলুম '৫৮-এ।

সব কিছু বেবাক বদলে গিয়েছে। ইস্তেক ক্রুয়েট তার মালমসলাসুদ্ধ গায়েব। যেদিন নুন-লংকার শিশিও যাবে, সেদিনই ইংরিজী রান্না তার চরম মোক্ষে পেঁছিবে। কে না জানে, ভালো রাঁধুনী কাউকে ফালতো নুন নিতে দেখলে বেদনা পায়। প্যারিসে শোনা যায়, ভোজরাজ সম্রাট আগা খান এক বিখ্যাত রেস্তোরাঁয় মনের ভুলে একটু ফালতো নুন নিয়েছিল বলে রেস্তোরাঁর রাঁধুনী মনের দুঃখে আত্মহত্যা করে। ইংলণ্ডে এখন পাচকই রান্নাঘরে আহারাদি তৈরী করে। গাহককে ডাইনিং হলে টেবিলের উপর পি সি সরকারের মত নিপুণ যাদুকরী হস্তে সিরকা সস ঢেলে কাঁচা-সেদ্ধ মালকে সুস্বাদ করতে হয় না। পৃথিবীর আর পাঁচটা জাত—মায় বাণ্টু হটেনটট—এতকাল যা করে আসছে।

এবং জাত-বেজাতের নূতন নূতন পদও তার রান্নাঘরে ঢুকতে দিয়েছে।

ত্রিশ বছর আগে রাইস-কারি খেতে হলে আপনাকে লিভিংস্টোনের মতো ছ'মাসের চালচিঁড়ে পুরনো ধুতিতে বেঁধে বেরোতে হত তারই আবিষ্কারে। বহু বাজে লোক কর্তৃক বেপথে চালিত হয়ে, বহু পুলিসমেনের 'সক্রিয় সহযোগিতা'র ফলে, 'অশেষ ক্লেশ ভুঞ্জিয়া' আপনি যখন মোকামে পেঁছিতেন তখন রাইস-কারি খতম! সেই লক্ষ্মীছাড়া বীফস্টেক খেয়ে বাড়ি ফিরতেন। মনে পড়তো সেই গরীব মোল্লার কাহিনী। চেয়েচিন্তে অতি কষ্টে খেয়ার একটি পয়সা যোগাড় করে সে যখন ওপারে ফাতেহার (শ্রাদ্ধের) ভোজে পেঁছিল তখন সব কিছু ফুরিয়ে গিয়েছে। মেহমানকে তো আর অভুক্ত ফেরানো যায় না—তাড়াতাড়ি ভাত আর মসুর ডাল সেদ্ধ করে তাকে খাওয়ানো হল। মনের দুঃখে সে বললো, 'ওরে ডাল, আমি না হয় খেয়ার পয়সা ধার করে যোগাড় করলুম; তুই পেলি কোথায়?' আপনিও স্টেককে শুধাবেন, 'এ পথ তুই পেলি কোন্ পুলিসকে শুধিয়ে?

একদম পয়লা নম্বরী হোটেলে—অর্থাৎ যেখানে গ্লস্টারের ড্যুক্, কেন্টের ডাচেস খেতে যান—আমি যাই নি। তার অধিকাংশই দামের ঠেলায় ফাঁকা। বিরাট হলের এখানে দু'জন ওখানে চারজন লোক খাচ্ছে, আর বেকার ওয়েটার-গুলো ঈভনিং ড্রেস পরে হেথা-হোথা জটলা পাকাচ্ছে, বাড়িটা যেন খাঁ খাঁ করছে – এমন জায়গায় খেয়ে সুখ নেই। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল চ্যারিটি ম্যাচে যদি গিয়ে দেখেন মাত্র আপনি আর ওপাড়ার গোবর্ধন উপস্থিত, আর কেউ নেই, তখন কি খেলা দেখাটা জমে? অবশ্য যেখানে এমন ভিড় যে পলায়মান বয়ের কাছাতে হ্যাঁচকা টান না দেওয়া পর্যন্ত একটা হাফ-সিঙ্গল চা জোটে না সেখানেও 'গবযন্ত্রণা'। বাচ্চা এবং চা আসি-আসি করে না এলে কি পীড়া

তা শুধু পোয়াতী আর গাহকরাই জানে।

অতএব যেতে হয় দুই নম্বরী হোটেলে। এবং সেখানে আপনি হরবকৎ রাইস-কারি পাবেন—পয়লা নম্বরীতে পান আর না-ই পান। আর কোনো কোনো রেস্তোরাঁয় লেখা আছে 'পাটনা রাইস'! পাটনা রাইসের প্রতি এ দুর্বলতা কেন? রাষ্ট্রপতির শহর বলে?

আর যারা খাচ্ছে তারা বাঙালী নয়, ভারতীয় নয়—দুনিয়ার চিড়িয়া।

এই সব খাস বিলিতি রেস্তোরাঁতেই যদি রাইস-কারি জামাইয়ের কদর পাচ্ছে তবে তার আপন বাড়িতে অবস্থাটা কি রকম?

সে এক অভিজ্ঞতা।

লণ্ডনের বুকের উপর তবে ঠিক বড় রাস্তায় নয়। ভালোই। হট্টগোল কম। এই আমাদের বড়বাজারে যতখানি। তবে বড় রাস্তায় গোলমাল কত? মুখুয্যেকে শোধাবেন। সে বেচারী ঘুমুতে পারতো না।

ইয়া লম্বা, উর্দী পরা, মাথায় পাঠানী পাগড়ী, ছ'ফুটি দরোয়ান। যেখানে হ্যাট রেনকোট ছাড়তে হয় সেখানেও তদ্বৎ। ঢুকেই লাউঞ্জ—কক্‌টেলটা-আসটা খাবার জন্য, ভাগ্যিস ওটা মুরারজী ভাই চালান না। সাজসজ্জা পুরো ভারতীয়। হেথায় নটরাজের ব্রোঞ্জ, হোথায় পেতলের ভারতীয় অ্যাসট্রে, আরো এটা সেটা, ধূপকাঠিও জ্বলছে।

এগিয়ে এলেন এক খাপসুরৎ শ্যামাঙ্গী, পরনে মুর্শিদাবাদী, চুলে তেল পড়েছে—মেমেদের শন-পাটের মত স্নেহহীন নয়—খোঁপাটিও নির্ঘাত বাঙালোরী, ব্লাউজ ব্লাউজেরই কাজ করছে—চোলীর প্রক্সি দিচ্ছে না—চোখে-মুখে খুশী, ভারি চটপটে। একটা 'নমস্তে' ভী পেশ করলে।

বাঃ, এ তো বেড়ে ব্যবস্থা!

গাছে না উঠতেই এক কাঁদি!

তাহলে উত্তম আহারাদি হবে।

ফরাসী গুণী রশফুকোল বলেছেন, 'আহার প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু রসিক-জনের মত আহার করা আর্ট।' ভোভানার্গ বলেছেন, 'মহৎ চিন্তা পেটের ভিতর থেকে আসে।' গ্রীক দার্শনিক এপিকুর বলেছেন, 'প্রকৃতিদত্ত বুদ্ধিবৃত্তি উত্তম কর্মে নিযুক্ত করবে এবং সুবুদ্ধিমানের মত পরিপাটি আহার করবে।' এবং ইক্‌লেসিয়াসটের মাধ্যমে নমস্য বাইবেল গ্রন্থ অনুশাসন দিয়েছেন, 'পান, আহার ও আনন্দ করার (ইট, ড্রিঙ্ক অ্যাণ্ড বি মেরি) চেয়ে মহত্তম কর্ম ত্রিভুবনে নেই।'

আর মলিয়ের যখন বলেন, 'আমরা বাঁচার জন্য খাই ; খাওয়ায় জন্য বাঁচি নে', তখন তিনি বর্বরজনসুলভ প্রলাপ বাক্য ব্যবহার করেছেন। 'আমরা খাওয়ার জন্য বাঁচি, বাঁচার জন্য খাই না।'

ভোজনাদি সম্বন্ধে আমি আলোচনা আরম্ভ করলেই কোন কোন উন্নাসিক পাঠক বিরক্ত হন, আবার কেউ কেউ বলেন, এ-সব কথা তো আগেও যেন শুনেছি বলে মনে হচ্ছে। উত্তরে নিবেদন, সব কথা শোনেন নি ; আর শুনে

থাকলেই বা কি ? পুরনো জিনিসের পুনরাবৃত্তি করতে গিয়ে নীটশে একদা লিখেছেন, 'এ কথা আমি পূর্বেও বলেছি, কিন্তু মানুষ শোনা কথাই শুনতে চায়, জানা কথাই বিশ্বাস করে।' একদম খাঁটি কথা। আমাদের মোহর বীবী, কণিকা ব্যানার্জিকে যখন শুধাই, 'সেই রেকর্ডে দেওয়া তোমার গান "ওগো তুমি পঞ্চদশী" ফের বেতারে গাইলে কেন ? ওটা তো ইচ্ছা করলেই রেকর্ড বাজিয়ে আবার শোনা যায়', তখন সে বলে, 'কি করবো, সৈয়দদা, লোকে যে পুরনো গানই শুনতে চায় ?' বুঝলুম, বাচ্চাদের কাছে নূতন গল্প বলতে চাইলে তারা যে রকম চেঁচিয়ে ওঠে, 'না মামা, কালকের সেই বাঘের গল্পটা বলো।'

দ্বিতীয়ত, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার রচনা বাঙলা দেশে অজরামর হয়ে থাকবে না, আমার রসনির্মাণপ্রচেষ্টা বাণী-সরস্বতীর অঙ্গদে কুণ্ডলে মাল্যরূপে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে না, কিন্তু এ-কথা স্থিরনিশ্চয় জানি, এই বঙ্গসন্তানদের যেদিন কাণ্ডজ্ঞান সম্যক্ প্রস্ফুরিত হবে, যেদিন তারা 'ভরতনাট্যম', 'পিকাসসো', 'সিংহেন্দ্র মাধ্যম' কিংবা 'ভাল্লুকপঞ্চমীর', পশ্চাদ্ধাবন কর্ম বর্বরস্য শক্তিক্ষয় বলে সুষ্ঠুরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে সেদিন সে উদরমার্গের সন্ধানে নব নব অভিযানের পথে নিষ্ক্রান্ত হবেই হবে। আজ যে রকম ক্বচিৎ-জাগরিত বিহঙ্গ-কাকলীর ন্যায় কোন কোন বিদ্বজ্জন চৈতন্যচরিতামৃতের ভোজনামৃত খাদ্য-নিঘণ্টু অধ্যয়ন করতে করতে বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন উত্থাপন করেন 'কিমাশ্চর্যম্ ! ছানার সন্দেশের উল্লেখ তো কুত্রাপি নেই ?'—ঠিক সেইরূপে অস্মদ্দেশে যেদিন রাজবর্ত্মে রাজবর্ত্মে চিৎকার প্রতিধ্বনিত হবে, 'আমাদের দাবি মানতে হবে ! ভোজনমার্গের গীতা রচনা করো ! ইনকিলাব জিন্দাবাদ ; পেট-কিল্লাব-ঝাণ্ডা তোলো !' সেদিন, বলতে লজ্জা করছে, বিনয়ে বাধছে, সেদিন এই অধমের, হ্যাঁ এই অধমের বইয়ের সন্ধানেই বেরোতে হবে বঙ্গের ম্যাকসমূলার মমজেনকে। আফগানিস্থানের সর্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস নির্মাণে মল্লিখিত 'দেশে-বিদেশে' ব্যবহৃত হবে কি না জানি না, কিন্তু এ বিষয়ের সূচ্যগ্রেণ সুতীক্ষ্ণেণ সন্দেহ নেই যে আজ আমরা যে রকম আমাদের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস রচনার সময় নিরপেক্ষ পর্যটক পরিদর্শক হিউয়েন সাঙের শরণাপন্ন হই, ঠিক সেই রকম ইংলণ্ড-সন্তান যেদিন সভ্য হয়ে তার দেশের ভোজনেতিহাস লিপিবদ্ধ করবে সেদিন তাকে বেরোতে হবে—পুনরায় ব্রীড়িত হচ্ছি—এই আমারই বইয়ের সন্ধানে, রাখাল বাড়ুয্যেকে যে রকম মোন্-জো-দড়োর সন্ধানে একদা বেরোতে হয়েছিল ; আপনাদের রবি ঠাকুরের 'চাঁদ উঠেছিল গগনে'র সন্ধানে সন্ধানে দেশে কেউ আসবে না। রায়গুণাকর অন্নদাশঙ্করের 'রত্ন ও শ্রীমতী'র জন্য তাঁর প্রকাশক মাত্র ইয়োরোপকে চেলেঞ্জ করছে, আমার প্রকাশক বিশ্বভুবনকে ক্রোঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করবে, কাজী সাহেবের ভাষায় (আল্লা তাঁর বিমারী বরবাদ করে জিন্দেগী দরাজ করুন !) ত্রিভুবনেশ্বরের সিংহাসন নিয়ে আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণ আরম্ভ করবে।

সেই রত্নসমা শ্রীমতী তো ফরাসিস পানীয়ের কথা ওঠাতে আরেকবার 'বিলক্ষণ' বলে অন্তর্ধান করলেন ; আমি ভাবলুম, ঐ যুঃ যা। ব্যাকরণে বুঝি গলতি হয়ে গেল। এ যে সম্ভ্রান্ত ভারতীয় ভোজনালয় ! এ সব বিদগ্ধ পানীয় বোধ হয় এখানে নিষিদ্ধ। আবার বাঙাল বনে গেলুম নাকি ?

নাঃ ! কোনো ভয় নেই। ভাতিজা, চ্যাংড়া মুখুয্যে ঘটিস্য ঘটি। সে দেখি দিব্যি তার টুথব্রাশ-গোঁফে আঙুল বুলোতে বুলোতে নিশ্চিন্ত মনে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে—চোখ দুটো যেন ব্লটিং পেপার – সব কিছু শুষে নিচ্ছে।

পুরীর সমুদ্রপারে ঢেউ দেখে অবন ঠাকুর ভীত হয়ে যখন পালাবার পথ খুঁজছিলেন, তখন তাঁর এক স্যানা বন্ধু তাঁকে বলেন, 'ভয় কিসের ? সায়েব-সুবোরা তো চতুর্দিকে রয়েছেন।' অর্থাৎ তেমন কিছু বিপজ্জনক পরিস্থিতি হলে পুলিস আগেই তাঁদের খবর দিতেন, তাঁরাও কাটতেন।

যাক্। এদেশে আনকোরা আগত মুখুয্যে যখন নিশ্চিন্ত তবে আর আমার ভয় কি ?—তখন কি আর ছাই জানতুম, সে আমারই ভরসায় নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে !

কিন্তু, সায়েব-সুবোরা তো রয়েছেনই। তেনারা তো 'পানীয়' বেগর ভোজন করতে পারেন না।

এবং সাতিশয় উল্লাসের সঙ্গে লক্ষ্য করলুম, কোনো ভারতীয় লাউঞ্জে নেই। তারা নিশ্চয়ই মনুনিষিদ্ধ এই পানে লিপ্ত হয়ে পাপবিদ্ধ হয় না। সোজা ডাই-নিংরুমে ভোজন করতে গিয়েছে। তাদের চরিত্রবল দেখে উল্লাস বোধ করলুম।

ওদিকে দেখি শ্রীমতী অন্য খদ্দেরকে স্বাগত জানাচ্ছেন। ভারী বিরক্তিবোধ হল। এ যে দেখি হুবহু বাঙালী দোকানের মতো। আপনাকে জিনিস দেখাতে দেখাতে হঠাৎ অন্য খদ্দের ঢুকছে দেখে দিল ছুট তার দিকে—আপনাকে ত্রিশঙ্কুর মত ঝুলিয়ে রেখে, কিংবা যে রকম নির্মল সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্ত জানান যে আপনার পরীক্ষার ফল পরে বেরুবে।

নাঃ। আমারই ভুল ! দেখি হেলেদুলে একটি মোটাসোটা ভারিক্কি ধরনের লোক আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। এর গলায় গলাবন্ধ কোটের উপর ঝোলানো মসীকৃষ্ণ উপবীত ও তৎসংলগ্ন কুঞ্চিকা দেখে এর জাতগোত্র বুঝতে আমার কণামাত্র সময় লাগলো না, যাঁরা সংস্কৃতে লেখা 'প্রতিমালক্ষণ' সংক্রান্ত অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থরাজি অধ্যয়ন করেছেন তাঁরাই জানেন, প্রতিমা দেখে কোন্‌টা কোন্ দেব না দেবীর জানতে হলে স্মরণ রাখতে হয়, কোন্ দেবীর দক্ষিণ হস্তে কুবলয় বলয়, কার বাম হস্তে চক্র, কার মস্তকে উষ্ণীষ, কার পদে নূপুর।

কুঞ্চিকাসমন্বিত কৃষ্ণোপবীত 'ওয়াইন মাস্টারে'র লক্ষণ।

আপনি যদি চাষাড়ে হুইস্কি বিয়ার রাম্ জিন না খেয়ে উত্তম বিদগ্ধ ফরাসী কিংবা জর্মন অথবা ইতালীয় 'ওয়াইন' খেতে চান, তবে এই ভদ্রসন্তান আপনাকে পরম বান্ধবের ন্যায় তাবৎ সন্ধিসুড়ুক বাতলে দেবেন। চাণক্য বলেছেন, 'ব্যসনে (এবং মদ্যপান ব্যসন-বিশেষ) যে সঙ্গে থাকে সে বান্ধব।' ইনি তাই করে থাকেন। তবে চাণক্যের বান্ধব আপনাকে কোনগতিকে ঠেকিয়ে

বাড়ি নিয়ে যাবার চেষ্টা করে ; ইনি মোকা পেলে ওস্কাবার চেষ্টা করেন—এই যা তফাত।

মৃত্যুঞ্জয় যে রকম কৈলাসে বিহার করেন, রাশান ডিকটেটর যে রকম ক্রেমলিনে বাস করেন, ভেজাল যে রকম খাদ্যে বিরাজ করেন, এই 'ওয়াইন মাস্টারটি' ঠিক তেমনি বিচরণ করেন অতিশয় পয়লানম্বরী খানদানী 'ভয়াঙ্কুর' রেস্তোরাঁতে। 'ভয়াঙ্কুর' বললুম ইচ্ছে করেই। এখানে অংকুর পর্যন্ত বিনষ্ট হয়। ইনি আপনার সর্বস্ব অপহরণ করেন। পাতলুন বন্ধক দিয়ে বিল শোধ করতে হয়।

ভীতকণ্ঠে ভাতিজাকে শুধালাম, 'ওরে, রেস্ত আছে তো?'

ভিতরের বুক-পকেটের উপর থাবড়া মারার মুদ্রা দেখিয়ে বললে, 'কুছ পরোয়া নেই ; আপনি চালান।'

সোনার চাঁদ ছেলে। একেই বলে বান্ধব। ব্যসনে সঙ্গে থাকে।

এ-জীবনে আর যদি কখনো চাকরি নিই তবে উমেদার হব এই 'ওয়াইন মাস্টারে'র চাকরির জন্য—বেতারের কাজ হয়ে গিয়েছে, সেখানে শুধু খাপসুরৎ কলাবতীর ঝামেলা ; তারা আমাকে যথেষ্ট 'কলচরড্' বলে বিবেচনা করেন না।

খানদানী রেস্তোরাঁর চার ইঞ্চি পুরু মহামূল্যবান ইরানী গালচের উপর মৃদু পদসঞ্চরণ করে কাটবে আপনার জীবন—ভ্রমর যে রকম তম্বঙ্গীর বিম্বাধরে পদক্ষেপ করে ঠিক সেই রকম (বিশ্বাস না হলে কালিদাস পশ্য) এক জোড়া চার আউন্স ওজনের ঈভনিং শুতে কেটে যাবে ঝাড়া দশটি বছর—হাপসোল পর্যন্ত বদলাতে হবে না। এ টেবিলে গিয়ে কাউকে বলবেন, 'তিপান্নের "নীরেনস্টাইনার" —সে একটি স্বপ্ন, স্বপ্ন। ১৯৫৩-এ সেখানকার আঙ্গুর মোলায়েম রৌদ্রে যা রসে টইটম্বুর হয়েছিল, সেরকম ধারা আর কখনো হয়নি। তাই দিয়ে এ সুধা নির্মিত হয়েছে। কখনো না অন্য টেবিলে গিয়ে ফিস্ ফিস্ করবেন 'মাদাম, দেখুন, দেখুন, এই শ্যাম্পেনের বুদ্বুদ কি রকম লক্ষ লক্ষ পরীর মত সলোমনের বোতল-বন্ধ জিনের ন্যায় নিষ্কৃতি পেয়ে লক্ষ লক্ষ হাওয়ার ডানা মেলে ঊর্ধ্বপানে উড়ে যাচ্ছে। এ বস্তু গলা দিয়ে নাবার সঙ্গে সঙ্গে আপনিও ইহলোকের সর্ববন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে নীলাম্বরের মর্মমাঝে উধাও হয়ে যাবেন।' তারপর একটু মৃদু হাসি হেসে বলবেন, 'তাই, মাদাম, এ শ্যাম্পেন যিনি অর্ডার দেন তাঁর কাছ থেকে আমরা আগেভাগেই বিলটা আদায় করে নিই অবশ্য, আপনাদের বেলা সে কথাই উঠছে না।'

এ তো হল। তারপর আপনি ঘড়ি ঘড়ি 'বারে' সেলারে গিয়ে তদারক করবেন, সর্ববস্তু রাজসিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত রয়েছে কি না। রাঁধুনীকে যে রকম সে-সব জিনিস মাঝে মাঝে চেখে দেখতে হয় আপনাকেও 'নিতান্ত বাধ্য হয়ে', 'অতিশয় অনিচ্ছায়'—আমাদের বরকর্তারা যে রকম পণ নেন · অল্পস্বল্প মাঝে-মধ্যে চেখে দেখতে হবে বইকি?

তাও হল। ওদিকে আপনাকে প্রতি শরতে ফ্রান্স যেতে হবে, সেখান থেকে

নিলামে পানীয় কিনে সেলার পূর্ণ করার জন্য। আপনার কমিশনটা-আসটা ঠেকায় কে? আপনার ভারী ভারী গাহক খদ্দেরের বাড়ির জন্য তাদের প্রাইভেট অর্ডারও সাপ্লাই করবেন। তাতেই বা কম কি? ওনরা হাত উপুড় করলেই আমাদের পর্বত-প্রমাণ!

আমাদের 'ওয়াইন মাস্টারটি' এসে নমস্তে জানালেন। চমৎকার চেহারা। নেয়াপাতি ভুঁড়ি, চোখ দুটি জবাকুসুমসংকাশং যা হওয়ার কথা।

আমি সবিনয়ে বললুম, 'ত্রিশ বছর পরে এসেছি। ইতিমধ্যে একটা লড়াই হয়ে গিয়েছে। জর্মনরা ফ্রান্স ছাড়ার সময় প্যারিসের 'নত্র দাম্' গির্জে সঙ্গে নিয়ে যায় নি বটে, কিন্তু ফ্রান্সের সেলারে সেলারে ঢুকে তার উত্তম-অধম সর্ব-পানীয় খতম করে যায়। এখন যা ফ্রান্স ইংলন্ডে পাওয়া যাচ্ছে, তার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। আপনি পথপ্রদর্শন করুন। তবে এইটুকু বলতে পারি, বর্দো এবং শান্ত।'

'শান্ত' মানে যে বস্তু সোডার মত বুজ্‌বুজ্ করে না, তেলের মতো শুয়ে থাকে।

চাকুরে যে রকম পেন্‌সন্‌ধারীকে খাতির করে, 'মাস্টার' আমাকে সেই রকম কদর করলে। আহা এককালে লোকটা সব কিছু জানতো। এখন না হয় আউট অব্ ডেট্।

ম্যাক্‌স্‌মূলার নাকি আমাদের সংস্কৃত শিখে ভশচাষদের তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন, হরিনাথ দে নাকি গ্রীক শিখে গ্রীকদের চিত্তহরণ করেন—এসব শোনা যায়, কিন্তু আমাদের এই 'পানের প্রভু' দেখলুম সত্যিই পেটে এলেম ধরে। দেখলুম হেন পানীয় নেই, যার ঠিকুজি-কুলজি তাঁর বিদ্যাচৌহদ্দীর বাইরে পড়ে। কবে কোন্ বৎসরে কোন্ গাঁয়ের আঙ্গুরে এ জিনিস তৈরী, সে বৎসর আঙ্গুর পাকার সময় সেখানে বৃষ্টি হয়েছিল না মেঘ ও রৌদ্র না মোলায়েম মোলায়েম মিঠে রোদ্দুর ছিল, কার চাপযন্ত্রে তার রস বের করা হয়, তাই দিয়ে সবসুদ্ধ ক' বোতল তৈরী হয়েছিল, তার কটা গেল মার্কিন মুল্লুকে কটা এল এ দেশে, এর 'বডি' কি রকম, 'বুকে' (bouquet)-টাই বা রমণীয় কিনা—সব কিছু জিহ্বাগ্র-দর্পণে এবং উভয়ার্থে।

'নগণ্য' ভারতীয় যে এই বিলিতি বিদ্যে এতখানি হাসিল করেছে তার কাছে ম্যাক্‌সমূলারের সংস্কৃতজ্ঞান শিশু।

শুধালুম, 'ভদ্রে, এ কর্মে কতদিন ধরে আছেন?'

সবিনয়ে বললে, 'আজ্ঞে, পঞ্চাশ বছর পূর্বে যখন এ রেস্তোরাঁ খোলা হয় তখন থেকে। সে আমলের আর কেউ নেই।'

তবে কি এসব জিনিস খেলে মানুষ দীর্ঘজীবী হয়? অর্থাৎ ওয়াইন—যে বস্তু আঙ্গুরের রস দিয়ে তৈরী হয়েছে, হুইস্কি বিয়ারের কথা উঠছে না।

জানি রসভঙ্গ হবে, তবু হুইস্কি ওয়াইন কোনো জিনিসই ভালো নয়। অতিশয় শীতের দেশে, কিংবা ডাক্তারের হুকুমে খাওয়া উচিত কিনা, সেকথা আমি বলতে পারবো না। অতখানি শীতের দেশে আমি কখনো যাই নি—

বিলেতে গরম দুধ, চা, কফি খেলেই চলে—আর অতখানি অসুস্থও আমি জীবনে কখনো হই নি। মদ্যপান করলে ভালো লেখা বেরোয় এ কথা আমি বিশ্বাস করি নে। মেঘনাদ কাব্য রচনার সময় মাইকেল ক্লান্তি দূর করার জন্য অল্প খেতেন, শেষের দিকে যখন মাত্রা বেড়ে গেল, তখন দু'চার পাতা লেখার পরেই বেএক্তেয়ার হয়ে ঢলে পড়তেন—তাঁর গ্রন্থাবলী সে সব অসমাপ্ত লেখায় ভর্তি। এবং তার চেয়েও বড় কথা, আপনি আমি মাইকেল নই। একখানা মেঘনাদ লিখুন ; তারপর না হয় মদ খেয়ে লিভার পচান—কেউ আপত্তি করবে না।

এবং সব চেয়ে মারাত্মক তত্ত্ব শুনেছি কোনো কোনো কলেজের ছোকরার কাছে। বিয়ার নাকি মদ নয়, ওতে নাকি নেশা হয় না, ও বস্তু খেলে নাকি পরীক্ষার পড়া করার সুবিধে !

বটে ! বিয়ারে নেশা হয় না ? লণ্ডন প্যারিসে রাস্তায় যারা মাতলামো করে তারা কি খায় ? কোকা কোলা ? অগা আর কারে কয় ! ওদের পনেরো আনা বিয়ার খেয়েই মাতাল হয়। আমাকে ওসব বলো না ; ঠাকুমাকে ডিম চোষা শেখাতে হবে না।

মূল ফার্সীতে আছে,

গর্ দস্ত দহদ্ জ্ মগ্জ্-ই-গন্দুম্
নানি,
ওয়াজ ময় দো মনী জ্ গোসফন্দী
রানি,
ওয়ানগাহ্ মন্ ওয়া তো নিশস্তে
দর ওয়েরানি
আয়েশী বোদ্ অন্ ন্ হদ্ হর্
সুলতানি

এর ইংরিজী—

Here with a loaf of bread
beneath the bough,
A flask of wine, a book of
verse—and Thou
Beside me singing in the
Wilderness—
And Wilderness is Paradise
enow.

(ফিট্সজেরাল্ড্)

তার বাঙলা—

সেই নিরালা পাতায় ঘেরা বনের ধারে
শীতল ছায়,

খাদ্য কিছু, পেয়ালা হাতে, ছন্দ গেঁথে
দিনটা যায় !
মৌন ভাঙি তার পাশেতে গুঞ্জে
তব মঞ্জু সুর—
সেই তো, সখি, স্বপ্ন আমার,
সেই বনানী স্বর্গপুর ।
(কান্তি ঘোষ)

কিংবা

বনচ্ছায়ায় কবিতার পুঁথি
পাই যদি একখানি
পাই যদি এক পাত্র মদিরা আর
যদি তুমি রানী
সে বিজনে মোর পার্শ্বে বসিয়া
গাহো গো মধুর গান
বিজন হইবে স্বর্গ আমার
তৃপ্ত লভিবে প্রাণ ।
(সত্যেন দত্ত)

যার প্রাণে যা চায় তিনি সেই ভাবে অনুবাদ করেছেন। খৈয়ামের খড়বাঁশের কাঠামোর উপর যে যার আপন মানসমূর্তি স্বপ্নপ্রতিমা গড়েছেন; আসলে কিন্তু আছে,

উত্তম ময়দার তৈরি রুটি যদি
হাতে থাকে,
আর যদি থাকে দু'মণ মদ এবং
বাচ্চা ভেড়ার আস্ত একখানা ঠ্যাং (রান),
ঘুঘু-চরা পোড়ো বাড়িতে কাছাকাছি বসে
তুমি আমি দু'জনা
সে আনন্দ বহু সুলতানেরও ভাগ্যে
জোটে না ।

খৈয়াম এ কবিতায় 'কবিত্ব' করেন নি। তিনি সাদামাটা ভাষায় বলছেন, তাঁর কি কি চাই। মোলায়েম কবিতায় বিলকুল অচল হওয়া সত্ত্বেও তিনি ভেড়ার একখানা আস্ত ঠ্যাং (রান্ কথাটা আসলে ফার্সী এবং তিনি ইটি এস্থলে নির্ভয়ে ব্যবহার করেছেন) অর্ডার দিয়েছেন এবং পাছে নেশা জমাবার আগে মদ ফুরিয়ে যায় তাই পাক্কা দু'মণ খাঁটি চেয়েছেন। এবং লক্ষ্য করার বিষয় তিনি কবিতার বই আদপেই চান নি। সে জিনিস যে পারে সেটা সে চায় না। মাটি থেকে পঞ্চাশ ফুট উঁচুতে যে দড়ির উপর নাচতে পারে। সে প্রিয়াকে নিয়ে বোটনিক্সে পিক্‌নিক করতে যাওয়ার সময় ডাণ্ডা দড়ি বগলে করে নিয়ে যায় না। এবং আসল কথাটা দুই বাঙালী অনুবাদকই ঘুলিয়ে ফেলেছেন। খৈয়াম

বলেছেন, 'যা সব চাইলুম তা পেলে আমি জাহান্নমেও যেতে রাজী আছি, ওরকম 'জাহান্নম' রাজা-বাদশার কপালেও জোটে না।'

যে ইরান-সন্তান চতুষ্পদীটির ফরাসী অনুবাদ করেছেন তিনি মূল তত্ত্বটি ধরতে পেরেছেন বলে খৈয়ামের প্রতি অবিচার করেন নি।[১]

Pour celui qui possede un
morceau de bon pain.
Un gigot de mouton, un grand
flacon de vin,
Vivre avec une belle au milieu
des ruines,
Vaut mieux que d'un Empire
etre le souverain.

(এতেস্সাম-জাদে)

কিন্তু আমার মূল বক্তব্য এখানে তা নয়।

আমি বলতে চাই, কবিতা বা অন্য কোনো বস্তু অনুবাদ করার সময় এ শুচিবাই কেন? কেন লোকে ধরে নেয় যে কাব্যে ভেড়ার ঠ্যাং চলতে পারে না? ইংরেজ এ শুচিবাই শিখেছে গ্রীকদের কাছে। তাদের 'ভিনাস' মূর্তি দেখে এক সরলা নিগ্রো রমণী শুধিয়েছিল, 'শরীরের নিচের আধা সম্বন্ধে মেয়েটার অত লজ্জা কেন? ওটা ছালা দিয়ে ঢেকেছে কেন?'

যুগে যুগে রুচি বদলায়। অনুবাদ করার সময় যদি আপন যুগের রুচি দিয়ে পূর্ববর্তী যুগের রুচির উপর সেনসর চালাই তবে কবির প্রতি তো অবিচার করা হয়ই, পরবর্তী যুগের রসিকজনের প্রতিও অমর্যাদা দেখানো হয়। কোনারকের মন্দির বহু সায়েবসুবোর রুচিতে বাধে। তাই বলে আমরা তো আর মূর্তিগুলোর মুণ্ডু বাইরে রেখে বাকি খড় কম্বল চাপা দিয়ে রাখি নে।

ওমরের স্মরণে আমি একখানা পুরো রানই অর্ডার করতে চেয়েছিলুম, কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ে গেল, পরশু রাতের শিক্ষা।

১ স্বরাজ লাভের পর দেশ-বিদেশ সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল বেড়েছে। বিশেষ করে ইরান, আরব ভূখণ্ড যখন নানা রকম আন্দোলন-আলোড়নের সৃষ্টি করে তখন এদেশের বহুলোক জানতে চান, এর পিছনে তত্ত্ব কতটুকু। এমন কি এদেশের চিত্রকররা পর্যন্ত জানতে চান, ইরান তুরানে ছবি কিভাবে আঁকা হচ্ছে?—সেই পুরানো পদ্ধতি, না মডার্ন প্রভাব তার উপর এসেছে। আমার কাছে তেহরানে প্রকাশিত যে সচিত্র খৈয়াম আছে তার ছবি দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়, এর কলাকার প্রাক্ রবি বর্মা (আমাদের হিসাবে) যুগের। চিত্রকর ফিট্সজেরাল্ডের স্মরণে খৈয়ামের হাতে একখানা কবিতার বই দিয়েছেন, পুরো রান্ না দিয়ে পেলেটে একখানা ছোট্ট মটন চপ রেখেছেন, এবং মদের বোতলটি খড়ে মোড়া—ইতালিয়ান কিয়ান্টি বোতলের মত।

তখন সন্ধ্যে আটটা। দেশের হিসেবে রাত দেড়টা। সবে এদেশে এসেছি; শরীরটা এদেশের টাইমে ধাতস্থ হয় নি। ভাতিজাকে বললুম, 'বাবাজী, আমি আর বেরুচ্ছিনি। তুমি আলুসেদ্ধ-ফেদ্ধ কিছু একটা নিয়ে এস—রুটি-মাখন ঘরেই আছে। তাই দিয়ে দিব্য চলে যাবে।'

মুখুজ্যে মশাই যখন ফিরে এলেন তখন দেখি তাঁর হাতে এক ঢাউজ থলতে—বাঙাল দেশে বলে ঢোঙ্কা।

মিনির মত সরল চিত্তে শুধালুম, 'এর ভিতর কি হাতি?'

বললে,'সর্বনাশ হয়েছে, স্যার!'

এস্থলে বলে রাখা ভালো, মুখুজ্যের 'সব্বনাশ'টা খাস কলকাত্তাই। মোকামে পেঁছে যখন দেখলে তার বহু পয়সার মাল শান্তিনিকেতনের একটা ডকুমেন্টরি ফিলম বেমালুম গায়েব হয়ে গিয়েছে, তখন 'টুথব্রাশমুস্টাশে' হাত বুলিয়ে বলে, 'যাক গে' আবার যখন পাতলুনের পকেট খুঁজে পায় না তখন বলে সব্বনাশ হয়েছে।

আমি তার সব্বনাশে বিলক্ষণ অভ্যস্ত বলে হাই তুলতে তুলতে নিশ্চিন্ত মনে শুধালুম, 'কি সব্বনাশ হয়েছে? দেশলাই খুঁজে পাচ্ছো না?'

'কি করে জানবো বলুন, এদেশে মুর্গীর সাইজ হয় দেশের খাসির? আপনি তো আলুসেদ্ধ চেয়েছিলেন,—রেস্তোরাঁওলা বললে, 'কাবার'। আমি বললুম, 'আলুসেদ্ধ নেই তো নেই—চিকেনসেদ্ধ দাও।' ভাগ্যিস 'হাফ-এ-চিকেন' বলেছিলুম, তাই রক্ষে। দেখুন।'

সেই চিকেন আমরা দুই পুরুষ্টু পাঁঠায় দেড়-বেলায় শেষ করি!

তারই স্মরণে অতখানি অর্ডার না করে যৎসামান্যের হুকুম দিলুম।

চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখি, সবাই গোরার পাল। একটি মাত্র ভারতীয়ও নেই। মেনুর দিকে নজর যেতেই কারণটা বুঝতে পারলুম। এক-একটি পদের যা দাম তাই দিয়ে যে কোন লন্ডনবাসী ভারতীয় ছাত্রের আড়াইখানা পুরো লাঞ্চ হয়! মুন্দ্রার মত পিসটন না থাকলে এরা এখানে আসতে পারে না।

বিলেতফের্তা বাঙালীদের নিয়ে দেশে বহু আলোচনা হয়ে গিয়েছে। এককালে এদের অনেকেই আর দিশী ডালভাত ধুতিচাদরে ফিরতেন না। তারপর বিশেষ করে চিত্তরঞ্জন দাস যে ভেল্কিবাজি দেখালেন তা দেখে আর বিলিতিয়ানা করার সাহস অল্প 'সায়েবের'ই রইল। কিন্তু যে সব ইংরেজ এদেশে বহু বছর কাটিয়ে বিলেত ফিরে যায় তাদের সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু জানা নেই। তবে শুনেছি, ড্রাইভার রাখার মত পয়সা ছিল না বলে লর্ড রোনাল্ড্‌শেকে ট্রামেবাসে দেখা যেত। এদের সম্বন্ধে সবচেয়ে ভালো লিখেছেন উড্‌হাউস্‌। তাঁর ধারণা এদের মাথায় ছিট ধরে। কেউ কেউ নাকি ডিনার আরম্ভ করে পুডিং দিয়ে ও শেষ করে সুপ দিয়ে!

তবে এ কথা বিলক্ষণ জানি এ দেশ থেকে তারা দুটো অভ্যাস নিয়ে যায়। স্নান করা ও মশলাদার খাদ্য খাওয়া। এই যে আজ ইংলন্ড-জর্মনিতে বাথরুমের ছড়াছড়ি না হোক, ব্যবস্থাটা অন্তত আছে (জর্মনিতে ম্যুনিসিপালিটির

আইন হয়েছে, কটা শোবার ঘর হলে কটা বাথরুম অবশ্য তৈরী করতে হবে। তার প্রধান বাহক চা-বাগানের ইংরেজ। আমার এক বন্ধুর কাছে শোনা, তাঁর সময়ে অর্থাৎ ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে সমস্ত অক্সফর্ডে নাকি মাত্র দুটি বাথরুম ছিল। তাই নিয়ে এক বাগিচার সায়েবের ছেলে কর্তৃপক্ষকে ফরিয়াদ জানালে তাঁদের একজন বলেন, 'তোমরা তো এখানে একনাগাড়ে থাকো ছ' হপ্তা (তখন বোধ হয় এক টার্ম বলতে ঐ সময়ই বোঝাতো) ; ছুটিতে বাড়ি ফিরে চান করলেই পারো।'

অর্থাৎ ছ' সপ্তাহে একটা স্নানই ইংরেজ বাচ্চার জন্য যথেষ্ট। ধেড়েদের জন্য বোধ হয় ছ' বছরে একটা। ফরাসীরা তো শুনেছি চান করে নদীতে আত্মহত্যা করার সময়।

কেন? তারা তাদের কলনি ইন্দোচীনে চান করতে শিখল না কেন? এখনো তা ফ্রান্সের চোদ্দ আনা বাড়িতে চানের ঘর নেই। বলতে পারবো না। তবে শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের কাছে শুনেছি, তিনি চীন দেশের বিরাট নদী দিয়ে জাহাজে করে গিয়েছেন কিন্তু কোনো চীনাকে নদীর জলে স্নান করতে দেখেন নি।

আর এদেশের মশলামাখা রান্না খেয়ে ইংরেজের স্বভাব এমনই বিগড়ে যায় যে, দেশে ফিরে তাকে যেতে হয় ভারতীয় রেস্তোরাঁতে। এদের পয়সাও প্রচুর ; তাই বোধ হয় খাস করে এদেরই জন্য এই তালু-পোড়া দামের রেস্তোরাঁ!

ইংরেজের যে কটি প্যারা সস্—যথা উস্টার, এইচ বি—এগুলো নাকি সর্ব-প্রথম ভারতবর্ষেই তৈরী হয়েছিল। এগুলো বানাতে যে সব মশলার প্রয়োজন হয়, সেগুলো যে ইয়োরোপে গজায় না সেকথা ভালো করেই জানি। এমন কি আমাদের দেশে গ্রীষ্মকালে যে সব তরকারি গজায় সেগুলো আপন দেশে গজাতে পারে না সাউথ অ্যামেরিকা থেকে আনিয়ে খায়। ঠিক বলতে পারবো না, তবে বেগুন খেতে শিখেছে বোধ হয় মাত্র ত্রিশ বৎসর।

আবার বলছি, এসব তত্ত্বের মাহাত্ম্য আমার বহু পাঠক দেবেন না। কিন্তু আমি সাধারণ জিনিসের খেই ধরে তত্ত্বচিন্তা করতে ভালোবাসি। যেমন ইংরেজ বেগুন খেতে শিখেছে বটে, কিন্তু সেটা খায় সেদ্ধ করে যতদূর সম্ভব বিস্বাদ বানিয়ে। বেগুন-পোড়া যে তার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিণতি, সে তত্ত্ব এখনো আবিষ্কার করতে পারে নি। ঠিক তেমনি মার্কিন জাত রেড্ ইণ্ডিয়ানের কাছ থেকে মুড়ি খেতে শিখেছে বটে, কিন্তু তেল, পেঁয়াজকুচি (পাঁপরভাজা বাদ দিন) দিয়ে খেতে শেখে নি।

আমি শুধু ভাবি ওসব 'সামান্য' জিনিস আবিষ্কার করতে মানুষের কত শত বৎসর লাগে।

ফার্পোতে যখন কেউ বাঁ হাতে ছুরি নেয় তখন তার কাবেল বন্ধুরা ফিস্-ফিস্ করে ভুল বাৎলে দেয়। এখানে দেখি 'উল্ট-পুরাণ'। পোলাও খেয়ে যাচ্ছে তো খেয়েই যাচ্ছে। মাংসের কারিটা পাশে পড়ে আছে। মেশাবার কথা মাথায় আসে নি। কাবাব খাচ্ছে তো খাচ্ছেই—পাশে চাপাতি পড়ে পড়ে

জুড়িয়ে হিম হয়ে গেল। ওকিব-হালরা তখন ফিস্ ফিস্ করে অ্যামেচারদের তালিম দিয়ে দুরুস্ত করার চেষ্টা করছেন।

এইবারে রসভঙ্গ করতে হল। আর চেপে রাখতে পারলুম না।

রান্না পছন্দ হল না।

মাদ্রাজী মশলা দিয়ে মোগলাই খানা এই আমি প্রথম খেলুম। এ যেন সেমেণ্ট দিয়ে তাজমহল বানানো, কিম্বা মাইকেলি অমিত্রাক্ষরে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়া, অথবা মাদ্রাজী মোগলাই মালমশলাই থাক—দক্ষিণের রাজগোপাল-আচারীকে উত্তরের চোগাচাপকান পরানো।

কিন্তু তবু খেতে মন্দ না। এ তো হাড্ডিসার মুর্গী ভেজাল দালদা দিয়ে রান্না নয়। মুর্গীটা যেন চর্বিওলা খাসী আর যে মাখন দিয়ে রান্না করা হয়েছে সেটা এদেশে সত্যযুগে পাওয়া যেত। দেশে থাকতে আমি তো একবার প্রস্তাব করেছিলুম, কোনোগতিকে একটুখানি খাঁটি গাওয়া ঘি যোগাড় করে মিউজিয়ামে রাখার জন্য—যাতে করে ভবিষ্যদ্বংশীয়রা জানতে পারে এককালে বাঙলা দেশের লোকে কি খেত।

তখন প্রায় রাত দুপুর। রাস্তায় বেরিয়ে পিকাডেলি। সচরাচর যাকে পৃথিবীর সব চেয়ে পুরনো ব্যবসা বলা হয়, তার সঙ্গে সেখানে মুখোমুখি-মোলাকাৎ।

এ ব্যবসা সম্বন্ধে লিখবো কি না মনঃস্থির করতে পারছি নে।

শ্যামবাজারের মামা নাকি হেদো না পেরিয়ে দু'বছরে তিন লাখ টাকা ফুঁকে দেওয়ার পর বিলেতগামী ভাগনেকে সদুপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, 'কোথায় যাবি বাবা, সেই জল, সেই ঘাস, সেই গাছ। ওগুলো দেখবার জন্য আবার বিদেশ যাবি কেন?'

আমাদের গ্রামের ভিতর যখন প্রথম ইঞ্জিন এসে রাতের বাসা বাঁধলো, তখন ছেলেবুড়ো সবাই হন্দমুন্দ হয়ে সেই কলের গাড়ি দেখতে গেল। ফিরে এসে সবাই যখন ইঞ্জিনের প্রশংসায় অষ্টপ্রহর পঞ্চমুখ তখন মুরুব্বী কলীমুল্লা বলেছিলেন, 'যা বলো যা কও, উই আমাদের আগুন উই আমাদের জল ছাড়া বাবুদের চলে না। আকাণ্টা পবনের নৌকোই বানাও, আর চিল্লীমারা "ইঞ্জিলই" বানাও সেই আগুন, সেই জল।'

এ তো সাধারণ লোকের কথা। স্বয়ং বাইবেল বলেছেন, সেই ঋষির মুখ দিয়েই, যিনি 'ইট, ড্রিংক অ্যাণ্ড বি মেরি' হতে সদুপদেশ দিয়েছেন 'যা ছিল তাই হবে, যা করা হয়ে গিয়েছে তাই আবার করা হবে; এ সংসারে নূতন কিছু নেই।'

বেশীর ভাগ লোক দেশভ্রমণে যায় নূতন কিছু দেখবার জন্য। এবং গিয়ে দেখি সেই জল, সেই ঘাস। আবার অন্য অনেক লোক বিদেশ গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে দেশের সন্ধানে লেগে যায়। প্যারিস গিয়ে খবর নেয়, সেখানে আপন দেশের

কেউ আছে কি না। তাকে খুঁজে বের করে শুধায়, 'রাইস-কারি' কোথায় পাওয়া যায়? সেই খেয়ে রেস্তোরাঁ থেকে বেরোতে বেরোতে বলে, 'চলো, দাদা, চট করে মোড়ের যদুর দোকান হয়ে যাই।'—পাড়ার যদুর পান বিখ্যাত!

আমি দেশভ্রমণে উপকারিতার চেয়ে অপকারিতাই দেখতে পাই বেশী। সে বিষয়ে অন্যত্র সবিস্তর আলোচনা করেছি। তবে এ বাবদে বলতে পারি, ভালো করে তাকিয়ে দেখলে বোঝা যায়, সব কিছু পুরাতন হলেও নূতন। বিলেতের ঘাস ঘাস, কিন্তু সে ঘাস আমাদের ঘাসের মত ঘন সবুজ নয়, একটু-খানি ফিকে, কেমন যেন হলদে ভাগটা বেশী। গাছপালার তো কথাই নেই। জলের স্বাদও অন্য রকম। একমাত্র আগুনে আগুনে কোনো পার্থক্য দেখি নি! তাই বোধ হয় পৃথিবীতে অগ্নি-উপাসকের সংখ্যা এখনো প্রচুর।

সেটা অবশ্য প্রথম যৌবনের প্রথম সফরে লক্ষ্য করি নি।

প্রথমবারের কথা বলছি।

একটানা জর্মনিতে থাকার পর অচেনা জিনিস দেখে দেখে যখন মন ক্লান্ত তখন গিয়েছি নেপল্সে—জাহাজে করে দেশে ফিরবো বলে। জাহাজ লেট্। দু'দিনের তরে সেই নির্বান্ধব বন্দরে আটকা পড়ে গেলুম। নিতান্ত কোনো কিছু করবার ছিল না বলে গেলুম পম্পেই দেখতে। (এস্থলে কিঞ্চিৎ অবান্তর এবং নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার হলেও বলি, আমি স্বেচ্ছায় কেবলমাত্র ভ্রমণের উদ্দেশ্যে কখনো বাড়ি থেকে বেরোই নি—বেরিয়েছি প্রয়োজনের তাগিদে। মাত্র একবার আমি কাইরো থেকে স্বেচ্ছায় পুণ্যভূমি প্যালেস্টাইন দেখতে গিয়েছিলুম। সেখানে ইহুদী, খৃস্টান ও মুসলমানের সঙ্গম। ধর্মচর্চাতে (আচরণে নয়) আমার চিরকালের শখ।)

পম্পেই মধ্য কিম্বা দক্ষিণ ইতালিতেও বলতে পারেন। আবহাওয়া একটু-খানি গরম।

পম্পের টিলার নীচে বাস থামতে হঠাৎ দেখি সামনে একবন করবীগাছ।

ওঃ! সে কী আনন্দ হয়েছিল! এ-জীবনে প্রথম যে গাছ চিনতে শিখি সেটি করবী। আমাদের দেশ বলে ঘণ্টা ফুল। মা আমায় চিনিয়ে দিয়েছিল। তারপর যখন তিনখানা বই পড়া শেষ হয়ে গিয়েছে, তখন চাচা বললেন, 'করব' আর 'কবরী'তে যেন গোবলেট না পাকাই! তারপর নিজের থেকেই শিখলুম, করবী পাঁচ রকমের হয়;—শ্বেত, পীত, রক্ত, কৃষ্ণ এবং পাটল—কৃষ্ণকরবী এখনো দেখি নি। সর্বশেষে শান্তিনিকেতনে ছাত্রাবস্থায় রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনলাম 'যক্ষপুরী'। পরে তার নাম হল 'রক্তকরবী'। এখন শিখলুম, ইতালির ভাষাতে ওলে-আন্দ্রো।

এ ফুলটি তাই কত স্মৃতি-বিস্মৃতিতে বিজড়িত। 'বিস্মৃতি' বলার কারণ সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলুম, ছেলেবেলায় নান্নুরে চণ্ডীদাসের ভিটে দেখতে গিয়ে পেলুম ডাক-বাঙলোর একপাশে অজস্র করবীগাছ—এই শুকনো খোয়াই-ভাঙার দেশ বীরভূমে।

কিন্তু করবীর সঙ্গে আমার পরিচয়ের দীর্ঘ ফিরিস্তিতে কার কোন্

কৌতূহল ? কৌতূহল তখনই হয় যখন কেউ সেই পম্পেইতে হঠাৎ দেখা করবীকে নৈর্ব্যক্তিক স্তরে তুলে রস-স্বরূপে প্রকাশ করতে পারে। যেমন রবীন্দ্রনাথ দেশে বসেই গাইলেন,—

'আবেশ লাগে বনে
শ্বেত-করবীর অকাল জাগরণে—' [১]

সঙ্গে সঙ্গে রসের মাধ্যমে করবী এসে আমাদের হৃদয় দখল করে বসে। সার্থক ভ্রমণকাহিনী-লেখক তাই নতুন পুরাতন উভয় অভিজ্ঞতাকে সমাহিত চিত্তে স্মরণ করে রসস্বরূপ প্রকাশ করেন। ভ্রমণ উপলক্ষ মাত্র।

কিম্বা হয়তো তথ্য পরিবেশন করেন। সেটা যদি রসরূপে প্রকাশিত হয়, তবে আরো ভালো। কিন্তু রস নেই, এবং তদুপরি যদি সে তথ্য কারো কোনো কাজে না লাগে তবে সেটা বলে কি লাভ আমি ঠিক বুঝতে পারি নে। কাবুলের অনৈসর্গিক যৌন সম্পর্কের কাহিনী এদেশে কেউ কেউ শুনেছেন, সেখানে অল্পবিস্তর গণিকাবৃত্তিও আছে, কিন্তু সে-সব তথ্য কারো কোনো কাজে লাগবে বলে আমার মনে হয় নি। এই নিয়ে আমার চারবার ইয়োরোপ যাওয়া হল। গণিকাবৃত্তি চোখে পড়ার কথা। এ নিয়ে সে-দেশের ছাত্রসমাজে নানা আলোচনাও হয়ে থাকে। বিশেষ করে যারা আইন ও ডাক্তারি পড়ে। সেগুলো অনেক সময় শুনতে হয়। সতীর্থরা হয়তো বা জিজ্ঞেস করে বসে, 'তোমাদের দেশে কি রকম ?'

তবু এ সম্বন্ধে আমি কোন কিছু লেখার প্রয়োজন বোধ করি নি। কিন্তু কিছুদিন পূর্বে এমন একটা ঘটনা ঘটেছে, যার পর হয়তো অল্প কিছু বলার সময় এসেছে।

গত বৎসর হঠাৎ খবর এল সরকার সোনাগাছির (কথাটা আসলে 'সোনা-গাজী'—হুতোমে আছে) গণিকাদের প্রতি আদেশ করেছেন, তারা যেন ওপাড়া ছেড়ে চলে যায়।

তাহলে প্রথম প্রশ্ন, তারা যাবে কোথায় ? তারা যদি ভদ্রপাড়াতে একজন কিংবা দু'জনে মিলে ঘর ভাড়া নেয়, তবে সরকার কোন আইনে তাদের ধরবেন কিংবা যে বাড়ি ভাড়া দিয়েছে তার বিরুদ্ধে সরকার কোন মোকদ্দমা আনবেন কি না, এসব কথা খবরের কাগজে ভালো করে বেরোয় নি। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এরা উদ্বাস্তু হয়ে বেশী ভাড়া দিতে রাজী হবে, এবং কলকাতাতেও লোভী বাড়িওলার অভাব নেই। প্রায় ঠিক এই ধরনের একটা ব্যাপার ঘটে কিছুদিন পূর্বে দিল্লী শহরে। সরকার আইন করে রেস্তোরাঁ এবং মদের দোকানে মদ, অর্থাৎ প্রকাশ্যে মদ্যপান বারণ করে দিলেন, কিন্তু দোকানে মদ কিনে বাড়িতে গিয়ে খাওয়া নিষিদ্ধ করলেন না। ফলে যে পাপকর্ম সে বাইরে করতো, পর

---

১ হেমন্ত ছাড়া অন্য কোনো সময় গাইতে হলে রবীন্দ্রনাথ এ-গানের 'হেমন্তে'র বদলে 'নিকুঞ্জে' ও 'অকালে'র বদলে 'হঠাৎ' করে গাইতেন। তথ্যটি অন্য কোথাও ছাপাতে দেখি নি বলে উল্লেখ করলুম।

কন্যা জানতে পারতো না, সেইটে অনেক বাড়ির ভিতরে আরম্ভ হয়ে গেল। ফলে পুত্র এবং কোনো কোনো স্থলে কন্যাও যদি মদ খেতে শেখে, তবে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। আমি সমাজ-সংস্কারক নই তবু তখন কাগজে লিখেছিলুম মদ্যপান এদেশে এখনো এমন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে নি, যার জন্য জুজুর ভয় দেখাতে হবে। আসল প্রয়োজন, যেন নতুন কনভার্ট না হয়, অর্থাৎ আজকের ছেলেছোকরারা যেন মদ খেতে না শেখে। যে রকম আফিঙের বেলায় নতুন পারমিট না দেওয়ার ফলে আসাম থেকে আফিঙ খাওয়া উঠে যাচ্ছে। দোকানে মদ না খেতে পেয়ে কর্তা যদি বাড়িতে মদ খেতে আরম্ভ করেন, তবে তো কন-ভার্টের সংখ্যা বাড়বে! এ বাবদে বিধানবাবু সাউথ ক্লাব থেকে মদ তুলে দিয়ে অতি উত্তম কর্ম করেছেন। ছেলে-ছোকরারা সেখানে যেত টেনিস খেলতে। 'বারে' যেতো শরবৎ খেতে। শরবৎ থেকে শরাব প্রয়াণ কঠিন কর্ম নয়—দুটো শব্দই আরবী 'শারাবা'—'পান করা' থেকে এসেছে।

এসব অবান্তর নয়। সরকার যদি মনে করে থাকেন যে, সোনাগাছি-বাসিন্দাদের ভিটে ছাড়া করতে পারলেই সর্ব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, তবে তাঁরা মারাত্মক ভুল করছেন। ভদ্র গৃহস্থ উদ্বাস্তুদের নিয়েই আমরা কি রকম হিমসিম খাচ্ছি—সেটা শেয়ালদাতে না নেমেও স্পষ্ট বোঝা যায়। এত সহজে এ সমস্যার সমাধান হয় না। রবীন্দ্রনাথ বলতেন, 'দীর্ঘতম পন্থা অনু-সরণ করলেই স্বল্পতম সময়ে পৌঁছানো যায়।' এটা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য কি না বলা কঠিন, কারণ গোল্ডেন রুল ইজ দ্যাট দেয়ার ইজ নো গোল্ডেন রুল, কিন্তু সচরাচর যে ব্যবসাকে সংসারের প্রাচীনতম ব্যবসা বলে বহু পণ্ডিত স্বীকার করে নিয়েছেন তার ওষুধ একটি বাড়িতেই হয়ে যাবে এ-কথা বিশ্বাস করা কঠিন।

আসলে আমরা বিলেতের অনুকরণ করছি। বিলেত ব্রথেল বা গণিকালয় তুলে দিয়েছে, আমরাও দিয়েছি। ফলে লণ্ডনের গণিকারা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে—আমাদের ছড়ায় নি। বোঝা গেল, ওষুধ না ধরাতেই আমরা উপকৃত হয়েছি বেশী।

এস্থলে একটি কথা না বললে কলকাতার প্রতি অবিচার করা হবে।

কলকাতার আপন জন না হয়েও আমি তার শত দোষ স্বীকার করি। কলকাতার শিশুরা সস্তায় খাঁটি দুধ পায় না, রুগীরা হাসপাতালে স্থান পান না, ওষুধ কালাবাজারে ঢুকেছে ভেজালের অন্ত নেই, এরকম অবর্ণনীয় নোংরা শহর ত্রিভুবনে নেই, ট্রামে বাসে পালোয়ানরাই শুধু উঠতে পারে, শেয়ালদা-হাওড়াতে ট্রেন যা লেট হয়, তাও পানকচুয়ালি হয় না—অবস্থা অবর্ণনীয়।

কিন্তু এই যে কলকাতা শহরে স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত—এত বেশী পুরুষ এবং এত কম মেয়ে—এ অনুপাত পৃথিবীর কোনো বড় শহরই দেখাতে পারবে না। এটা কিছু গর্বের বিষয় নয়, কিন্তু আমি বিদেশ থেকে ফিরে বার বার গর্ব অনুভব করেছি যে, এ শহরের লোক যৌন-ক্ষুধা সম্বন্ধে কতখানি অচেতন, কিম্বা তারা সুযোগ পায় নি, সেটা কেন তৈরী করে নি, তা জানি নে।

ইয়োরোপে যখনই যুদ্ধের ফলে বা কোনো কারণে স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত অস্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায় এবং বিদেশী সৈন্যের মিত্র বা শত্রুভাবে আগমন হয়, সঙ্গে সঙ্গে জারজ সন্তানের সংখ্যা যে কী অসম্ভব রকম বেড়ে যায়, তা দেখে সমাজসেবীরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এবারে সে সংখ্যা এমনই হিসেবের বাইরে চলে গেল যে শেষটায় পাদ্রীসায়েবরাই প্রস্তাব করলেন জারজ শিশুদের যেন সমাজ ও ধর্মপ্রতিষ্ঠান আইনত ন্যায্য বলে স্বীকার করে নেয়।

শান্তির সময়েও এরকম ধারা হয়। উত্তর ইয়োরোপের কোনো একটি দেশে অনুপাত অস্বাভাবিক হয়ে যাওয়ায় দেখা গেল বহু পুরুষ একটি স্ত্রী এবং একটি করে 'রক্ষিতা' পুষছে। 'রক্ষিতা' বলা ভুল, কারণ এ রমণী ভদ্রঘরের মেয়ে, বেশ্যাবৃত্তি কখনো করে নি, তার প্রতিপালকের সঙ্গে তার স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, তার পুত্র-কন্যা আছে, সমাজে সে অপমানিত নয়। অনেক স্থলে তার আসল স্ত্রী এ রমণীর খবর জানেন, এবং কোনো স্থলে পালা-পরবে দুই পরিবার একত্র হয়ে আনন্দোল্লাস করেন। বস্তুত আমাদের দেশে কোনো পুরুষের যদি দুই স্ত্রী থাকে এবং তারা যদি ভিন্ন ভিন্ন বাড়িতে থাকে তাহলে সচরাচর যা হয়ে থাকে।

কোনো কোনো বুদ্ধিমান সমাজসেবী তাই প্রস্তাব করেছেন, এই অস্বাভাবিক ব্যবস্থার চেয়ে ঢের ভালো হয়, এই সব লোকদের আইনত দুটি বিয়ে করার অধিকার দেওয়া। কিন্তু খৃষ্টধর্মে এক স্ত্রীর জীবিতাবস্থায় দ্বিতীয় বিবাহ বেআইনী—তাকে তালাক না দিয়ে। ক্যাথলিক ধর্মে আবার ঠিক তালাকের ব্যবস্থাও নেই—সেখানে প্রমাণ করতে হয়, বিবাহের আচার-অনুষ্ঠানের ত্রুটি থাকায় বিয়েটা আদপেই হয় নি। ধর্মের অনুশাসন এড়াবার জন্যে কেউ কেউ তার সুবিধেও নিয়ে থাকেন।

অথচ ইয়োরোপে আমাদের বদনামের অন্ত নেই—আমরা বহুবিবাহ বিশ্বাস করি, আমরা হারেম পুষি!

দুশমন সকলেরই থাকে। খৃষ্টের ছিল, সক্রাতেসের ছিল। আমাদেরও আছে। ইয়োরোপেও আছে।

তাদেরই কেউ কেউ আপনাকে অপ্রস্তুত করার জন্যে পাঁচজনের সামনে শুধাবে, 'আপনাদের দেশে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে—না?'

আমি কোথায় না লজ্জা পাবো, উল্টে একগাল হাসি। যেন বঙ্গ দু'কান কাটা। বলি, 'বিলক্ষণ! একটা, দুটো, চারটে—মুসলমান হলে—যত খুশী। আর হিন্দু হলে তো কথাই নেই। এক মুখুয্যের ছিল আটশ', বাঁড়ুয্যের ছ'শ', চাটুয্যের চারশ', বেচারী গাঙ্গুলীর মাত্র আশী—ঘোষালের ফর্দটা জানা নেই।[১] কায়েতরা অতখানি না, তবে তাঁরাও ছেড়ে কথা কন নি। বার্নার্ড শ এ-ব্যবস্থার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।'

১ বিদ্যাসাগর মশাইয়ের বিধবা বিবাহ বইয়ে পুরো হিসেব আছে। আমি স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে বলছি। তবে হিসেবটা মোটামুটি এই।

তারপর হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বলি, 'এ-ব্যবস্থা অতি অল্পকাল স্থায়ী ছিল। আসলে ভারতের শতকরা নিরানব্বুইজন লোক একটি মাত্র স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে আসে। যদিও একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অধিকার আইনত তার ষোল আনা আছে।'[১]

তারপর ধীরে ধীরে রসকসহীন অতি শুকনো গলায় বলি, 'এবারে আপনারা বুকে হাত দিয়ে বলুন তো, আপনাদের দেশে ক'জন লোক একদারনিষ্ঠ হয়ে, অর্থাৎ বিবাহের পূর্বে বা পরে অন্য কোনো কুমারী বা বিবাহিতের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে না এসে জীবন কাটায়? যদিও একাধিক স্ত্রীগমনের অধিকার আইনত আপনাদের নেই।'

যেন ফতেহ্‌পুর সিক্রির বুলন্দ্‌ দরওয়াজার নিচে দিয়ে যাচ্ছি। এই বিশাল উন্নতশির দেউড়ি যেন স্থপতি ইচ্ছে করেই এমন ভাবে বানিয়েছেন যে, নীচে দিয়ে যাবার সময় মানুষ বুঝতে পারে সে কত নগণ্য।

কেন্‌সিংটন গার্ডেনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। গাছগুলো এমনি বিরাট, এমনি উঁচু যে, যেতে যেতে আমার মনে পড়ল বুলন্দ্‌ দরওয়াজার কথা। সেখানেও শীতের প্রভাতে কাঁপতে কাঁপতে ঢুকেছিলাম; এখানেও হেমন্তের শীতে জবুথবু হয়ে সামনের দিকে এগোচ্ছি।

আকাশে একরত্তি মেঘ নেই, বাতাসে এক ফোঁটা হিম নেই—সূর্যদেব তাঁর ভাণ্ডার উজাড় করে স্বর্ণরৌদ্র ঢেলে দিয়েছেন কিন্তু শীতের দাপট কমাতে পারেন নি। পার্ক থেকেই দেখতে পাচ্ছি, বয়স্করা ওভারকোট পরেছে। কাল বৃষ্টি নেমেছিল—তখন জোয়ানরা পর্যন্ত কাঁধ কুঁচিয়ে, মাথা নীচু করে, হ্যাট সামনের দিকে নামিয়ে দিয়ে হন হন করে চলেছিল গায়ের গরম বাড়াবার জন্য। মেয়েরা কী করে হাঁটু পর্যন্ত ঐটুকু সিল্কের মোজা পরে শীত ভাঙায় সে এক সমস্যা। প্যারিসে দেখেছি, পেভমেন্টে যারা পুরনো বই বিক্রি করে তাদের কোনও প্রকারের আশ্রয় নেই বলে দোকানের সামনে ঘন ঘন পাইচারি করে, আর দুই বাহু প্রসারিত, ডান হাত শরীরের বাঁ দিকে আর বাঁ হাত ডান দিকে থাবড়ায়। মাঝে মাঝে হাতের তেলো গরম করার জন্য দু'হাত আঁজলা করে মুখ দিয়ে জোর ফুঁ দেয়।

কাল রাতের বৃষ্টি না আজ ভোরের হিমে গাছের পাতা সব ভেজা। সেগুন-গাছের পাতার মত তারা ওজনে ভারী—সারা গ্রীষ্মকাল রোদ আর জল খেয়ে খেয়ে তারা যেন পেটের অসুখ করে কেউ হলদে, কেউ ফিকে, কেউ বা কালো হয়ে গিয়েছে। আর কেউ টকটকে লাল—শুনেছি, ঠিক মরার সময় কোনও কোনও মানুষের সব রক্ত এসে মুখে জড়ো হয়। টুপ করে কখনও এক ফোঁটা জল এসে নাকের উপর পড়ে, কখনও বা হাতের উপর। কী ঠাণ্ডা! সঙ্গে

১ এখন অবশ্য আইন বদলেছে।

সঙ্গে অতি নিঃশব্দে দুটি লাল পাতা।

দু' দিকে সবুজ ঘাসের লন। ঠিক সবুজ বলা চলে না। নীলের ভাগটা কম, হলদেটাই বেশী। এখন না হয় হেমন্তের প্রথম শীতে তারা ফিকে হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ভরগ্রীষ্মকালেও আমি ইউরোপে কখনও দেশের কালো-সবুজ দেখি নি। আর ঘাসগুলোই বা কী অভদ্র রকমের লম্বা আর মোটা! একে তো তাদের যত্ন নেওয়া হয় প্রচুর, তার উপর বোধ হয় এদের মাড়িয়ে পাইচারি করা বারণ বলে কী রকম উদ্ধত ভাবে মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে। এরাও ভেজা। গায়ে হাত বুলোতে ইচ্ছে করে না। দেশে শীতের সকালে নৌকো দিয়ে যাবার সময় যে রকম ভিজে সাপলা পাতায় হাত দিতে গা কির কির করে।

দু'দিকের সবুজ লনের মাঝখানে কালো পিচের রাস্তা। ছোট্ট, এক ফালি। এঁকেবেঁকে একটুখানি এগিয়ে গিয়ে ডান দিকে চলে গিয়েছে বিরাট হাইড্ পার্কে, বাঁ দিকে গিয়েছে এ-বাগানেরই 'গোলদিঘি'র দিকে। সেই ফালি রাস্তা-টুকু আবার নিয়েছে নানা রঙের মোজায়িক, কেটেছে ঝরা পাতার আলপনা। কিন্তু বেশীক্ষণের জন্য আলপনা এক রকমের থাকে না। মুখে পাইপ,হলদে গোঁপওলা বুড়ো মালী এসে ঝাঁট দিয়ে সাফ করে যায়। সঙ্গে সঙ্গে দমকা বাতাসে আরেক প্রস্থ রঙীন পাতা ঝরে পড়ে—আবার নূতন আলপনা আঁকা হয়।

বেলা এগারোটা। সমস্ত পার্কে মেরে কেটে দশ-বারো জন লোক হয় কি না-হয়। শুনেছি আরও সকালে, ছুটির দিনে এবং গ্রীষ্মকালে বেশী ভিড় হয়। লণ্ডন শহরের লোক যে কাজ করে, ছুটির দিন ছাড়া আলসেমি করে না, এ-তত্ত্বটা এদের ফাঁকা পার্ক দেখলেই বোঝা যায়। ইতালিতে অন্য ব্যবস্থা। তাদের পার্ক সব সময়েই ভর্তি—অবশ্য সে-দেশে টুরিস্টও যায় বেশী—এবং তাদের 'পাব'ও সব সময়েই গুলজার। সকাল দশটাই হোক আর বিকেল চারটাই হোক—জোয়ান মদ্দেরা কাজকর্ম ছেড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সস্তা লাল মদ খায় আর 'ব্যাক্-গ্যামন্' খেলে। এ-খেলাটা আমি দেশে কখনও দেখি নি, অথচ ভূমধ্যসাগরের পারে পারে, ইতালি গ্রীস তুর্কি লেবানন প্যালেস্টাইন মিশর সর্বত্র প্রচলিত। তাই বোধ হয় এরা কেউ দাবা খেলাতে নাম কিনতে পারে নি।

'ব্যাক্-গ্যামনের' সুবাদে একটা কথা বলে নিই। মিশরে ঐ খেলাতে পয়েন্ট গোনা হয় ফার্সীতে—আরবীতে নয়। আমরা যে রকম টেনিস খেলার সময় 'থার্টি ফর্টি', 'লাভ ফিফ্টিন, 'থার্টি অল্' বলি—'ত্রিশ-চল্লিশ, 'ভালো-বাসার পনেরো' বা 'ত্রিশ সমস্ত' বলি নে। ফার্সীতে নম্বর গোনা থেকে বোঝা যায় খেলাটা আসলে ইরান থেকে মিশরে গিয়েছে। ঠিক তেমনি বাঙলা দেশের একাধিক গ্রাম্য খেলাতে দেখেছি, নম্বর গোনা হয় কিছু-জানা-কিছু-অজানা ভাষায়—পুরোপুরি বাঙলায় নয়। এগুলো তবে কোন্ ভাষা থেকে এসেছে? আমার বিশ্বাস, সত্যকার রিসার্চ করলে তার থেকে বেরোবে আর্যরা

বাঙলা দেশে এসে কোনো জাতি-উপজাতির সংস্পর্শে এসেছিল। অনেক পণ্ডিত বলেন, সিঁথির সিঁদুর আমরা সাঁওতালদের কাছ থেকে নিয়েছি। আমার বিশ্বাস, খেলার নম্বরের অনুসন্ধান করলে আরও বেশী তথ্য এবং তত্ত্ব বেরোবে। মমাগ্রজ গ্রামের অবাঙলা নাম নিয়ে বহু বৎসর খেটে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন আর্যভাষীরা কোন্ কোন্ উপজাতির সংস্রবে এসেছিল। তাঁর ওসব লেখা কেউ পড়ে না। গবেষণা বলতে বাঙলা দেশে বোঝায়, তিনখানা বই পড়ে চতুর্থ বই লেখা। অর্থাৎ একখানা বই থেকে গাপ্-মারা চুরি; তিনখানা বই থেকে চুরি-করা গবেষণা।

বেশী হাঁটাহাঁটি করলে পাছে ভগবান আসছে জন্মে-ডাকহরকরা বানিয়ে দেয় তাই গোলদিঘির কাছে এসে একটা বেঞ্চিতে বসে পড়লুম। পুকুরের জল স্বচ্ছ কালো। চতুর্দিকে অনেকখানি খোলা বলে জোর বাতাস শুকনো পাতা পুকুরের সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়ে নিজেই ঢেউয়ে ঢেউয়ে এক পাড়ে জড়ো করছে। মালী সেখানে দাঁড়িয়ে লম্বা আঁকশি দিয়ে টেনে এনে পুকুর সাফ রাখছে। একপাল পাতিহাঁস ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলছে। বাতাস হাড়ে হাড়ে কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছে, স্বচ্ছ কালো জলের দিকে তাকিয়ে সে শীত যেন তার চরমে পেঁছচ্ছে আর আহাম্মুকের মত ভাবছি, হাঁসগুলো ঐ হিমে থাকে কী করে? উত্তর সরল; হিমালয়ের সরোবরে যখন থাকতে পারে তখন এখানেই বা থাকতে পারবে না কেন? কিন্তু চোখে দেখেও যেন বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না।

হঠাৎ একটা ধেড়ে রাজহাঁস বিরাট দুটো পাখা এলোপাতাড়ি থাবড়াথাবড়ি করে পড়ি-পড়ি হয়ে ধপ্ করে নামল পাতিগুলোর মাঝখানে। তারা ভয় পেয়ে প্যাঁক প্যাঁক। এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ল। কী দরকার ছিল এদের এই শান্তিভঙ্গ করার? রাজহাঁসটা ভেবেছে, পাতিগুলো এতক্ষণ ধরে ঐ কোণে যখন জটলা পাকাচ্ছে তখন নিশ্চয়ই ভাল খাবারের সন্ধান পেয়েছে।

তাই হবে। নিশ্চয়ই তাই। ইয়োরোপের পাতিজাতগুলো যখন এশিয়া আফ্রিকায় খাবার পেয়ে জটলা পাকাল তখন ধেড়ে ইংরেজ তাদের তাড়িয়ে দিয়ে রাজ্য বিস্তার করল। সাধে কি আর বিষ্ণুশর্মা এসপ্ বলেছেন, পশুপক্ষীর কাছ থেকে জ্ঞান সঞ্চয় করতে হয়। কিন্তু তাই করে কতকগুলো জাত যে পশুর মত আচরণ করলে, এবং এখনো করছে, তার কী?

আচ্ছা, যদি খুব শীত পড়ে আর পুকুরের জল জমে যায়—আমি স্বচক্ষে রাইনের মত নদী পর্যন্ত জমে যেতে দেখেছি—তাহলে এ হাঁসগুলো যায় কোথায়? কোথায় যেন পড়েছি, কবি দুঃখ করে বলেছেন, 'আমি মানস সরোবরের যেন ডানা-ভাঙা রাজহাঁস। চতুর্দিকে জল জমে গিয়ে বরফ হয়ে হয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে, শেষটায় আমাকে পিষে মারবে। আমার সঙ্গী-সাথীরা অনেকদিন হল দক্ষিণে চলে গিয়েছে। আমার যাবার উপায় নেই।' হায়, আমাদের সক্কলেরই তাই। কারও পা খোঁড়া, কারও ডানা ভাঙা, কারও প্রিয়া পালিয়ে গিয়েছে, কাউকে বা সরকার জেলে পুরে দিয়েছে—সবাই যেন বলছে, "পিছিয়ে পড়েছি আমি, যাব যে কী করে!

এদের জন্য নিশ্চয়ই কোনও ব্যবস্থা আছে। লণ্ডন তো আর দেন্দেড়ে গ্রাম নয় যে, হাঁসগুলো গোলাবাড়ির খামারঘরে গিয়ে আশ্রয় নেবে। পশুপ্রীতি ইংরেজের যথেষ্ট আছে। মিশর পরাধীন থাকাকালীন এক ইংরেজ হাকিম যখন এক মিশরী খচ্চরওলাকে জরিমানা করে জন্তুটাকে পিটিয়ে আধ-মরা করে দেওয়ার জন্য—তখন সে মনের দুঃখে বলেছিল, 'আমি তো জানতুম না রে খচ্চর, আদালতে তোর এক দরদী ভাই রয়েছে!'

সামনে দিয়ে একটি মেমসায়েব চলে গেল। লম্বা লম্বা পা ফেলে—দেশের মা-মাসীরা দেখতে পেলে বলতেন, 'হুনোমুখো'। না পরনে সে স্কার্ট নয় যা পরে বাসে উঠতে গেলে ছিঁড়ে যায়। এর পরনে হুবহু চীনা পাতলুন। ক্লাইভ স্ট্রীটে বিস্তর দেখেছি। তবে চামড়ার সঙ্গে সেঁটে টাইট, মেরে-কেটে পায়ের ডিম ছাড়ায় কি না-ছাড়ায়, আর লাল সবুজের মারাত্মক চেক্। শিল-ওয়ার বুঝি, বড়ী মোরী—অর্থাৎ ঢিলে পায়জামা বুঝি, চীনে পাজামা বোঝাও অসম্ভব নয়, কিন্তু এই সৃষ্টিছাড়া পাজামা পরলে রমণীদেহের কোন্ সৌন্দর্যের কী যে খোলতাই হয় সেটা আদপেই বুঝতে পারলুম না। আর শরীরটাই না কী বাহারে! বার তিনেক না ঘোরালে বোঝা যায় না কোন্‌টা সামনের দিক, কোন্‌টা পিছন। যেন 'মডার্ণ পেণ্টিং'! গ্যালারিতে দেখে আমাদের মত বেকুবদের মনে সন্দ জাগে উল্টো টাঙায় নি তো?

যৌবনে কুক্কুরী ধন্যা। যুবতী কখনও কুৎসিতা হয় না। তবে যার যেটা মানায় তাকে সেটা পরতে হয়। আজকাল তো আরও কত সব কল বেরিয়েছে শুনতে পাই। তা না হয় নাই বা হল। একটু ফোলা-ফাঁপার জামাকাপড়ও তো আছে। সাড়েবাইশ-গজী শিলওয়ার না-ই বা হল।

পিছনে আবার একটা কুকুর। মনিবের সেই মেলগাড়ির তেজে চলার সঙ্গে পাল্লা রাখতে গিয়ে এই শীতে হাঁপিয়ে উঠেছে। অতিশয় অপ্রিয়দর্শন। 'ডাক্সুহুণ্ট' না কী যেন নাম। পিপের মত দেহ। মনে হয় যেন দুটো কুকুর জুড়ে একটা বানানো হয়েছে। অথচ আস্তে আস্তে চললে একেও হয়ত মন্দ দেখাত না।

সবসুদ্ধ জড়িয়ে মড়িয়ে যাকে বলে 'কাল্ট্ অব দি আগ্‌লি' অর্থাৎ "কুৎসিত ধর্ম"। মডার্ণ কবিতা। যার বিষয়বস্তু, ডাস্টবিন, পচা ইঁদুর, মরা ব্যাঙ।

বিরক্তি হয় নি, দুঃখ হয়েছিল। আসলে এরা তো কুৎসিত নয়। এসব গায়ে পড়ে করা। দেশকালপাত্র।

বাঁচালে। হাওয়াটা বন্ধ হয়েছে। ঐ হাওয়াটাই যত অনর্থের মূল। উনি বন্ধ হলে বেশ ওম-ওম ভাবটা জমে আসে। বেঞ্চির হেলানে মাথাটা চিত করে আকাশমুখো করলুম। ধুপ করে হ্যাটটা পড়ে গেল। তা পড়ুক। বন্ধ চোখে লাগল রোদের কুসুম কুসুম পরশ। দেশে গরমের দিনে চোখে ঠাণ্ডা জল দিলে যে রকম আরাম বোধ হয়। হাওয়া বন্ধ হয়েছে বলে পোড়া পেট্রলের গন্ধও নাকে আসছে না। এদেশের লোকের বোধ হয় অভ্যেস হয়ে গিয়েছে।

আমি তো সর্বক্ষণ হাতে গোঁফে চামেলী ঘষি। ভাগ্যিস খানিকটে আতর সুটকেসের পকেটে করে অজান্তে চলে এসেছে। এদেশের ও দ্য কলোন লেভেণ্ডার ছিটোলে শীতটা যেন আরও ছমছম করে ওঠে।

এবারে হেমন্তটা এই পোড়া লণ্ডনেও হেমন্ত বলেই ঠেকছে। কাল গিয়েছিলুম মোটরে করে লণ্ডনের উত্তরে, গ্রামাঞ্চলে মাইল বিশেক দূরে। তখন চোখে পড়েছিল সত্যকার হেমন্ত।

হেমন্ত নিয়ে এ-সংসারের সব কবিই বিপদগ্রস্ত হয়েছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় শ'দেড়েক গান রচেছেন বর্ষা নিয়ে। হেমন্ত নিয়ে পাঁচটি হয় কি না-হয়। কবিগুরু কালিদাস পর্যন্ত ঋতুসংহারে হেমন্তের বর্ণনা করতে গিয়ে যা রচেছেন তার তুলনায় তাঁর বর্ষা-বর্ণন শতগুণে শ্রেয়ঃ। তবু তাঁর কলম জোর-দার। হেমন্ত ঋতুতে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেছেন তিনি মানসযাত্রী হংস ক্রৌঞ্চমিথুন আর মাটির দিকে দেখেছেন পরিপক্ক শস্যে গ্রামের প্রত্যন্ত প্রদেশ পরিপূর্ণ। হেমন্তের সেই সফল শান্তির পূর্ণতা দেখে প্রার্থনা করেছেন ;—

বহুগুণরমণীয়ো যোষিতাং চিত্তহারী
পরিণতবহুশালিব্যাকুলগ্রামসীমা।
সততমতিমনোজ্ঞঃ ক্রৌঞ্চমালাপরীতঃ
প্রদিশতু হিমযুক্তঃ কাল এব সুখং বঃ॥

হঠাৎ শুনি ধমকের শব্দ। রমনীকণ্ঠে।

শিক্ষিত ভদ্রোলোকের ইংরিজীই ভাল করে বুঝি নে, কক্‌নি বোঝা আমার কর্ম নয়। তাকিয়ে দেখি, আমার সামনে ডান দিকে একটি পেরেম্বুলেটর। তার পিছনে একটি ছোট্ট বাচ্চা। চলি-চলি পা-পা করে গোলদিঘিতে ক্ষুদে একটি রবারের নৌকা ভাসাবার চেণ্টা করছে। ঢেউয়ের ধাক্কায় সেটা বার বার কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছে। ওদিকে তার আয়া অসহিষ্ণু হয়ে লাগিয়েছে তাকে এক বিকট ধমক। সে-ধমকের ধাক্কায় রাজ-পাতি সব হাঁস প্যাঁক প্যাঁক করে পালাচ্ছে, নৌকোটা পর্যন্ত ডুবুডুবু।

শুনেছিলুম, এ-দেশে বাচ্চাদের ধমক দেওয়া হয় না। দেশের এক অতি আধুনিক পরিবারে। সেখানে অতিথি এলে এক ছেলে পিঠে পিন ফুটাত, অন্য ছেলে ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে কাঁচি দিয়ে তার টাইটি কাটতে আরম্ভ করত। ধমক দিতে গেলে বাপ-মা অতিথিকে বিলেতের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন।

ফের ঘাড় ঝুলিয়ে দিলুম বেঞ্চির হেলানে, মুখ তুলে দিলুম আকাশের দিকে। অস্ফুট কণ্ঠে বললুম, 'হায় পেস্তালৎসি, হায় রে ফ্রোবেল্, কোথায় তুমি ফ্রয়েট! এই কক্‌নি রমণীকে পর্যন্ত তালিম দিয়ে শাবুদ করতে পারো নি!'

এবারে শুনি বাঁ দিক থেকে 'বেগি পান্'। মানে? ওঃ—'বেগ ইয়োর পার্ডন'! হকচকিয়ে চোখ খুলে দেখি, আমার অজানতে এক ভদ্রলোক বেঞ্চির অন্য প্রান্তে আসন নিয়েছেন।

সুন্দর চেহারা। ঢেউ-খেলানো সোনালী ব্লন্ড চুল—হাওয়াতে অল্প উস্কো-খুস্কো। নাকটি খাঁটি রোমান, ব্রিজের চিহ্নমাত্র নেই। মুখের রঙ পুরানো হাতির দাঁতের মত। শুধু গাল দুটিতে অতি অল্প গোলাপীর ছোঁয়াচ লেগেছে। একটুখানি গোঁপ—মাথার চুলের চেয়ে এক পোঁচ বেশী সোনালী।

আমি তাড়াতাড়ি বললুম, 'আজ্ঞে না। আমি কিছু বলি নি।' তারপর আমতা আমতা করে বললুম, 'আমি শুধু পেস্তালৎসির কথা স্মরণ করছিলুম।'

হাত দু'খানি জানুর উপর ভারী শান্তভাবে রাখা, যেন রেমব্রান্টের ছবিতে আঁকা। সরু লম্বা লম্বা। নখে লালের আভাস। চমৎকার মেনিকোর করা। বয়স ৩০।৩৫। ঠিক বলতে পারব না। সায়েব-সুবোদের বয়েস আমি অনুমান করতে পারি নে।

এবারে আমার পালা। সায়েব কী যেন বললে। বুঝতে না পেরে বললুম, 'বেগ পান্।' সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু বুঝে গেলুম বলেছে, 'থ্যাংক গড্' ধরনের কিছু একটা। কিন্তু তখন তো আর 'বেগ্ ইয়োর পার্ডন'টা ফের বেগ্ করে ফেরত নেওয়া যায় না।

পাশে বেঞ্চির উপর অত্যুৎকৃষ্ট শোলার হ্যাট, তার ভিতরে দু'খানা দস্তানা। পরনে হেরিং মাছের কাঁটার নক্সা-কাটা নূতন সুট। শক্ত কলার, ডোরা কাটা টাই—কোনো পাবলিক স্কুলের নিশান-মারা হতেও পারে—কাফের বোতাম ঝিনুকের, মাঝখানে কী একটা ঝক্‌ঝক্ করছে। পায়ে ছুঁচলো কালো জুতো। এবং বিশ্বাস করবেন না, তার উপর স্প্যাট!

ত্রিশ বৎসর পূর্বে এ-রকম বেশভূষা মাঝে-মধ্যে দেখেছি। বইয়ে বর্ণনা পড়েছি। এ কি বিংশ শতাব্দীর রিপ্ ভান্ উইন্‌ক্‌ল্?

তখন মনে পড়ল কেনসিংটন গার্ডেনের আশেপাশে থাকেন এদেশের খানদানীরা। কাশ্মীরের বর্ণনা দিতে গিয়ে হিন্দী কবি গেয়েছেন,

> 'য়হী স্বর্গ সুরলোক
>
> য়হী সুরকানন সুন্দর।
>
> য়হাঁ অমরোকা ওক,
>
> য়হাঁ কঁহী বসত পুরন্দর॥'

এইটেই স্বর্গসুরলোক, এইখানেই কোথাও পুরন্দর বাস করেন।

শুনেছি, এরই আশেপাশে চার্চিল থাকেন, এপস্টাইন বাস করেন।

তবে ইনি খানদানী লোক। কাজকর্ম নেই। অবেলায় পার্কে রোদ মারতে বেরিয়েছেন।

ছিঃ! তখন দেখি তাঁর বাঁ দিকে একটা ক্রাচ—খোঁড়ারা যার উপর ভর করে হাঁটে। নিজের মনকে কষে কান মলে দিলুম—উত্তমরূপে পর্যবেক্ষণ না করে মীমাংসায় উপনীত হওয়ার জন্য।

বললেন, 'পেস্তালৎসি কিন্তু শেষ বয়সে আপন মত অনেকখানি পরিবর্তন করেছিলেন। বলতেন, বাচ্চাদের বড্ড বেশী যা-তা করতে দিতে নেই।'

আমি অবাক। আমি তো শুনেছি ইংরেজ অচেনার সঙ্গে কথা কয় না। ইনি আবার খানদানী।

ভদ্রলোক কিন্তু পাঁচসিকে সপ্রতিভ। কঞ্জুস যে রকম চুনের কৌটো থেকে খুঁটে খুঁটে শেষ রত্তি বের করে, ইনি ঠিক তেমনি দুটি নীল চোখ দিয়ে আমার চোখ দুটি খুঁটে খুঁটে শেষ চিন্তা বের করে নিচ্ছেন।

বললেন, 'সে আমি বেশ জানি, প্রাচ্যদেশীয়দের সঙ্গে বিনা পরিচয়েই কথা আরম্ভ করা যায়।' মুখে অল্প অল্প হাসি-খুশির ভাব।

আমি শুধালুম, 'আপনি কি অনেক প্রাচ্যদেশীয়দের চেনেন?'

বললেন, 'আদপেই না। আপনিই প্রথম।'

আমি বললুম, 'সে কী? এখন তো লণ্ডনে বিদেশীই বেশী বলে মনে হয়। আমি তো ভেবেছিলুম পাছে এদের ঠেলায় খাস লণ্ডনবাসীরা শহরছাড়া হয় তাই ম্যাক্‌মিলানকে প্রস্তাব করে পাঠাব কাঁটার তার দিয়ে দিয়ে লণ্ডনের আদিবাসীদের জন্য (আমি 'এবরোজিনালস্' শব্দটি প্রয়োগ করেছিলুম) আলাদা মহল্লা করে দেবার জন্য। সাইনবোর্ডে লেখা থাকবে, "প্রাণীদের খাবার দেওয়া বারণ। হুকুম অমান্য করলে এক পৌণ্ড জরিমানা।" কী বলেন!'

বললেন, 'খাঁটি কথা। আমাদের পাড়া তো যায়-যায়।'

ইচ্ছে যাচ্ছিল শুধাই কোন্ পাড়া। কিন্তু ইনি যখন প্রাচ্য কায়দায় বিনা পরিচয়ে আলাপ আরম্ভ করেছেন, তখন আমার উচিত প্রতীচ্য কায়দা অনুসরণ করা।

বললুম, 'কলকাতায় তো তাই হয়েছে! আমরা কলকাতার আদিবাসীদের কোণ-ঠাসা করে এনেছি।'

তিনি শুধালেন, '"আমরা" মানে কারা?'

এ তো তোফা ব্যবস্থা। উনি প্রাচ্য পদ্ধতিতে দিব্য প্রশ্নের পর প্রশ্ন শুধিয়ে যাচ্ছেন, আর আমি নেটিভ ছুরি-কাঁটা নিয়ে আনাড়ীর মত কিছুই মুখে তুলতে পারছি নে। ঠিকই তো। সেই কথামালার গল্প। বক তার লম্বা ঠোঁট চালিয়ে কুঁজো থেকে টপাটপ খাবার তুলে নিচ্ছে আর আমি খেঁকশেয়ালটার মত শুধু কুঁজোটার গা চাটছি। আর ব্যবস্থাটা করেছে বকই।

কিন্তু হলে কি হয়? ইংরেজের বাচ্চা। বেশীক্ষণ প্রশ্ন শুধোবে কী করে? অনভ্যাসের ফোঁটা নয়, অনভ্যাসের লাল লংকা। খাবে কতক্ষণ!

আমি বললুম, 'আমি শিক্ষাবিদ্ নই, তবু জানতে ইচ্ছা করে এ দেশের শিক্ষিত পরিবারে বাচ্চারা কতটুকু যাচ্ছেতাই করার সুযোগ পেয়েছে!'

এবারে ইংরেজের ইংরিজীপনা আরম্ভ হল। অনেকগুলো সব্‌জন্‌ক্‌টিভ মুড ব্যবহার করতে পেরে ভদ্রলোক যেন বেঁচে গেলেন। ঐ মুডটাই ইংরিজীতে সবচেয়ে বেশী ব্যবহার করা হয়, কারণ এতে প্রকাশ পায় অনিশ্চয়তা। 'শুড' 'উডে'র ছড়াছড়ি—'আই শুড সে', 'ইট উড্ অ্যাপিয়ার', 'ওয়ান মাইট থিন্‌ক্' থাকলেই বুঝতে হবে ইংরেজ পাকাপাকি কিছু বলতে

চায় না, কিংবা ভদ্রতা প্রকাশ করতে চায়—ফাউলার যা বলুন, বলুন। আমরা এ-জিনিসটেই প্রকাশ করি অতীতকাল দিয়ে। শ্বশুরমশাই যখন জিজ্ঞেস করেন, 'তা হলে বাবাজী আসছ কবে ?' আমরা ঘাড় নীচু করে বলি, 'আজ্ঞে আমি তো ভেবেছিলুম ভাদ্র মাসে এলেই ভাল হয়।' আসলে কিন্তু বলতে চাই, 'আমি ভাবছি…।' তা বলি নে ; অতীতে ফেললে বিনয় প্রকাশ হয়, অনিশ্চয়তাও বোঝানো হয়, অর্থাৎ শ্বশুরমশাই ইচ্ছে করলেই আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা নাকচ করে দিতে পারেন।

ইংরেজ বললেন, 'অন্য লোকে যে আমাদের "দ্বীপবাসী" বলে সেটা কিছু মিথ্যে নয় ! ঐ পেস্তালৎসি, ফ্রোবেলের কথা বলছিলেন না ? এদের তত্ত্বকথা সর্বজনমান্য হয়ে গেলেও আমরা সেগুলো গ্রহণ করি সক্কলের পরে। চ্যানেলের ওপার থেকে যা-কিছু আসে তাই যেন আমরা একটু সন্দেহের চোখে দেখি। আর গ্রহণ করলেও সমাজের সব শ্রেণী একই সময়ে নেয় না। আমাদের বাড়িতে—কিছু মনে করবেন না, একটু ব্যক্তিগত হয়ে যাচ্ছে—'

আমি বললুম, 'প্রাচ্য পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত হওয়াটাই রেওয়াজ।'

'ধন্যবাদ। আমাদের বাড়িতে এখনও প্রাচীন পন্থা চালু। দুনিয়ার আর সর্বত্র সেণ্ট্রাল হীটিঙ কিংবা ইলেকট্রিক দিয়ে ঘর গরম করা হয়, আমাদের বাড়িতে এখনও "লগ্ ফাইয়ার"—কাঠের আগুন। ওঃ ! একটা ঘটনা মনে পড়ল। আপনি জাওয়ারব্রুখ্ ডাক্তারের কথা শুনেছেন ?'

যদিও লোকটি অতিশয় ভদ্র, মাত্রাধিক ভদ্র বললেও ভুল বলা হবে না, তবু একটু বিরক্ত হলুম। এই ইংরেজরা কি আমাদের এতই অগা মনে করে ? বললুম, 'সেই যিনি সর্বপ্রথম ফুসফুসের অপারেশন আরম্ভ করেন ?'

ইংরেজের তারিফ করতে হয়—মানুষের গলা থেকে মনের ভাব চট করে বুঝে নেয়। ভদ্রলোক বার বার মাফ চাইতে আরম্ভ করলেন। আমিও একটু লজ্জা পেলুম।

বললেন, 'হাজারটা ইংরেজের একটা ইংরেজও ওঁর নাম জানে না। তাই আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম।'

আমিও ভদ্রতা করে বললুম, 'আমিও জানতুম না—যদি না এক জর্মন ডাক্তারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা না হত। তারপর কী বলছিলেন, বলুন ?'

'১৯২৮-এ যখন পঞ্চম জর্জের শক্ত ব্যামো হয়, তখন তাঁর কাছে ইংরেজ ডাক্তাররা পাঠালে রাজার এক্স-রে ছবি। ওঁর মতামত জানতে চাইলে—বুকে অপারেশন করা হবে, না শুধু ফুটো করলেই হবে, না ড্রেন করতে হবে, না কি ? এবং এ-কথাও জাওয়ারব্রুখ বুঝে গেলেন যে, আর যা হয় হোক, কোনও বিদেশী সার্জনকে দিয়ে রাজার অপারেশন করা চলবে না। ইংরেজ ডাক্তার-গোষ্ঠী তা হলে আপন দেশে মুখ দেখাতে পারবে না।'

আমি বললুম, 'আশ্চর্য ! আমাদের গাঁধীকে তো ইংরেজ ডাক্তারই অপারেশন করেছিল।'

একটু চুপ থেকে বললেন, 'গল্পটা এখানেই শেষ নয়। কয়েকদিন পর

ডাচেস অব কনোট না কেণ্ট, কার জানি শক্ত ব্যামো হয়েছে। জাওয়াররুখকে প্লেনে করে—এখন তো প্লেন ডাল-ভাত—লণ্ডন আনানো হল। অর্থাৎ ডাচেসের বেলা জর্মন ডাক্তার চললে চলতেও পারে, রাজার বেলা নয়।'

আমি বললুম, 'বা রে!'

বললেন, 'এখানেও শেষ নয়। জাওয়াররুখ তো রুগীর ঘরে ঢুকে রেগে কাঁই। এ রুগী তো ভয়ে কাঁপছে না, কাঁপছে শীতে। রুগীর লেপ তো লেপ নয়, ভিজে কাঁথা। বললেন, এ-ঘরে রুগীর চিকিৎসা চলবে না। বেশ চড়া গলাইতেই নাকি বলেছিলেন, মানুষ থাকার উপযোগী এবং ভদ্র (রিজনেব্‌ল) ঘরে ওঁকে নাকি নিয়ে যেতে হবে। একে জর্মন, তায় ডাক্তার—চড়া গলাতে বলবেই তো। তখন আরম্ভ হল তুলকালাম কাণ্ড। বহু হট্টগোলের পর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল অন্য ঘরে—সেখানে একটি ইলেকট্রিক হীটার কোনও গতিকে লাগানো হল।

'ডাক্তার কী বললেন জানেন? বললেন, "কিছু হয় নি; কালই সেরে যাবেন।" এবং সেরে গেলেনও।'

আমি বললুম, 'আশ্চর্য!

তিনি বললেন, 'এও শেষ নয়। পরদিন ড্যুক দিলেন ডাক্তারকে বিরাট ভোজ। তাঁর পরিচিত লাট-বেলাট সবাইকে নেমন্তন্ন করা হল। স্বয়ং ডাচেস সেরে উঠে ব্যানকুয়েটে বসলেন। চার্চিলও ছিলেন। তারপর কী কাণ্ড হল জানেন?'

'ভোজ খেয়ে হোটেলে ফিরে এসে জাওয়াররুখ দেখেন সেখানে আরেক কাণ্ড। চেনা আধা-চেনা যে তাকে দেখে সেই মাথা নিচু করে বাও করে! ওয়েটার, ম্যানেজার সবাই তাঁর পিছনে পিছনে ছুটছে! "হুজুরের কোনও অসুবিধা হচ্ছে না তো, হুজুরের কী চাই?" ডাক্তার তো অবাক! ডাচেসের জন্য গরম ঘরের ব্যবস্থা করেই এতখানি?

'আসলে তা নয়। শোবার ঘরে গিয়ে ডাক্তার দেখেন, তাঁর টেবিলের উপর সন্ধ্যেবেলাকার কাগজ। তাতে মোটা মোটা হরফে লেখা: "জর্মনির ডাক্তার জাওয়াররুখ রাজাকে আজ সন্ধ্যায় অপারেশন করলেন।" খবরের কাগজ সব কিছু জানে কি না! জাওয়াররুখ্ লণ্ডনে, ঐ সময়ে, টায়টায়।'

আমি আবার বললুম, 'আশ্চর্য! জাওয়াররুখ প্রতিবাদ করলেন না?'

তিনি বললেন, 'পরের দিন ভোরেই তাঁকে প্লেনে তুলে দেওয়া হল—এ্যারপোর্টে ড্যুক ডাচেস সবাই উপস্থিত। হৈহৈ-রৈরৈ। দেশে গিয়ে দেখেন, ইতিমধ্যে মার্কিন কাগজগুলো বলতে আরম্ভ করেছে, জাওয়াররুখ্ অস্তর করার জন্য এক মিলিয়ন পৌণ্ড পেয়েছেন! জর্মন কাগজরা আত্মম্ভরিতায় ফেটে যাবার উপক্রম। জাওয়াররুখ্ এঁকে ওঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কী করা উচিত? সবাই বলে এই ডামাডোলের বাজারে কেউ তোমার প্রতিবাদ (দেমাঁতি) শুনবে না চেপে যাও।'

'তারপর?'

ঠিক সেই সময়ে এক তাগড়া লম্বাচোড়া নার্স এসে উপস্থিত, তাঁকে তুলে ধরল। তিনি ক্রাচ তুলে নিয়ে এক দিকে ধরলেন, অন্য দিকে ভর করলেন নার্স। সঙ্গে সঙ্গে শুনলুম বারোটার ঘণ্টা। বললেন, 'ও রেভোয়া'—অর্থাৎ 'আবার দেখা হবে'। গুড্ বাই নয়। তার অর্থ অন্য।

কিন্তু আমার মনে প্রশ্ন জাগল, জাওয়ারবুখ্ কি জানতেন তাঁকে ডাচেসের বাড়িতে আনা হয়েছিল তাঁর অসুখের ভান করে! ঐ সময় তিনি যেন লণ্ডনের হাতের কাছে থাকেন। অপারেশনে যদি গণ্ডোগোল হয়, তাঁকে তখ্খুনি ডেকে পাঠাবার জন্য।

যাগ্ গে। কালই তো জর্মনি যাচ্ছি। আমার বন্ধু পাউলকে শুধাব। সে গুণী, সব জানে।

বহু চেষ্টা করেও লণ্ডনের সঙ্গে দোস্তী জমাতে পারলুম না। পূর্বেও পারি নি। কারণ অনুসন্ধান করে আশ্চর্য বোধ হয়েছে, যে শহরকে দশ-এগারো বছর বয়স থেকে ইংরিজী ভাষা ও সাহিত্যের মারফতে চিনতে শিখেছি তার সঙ্গে হৃদ্যতা হয় না কেন? বোধ হয় ইংরেজ এদেশে রাজত্ব করেছে বলে। বোধ হয় বহুকাল ইংরেজের গোলামী করেছি বলে তার প্রতি রাগটা যেন যেতে চায় না। তার সদ্গুণ দেখলে রাগটা আরো যেন বেড়ে যায়। তখন মনে হয়, এর সঙ্গে দোস্তীটা জমাতে পারলে জীবনটা আরো মধুময় হতে পারতো।

কিন্তু আমি তো এ ফরিয়াদে একা নই। ফরাসীরা তো ইংরেজকে সোজা-সুজি অনেক কথা বলে। মাদাম টাবউই বই লিখেছিলেন—'পারফিডিয়াস এলবিয়ন অর আঁতাৎ কর্দিয়াল।' জর্মন, হাঙ্গেরিয়ান এবং অন্যান্য জাত অত কড়া ভাবে কথাটা বলে নি বটে, কিন্তু ইংরেজের প্রকৃতি যে আর পাঁচটা জাতের মত নয় সেকথা সবাই স্বীকার করে নেয়। কেউ ব্যঙ্গ করেছে, কেউ সহিষ্ণুতার সদয় হাসি হেসেছে। এ শুধু টুরিস্টদের সাধারণ অভিজ্ঞতা নয়, হাইনে, ভল-তেয়ার, জোলার মত বিচক্ষণ মহাজনরা যা বলে গেছেন সে তো কিছু ঝেড়ে ফেলে দেবার মত নয়।

কিন্তু একটি কথা সবাই স্বীকার করেছেন। সেকস্পীয়রের মত কবি হয় না, ইস্কিলাস, দান্তে, গ্যোটে এদের কারো চেয়ে ইনি কম নন। আর এঁর মহত্ত্ব এমনই বিরাট যে, তাঁকে নকল পর্যন্ত করার সাহস কারো হয় না।

কিন্তু এ তত্ত্ব নিয়ে অত্যধিক বাক্যব্যয় আমি করতে যাবো কেন?

আমাকে যে জিনিস সব চেয়ে মুগ্ধ করেছে সেইটে বলে প্লেনে উঠি।

ব্রিটিশ মিউজিয়মের পাঠাগার। অনেক দেশে বিস্তর পুস্তকাগারে ঢুকেছি। থানাতেও দু'একবার গিয়েছি। দুটোতে কোনো পার্থক্য লক্ষ্য করতে পারি নি। আমি যেন চোর। বই সরাবার মতলব ভিন্ন আমার অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে এটা কেউই যেন বিশ্বাস করতে চায় না। কার্ড দেখানো থেকে আরম্ভ করে বই ফেরত দিয়ে বেরোবার পরও মনে হয় পিঠের উপর ওদের চোখ-

গুলো যেন সার্জেনের তুরপুনের মত কুরে কুরে ঢুকছে।

এর জন্য কে দায়ী বলা কঠিন। কিন্তু যেই হোক্, কিংবা যাঁরাই হোন্, এ বিষয়ে তো কোনো সন্দেহ নেই যে, চোর-পুলিসের বাতাবরণে আর যা হয় হোক, জ্ঞানসঞ্চয় বিদ্যার্জন হয় না। তবে এর ব্যত্যয় আছে। এবং আমার বিশ্বাস, আমরা উন্নতির দিকেই চলেছি।

ব্রিটিশ মিউজিয়মে কাউকে যে সন্দেহের চোখে দেখা হয় না তার প্রধান কারণ প্রায় সবাই বয়স্ক, অনেকেই পণ্ডিতরূপে বিশ্ববরেণ্য। এখানে কাজ করতে হলে সহজে অনুমতি পাওয়া যায় না। ব্রিটিশ মিউজিয়মের কর্তারা যে 'ডগ অ্যাণ্ড দি ম্যানেজার', অর্থাৎ আমি খাবো না, তোকেও খেতে দেব না নীতি অবলম্বন করেন তা নয়। তাঁদের বক্তব্য, সাধারণ রিসার্চ, যেমন মনে করুন, ডক্টরেটের কাজ করার জন্য লণ্ডনে আরো বিস্তর লাইব্রেরী রয়েছে। সেখানে ভিড় কম, ও রিসার্চ একটি বিশেষ বিষয়বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ বলে আপনি আপনার বই পেয়ে যাবেন তাড়াতাড়ি। যেমন মনে করুন, আপনি সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতেই আপনি আপনার প্রয়োজনীয় বই পেয়ে যাবেন। কিন্তু যেখানে গবেষণা একাধিক বিষয়বস্তু ছাড়িয়ে যায় সেখানে স্পেশালাইজড লাইব্রেরী কুলিয়ে উঠতে পারে না—তখন ব্রিটিশ মিউজিয়ম আপনাকে স্বাগতম জানায়।

এবং সব চেয়ে বড় কথা—পৃথিবীর সর্ব জায়গা থেকে এত সব নামকরা পণ্ডিত এখানে আসেন যে, মিউজিয়ম তাঁদের নিরাশ করে অপেক্ষাকৃত, কিংবা সম্পূর্ণ অজানা গবেষককে স্থান দিতে চায় না—কারণ পাঠাগারের সাইজ দশ ডবল করে দিলেও সে তার মোহাকৃষ্ট গবেষকদের স্থানকুলান করতে পারবে না।

মিউজিয়মের চায়ের স্টলে একটি পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপ হয়।

তিনি বললেন, 'রীডিং রুমে ঢুকেই একটি নিগ্রো ভদ্রলোককে লক্ষ্য করেছেন কি? আবলুশের মত রঙ আর বরফের মত সাদা চুল? নাগাড়ে বিশ বছর ধরে ঐ আসনে বসে কাজ করে যাচ্ছেন।'

আমি বললুম, 'আপনি ক' বছর ধরে?'

তিনি যেন একটু লজ্জা পেয়ে বললেন, 'সামান্য। পনেরো হবে। আমার চেয়ে যাঁরা ঢের প্রবীণ তাঁদের কাছে শোনা।'

আমি শুধালুম, 'ইনি কি কাজ করছেন?'

'হাবশী মুল্লুকে খৃষ্টধর্মের অভ্যুদয় কিংবা ওরই কাছাকাছি কিছু একটা। হীব্রু, আরাহময়িক, আহমরিক, সিরিয়াক এসব তাবৎ ভাষায় লেখা বই ঘাঁটতে হলে এখানে না এসে তো উপায় নেই।

আমি সামান্য যে ক'দিন কাজ করেছিলুম সে ক'দিন নিগ্রো ভদ্রলোকের নিষ্ঠা দেখে স্তম্ভিত হয়েছি। ন'টার সময় কাঁটায় কাঁটায় তাঁকে আসন নিতে দেখেছি, এবং উঠতেন ছ'টার সময়। এর ভিতরে আসন ছেড়ে কোথাও গিয়ে থাকলে আমার অজানতে। আর দেড়টা থেকে দুটো অবধি চেয়ারের হেলানে মাথা দিয়ে একটুখানি ঘুমিয়ে নিতেন।

লিখতেন অল্পই। পড়তেন বেশী। চিন্তা করতেন তারো বেশী। দু'একবার চোখাচুখি হয়েছে। তিনি যেন আমাকে দেখতেই পান নি। চোখ দুটি কোন্ অসীম ভাবনার গভীর অতলে ডুবে আছে আমি জানবো কি করে? কিংবা তিনি হয়তো ছবি দেখছেন, সেই আদিম আবিসিনিয়ান সমাজের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন খৃষ্টের দূত, শান্তির বাণী বহন করে। তখন তাঁদের সভ্যতা সংস্কৃতি কোন্ স্তরে ছিল, খৃষ্টের বাণী তাঁরা কি ভাবে গ্রহণ করেছিলেন—তারই ছবি দেখছেন। যেখানে ছবি অসম্পূর্ণ কিংবা ঝাপসা সেটাকে সম্পূর্ণ সর্বাঙ্গসুন্দর করার জন্য এই সাধনা।

তাঁর বই লেখা শেষ হয়েছিল কি না, প্রকাশিত হলে ক'জন লোক সেটি পড়েছিল, বোঝবার মত শক্তি ক' জন পাঠকের ছিল তাও জানি নে। কারণ এরকম নিষ্ঠাবান সাধক পাঠাগারের অনেকেই।

এস্থলে পাঠক হয়তো ভাবছেন, আমি সেখানে ঠাঁই পেলুম কি করে? কারণ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন, আমি পণ্ডিত নই।

জর্মনিতে পড়াশোনা করার সময় আমার কয়েকখানা বইয়ের প্রয়োজন হয়। সেদেশে সেগুলো পাওয়া যাচ্ছিল না বলে অধ্যাপক বললেন, 'ব্রিটিশ মিউজিয়মে যাও; সেই সুযোগে লণ্ডনও দেখা হয়ে যাবে।'

তিনি নিজে প্রায়ই লণ্ডনে এসে কাজ করে যেতেন। মিউজিয়মের কর্তারা ভালো করেই জানতেন, পণ্ডিতসমাজে তাঁর স্থান কতখানি উঁচুতে। তিনি যখন পরিচয়পত্র দিয়ে পাঠালেন তখন এঁরা আর কোনো প্রশ্ন শুধালেন না।

কিন্তু বার বার লজ্জা অনুভব করেছি।

প্রথম মুশকিল আসন নিয়ে। কোনো আসনে কেউ বসছেন বিশ বছর ধরে, কেউ ত্রিশ বছর ধরে। ঠিক সেদিনটাই হয়তো তিনি তখনো আসেন নি। আপনি না জেনে বসে গেলেন তাঁরই আসনে—কারণ কোনো চেয়ার কারো জন্য রিজার্ভ করা হয় না। তিনি খানিকক্ষণ পরে এসে আপনাকে ঐ চেয়ারে দেখে চলে গেলেন কিছু না বলে। অন্য জায়গায় বসে তিনি ঠিক আরাম পেলেন না। আপনি কিন্তু জানতেই পেলেন না।

পরের দিন গিয়ে দেখলেন, অন্য কে একজন—তিনিই হবেন—ঐ আসনে বসে আছেন। আপনি নূতন আসনের সন্ধানে বেরোলেন।

এসব বুঝতে বুঝতে কেটে যায় বেশ কয়েকদিন। যখন বুঝলুম, তখন শরণাপন্ন হলুম এক কর্মচারীর। তিনি অনেক ঘাড় চুলকে আমাকে একটি আসন দেখিয়ে ববলেন, 'এ চেয়ারটায় এক ভদ্রলোক বসছেন দশ বৎসর ধরে।'

আমি বললুম, 'থাক্ থাক্।'

তিনি বললেন, 'তবে মাসখানেক ধরে তিনি আসছেন না।'

আমি বললুম, 'তা হলে উপস্থিত এখানেই বসি। কিন্তু তিনি এলে আমায় বলে দেবেন কি?'

বিরাট গোল ঘর। মাঝখানে চক্রাকারে সাজানো ক্যাটলগ। আর একেবারে কেন্দ্র বসে কয়েকজন কর্মচারী। এঁদের সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন বড়

একটা হয় না। বই আসে যায় কলের মত।

কেন্দ্র থেকে সারি সারি হয়ে দেয়াল অবধি বেরিয়েছে পাঠকদের আসন-পঙ্‌ক্তি। উপরের কাঁচ দিয়ে যে আলো আসছে সেটুকু যথেষ্ট নয় বলে টেবিলে টেবিলে ল্যাম্প। পাঠকদের অনেকেই পরেছেন কপালের উপরে রবারে বাঁধা 'শেড্'—টেনিস খেলোয়াড়দের মত। সামান্য পাতা উল্টোনোর শব্দ, পাশের ভদ্রলোকের কলমের অতি অল্প খসখস। আর কোনো শব্দ কোনো দিক দিয়ে আসছে না। অখণ্ড মনোযোগের পরিপূর্ণ অবকাশ।

এ-জায়গা মানুষকে কাজ করতে শেখায়। আপনি হয়তো এলেন ন'টা পনেরো মিনিটে। এসে দেখেন আপনার পাশের ভদ্রলোক যেভাবে কাজ করছেন তার থেকে মনে হয়, তিনি অনেকখানি এগিয়ে গেছেন। তারপর দশটা এগারোটা বারোটা একটা অবধি তিনি আর ঘাড় তোলেন না। আপনার ক্ষিদে পেয়ে গিয়েছে। তাঁর পায় নি। আপনারও রোখ চেপে গেল। উনি না উঠলে আপনিও উঠবেন না। ইতোমধ্যে বাইরে গিয়ে বার বার সিগরেট খাবার ইচ্ছে হয়েছে—সেটাও চেপে গিয়েছেন। দুটোর সময় উনি উঠলেন। আপনি যখন সাততাড়াতাড়িতে চা-রুটি খেয়ে ফিরলেন, তিনি তখন ঘাড় গুঁজে ফের কাজে ডুব মেরেছেন। বোঝা গেল, বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনি সঙ্গে-আনা দুখানা স্যাণ্ডউইচ খেয়েই কাজ সেরেছেন। তারপর তিনি উঠলেন পাঠাগার বন্ধ হওয়ার সময়।

এরকম যদি একটা লোক পাশে বসে কাজ করে তবে কার না মাথায় খুন চাপে! কিছুদিনের ভিতর দেখতে পাবেন, আপনিও দিব্য ন'টা ছ'টা করে যাচ্ছেন। কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, কোনো ক্লান্তি আসছে না।

একেবারে কেন্দ্রে বসতেন একটি অতিশয় ছোটখাটো বৃদ্ধ। পরনে মর্নিং সুট। লম্বা দাড়ি। আবার মাথায় টপ হ্যাট। ঘরের ভিতরে ইংরাজ হ্যাট পরে না। এঁকে কিন্তু কখনো হ্যাটটি নামাতে দেখি নি। বোধ হয় হ্যাটের সামনের দিকটা দিয়ে তিনি শেডের কাজ চালিয়ে নিতেন।

সিন্ধী গুজরাতীতে মেশানো কয়েকখানি ধর্মগ্রন্থের সন্ধান না পেয়ে তাঁর কাছে গেলুম। তিন মিনিটের ভিতর তিনি ক্যাটলগের ঠিক জায়গা বের করে দিলেন, এবং এটাও বললেন, 'বোধ হয় ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে এ সম্বন্ধে আরো বই আছে।'

পরে এক ভারতীয়ের মুখে শুনলুম, হেন বই লাইব্রেরীতে নেই যার হদিস তাঁর অজানা। মিউজিয়ামের চায়ের ঘরে কথা হচ্ছিল। লাইব্রেরীতে দেশ-বিদেশের পাকা গাহক কয়েকজন ঘাড় নাড়িয়ে সায় দিলেন।

এই অশান্ত অজস্র পরিশ্রম আর নিষ্ঠার শেষ কোথায়, ফল কি? এঁদের সকলের বই কি জনসমাজে সম্মান পায়? বহু পরিশ্রমের পর যখন বই সম্মান পায় না তখন লেখকের মনে কি চিন্তার উদয় হয়? তিনি কি আবার নূতন করে কাজ আরম্ভ করেন, না ভগ্নহৃদয়ে শয্যাগ্রহণ করেন?

এর উত্তর দেবে কে?

শুধু এইটুকু জানি, মিউজিয়ম এ নিয়ে মাথা ঘামাক আর নাই ঘামাক সে সাদরে বংশপরম্পরাকে জ্ঞানের সন্ধানে সাহায্য করছে, আর পাঠাগারের কেন্দ্রটি বিশ্বের সর্বজ্ঞানের কেন্দ্র না হোক, অন্যতম কেন্দ্র।

ইংরেজকে এখানে নমস্কার।

বিশ্বজনের কাছে ভারতবর্ষ অপরিচিত দেশ নয়। প্রাচীন যুগে সে অপরিচিত ছিল না, এ যুগেও নয়। মাঝখানে কিছুদিনের জন্য অল্পসংখ্যক স্বার্থান্বেষী সাম্রাজ্যবাদী ভারতবর্ষের সম্বন্ধে প্রচার করেন যে, যদিও এ দেশ একদা সভ্যতা-সংস্কৃতির সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছিল আজ তার সর্বস্ব লোপ পেয়েছে এবং বৈদেশিক শাসন ভিন্ন এর পুনর্জীবন লাভের অন্য কোনও পন্থা নেই। এ-কুৎসা প্রচারের ফলে প্রাচ্য-প্রতীচ্য উভয় মহাদেশেই বিস্তর কুফল ফলেছিল, এখনও কিছু কিছু ফলছে। এর জন্য সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেই স্বল্পসংখ্যক সাম্রাজ্যবাদীদের দেশই। কিন্তু এ-স্থলে স্মরণ রাখা কর্তব্য সে-দেশের মনীষীগণও তাই নিয়ে প্রচুর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

মাত্র একটি দেশ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কখনও তার ভক্তিশ্রদ্ধা হারায় নি। সে-দেশ জর্মনি।' এদেশের গুণীজ্ঞানীরা সে তত্ত্ব অবগত আছেন। আমাদের কবি মধুসূদন একশ' বছর পূর্বে লণ্ডনে থাকাকালীন জর্মনপণ্ডিত গল্টস্ট্যুকারের সঙ্গে দেখা করতে যান; এমন কি যে স্বল্প-সংখ্যক জর্মনপণ্ডিতের মতবাদ আমাদের সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র ভ্রমাত্মক বলে মনে করেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে তিনি আপন যুক্তিতর্ক উত্থাপন করেছেন। পরবর্তী যুগে আমাদের শিক্ষাচার্য রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় শাস্ত্র গবেষণার জন্য জর্মনপণ্ডিত উইন্‌টারনিৎসকে নিমন্ত্রণ করে বিশ্বভারতীতে নিয়ে আসেন; তখনই অপরিচিতা শ্রীমতী ক্রামরিশ তাঁরই সৌজন্যে বিশ্বভারতীতে ভারতীয় কলাচর্চার সুযোগ পান।

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এদেশের জনসাধারণ জর্মনির খবর পেল দুই অশুভ যোগাযোগের ফলে। দুই বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে ভারতবাসী জর্মনি সম্বন্ধে নানা অতিরঞ্জিত কাহিনী শুনে ঈষৎ পথভ্রান্ত হয়েছে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। এদেশের পণ্ডিতসমাজেও জর্মন ভাষা সুপ্রচলিত নয় বলে ভারতবর্ষীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা জর্মনিতে কি ভাবে হয়, তার কতখানি উন্নতি হয়েছে, সে বিষয় বাঙলায় অনূদিত হওয়ার সুযোগ পায় নি। যে-সব বাঙালী বিপ্লবী জর্মনিতে আশ্রয় পেয়েছিলেন তাঁদের অভিজ্ঞতাও সুস্পষ্ট কারণবশত এদেশে প্রসারলাভ করতে পারে নি।

ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান কলা-দর্শন সভ্যতা-সংস্কৃতি চর্চার জন্য ইয়োরোপে যে শব্দটি প্রচলিত তার নাম ইণ্ডলজি—জর্মন উচ্চারণ ইণ্ডলগী। শব্দটি অর্বাচীন ও গ্রীক-গোত্রীয় (অবশ্য এর প্রথমাংশ 'ইন্দস' শব্দটি মূলে ভারতীয়) এবং জর্মনির শিক্ষিতজন মাত্রই এটির বহুল প্রয়োগ করে থাকেন; ইংলণ্ডের পণ্ডিতসমাজে এটি কখনও কখনও ব্যবহৃত হয়—এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায়

শব্দটি নেই, জর্মন সাইক্লোপিডিয়ায় নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ আছে।

জর্মনিতে ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞান ইত্যাদির চর্চা অর্থাৎ ইন্ডলজি কতখানি প্রচার এবং প্রসার লাভ করেছে সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা বাঙলাতে আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। ভ্রমণকাহিনী তার জন্য প্রশস্ত স্থান নয়, কিন্তু এ সম্বন্ধে যৎ-কিঞ্চিৎ জ্ঞান না থাকলে জর্মন দেশ-বৃত্তান্তের একটা বিরাট মহৎ দিক অবহেলিত হয়, এবং দ্বিতীয়ত আমার ছাত্রজীবনের প্রায় চার বৎসর সেখানে কাটিয়েছি বলে একাধিক জর্মন-সংস্কৃতজ্ঞের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য আমার হয় এবং ভ্রমণ কাহিনীতে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ইচ্ছা-অনিচ্ছায় প্রকাশিত হবে বলেই এ-সব পণ্ডিত এবং তাঁদের সাধনা সম্বন্ধে এই সুযোগে যা না বললে নিতান্তই চলে না সেইটুকু বলে রাখি। আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছি, ভবিষ্যতে আমি এ প্রলোভন সম্বরণ করব।

ইন্ডলজি আরম্ভ করেন ইংরেজরাই—অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে। জোন্স্, কোলব্রুক্, উইল্‌সন্-এর প্রতিষ্ঠাতা। এর পরই ফ্রান্সে সিলভেসৎর দ্য সাসি এ চর্চা আরম্ভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে জর্মনিতে সেটা ব্যাপকতর ভাবে আরম্ভ হয়। জর্মনপণ্ডিত শ্লেগেলই সর্বপ্রথম এ চর্চার ব্যাপকতা এবং কী ভাবে এতে অগ্রসর হতে হবে তার কর্মসূচী তাঁর পুস্তক 'য়ুবার ডি স্প্রাখে উন্ট ভাইজ্‌হাইট্‌ডের ইন্ডার-' ('ভারতীয় ভাষা ও মনীষা') ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। এর কয়েক বৎসর পরেই জর্মনপণ্ডিত বপ্ সংস্কৃত ধাতুরূপের সঙ্গে গ্রীক, লাতিন এবং প্রাচীন জর্মন ধাতুর তুলনা করে সপ্রমাণ করেন যে, ভবিষ্যতে আর্যগোষ্ঠীর যে-কোন ভাষার মূলে পেঁছিতে হলে সংস্কৃত ভাষা অপরিহার্য। বস্তুত তিনিই প্রথম তুলনাত্মক ভাষাতত্ত্বের কেন্দ্রভূমিতে যে সংস্কৃতকে স্থাপনা করলেন এখনও সে সেখানেই আছে। তারই দু' বৎসর পরে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে জর্মনির বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি হয় এবং ঐ কর্মে নিয়োজিত হন পূর্বোল্লিখিত ফ্রীড্‌রিষ শ্লেগেলের ভ্রাতা ভিল্‌হেল্‌ম্ শ্লেগেল। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে বপ্ বার্লিনে নিযুক্ত হলেন।

ভারতবর্ষে তখন সংস্কৃত চর্চার কী দুর্দিন!

শ্লেগেল ভ্রাতৃদ্বয়, বপ্ যে শুধু ভারতীয় ব্যাকরণ নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন তাই নয়, তাঁরা তখন সংস্কৃত সাহিত্যের রসের দিক অনুবাদের মাধ্যমে জর্মনিতে পরিবেষণ করতে আরম্ভ করেছেন। ফলে তার প্রভাব গিয়ে পড়ল জর্মন সাহিত্যে। কবিগুরু গ্যোটে শকুন্তলার অনুবাদ পড়ে মুগ্ধ। তিনি তখন যা বলেছিলেন তাই নিয়ে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখলেন প্রায় একশ' বছর পরে। তিনি লিখলেন ঃ

'য়ুরোপের কবিগুরু গ্যোটে একটিমাত্র শ্লোকে শকুন্তলার সমালোচনা লিখিয়াছেন, তিনি কাব্যকে খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন করেন নাই। তাঁহার শ্লোকটি একটি দীপবর্তিকার শিখার ন্যায় ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহা দীপশিখার মতোই সমগ্র শকুন্তলাকে এক মুহূর্তে উদ্ভাসিত করিয়া দেখাইবার উপায়।' তিনি এক কথায় বলিয়াছিলেন, 'কেহ যদি তরুণ বৎসরের ফুল, কেহ যদি মর্ত্য ও স্বর্গ একত্র

দেখিতে চায়, তবে শকুন্তলায় তাহা পাইবে।'

এবং প্রবন্ধ শেষ করতে গিয়ে লিখলেন:

'গ্যোটের সমালোচনার অনুসরণ করিয়া পুনর্বার বলি, শকুন্তলায় আরম্ভের তরুণ সৌন্দর্য মঙ্গলময় পরম পরিণতিতে সফলতা লাভ করিয়া মর্ত্যকে স্বর্গের সহিত সম্মিলিত করিয়া দিয়াছে।'

গ্যোটের মত কবি যখন সংস্কৃত নাটক পড়ে উচ্ছ্বসিত তখন অন্যান্য কবিরা যে উৎসাহিত হবেন সেটা সহজেই অনুমান করা যায়। গীতিকাব্যের রাজা হাইনে তখন দুঃখ-বেদনায় কাতর বলেই স্বপ্ন দেখতে লাগতেন সেই আনন্দ-নিকেতন, সেই স্বপ্নের ভুবন ভারতবর্ষ—শেলি কীট্‌স বায়রন যে অবস্থায় স্বপ্ন দেখতেন গ্রীসের।

'গঙ্গার পার—মধুর গন্ধ ত্রিভুবন আলো ভরা—
কত না বিরাট বনস্পতিরে ধরে
পুরুষ রমণী সুন্দর আর শান্ত প্রকৃতিধরা
নতজানু হয়ে শতদলে পূজা করে।'

আম্ গাঙেস্ ডুফটেট্‌স লয়েস্টট্‌স
উন্‌ট্ রীজেন্‌বয়মে ব্ল্যুয়েন,
উন্‌ট্ শ্যোনে স্টিলে মেনশেন্
ফর্ লটসব্লুমেন ক্নীয়েন।

গঙ্গানদীতে আমি পদ্মফুল ফুটতে দেখি নি। কিন্তু এ তো স্বপ্নরাজ্য। এর কিছুটা সত্য কিছুটা কল্পনা। তাই পূব-বাঙলার কবিও মধ্য আরবের মরু-ভূমির ভিতর দিয়ে তার নায়িকা লায়লাকে যখন মজনুর কাছে নিয়ে যাচ্ছেন তখন তিনি যাচ্ছেন নৌকোয় চড়ে! এবং শুধু কি তাই? তিনি বিলের জল থেকে—সেই আরব দেশে—কুমুদকহ্লার তুলে তুলে খোঁপায় গুঁজছেন!

হাইনে জাত-ধর্মে ইহুদী। তাঁর ধমনীতে আর্যরক্ত নেই। কিন্তু আর্য-জর্মনিতে তখন ভারতীয় আর্যের প্রতি যে সমবেদনা, গৌরবানুভূতির প্লাবন আরম্ভ হয়েছে তাতে তিনিও নিজেকে ভাসিয়ে দিলেন। তাঁর বহু কবিতায় কখনও প্রচ্ছন্ন কভু বা প্রকাশ্যে ভারতের প্রতি আকুল ব্যাকুল হৃদয়াবেগ (জর্মন ভাষায় এই 'হৃদয়াবেগে'র নাম 'শুয়েমে'রাই'।)

ঐ সময়ে ভারতের প্রতি জর্মনির কতখানি শুয়েমে'রাই (ইংরিজীতেও এর প্রতিশব্দ নেই—'ফেনাটিক এনথুসিয়েজম'-এর অনেকটা কাছাকাছি) তার আরেকটি উদাহরণ দিই।

ভারতবর্ষে যখন কেউ জর্মন ভাষা শিখতে আরম্ভ করে তখন সাধারণত তাকে যে প্রথম ক্ষুদ্র উপন্যাস পড়তে দেওয়া হয় তার নাম 'ইমেন্‌জে'। আমিও এই বই পূর্বোল্লিখিতা শ্রীযুক্তা ক্রামরিষের কাছে পড়ি। তাতে জর্মন বাচ্চা-দের খেলাধুলোর একটি বর্ণনা আছে। তারা সবাই মিলে একটা ঠেলাগাড়ি তৈরি করে তার উপর কেউ বা চাপছে, কেউ বা দিচ্ছে ঠেলা। আর সবাই মিলে

এক সঙ্গে প্রাণপণ চেঁচাচ্ছে ঃ

"নাখ্ ইণ্ডিয়েন, নাখ্ ইণ্ডিয়েন্ !"

"ভারত চলো, ভারত চলো।"

ঠেলাগাড়ি চড়ে-চড়েই তারা ভারতবর্ষে পেঁছিবে!

কবিরা শিশুপ্রকৃতি ধরেন, এবং শিশুরাও কবিপ্রকৃতি ধরে। দুজনারই বাস কল্পনারাজ্যে।

কিন্তু প্রশ্ন, তারা 'নাখ্ ইণ্ডিয়েন, নাখ্ ইণ্ডিয়েনই' করছে কেন, 'নাখ্ আমেরিকা' কিংবা 'নাখ্ চীনা' চেঁচাচ্ছে না কেন? জর্মনির কাচ্চাবাচ্চাদের ভিতরও তখন এই শুয়েমের্‌রাই ছড়িয়ে পড়েছে। এ বইয়ের প্রকাশ ১৮৪৯খৃষ্টাব্দে।

ঐ সময় ইয়োরোপে যে সব পণ্ডিত বেদচর্চায় মত্ত তাদের তিনজনই জর্মন ঃ বেন্‌ফাই, ম্যাক্সমুলার এবং ভেবার। ম্যাক্সমুলারকে সবাই চেনেন, ভেবারের লেখার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র সুপরিচিত ছিলেন, কিন্তু বেন্‌ফাই সামবেদের অনুবাদ করেছিলেন বলেই বোধ হয় অতখানি খ্যাতি পান নি। তবে জর্মনির শিশুসাহিত্যে তিনি সম্রাট। তাঁর 'পঞ্চতন্ত্রের'র অনুবাদ প্রাতঃস্মরণীয়।

কাজ তখন এত এগিয়ে গিয়েছে যে একখানা সর্বাঙ্গসুন্দর সংস্কৃত-জর্মন অভিধান না হলে আর চলে না। দুই জর্মনপণ্ডিত ব্যোট্‌লিঙ্ক ও রোট তখন যে অভিধান প্রস্তুত করলেন সেটি প্রকাশিত হল রুশ সম্রাটের অর্থসাহায্যে সাত ভলুমে, ১৮৫২-৭৫ খৃষ্টাব্দে।

এ অভিধান অতুলনীয়। কিয়দ্দিন পূর্বে পরলোকগত পণ্ডিতবর হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ই আমার জানামতে একমাত্র বাঙলা আভিধানিক যিনি তাঁর 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' রচনাকালে এর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন।

"ওই শুন দিশে দিশে তোমা লাগি
কাঁদিছে ক্রন্দসী"

এস্থলে 'ক্রন্দসী' শব্দের অর্থ কি? ভাসা-ভাসা ভাবে অনেকেই ভাবেন, ঐ চতুর্দিকে "কান্নাকাটি" হচ্ছে, আর কি?' অন্যায়টাই বা কি? স্বয়ং নজরুল ইসলাম লিখেছেন, 'কাঁদে কোন ক্রন্দসী কারবালা ফোরাতে।' জ্ঞানেন্দ্রমোহনের কোষ অনবদ্য। তাতেও দেখবেন, 'সংস্কৃত অভিধানে পাই নাই, কিন্তু "রোদসী" পাইয়াছি। তার অনুকরণে অনুপ্রাসানুরোধে (!) 'ক্রন্দসী'। কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক উদ্ভাবিত (!) এবং বাংলায় প্রথম ব্যবহৃত। কিন্তু এতখানি বলার পর জ্ঞানেন্দ্রমোহন প্রকৃত কোষকারের ন্যায় অর্থটি দিয়েছেন ঠিক। 'আকাশ ও পৃথিবী; স্বর্গমর্ত্য।'

ব্যোট্‌লিঙ্ক-রোটের সংস্কৃত-জর্মন অভিধানখানার প্রসঙ্গ উঠেছে বলেই এ উদাহরণটি প্রয়োজন হল। এ অভিধান জর্মন দেশ ও বাঙলার যোগসেতু।

একটু ব্যক্তিগত হয়ে গেলে পাঠক অপরাধ নেবেন না।

ছেলেবেলায় আমার মনে ধোঁকা লাগে 'ক্রন্দসী' শব্দ নিয়ে। সবে শান্তিনিকেতনে এসেছি। দূর থেকে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখেছি। শুনে

ভয় পেয়েছি, তিনি নাকি বিশ বছর ধরে একখানা বাঙলা অভিধান লিখছেন। বিশ বছর ধরে বাঙলা—সংস্কৃত নয়, গ্রীক নয়, বাঙলা অভিধান—বি···শ বছর ধরে। তখনো জানতুম না তারপরও তিনি আরো প্রায় বিশ বছর খাটবেন।

তাঁকে গিয়ে শুধাতে তিনি বড় আনন্দিত হলেন—আমি ভয় পেয়েছিলুম, তিনি বিরক্ত হতে পারেন। একাধিক বাঙলা অভিধান দেখালেন যাতে শব্দটা নেই। তারপর ব্যোট্‌লিঙ্ক-রোট পাড়তে পাড়তে বললেন, 'এইবারে দেখো, জর্মনরা কি বলে।' তাতে দেখি, ডি টোবেণ্ডেন শ্লাখট্‌রাইয়েন, অর্থাৎ 'যে দুই সৈন্যবাহিনী হুংকার করছে।' হরিবাবু বললেন, 'ঠিক, অর্থাৎ "দুই পক্ষ" —তার মানে উর্বশীর জন্য দু'পক্ষই কাঁদছে। কিন্তু তার পরেও এগোতে হয়। ঋগ্বেদের এই ২, ১২, ৮-এর টীকা দিতে গিয়ে সায়নাচার্য "ক্রন্দসী" শব্দের অর্থ করেছেন "স্বর্গমর্ত্য"।

উর্বশী কবিতায় রবীন্দ্রনাথও ক্রন্দসী শব্দ 'স্বর্গ ও মর্ত্য' এই মর্মে ব্যবহার করেছেন। কারণ স্বর্গের দেবতা এবং মর্ত্যের মানব দুই-ই যে তাঁর প্রেমাকাঙ্ক্ষী, তার বর্ণনা তিনি এ কবিতায় দিয়েছেন।

এস্থলে আর এগোবার দরকার নেই। জর্মনিতে ফিরে যাবার পূর্বে উল্লেখ করি হরিচরণ তাঁর সকল শব্দকোষ ব্যোট্‌লিঙ্ক-রোট কৃত অভিধানের প্যাটার্নে নির্মাণ করেছেন।

এ অভিধান জর্মনিতে প্রসারলাভ করার ফলে সে-দেশে ভারতীয় জ্ঞান-চর্চা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এগিয়ে চললো এবং তারই ফলে তার পরিমাণ এমনই বিরাট রূপ ধরলো যে, ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতদের হাতে সমর্পণ করতে হল। জর্মন পণ্ডিত বুলার তখন এক বিরাট পুস্তকের পরিকল্পনা করলেন। 'আর্যপ্রাচ্যতত্ত্বের পরিকল্পনা'—গ্রুণ্ডরিস্ ডের ইণ্ডো-আরিশেন ফিললগি উন্ট্ আলটেরটুমস্‌কুণ্ডে নামে এ-বই পরিচিত। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে এর প্রথম ভলুম বেরোয়; এযাবৎ কুড়ি ভলুম বেরিয়েছে। প্রধানত কীলহর্ন, ল্যুডার্স, ভাকের-নাগেল এবং আরও অসংখ্য পণ্ডিত এতে সাহায্য করেন।

এর পর আর হিসেব রাখা যায় না।

কারণ এতদিনছিল ব্যাকরণ, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন নিয়ে চর্চা, তারপর আরম্ভ হল ভাস্কর্য, স্থাপত্য, চিত্র, নাট্য, নৃত্য, হস্তশিল্প, সঙ্গীত—আরো কত কী নিয়ে আলোচনা। শ্মিট সায়েব তো একটা জীবন কাটিয়ে দিলেন কামসূত্র নিয়ে। ব্যোটলিঙ্কের অভিধানে কামসূত্রের টেকনিকাল শব্দ বাদ পড়ে গিয়েছিল —শ্মিট সে অভিধানের প্রযোজন খণ্ড প্রণয়নকালে এত বেশী কামসূত্রীয় শব্দ প্রবেশ করিয়ে দিলেন যে, তাই নিয়ে পণ্ডিতমহলে নানা রকমের 'শ্রুতিমধুর' মন্তব্য শোনা গেল। কৌটিল্য নিয়ে কী মাতামাতি! আর, আমি দেখেছি আমারই চোখের সামনে এক জর্মন মহিলা সপ্তাহে তিন দিন করে তিনটি বচ্ছর এলেন অধ্যাপক কির্ফেলের কাছে অষ্টাঙ্গের জর্মন অনুবাদে সাহায্যের জন্যে। তার পূর্বে তিনি মেডিকেল কলেজ পাস করে ঐ বিষয়ে বোধ হয় ডক্টরেটও নিয়েছিলেন। তিনি শেষ পর্যন্ত ক' বছর খেটেছিলেন বলতে পারবো না। যে

ডক্টর জাওয়ারব্রুখের কাহিনী পঞ্চম জর্জের অপারেশন প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি, তিনি পর্যন্ত ক্যানসারের গবেষণা আরম্ভ করার পূর্বে জর্মন ইণ্ডলজিস্টের কাছ থেকে শুনে নিয়েছিলেন, ভারতীয় বৈদ্যরাজগণ এই মারাত্মক ব্যাধি সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, কোন্ চিকিৎসার নির্দেশ দিয়েছে।

ভারতীয় সঙ্গীত ও জর্মন সঙ্গীত ভিন্ন ভিন্ন মার্গে চলে। তৎসত্ত্বেও ভারতীয় বিষয়বস্তু একাধিক সঙ্গীতকারকে ভারতীয় 'লাইট-মোতীফ' জুটিয়েছে, তুলনাত্মক আলোচনা প্রচুর হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জনৈক মজুমদার এ সম্বন্ধে একখানি উচ্চাঙ্গের পুস্তক লিখে ডক্টরেট পান। পরম পরিতাপের বিষয় ঐ যুদ্ধে তিনি তরুণ বয়সে প্রাণ হারান। বইখানির পাণ্ডুলিপি দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। এযাবৎ সে বই কেন যে কোনো ভারতীয় বা ইংরিজী ভাষাতে অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয় নি সে এক বিস্ময়।

মৃচ্ছকটিক জর্মনদের প্রিয় নাট্য। তার একাধিক প্রাঞ্জল এবং মধুর জর্মন অনুবাদ আমি দেখেছি। এ নাট্যের ঘটনাপরম্পরার বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাত যে রকম জর্মন মনকে চঞ্চলিত করে, ঠিক তেমনি তার গীতিরস—বিশেষ করে অকাল বর্ষায় বসন্তসেনার অভিসার ও দয়িত 'দরিদ্র-চারুদত্তে'র সঙ্গে মিলিত হওয়ার পর উভয়ের সে বর্ষণবর্ণন জর্মন-হৃদয়কে নাট্যগৃহে বহুবার উল্লসিত উদ্বেলিত করেছে। জর্মন ভাষা ইংরিজীর তুলনায় অনেক বেশি গম্ভীর ও প্রাচীনত্ব (আরকাইক) ধরে বলে সে ভাষায় মূল সংস্কৃতের অনেকখানি স্বাদগন্ধ রক্ষা পায় এবং কাব্যরসাশ্রিত নাট্যরস সহজেই সে ভাষায় সঞ্চারিত হয়।

জর্মন সাহিত্যদর্শন তথা জাতীয়জীবন—এ দুইয়ের উপর ভারতীয় সংস্কৃতি-বৈদগ্ধ্যের প্রভাব কতখানি হয়েছে তার সিংহাবলোকন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রবীন্দ্রনাথ জর্মনিতে যান। জর্মনি তখন মিত্রশক্তির পদদলিত, শব্দার্থে মর্মাহত। সেখানে রবীন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন, 'পরাজিতের সঙ্গীত'। তখন তিনি জর্মনিতে যেরূপ হার্দিক অভিনন্দন পেয়েছিলেন সেরকম অন্যত্র কোথাও পান নি। সে-কথার উল্লেখ তিনি নিজেই করে গিয়েছেন। আমি অন্যত্র একাধিকবার তাঁর প্রতি জর্মনপ্রীতির নিদর্শন বর্ণন করার চেষ্টা করেছি। এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

এতদিন জর্মনদের বিশ্বাস ছিল, ভারতবর্ষ একদা সভ্যতা-সংস্কৃতির উচ্চ শিখরে উঠেছিল বটে, কিন্তু বর্তমান যুগে সে দেশে শুধু ম্যালেরিয়া, গোখরো এবং ইংরেজ। (যদিও অবান্তর তবু বলে ফেলি ; শেষের দুটোর মধ্যে কোন্‌টা বেশী বেইমান সেটা পশুবিদ্‌রা এযাবৎ স্থির করে উঠতে পারেন নি।) রবীন্দ্রনাথের আগমনে এবং দু' তিন মাসের ভিতর তাঁর লক্ষাধিক পুস্তক জনসমাজে প্রচারিত হওয়ার ফলে তথা 'ডাকঘর' নাট্যরূপে দেখে তাদের এ ভুল ভাঙলো। নবীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাদের মনে কৌতূহল জাগলো। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা শেখানোর ব্যবস্থা হল। প্রথম অধ্যাপক ভাগনার অবশ্য বাঙলা শিখেছিলেন নিজের চেষ্টাতেই। জর্মনিতে অনূদিত তাঁর 'বাঙলা-গল্প-চয়নিকা' 'বেঙ্গালিষে এরৎসেলুঙ্গেন' সম্বন্ধে আমি অন্যত্র আলোচনা করেছি। বাঙলা

ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর একনিষ্ঠ শ্রদ্ধা এবং প্রগাঢ় প্রীতি সম্বন্ধে বার্লিনে প্রবাসী বাঙালী মাত্রই সচেতন ছিলেন। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর দরদটি কেমন যেন ভীতি-ভরা বলে আমার মনে হত। আমার মনে হত, বিশ্ব-সাহিত্যের অপরিচিত এই সাহিত্যের প্রতি তাঁর মাত্রাতিরিক্ত প্রীতি (প্রায় 'শুয়ে-মে'রাই' বলা চলে) পাছে লোকে ভুল বোঝে, সেই ছলে পাছে সেটিকেও অনাদর করে ফেলে—এই ছিল তাঁর ভয়। দুঃখিনী মা লাজুক ছেলেকে যে রকম পরের বাড়িতে নিয়ে যেতে ভয় পায়। শোকের বিষয় এই নিরীহ ভাবুকটিও মজুম-দারের মত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রাণ হারান।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এবং তার পরও জর্মনি অনেক ভারতীয় রাজ-দ্রোহীকে আশ্রয় দিয়েছে। এ সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু জানি নে। তার কারণ এর সব কিছুটাই ঘটতো লোকচক্ষুর অগোচরে। তবে শুনেছি ইংরেজ যখন জর্মনির উপর চাপ আনতো কোনো ভারতীয় বিদ্রোহীকে সে-দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্য, তখন জর্মন পুলিস তাকে কাতর কণ্ঠে বলতো, 'কেন বাপু একই ঠিকানায় বেশী দিন ধরে থাকো? ইংরেজ খবর জেনে আমাদের উপর চোটপাট করে তোমাকে তাড়িয়ে দেবার জন্য। আজই বাড়ি বদলাও। আমরা বলবো, তোমার ঠিকানা জানি নে।' এ কথাটি আমি শুনেছি, নেতা লালা হরকিষণ লালের ছেলে মনো মোহনলাল গাওবার কাছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কিম্বা দুই বিশ্বযুদ্ধের মাঝখানে আমার চেনার মধ্যে জর্মনিতে ছিলেন শ্রীযুক্ত সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা মহেন্দ্র পতাপ ও বীরেন সেন (এঁর পুরো নাম ও পদবী আমার ঠিক মনে নেই)। এ সম্বন্ধে এঁরা সবিস্তর বলতে পারবেন এবং কিছু কিছু বলেছেনও। আর ছিলেন পরলোকগত মানবেন্দ্র রায়।

ভারতের প্রতি হিটলারের শ্রদ্ধাভক্তি ছিল না। তদুপরি জাপানকে হাতে আনবার জন্য তিনি চীন ভারত তাকে ('প্রভাবভূমি' বা স্ফিয়ার অব্ ইনফ্লুয়েন্স রূপে) দান করে বসেছিলেন বলে সুভাষচন্দ্রকে বাইরে আদর দেখিয়েও ঠিক মত সাহায্য করেন নি। সুভাষচন্দ্র যে অতিশয় তেজস্বী মহাবীর এবং সঙ্গে সঙ্গে অসাধারণ বিচক্ষণ কুটনৈতিক ছিলেন সে-কথা আমার মত সামান্য প্রাণীর প্রশস্তি গেয়ে বলার প্রয়োজন নেই। তিনি হিটলারের মনোভাব বুঝতে পেরে জাপান চলে যান। জাপানই যখন শেষমেষ ভারত আক্রমণ করবে, তখন জর্মনিতে বসে না থেকে জাপান চলে যাওয়াই তো বিচক্ষণের কর্ম। এ সম্বন্ধে বাকি কথা প্রসঙ্গ এলে হবে।

জর্মন সাহিত্যদর্শন তথা তার জাতীয়জীবন—এ দুয়েরই উপর ভারতীয় সংস্কৃতি-বৈদগ্ধ্যের প্রভাব কতখানি হয়েছে, এ সম্বন্ধে আলোচনা করার অধিকার আমার নেই। আশা করি শাস্ত্রাধিকারী ভবিষ্যতে এ নিয়ে প্রামাণিক পুস্তক লিখবেন। উপস্থিত আমি মাত্র একটি উদাহরণ দিয়ে এ-স্থলে ক্ষান্ত হই—

ইংরিজী এনসাইক্লোপিডিয়ায় টেগোর শব্দ খুললে পাবেন, মাত্র রবীন্দ্রনাথের

একটি অতি ক্ষুদ্র জীবনী। এবং তাঁর জীবনীকার হিসেবে একমাত্র টমসনের নাম।

জর্মন এনসাইক্লোপিডিয়া সাইজে তার ইংরিজী অগ্রজের অর্ধেক মাত্র। তবু তার প্রথমেই পাবেন, টেগোর অব্দের অর্থ। অনুবাদ দিচ্ছি—

'টাগোরে', আসলে ঠাকুর (Thakur) [সংস্কৃত ঠাকুর, 'প্রভু', সম্মতির প্রভু], পদবী (অষ্টাদশ শতাব্দীর আরম্ভ থেকে', বর্তমানে পারিবারিক নাম। এ পরিবার দ্বাদশ শতাব্দীতে অযোধ্যা হতে বঙ্গে আগত ব্রাহ্মণদের বাঁড়ুয্যে পদবীধারী। পূর্বপুরুষ সংস্কৃত নাট্যকার ভট্টনারায়ণ (অষ্টম শতাব্দী)।'

এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্য তারপর একখানি পুস্তকের উল্লেখ আছে। নাম 'আর্খিভ ফ্যুর রাসেন উনট্ গেজেলশাফটস্-বিয়োলগী' অর্থাৎ 'আর্কাইভ ফর রেস এণ্ড বায়োলজি অব্ সোসাইটি'—'জাতি এবং সামাজিক জীববিদ্যার দলিলদস্তাবেজ।'

এর পর আছে অবনীন্দ্রনাথের জীবনী, তার পর দেবেন্দ্রনাথের এবং বিস্তৃত বিবরণের জন্য তাঁর আত্মজীবনীর উল্লেখ আছে।

বর্ণানুক্রমে সাজানো বলে সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথের জীবনী। অন্যান্য বিষয় উল্লেখ করে লেখক বলছেন, "১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তাঁকে যে 'স্যর' উপাধি দেওয়া হয়, সেটা তিনি ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে অমৃতসরে রক্তগঙ্গা (জর্মনে ব্লুট-বাট =ব্লাড্-বাথ) প্রবাহিত হওয়ার পর বর্জন করেন।"[১]

এবং সর্বশেষে যে জীবনীগুলোর উল্লেখ আছে সেটি লক্ষণীয়।

(1) H. Meyer-Benfey ; Rabindranath Tagore (1921) ; (2) P. Natorp ; Stunden mit Rabindranath Tagore (1921) ; (3) W. Graefe ; Die Weltanschauung Rabindranath Tagores (1930) ; (4) R. Otto : Rabindranath Tagores Bekenntnis (1931) ; (5) M. Winternitz ; Rabindranath Togore, Religion und Weltanschauung des Dichters (Prag 1936) অতি উৎকৃষ্ট ; এর বাংলা অনুবাদ হওয়া উচিত (লেখক) ; (6) Marjorie Sykes : Rabindranath Tagore (1943) ; (7) E. J. Thompson : Rabindranath Tagore, Poet aud dramatist (1948) ; (8) J. C. Ghosh ; Bengali Literature (1948).

১। Encyclopaediaতে আছে : 'He accepted a knighthood in 1915, but in 1919 resigned it as a protest against the methods adopted for the repression of disturbances in the Punjab. in later years, however, he offered no objection to the use of this title.'

কী দুষ্ট বুদ্ধিতে শেষ বাক্যটি লেখা! কবি যথেষ্ট আপত্তি জানিয়েছিলেন, কিন্তু তখন আদালতে মোকদ্দমা করা ছাড়া অন্য কোনো পন্থা ছিল না।

পাঠশালে গুরুমহাশয়ের কাছে প্রথম যে চড় খেয়েছিলুম সেটা আজও ভুলি নি। স্পষ্ট চোখের সামনে ভাসছে সে দৃশ্যটা—কিন্তু তার কথা এখন ভাবতে গেলে কেমন যেন সদয় হাসি পায়। অথচ বার্লিনে নেমে যে চড় খেয়েছিলুম সেটা তো ভুলি নি বটেই, তদুপরি এখনও সেটা স্বপ্নে দেখি এবং এক গা ঘেমে জেগে উঠি। প্রত্যেকটি ঘটনা ঠাস ঠাস করে টাইপরাইটারের মত গালে চড় মেরে যায়—এবং তার প্রত্যেকটি যেন মনের সাদা কাগজের উপর লাল রিবনের কালিতে এখনও জ্বলজ্বল করছে?

প্রথমবারের অভিজ্ঞতা। কাবুল থেকে দেশ হয়ে বার্লিন পৌঁছেছি। কাবুলে অনেক মার খেয়ে অনেক কিছু শিখেছি, কিন্তু সেগুলো তো এখানে কোনও কাজে লাগবে না। বার্লিন মারাত্মক মর্ডান শহর। এখানে চলাফেরার কায়দাকেতা একদম অজানা।

প্ল্যাটফর্মে অসহায় আমি দাঁড়িয়ে। রবিনসন ক্রুশো নিশ্চয়ই এতখানি অসহায় অনুভব করেন নি। তিনি যে ভুলই করুন না কেন, তার জন্য তাঁকে কারও কাছ থেকে চড় খেতে হবে না, জেলে যেতে হবে না। তিনি উদোম হয়ে ঘুরে বেড়ালেও কেউ কিছু বলবে না। আমি মার্সেলেস বন্দরে রাস্তার বাঁ দিকে চলতে গিয়ে প্রথম ধমক খেয়েছি। ফরাসী মাস্টার বলে দিয়েছিলেন বটে, কন্টিনেন্টে 'কীপ টু দি রাইট'—আমাদের দেশে খাল-বিলেও মাঝিরা চিৎকার করে একে অন্যকে তম্বী করে 'আপন ডা-ই-ন!'—কিন্তু বন্দরের ধুন্দুমারের ভিতর কি অতশত মনে থাকে?

স্পষ্ট বুঝতে পারলুম যাঁকে মার্সেলেস থেকে তার করেছিলুম, তিনি সে তার পান নি কিম্বা—সেগুলো আর বলে দরকার নেই। ভুক্তভোগীই জানেন, তখন সম্ভব অসম্ভব কত কারণই মনে আসে। আমি আসছি জেনে সে আত্মহত্যা করে নি তো ইস্তেক।

পোর্টারটি কিন্তু দেখলুম আমাদের কুলির মত ঘড়ি ঘড়ি তাড়া লাগালে না। আমার সেই বিরাট মাল-বহর—পরে দেখলুম বার্লিনে তার পনেরো আনাই কাজে লাগে না—ঠেলাগাড়িতে চাপিয়ে নির্বিকার চিত্তে পাইপ টানছে।

জর্মন ভাষা যে একেবারে জানি নে তা নয়। ঝাড়া পাঁচটি বচ্ছর উত্তম উত্তম গুরুর কাছে শান্তিনিকেতনে সে-ভাষার ব্যাকরণ কণ্ঠস্থ করেছি। কিন্তু বার্লিনের এই জীর্ণ শীতের সাঁঝে কোন্ জর্মন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে বিদেশীর মুখে তারই মাতৃভাষার শব্দরূপ—তাও ভুল উচ্চারণে—শুনতে যাবে? হাওড়া স্টেশনে যদি কাবুলিওলা কোন বঙ্গসন্তানকে দাঁড় করিয়ে তার খাস কাবুলী উচ্চারণ সহযোগে লিট্, লুঙ, আশীর্লিঙ শোনাতে চায় তবে অবস্থাটা হয় কী রকম?

বুদ্ধি করে ট্রেনে একটি ফরাসী-জাননেওলী মহিলাকে শুধিয়ে নিয়েছিলুম, স্টেশনে মালপত্র রাখার জায়গাটাকে জর্মনে কী বলে? তিনি বলেছিলেন,

Gepaeckaufbewahrungsstelle

! ! !

প্রথম ভেবেছিলুম তিনি মস্করা করছেন। তাই আমি সেটা টুকে নিয়েছিলুম। মাসখানেক পরে বার্লিনে গোছগাছ করে বসার পর শব্দটিকে হামানদিস্তে দিয়ে টুকরো টুকরো করে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তার অর্থ বের করেছিলুম। উপস্থিত সেই চিরকুটটুকুন পোর্টারের হাতে দিলুম। সে একটা 'হুম' শব্দ করে গুম গুম করে ঠেলাগাড়ি চালিয়ে এগোল। আমি মেরির লিটল্ ল্যামের মত পিছনে পিছনে চললুম!

মাল সঁপে দিয়ে রাস্তায় নামলুম।

দেখি নি, কিছুই দেখি নি। রাস্তা, বাড়ি, দোকান, গাড়ি কিছুই দেখি নি। আমি ভাবছি, যাই কোথায়?

হুদো-হুদো কড়ি থাকলে কিচ্ছুটি ভাবনা নেই। 'ট্যাক্সি' এবং 'হোটেল' এ দুটি শব্দের প্রসাদাৎ স্পুটনিক-সহযোগে চন্দ্রলোকে নেমেও আশ্রয় মেলে। কিন্তু আমার বটুয়াতে তখন ছুঁচোর কেত্তন। স্কলারশিপের প্রথম কিস্তি না-পাওয়া পর্যন্ত মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হবে। তখনও অবশ্য জানতুম না, মাটি পেতে হলে পাথর-ঢাকা বার্লিন থেকে অন্তত বারো মাইল দূরে যেতে হয়।

হঠাৎ শুনি, 'গুটুন্ আবেন্ট!' তারপর 'গুড্ ঈভনিং', তারপর 'বঁ সোয়ার'। তাকিয়ে দেখি, আমার চেয়ে দু-মাথা উঁচু এক পুলিসম্যান, কিংবা সেপাইও হতে পারে।

পরিষ্কার ইংরিজীতে শুধালে, 'আপনার কি কোনও সাহায্যের প্রয়োজন?'

ম্যাট্রিক ফেল বঙ্গসন্তান দু'শ টাকার চাকরি পেলেও বোধ হয় অতখানি খুশী হয় না।

আমি ক্ষীণকণ্ঠে বললুম, 'হোটেল।'

লোকটা আমুদে। চলতে চলতে বললে, 'এ শব্দটা তো ইণ্টারন্যাশনাল। আপনি অত অসহায় বোধ করছিলেন কেন?'

সত্যি কথা বলে দেব? প্রথম পরিচয়ের প্রথম জর্মনকে? বলেই ফেলি।

লোকটি দরদীও বটে। দাঁড়িয়ে বললে, 'সে তো অত্যন্ত স্বাভাবিক। স্টুডেন্ট মানুষ। পয়সা থাকার তো কথা নয়। তা হলে হসপিৎসে চলুন।'

আমি শুধালুম, 'সে আবার কী?'

'ও! হস্‌পিস্। ওটা তো ইংরিজীতেও চলে।'

হায় রে কপাল! শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্রনাথ, অ্যান্ড্রুজ, কলিন্সের কাছ থেকে পাঁচ বছর ইংরিজী শিখেও যা জানি নে, জর্মন পুলিস সেটাও জানে। কলকাতার ভোজপুরী পুলিস তা হলে একদিন আমাকে আরবী শেখাবে!

'হোটেলেরই মত। তবে 'বার', 'বুফে', 'ডান্স হল', 'কাবারে' নেই। খাবার-দাবার সাদাসিধে। ঘণ্টি বাজালেই ওয়েটার আসে না। তাই সস্তা পড়ে।'

অর্থাৎ হোটেল জিনিসটি 'দ্য লুক্স'—হস্‌পিস্ তারই গার্হস্থ্য সংস্করণ। ডাকবাঙলো আর চটিতে যে তফাৎ তাই।

এতদিন পরও আমার স্পষ্ট মনে আছে লোকটি সঙ্গে যেতে যেতে তার মনের দুঃখ আমাকে বলেছিল। তার ছেলেটি ম্যাট্রিক পাস করেছে, কিন্তু পয়সার অভাব বলে কলেজে ঢুকতে পারে নি।

আমি তো অবাক। তিন-তিনটে ভাষা জানে। শিক্ষিত লোক বলেই মনে হচ্ছে। ফিটফাট য়ুনিফর্ম না হয় সরকারই দিয়েছে, কিন্তু তেমন কিছু গরিব বলে তো মনে হচ্ছে না। তবে কি এদেশেও গরিব লোক আছে?

বাকী কথা পরে হয়েছিল। হস্‌পিস্ কাছেই। পৌঁছে গিয়েছি।

পুলিস মোকামে পৌঁছে দিল এই তো বিস্তর। কিন্তু এ-লোকটি শত্রু মিত্রে তফাত করে না। শত্রুর শেষ করতে হয়—শাস্ত্রে বলে—এ-লোকটি মিত্রেরও শেষ ব্যবস্থা দেখে যেতে চায়। হোটেলওলার সঙ্গে আলাপচারী করে সুব্যবস্থা করে দিল। আমি ভাবলুম, এবারে বোধ হয় আমার খাটের পাশে বসে ঘুমপাড়ানিয়া গান গাইবে।

যাবার সময় আমি বললুম, 'আপনার নাম কি?'

একখানা ভিজিটিং কার্ড বের করে দিলে।

পুলিসম্যানেরও ভিজিটিং কার্ড!

আমি শুধালুম,'এদেশের সব পুলিসই কি ইংরিজী ফরাসী বলতে পারে?'

বললে, 'আদপেই না।' তারপর একটা ব্যাজ দেখিয়ে বললে, 'যাদের গায়ে এই ব্যাজ থাকে তারা একাধিক ভাষা বলতে পারে। যার ব্যাজে যটা ফুটকি, সে ততটা ভাষা জানে। আমার ব্যাজে তিনটে।'

ধন্যবাদ দেবার মত ভাষা খুঁজে পাই নি।

পরে জানলুম, একাধিক ভাষা জাননেওলা পুলিস বিরল—আমার কপাল ভাল যে প্রথম ধাক্কাতেই তারই একজন জুটে গিয়েছিল।

চাটুয্যে অতিশয় সুদর্শন পুরুষ। সুন্দর ঢেউ-খেলানো চুল। বর্ণটি উজ্জ্বল শ্যাম। চোখ দুটি স্বপ্নালু—ঘন আঁখিপল্লব যেন অরণ্যানীর স্নিগ্ধচ্ছায়া নির্মাণ করেছে। সাধারণ বাঙালীর চেয়ে কাঁধ অনেক বেশী চওড়া—বুকের পাটা রীতিমত জোরদার। কোমরটি সরু—প্রায় মেয়েদের মত। পা দুটি সেই মাপে। তাই চলনটি ছিল চড়ুই পাখির মত। সেই চওড়া বুক নিয়ে চড়ুই পাখির চলনের মধ্যে যে একটা দ্বন্দ্ব থাকত তাকে দ্বন্দ্বমধুর বলা যেতে পারে।

কিন্তু বার্লিনের ভারতীয়-মহল এবং তার রায়ত-প্রজাদের ভিতর সব চেয়ে বিখ্যাত ছিল তার আহনুলম্বিত দুটি মোলায়েম আকুঞ্চিত জুলপি—খ্যাতিতে হিণ্ডেনবুর্গের গোঁপের সঙ্গে এরা তাবৎ বার্লিনে পাল্লা দিত। জর্মন ভাষায় জুলপিকে বলে 'কাটলেট্'। 'হিন্দুস্থান হৌস্' রেস্তোরাঁয় চাটুয্যে খাবার কটলেটের অর্ডার দিলে আমাদের ঠিকে 'বাম্‌নী' রঙ্গ করে বলত, 'দুটো কাটলেটের জন্য একটা কাটলেট, প্লীজ!' সেই বাম্‌নী থেকে আরম্ভ করে বার্লিন সমাজের মশাইমোড়ল সবাই তাঁর নামে অজ্ঞান। চেহারা ছাড়া তার

আরও দুটো কারণ ছিল। অতিশয় নম্র এবং স্বল্পভাষী। হাঙ্গাম হুজ্জত অপছন্দ করতেন বলে দিনযামিনীর অধিকাংশ তাঁর কাটত 'হিন্দুস্থান হৌসের' সুন্দরতম কোণের বৃহত্তম সোফার নিবিড়তম আশ্রয়ে। ব্যসনের মধ্যে ছিল অবরে-সবরে বিপ্লবী ৺নলিনী গুপ্তের সঙ্গে এক গেলাস অতি পানসে বিয়ার পান। এস্থলে বলে রাখা ভাল যে, বিয়ার পান বার্লিনে ব্যসন নয়। খাঁটি খানদানী বার্লিনবাসী ভিরমি গেলেও তার গলা দিয়ে জল গলানো যায় না, এবং মৃতজনের মুখে বিয়ার পাত্র ধরলে সে চুকুস চুকুস করে দিব্য চাঙ্গা হয়ে ওঠে। আর চাটুয্যে ছিলেন মিঃ বার্লিন নম্বর ওয়ান।

খুব যে বিত্তশালী ছিলেন তা নয়, কিন্তু পরনে সব সময়ই সুরুচিসম্মত সুট টাই। ফরাসী মহিলাদের সঙ্গে সেদিক দিয়ে তাঁর মিল ছিল। শুনেছি ইংরেজ রমণীর নাকি ক্ষোভ, ফরাসিনী কী করে এত অল্প খরচে এত সুন্দর জামাকাপড় পরে। কাঁচা বউ যে রকম পাকা শাশুড়ীর মত কম তেল-ঘিয়ে রান্না করা দেখে অবাক হয়।

তিনি ছিলেন ভারতীয় সমাজের বেসরকারী অনারারি পাবলিক রিলেশনস্ অফিসার। তাঁর অতিশয় অনিচ্ছাতে এ-কর্ম তাঁর স্কন্ধে এসে পড়েছিল বলে হিন্দুস্থান হৌসের টেলিফোন বাজলে তিনি ব্যস্তসমস্ত হয়ে হাত নেড়ে যে ফোনের কাছে বসে আছে তাকে বোঝাতেন যে তিনি অনুপস্থিত। অবশ্য বামাকণ্ঠ হলে শিভালরির খাতিরে মাঝে-মধ্যে ব্যত্যয় করা হত।

সোফার হাতায় ডান হাত ঠেস দিয়ে তারই উপর গাল রেখে দিনরাত চিন্তা করতেন। কী চিন্তা করতেন জানি নে—খোঁচাখুঁচি করেও বের করতে পারি নি।

হোটেল বায়স-নিদ্রায় যামিনী-যাপন করে পরদিন বেরোলুম বন্ধুর সন্ধানে। সে ঠিকানায় তিনি নেই। তারপর কলকাতার হিসেবে বলতে গেলে কখনও শেয়ালদা, কখনও আলিপুর, কখনও হাতিবাগান, কখনও টালিগঞ্জ করে করে বুঝলুম, বন্ধুর যে-ঠিকানা আমার কাছে ছিল, সেটা অন্তত এক বছরের পুরনো এবং ইতিমধ্যে তিনি প্রায় প্রতি মাসে বাড়ি বদল করেছেন। পাওনাদারের ভীতি তাঁর নেই, তবে যে কেন তিনি এই বার্লিন প্রদেশটার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত অবধি চষেছেন পরে তাঁকে জিজ্ঞেস করেও সেটা জানতে পাই নি। ইতিমধ্যে আমি ভুল বাসে উঠে, ভুল জায়গায় নেমে, ট্রামের নম্বরের সঙ্গে বাসের নম্বর ঘুলিয়ে ফেলে, বিরাট বিরাট বাড়ির আগাপাস্তলা ঠ্যাঙাতে ঠ্যাঙাতে শীতে জবু-থবু হয়ে ককাতে ককাতে যখন নিতান্তই একটা বাড়ির সিঁড়িতে ভেঙে পড়লুম, তখন সন্ধান পেলুম সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মশায়ের। তিনি নিয়ে গেলেন চাটুয্যের কাছে।

সেই শীতে আমি যেন মাঘের পানাপুকুরে চুবুনি খেয়ে দেখি সমুখের আঙিনায় খড়ের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। এক লহমায় সর্বাঙ্গ ওমে এলিয়ে পড়ল। দু' লহমায় কুল্লে সমস্যার সমাধান হল। সাধে কি রাঢ়ভূমি বলে, 'মুখুয্যে কুটিল অতি, বন্দ্যো বটে সাদা, তার মাঝে বসে আছে চট্টো মহারাজা!'

পাঠান্তর প্রক্ষিপ্ত।[১]

আমাদের 'বটতলা'তে বই বিক্রি হয়, কলকাতা-মাদ্রাসা অঞ্চলের নাম তাল-তলা। সেখানে আরবী, ফার্সী, উর্দু বই বিক্রি হয়। এখানে 'লিণ্ডেনতলা'তে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়। লিণ্ডেন মানে ইংরিজীতে 'লাইম', কিন্তু সে 'লাইম' আমাদের নেবু নয়, তাহলে ওটাকে স্বচ্ছন্দে নেবুতলা বলা যেত। বাঙ্গালীরা তৎসত্ত্বেও বলত।

আমাদের দেশ গরম। সেখানে না হয় পণ্ডিতমশাই অক্লেশে ক্লাস বসান। তারও বহু পূর্বে আরণ্যক হয়ে গিয়েছে। অরণ্যে পাঠ্য ব্রাহ্মণের অংশবিশেষ। কিন্তু এই শীতের দেশে গাছতলাতে ক্লাস বসবে কী করে? নেবুতলা নাম তাহলে নিতান্তই কাকতালীয়। যেমন বেনেরা বটগাছতলায় বসত বলে ফিরিঙ্গিরা বট গাছের নাম দিল 'বানয়ান ট্রি'।

হিটলার যখন তাঁর 'হাজার বছরের জন্য রাষ্ট্র' গড়তে গিয়ে তার রাজধানী বার্লিন শহরের সংস্কার করতে আরম্ভ করলেন, তখন প্রথমেই হুকুম দিলেন লিণ্ডেন বা লাইম গাছগুলো কেটে ফেলতে। শত্রুপক্ষ রটালে, 'ইনি আবার আর্টিস্ট!' আসলে কিন্তু তাঁর দোষ নেই; গাছগুলো তখন অত্যন্ত বৃদ্ধ জরাজীর্ণ। সেগুলো কাটার ফলে রাস্তার ল্যাম্পপোস্টগুলো বড্ড ক্যাটক্যাট করে চোখে পড়ল—শত্রু-মিত্র-নিরপেক্ষ সবাই মিলে রাস্তাটার নূতন নামকরণ করলে 'উনটার ডেন্ ল্যাটের্নেন্' অর্থাৎ 'লণ্ঠনতলা'! পরে অবশ্য হিটলার তামাম জর্মনি খুঁজে সব চেয়ে সেরা লিণ্ডেন চারা সেখানে পুঁতেছিলেন।

দুশ' বছরের পুরনো খানদানী রাজপথ। রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রায় এক মাইল অবধি গিয়ে ব্রাণ্ডেনবুর্গ গেট। বিরাট সুউচ্চ সেই তোরণের উপর রথাশ্ব সহ 'বিজয়িনী' বা 'ভিক্টোরিয়া'র (ইংলণ্ডের রানী না) ব্রোঞ্জ প্রতিমূর্তি। হিটলার এ রাস্তা বাড়িয়ে দিয়ে শার্লটেনবুর্গ পেরিয়ে বহুদূর অবধি টেনে নিয়ে তার নাম দিয়েছিলেন 'ইস্ট-ওয়েস্ট এক্সিস'। তাঁর আত্মহত্যা করার কয়েক দিন পূর্বে এ-রাস্তায় যান চলাচল যখন প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ তখন তাঁকে সাহায্য করার জন্য এখানে উড়োজাহাজ পর্যন্ত একাধিকবার ওঠা-নামা করেছিল। এ্যার-পোর্টগুলো তখন মিত্রশক্তির কব্জাতে চলে গিয়েছে বলে যাঁরা বিশ্বাস করেন—হিটলারের পালাবার কোনও উপায় ছিল না, তাঁদের বিরুদ্ধে অন্যপক্ষ এই ইস্ট-ওয়েস্ট একসিস্ দেখিয়ে দেন। আজ অর্থাৎ ১৯৫৯ সনে এ রাস্তার পূর্বার্ধ রাশার হাতে, পশ্চিমার্ধ মিত্রশক্তির। কিন্তু সে-সব অনেক পরের কথা।

এ-রাস্তায় দ্রুত জীবনের চরম গতিবেগের সঙ্গে শান্ত গ্রাম্য-জীবনের সুষুপ্তির অদ্ভুত সমন্বয়। দুদিকে যান-চলাচলের রাস্তা; মাঝখানে লাইম গাছের বিস্তীর্ণ এভিন্যু—চলেছে ত চলেছে, তার যেন শেষ নেই। এদিকে পেভমেণ্টের উপর ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে একাধিক লোক, বাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, স্টপেজে

১। তুলনার জন্য সুশীল দের 'বাংলা প্রবাদ' নং ২৮৬০ ও ৬৮২৩ দ্রষ্টব্য।

ওটাতে চাপবে বলে, আর এদিকে এভিন্যুর উপর দিয়ে মা চলেছেন পেরাম্বুলেটর ঠেলে ঠেলে সপ্তপদী চলার গতিতে। দশ কদম যেতে না যেতে বসে পড়ছেন হেলানদার বেঞ্চিতে। সেখানে পেনশনার চোখ বন্ধ করে পাইপ টানছেন, যুদ্ধে বিকলাঙ্গ বেঞ্চির গায়ে ক্রাচ খাড়া করে দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছে, এ-বাড়ির আয়া ও-পাড়ার রুটিওলার সঙ্গে রসালাপ করছে, আর বেঞ্চির হেলানে মাথা দিয়ে হেথাহোথা সর্বত্র ঘুমুচ্ছে অনেক লোক। এক বেঞ্চিতে দুটি কলেজের ছোকরা মৃদুকণ্ঠে আলোচনা করছে। আরেক বেঞ্চে একজন আরেকজনের পড়া নিচ্ছে।

দুই সারি বেঞ্চির মাঝখান দিয়ে স্কিপ করতে করতে চলে যাচ্ছে একটি মেয়ে। পেছনে ঠাকুরদা চলেছেন 'প্র্যাম'টার চেয়েও মন্দগতিতে। মেয়েটি ঊই—ওখানে—এখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্কিপ করছে ; ঠাকুরদা গতিবেগ বাড়াবার প্রয়োজন বোধ করছেন না।

এরই এক পাশে দাঁড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয়।

বেশী পুরনো দিনের নয়। একশ' বছরের একটু বেশী। এর চেয়ে ঢের পুরনো বিশ্ববিদ্যালয় জর্মনিতে আছে। আসলে বার্লিন খুব সম্ভ্রান্ত শহর নয়। সে বাবদে রোম, প্যারিস, ভিয়েনা—এমন কি প্রাগ ;—যাঁরা দেখেছেন তাঁরা ইস্তাম্বুলেরও নাম করেন। বার্লিন অনেকটা লণ্ডনের মত ; বেশীর ভাগ জিনিসই নকল। সঙ্গীতের জন্য ভিয়েনা, চিত্রের জন্য প্যারিস, ভাস্কর্যের জন্য রোম। তবে কিনা বিজ্ঞান এ-যুগের কামনার ধন। সেখানে বার্লিনের নাম আছে, আর আছে জর্মনীর রাজধানীরূপে। তারই প্রায় কেন্দ্রভূমিতে অবস্থিত বলে ব্যবসাবাণিজ্য এখানে প্রচুর। টোকিও না ওঠা পর্যন্ত বার্লিন পৃথিবীর তৃতীয় নগরী ছিল।

য়ুনিভার্সিটির সামনেই প্রতিষ্ঠাতা ভিল্‌হেলম ফন্ হুম্‌বল্টের প্রতিমূর্তি। গ্যোটের বিশিষ্ট বন্ধু।

হায়, সে সত্যযুগ গিয়েছে।

ভারতবর্ষ, গ্রীস, আরব ভূখণ্ডে একদা জ্ঞানী বললে বোঝাত সর্বজ্ঞানে জ্ঞানী। সর্ববিষয়ে সমান জ্ঞান থাকবে এমন কোনও কথা ছিল না, কিন্তু সর্ব জ্ঞানভাণ্ডার থেকে অল্পবিস্তর সঞ্চয় করে যিনি অখণ্ড সর্বাঙ্গসুন্দর বিশ্বদর্শনে উপনীত হতে পারতেন তাঁকেই বলা হত পণ্ডিত। এ তিন ভূখণ্ডের পাঠ্য-নির্ঘণ্ট দেখলেই বোঝা যায়, আদর্শ ছিল মানবজীবনে পরিপূর্ণতায় পৌঁছনোর জন্য পরিপূর্ণ জ্ঞানের সন্ধান। এক দিকে আয়ুর্বেদ অন্য দিকে যোগশাস্ত্র, এক দিকে ব্যাকরণ অন্য দিকে অলঙ্কার, একদিকে রসায়ন অন্য দিকে দর্শন, সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের প্রতি স্পর্শকাতরতা, নাট্যে প্রীতি, কৌটিল্যের কুটিলতার সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়, বসন্তসেনার নৃত্যগীতসঙ্গীতের সম্মুখে সহৃদয় বিস্ময়।

বস্তুত, এ সবই বাহ্য। কিন্তু এদের সন্নিবেশের মাধ্যমে কোন কোন গুণী হঠাৎ পেয়ে যান অনির্বচনীয়ের সন্ধান। সে সন্ধান ভূয়োদর্শনের, ভূমানন্দের।

সবাই পেত তা নয়, কিন্তু না পেলেও তাঁরা সাধকসমাজে সম্মানিত হতেন। সর্ববিষয়ে তাঁদের সহানুভূতি থাকত বলে তাঁরা প্রাজ্ঞসমাজের পৃষ্ঠপোষক বলে খ্যাত হতেন।

জর্মনিতে এ স্বর্ণযুগ আসে অষ্টাদশ শতকের শেষে ও উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে। তার অন্যতম প্রতীক ভিলহেল্‌ম্ ফন্ হুম্‌বল্ট।

আসলে ইনি কবি এবং আলঙ্কারিক। রসশাস্ত্র সম্বন্ধে প্রামাণিক পুস্তক এবং গ্যোটের কাব্যালোচনা নিয়ে তিনি নামলেন আসরে। কিন্তু অল্পকাল যেতে না যেতেই তাঁর রাজনৈতিক প্রাখর্য ধরা পড়তেই তাঁকে ডাকা হল রাজসভায়। ওদিকে তিনি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করতেন—সর্বোচ্চ আদর্শ বলে ধরে তুলেছিলেন মানবচরিত্রের স্বাধীন এবং সর্বাঙ্গীন বিকাশ। সেই আদর্শ যাতে ক্ষুন্ন না হয় তাই তিনি আজ ভিয়েনা কাল লণ্ডনের রাজদরবারে যেতেন, কিংবা পরশু বার্লিনের শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে কাজ করে গেলেন। ঐ সময়েই তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়াপত্তন করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে স্পেনের বাস্‌কদের ভাষা নিয়ে আলোচনা করে দেখিয়ে দিলেন যে ভাষার মূলে ব্যাকরণ আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু ভাষার কাঠামো ভাল করে পরীক্ষা করলে পাওয়া যায় সে-ভাষাভাষীর পরিপূর্ণ পরিহাস। যে-কোন সমাজের সর্বাঙ্গীণ ইতিহাস লুকনো থাকে তার ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের মাঝখানে। তাই এক সমাজ যেমন অন্য সমাজ থেকে ভিন্ন, ঠিক তেমনি এক ভাষা অন্য ভাষা থেকে। মূলে এক সমাজ হলেও তারা যদি দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়, তবে তাদের ভিন্ন ভিন্ন বিবর্তন তাদের আপন আপন ভাষাতে প্রতিবিম্বিত হয়।

সেই সূত্রে তিনি উপনীত হলেন চরম মীমাংসায়—মানুষের মননবৃত্তির শ্রেষ্ঠতম বিকাশ হয়েছে আর্য ভাষায়। মানব দেবতাত্মার পরিপূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় তার বাঙ্ময় ভুবনে।

ভিলহেল্‌ম্ ফন হুম্‌বল্ট ভাষাতত্ত্বের সর্বপ্রথম দার্শনিক।

তাঁর অনুজ আলেক্সাণ্ডার ফন হুম্‌বল্টের পরিচয় দেওয়া আরও কঠিন। সেযুগের গুণীরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন, নেপোলিয়নের পরেই খ্যাতিতে এঁর স্থান। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন শাখা-প্রশাখা ছিল না যাতে তিনি বিচরণ করেন নি। এদিকে ভুতত্ত্ব উদ্ভিদতত্ত্ব, ওদিকে উত্তর মেরু থেকে আরম্ভ করে বিষুবরেখা অবধি চুম্বকের আকর্ষণশক্তি-বিবর্তন, মহাকাশে উল্কাপিণ্ডের বিশেষ দিনে প্রবলতর বর্ষণ—বিজ্ঞানের একাধিক নবীন ক্ষেত্র তিনি আবিষ্কার করলেন। মহাপুরুষ মুহম্মদ বলেছিলেন, জ্ঞানের সন্ধানে যদি বেরুতে হয় তবে চীনেও যেয়ো। আরবীদের কাছে চীনই সব চেয়ে দূরের দেশ। এ মনীষী জর্মনি থেকে চীন, ওদিকে দক্ষিণ আমেরিকার সর্বোচ্চ পর্বত কিছুই বাদ দেন নি। ষাট বছর বয়সে মানুষ যখন খ্যাতির মুকুটপরে সহাস্যবদনে জনগণের করতালিধ্বনি শোনে, তখন হঠাৎ অর্থানুকুল্য পেয়ে বেরোলেন রাশিয়া ভ্রমণে—আবিষ্কার করলেন উরালে হীরকচিহ্ন। অথচ প্রথম যৌবনে প্রকাশিত তাঁর দার্শনিক

রহস্যতত্ত্ব ও মাংসপেশীর স্নায়ু সম্বন্ধে রচনা তখনই পণ্ডিতমণ্ডলীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল।

তাঁর 'কস্‌মস্‌' বা সৃষ্টি এখনও আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে পড়া যায়। এ-ধরনের বই আজকাল আর লেখা হয় না। প্রাচীন দার্শনিক জ্ঞান ও সনাতন রসতত্ত্ব তিনি মিলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন সে-যুগের নববিকশিত বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে এমন এক সংমিশ্রণে যাতে করে বিজ্ঞানের ক্ষুদ্রতম বিচ্ছিন্ন জ্ঞানবিন্দু ভুয়োদর্শনের অসীম সিন্ধুতে স্থান পায়। পক্ষান্তরে দার্শনিকের কল্পনা-বিলাসের ব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমা যেন বাস্তবের ধূলিকণাকে অবহেলা না করে।

তাই বোধ হয় নগণ্যজনের দৈন্য-দুর্দশা সম্বন্ধে তিনি যৌবন-প্রারম্ভেই সচেতন হন। শ্রমিকদের জীবনযাত্রার পদ্ধতি দেখে উদ্ধত ভাষায় তার প্রতিবাদ জানিয়ে যে সংস্কার কর্ম আরম্ভ করলেন সে-কথা আজও জর্মনি ভোলে নি। পরবর্তীকালে দাস-প্রথার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়। তিনি তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন, এই যুগধর্মসম্মত প্রথার বিরুদ্ধে। এবং আজীবন তাঁর প্রচেষ্টা ছিল, বিত্তহীন জ্ঞানার্থী দুঃস্থ পণ্ডিত যেন সংসারের তাড়নায় তার সাধনার মার্গ বর্জন না করে।

তাই যখন কৃতজ্ঞ জর্মনগণ বিত্তহীন জ্ঞানার্থীর জন্য 'ব্রহ্মোত্তর' বা 'ওয়াক্‌ফ্‌' অর্থাৎ 'ট্রাস্‌ট্‌' নির্মাণ করল তখন সেটিকে উৎসর্গ করা হল তাঁরই নামে—'আলেকজাণ্ডার ফন্‌ হুম্‌বল্ট স্টিফ্‌টুঙ্‌'। দেশে-বিদেশে এটি সুপরিচিত।

এদেশে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে এই ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে তুলনা করা যায়। ইনি এঁদের জীবনী ও কার্যকলাপের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন।

সে সত্যযুগ গেছে। মহাকবি গ্যোটেকে গুরুত্বে বরণ করে তাঁর চতুর্দিকে যে কেন্দ্র সৃষ্টি হয়েছিল পৃথিবীর ইতিহাসে এমন আর কোথাও হয় নি। শ্লেগেল, ফিষটে, শিলার, হুম্‌বল্ট-ভ্রাতৃদ্বয়, একেরমান ইত্যাদি ইত্যাদি বহু পণ্ডিত, গবেষক, কবি তাঁদের জীবন-বাতায়ন উন্মুক্ত করে পূর্ব-পশ্চিমের জ্ঞান-দর্শন, ঊর্ধ্ব-অধেঃর বিজ্ঞান-বিশ্লেষণকে যে আবাহন করেছিলেন, তারই ফলে জর্মনির যে সর্বমুখী বিকাশ হল আজও সে বিশ্বজনের বিস্ময়।

লোকে শুধায়, যে জর্মনি ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে পদদলিত, নিঃস্ব, আজ সে বিশ্বের উত্তমর্ণ হল কী প্রকারে?

এর বুনিয়াদ বড় দড়।

জীবনের সেই তিনটি সপ্তাহ কী করে কেটেছে তার বর্ণনা দেবার শক্তি আমার নেই। যেন পাহাড়ের চূড়ায় হঠাৎ কুয়াশা নামল। হাতড়ে হাতড়ে আমি এদিকে যাচ্ছি ওদিকে যাচ্ছি আর দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা দেখছি; হঠাৎ পায়ের তলার শক্ত জমি খসে পড়েছে আর আমি সর্বনাশের অতল গভীরে বিলীন হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছি। এবারে 'ভাষা-পরীক্ষা'র শক্ত জমিতে পড়ার সঙ্গে সব কটা হাড়হাড্ডি গুঁড়িয়ে যাবে।

'ভাষা-পরীক্ষা'টা কী?

চাটুয্যে নিয়ে গেছেন ডঃ গ্যোপেলের কাছে। বলে রাখা ভাল, ইনি হিটলারের প্রোপাগাণ্ডা-মাস্টার ডঃ গ্যোবেল্‌স্‌ নন। হুম্‌বল্ট ফাউণ্ডেশনের সেক্রেটারি। অতিশয় নিরীহ লোক। ততোধিক সাদাসিধে জামাকাপড়—যত দূর সস্তা হতে পারে। মোটাসোটা মানুষ এবং হাসি-হাসি মুখ। মিষ্টি সুরে এত নিচু গলায় কথা কন যে, টেবিলের এপারে এসে পেঁছয় না। দেশে থাকতে এঁর সঙ্গেই পত্রালাপ ছিল। ইনিই প্রাঞ্জল জর্মনে জানিয়েছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সীট তৈরী ; আমি এলেই হল। এখন বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ সেই মিষ্টি গলাতেই বললেন, 'অবশ্য একটা অত্যন্ত সরল মামুলী পরীক্ষা দিতে হবে যে, কলেজের লেকচার বোঝার মত জর্মন ভাষায় ক খ গ ঘ আপনি জানেন।'

বলে কী! পরীক্ষা দেব কী করে? ফেল মারব নিশ্চিত। পড়তে পারি—খানিকটা। কিন্তু কেউ কথা বললে সেটা বুঝতে তো পারি নে। না হলে চাটুয্যেকে, দোভাষী বানিয়ে আনব কেন?

আর এ তো বড় বিদকুটে ব্যবস্থা। পড়াশুনোর পর পরীক্ষা দিতে রাজী আছি, কিন্তু এখানে বুঝি আগে পরীক্ষা, তারপর লেখাপড়ি? আগে ফাঁসি তারপর বিচার! হটেনটটের রাজত্বেও তো এ-রকম ধারা হয় না। হ্যাঁ, দার্শনিক শোপেনহাওয়ার নামকরা জর্মন লেখকদের ভাষাতে ব্যাকরণের ভুল দেখে একবার বলেছিলেন, 'শুধু জর্মন আর হটেন্‌টটরাই আপন মাতৃভাষা নিয়ে এরকম ছিনিমিনি খেলে।'

আমাদের রঙ কালো বলে মুখের ভাব-পরিবর্তন ইয়োরোপীয়রা চট করে ধরতে পারে না। তাই তারা বলে, আমরা দুর্জ্ঞেয়, অবোধ্য। আমার চেহারা কিন্তু তখনি এমনি ফ্যাকাশে মেরে গিয়েছে, শুকনো গলা-তালু থেকে এমনি চেরা বাঁশের শব্দে আওয়াজ বেরুচ্ছে যে, ভালমানুষ ডঃ গ্যোপেল পর্যন্ত সেটা লক্ষ্য করে আমাকে দিলাশা-সান্ত্বনা দিতে আরম্ভ করেছেন। পরীক্ষাটা নাকি একেবারে কিসসুটি নয়, ছেলেখেলা, এলিমেণ্টারী, ছ'মাসের কোর্স, এখনও তিন সপ্তাহ রয়েছে, এন্তের সময় পড়ে আছে।

'মানে?'

'অর্থাৎ বিদেশীদের জন্য জর্মন ভাষার ক্লাস হয়। ছ'মাসের কোর্স। আর তিন সপ্তাহ বাদে পরীক্ষা। আপনি কাল থেকে ঢুকে যান—সব ঠিক হয়ে যাবে।'

অর্থাৎ ছ'মাসের কোর্স আমাকে তিন হপ্তায় শেষ করতে হবে। ওঃ! কী সুখবর।

কিন্তু আমি আপত্তি জানাই কি করে? বৃত্তির জন্য দরখাস্ত পেশ করার সময় কবুল জানিয়েছি যে, আমি জর্মন জানি, প্রোফেসারের সার্টিফিকেটও সঙ্গে ছিল। এখন সেগুলো রদবদল করি কি প্রকারে?

গ্যোপেল মিষ্টি গলায় হাসিমুখে আমাকে আরও অনেক সান্ত্বনা দিলেন—তার অল্প অল্প বুঝলুম। বাকিটা চাটুয্যে অনুবাদ করে দিলেন।

তাঁর প্রত্যেকটি সান্ত্বনা-বচন আমার সর্বাঙ্গ কণ্টকিত করল। এ যেন ফাঁসির

আসামীকে বলা হচ্ছে, দড়িটাকে মাখন মাখিয়ে মোলায়েম করা হয়েছে, যে-টুলে দাঁড়াবে সেটা মখমলে মোড়া!

সায়েবের কথার ফাঁকে এটাও বেরিয়ে গেল যে, পরীক্ষায় ফেল মারলে ভর্তি হতে পারব না। আবার ভর্তি হওয়ার পালা ছ'মাস পরে। অর্থাৎ আমার জর্মন-বাসের শেষের ছ'মাস কাটবে বিনা বৃত্তিতে—অনাহারী। সায়েব সেটা অবশ্য বলেন নি। তিনি পই পই করে বোঝাচ্ছিলেন ও-পরীক্ষাতে ফেল মারে শতকরা একজন। কিন্তু সে একজন যে আমি হব না, তিনি জানেন কী করে? লটারিতে হই না, সে আমি জানি।

আরবী ভাষায় বলে, আকাশে দু'খানা চাপাতি। একটি ঠাণ্ডা, আরেকটি গরম। চন্দ্র আর সূর্য।

রাস্তায় যখন বেরোলুম তখন দুপুর। সূর্যটিও তখন আমার কাছে ঠাণ্ডা চাপাতি বলে মনে হল।

তাই বলছিলুম, 'ভাষা-পরীক্ষা'র শক্ত জমিতে পড়ে হাড়-হাড্ডি চুরমার না হওয়া পর্যন্ত এখন শুধু হুশ্ হুশ্ করে নীচের দিকে পতন।

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডরের ক্রসিঙে ক্রসিঙে ট্রাফিক পুলিসম্যান রাখা উচিত। আমি ঢুকেছিলুম দু' পিরিয়ডের মাঝখানে ক্লাস-বদলাবদলির সময়। করিডরে করিডরে 'আপন ডাইন' রেখে তরুণ-তরুণীর জনস্রোত উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম পানে যাচ্ছে, কিন্তু ক্রসিঙে এসে লেগে যাচ্ছে ধুন্দুমার। ঠিক ঐ সময়ই হয়ত খুলে গেল তারই পাশের বিরাট হলের দরজা। তার থেকে বেরোবার চেষ্টা করছে আরও শ' দুই ছাত্র-ছাত্রী। তখন লেগে যায় সত্যিকার হরিষ্মুট। সবাই আবার চলতে চলতে ধাক্কা খেয়ে এদিক ওদিক ঠিকরে পড়ে তর্ক চালাচ্ছে নিজেদের মধ্যে—এখ্খুনি ক্লাসে অধ্যাপক যা পড়িয়েছেন তাই বিষয়বস্তু।

কিন্তু এত তাড়া কিসের? পরে শুনলুম এবং দেখলুমও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা এবং তার অনুপাতেরও বেশী ছাত্রসংখ্যা এত মারাত্মক রকমের বেড়ে গিয়েছে যে, এখন আর ক্লাসে জায়গা হয় না। আগে না গেলে রক্ষে নেই।

রোল কল্ এদেশে নেই। শুনে বঙ্গসন্তান আমি বড়ই উল্লাস বোধ করেছিলুম। গাইড-বুক নিশ্চয়ই আছে। তাই মুখস্থ করে ঠিক পরীক্ষা পাস করে যাব—অবশ্য 'ভাষা-পরীক্ষা' নয়, ফাইনালটার কথা হচ্ছে। তখন শুনলুম, গাইড বুক নেই, অধ্যাপকরা বই লেখেন, সেগুলো পড়তে হয়। তাহলে ক্লাসে যাবার কী প্রয়োজন? বিস্তর বই প্রকাশিত হওয়ার পরও অধ্যাপক সে-সব গবেষণা করেছেন সেগুলো বলেন ক্লাস-লেকচারে। পরীক্ষার সময় প্রশ্ন করেন তার থেকে। তার উত্তর দিতে না পারলে নম্বর পাওয়া যায় না—শুধু মাত্র বইয়ের জোরে মেরেকেটে পাস-নম্বর পাওয়া যায় মাত্র।

এসব পরের কথা।

এ-জলতরঙ্গ ভেদ করে গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো সম্পূর্ণ অসম্ভব বুঝতে পেরে আমি মোকা পেয়ে একটা ফাঁকা ক্লাসে ঢুকে পড়লুম। খানিকক্ষণ পরে ঘণ্টা

পড়ল, নেক্সট্‌ পিরিয়েডের। করিডরগুলো মরুভূমির মত খাঁ খাঁ করতে লাগল।

দেশে থাকতে কত রকম কথাই না শুনেছিলুম—জর্মন পাণ্ডিতদের দেশ, সেখানকার সবাই ইংরিজি জানে। রাস্তা সোনা মোড়া। গাঁয়ের লোক যে রকম ভাবে শ্যালদায় পেঁছিলেই তার জন্যে হুদো হুদো চাকরি 'অপিক্ষে' করে বসে আছে।

অনেক কষ্টে 'বিদেশীদের প্রতিষ্ঠানটি' আবিষ্কার করলুম। আশা করে-ছিলুম, বিদেশীদের নিয়ে এদের যখন কারবার তখন অন্তত এরা ইংরিজী বলতে পারবে। পারে। তবে আমি যতখানি জর্মন পারি তার চেয়েও কম।

বুঝলুম, বিদেশী রাজত্ব না হওয়া পর্যন্ত কোনও দেশের লোক ব্যাপকভাবে বিদেশী ভাষা শেখে না। আমরা এককালে ফার্সী শিখেছিলুম; তারপর ইংরিজী শিখলুম।

মনকে সান্ত্বনা দিলুম, এরা সবাই ইংরিজী বলতে পারলে আমার আর জর্মন শেখা হত না।

ইতিমধ্যে এক সুপুরুষ কাউণ্টারে এসে আমার পাশে দাঁড়ালেন। ওঁকে দেখেই যে-মহিলাটি আমার তদারক করার চেষ্টা করেছিলেন তিনি খুশিভরা মুখে অনর্গল জর্মন বলে যেতে লাগলেন। বার বার 'প্রফেসর' কথাটি আসছিল বলে অনুমান করলুম, ইনি আমাকে জর্মন শেখাবেন। আমিও খুশিমনে ভাবলুম, এবারে আমার ভাঙা-নৌকা কূল পেল। একে আমার হৃদয়-বেদনা সমুচিত ভাষায় বুঝিয়ে বলতে পারব।

ইয়াল্লা! ইনিও তদ্বৎ। পরে জানলুম, পাছে তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা সবাই আপন আপন মাতৃভাষায় তাঁর সঙ্গে কথা বলে বলে জর্মন অবহেলা করে তাই তিনি একাধিক ভাষা জানা সত্ত্বেও জর্মন ভিন্ন অন্য ভাষা বলেন না।

নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। ভাঙা নৌকোটা দ'য়ের দিকে ঠেলে দিয়ে অতল জলে ডুব দিলুম। মা গঙ্গাই জানেন, বস্ত্র নেই—গামছাখানা পর্যন্ত গেছে। মনকে ধমক দিয়ে বললুম, 'ইংরিজীর প্রতি তোমার এত দরদ কেন? ওটা কি তোমার বোনপোর ভাষা? জর্মন কি সতীনের ভাষা? ব্যস, হয়েছে, আর মুক্তোবনে বেনা বোনবার প্রয়োজন নেই।'

প্রফেসর আদর করে প্রায় হাতে ধরে ক্লাসের দিকে নিয়ে চললেন। আবার চতুর্দিকে জনসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ। এবারে কিন্তু ভয় নেই। প্রফেসর কাণ্ডারী। ইনি যদি এ দরিয়ায় আমাকে না বাঁচাতে পারেন তবে ব্যাকরণ পারাবারের কুমীর-হাঙ্গর কৃৎ-তদ্ধিতের পুচ্ছ-দন্ত থেকে পরিত্রাণ করে ভাষা-পরীক্ষার ওপারে নিয়ে যাবেন কি করে? সেই পাদ্রী সায়েবের গল্প মনে পড়ল। বদলি হয়ে এসে অচেনা গ্রামে নেমেছেন। রাস্তায় দুটি ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন গাঁয়ের গির্জের পথ।

তারা বাতলে দিলে তিনি খুশি হয়ে বললেন, 'আজ তোমরা আমাকে গাঁয়ের পথ বাতলে দিলে; আসছে রববারে যদি গির্জেয় আস তবে স্বর্গে যাবার

পথ আমি তোমাদের বাতলে দেব।'

তখন একটা ছেলে অন্য ছেলেটার পাঁজরে খোঁচা মেরে বললে, 'শুনলি ? গাঁয়ের পথ জানে না—সে বাতলে দেবে স্বর্গে যাবার পথ !'

উপস্থিত দেখলুম, জর্মনি দেশের আমার প্রথম গুরু অন্তত গাঁয়ের পথটা জানেন।

সে কী ক্লাস ! চীনেম্যান থেকে আরম্ভ করে নিগ্রো পর্যন্ত ! ঢের ঢের চিড়িয়াখানা দেখেছি, কিন্তু এ-রকম তাজ্জব চিড়িয়াখানা পূর্বে দেখি নি পরেও দেখি নি। এরা যদি কোট-পাতলুন না পরে আপন আপন দেশের পোশাক পরত তাহলে অনায়াসে পৃথিবীর যে-কোন ফ্যানসি ড্রেস, কস্ট্যুম্ বলকে হারাতে পারত। দুনিয়ার চিড়িয়া জড়ো হয়েছে জর্মন বুলি শিখে, এদেশের এলেম রপ্ত করে দেশে ফিরে নয়ী তালিমের ছয়লাপ বইয়ে দেবার জন্য। আর বয়েসেরই বা কত রকমফের ! আঠার থেকে চল্লিশ অবধি ছেলেবুড়ো, মেয়ে-মদ্দ।

আমরা যখন ক্লাসে ঢুকলুম তখন একটি আঠার-উনিশের খাপসুরৎ চিংড়ি প্রায় চল্লিশ-বিয়াল্লিশের রগে-পাক-ধরা চুলের চীনা ভদ্রলোককে ব্লাকবোর্ডের উপর কী একটা ধাঁধা বোঝাতে গিয়ে খিল-খিল করে হাসছে, আর চীনা প্রৌঢ়টি গাম্ভীর্যের স্মিতহাস্যের সঙ্গে বোকা-বনে-যাওয়ার ভাবটা মিশিয়ে ঘন ঘন সামনে পিছনে দুলে দুলে দু' ভাঁজ হচ্ছেন—ভদ্রতা আর ধন্যবাদ জানাতে হলে চীনারা যে রকম 'কাওটাও' করে।

প্রফেসর হেসে বললেন, 'চলুক। আমি বাধা দিতে চাই নে। ধাঁধাটা কী ?'

চিংড়ি আড়াই লম্ফে ডেস্ককে পেঁছে তারই উপর মোলায়েমসে বাঁ হাত রেখে অর্ধ লম্ফের আধা চক্কর খেয়ে ডেস্ক্ টপকে গুপ্স করে বসে পড়ল আপন সীটে। আমি শুধু দেখতে পেলুম, একগাদা বাদামী-সোনালী মেশা ঢেউ-খেলানো চুল আর বেগুনি হলদেতে ডোরা-কাটা ঘাঘরার ঘূর্ণি।

ক্লাসের লটবর—পরে জানলুম গ্রীক—বললে, 'শাবাশ !'

ত্রেতা

সেই যে সুন্দরী মেয়েটি এক লম্ফে ডেস্‌ক্‌ ডিঙিয়ে আসন নিয়েছিল তারপর ঝাড়া বিয়াল্লিশটি বছর কি করে যে হুশ করে মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল তার জমা খরচ আমি কথনো নিই নি। এই চল্লিশ বৎসরের ইতিহাস লেখা আমার শক্তির বাইরে। তবে মনে মনে আশা পোষণ করেছিলুম ল্যানগুইজ পরীক্ষায় পাস করে আমি যে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকেছিলুম তার বয়স, বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মপদ্ধতি, সেখানকার ছাত্রজীবন, তারপর বন্‌ বিশ্ববিদ্যা-লয়ে অধ্যয়ন, এদিকে বন্‌ শহর ওদিকে সপ্তকুলাচল, মাঝখানে বিশাল প্রশস্ত রাইন নদ, গোডেসবের্গে জীবন-যাপন, হিটলারের অভ্যুদয়, তার একচ্ছত্রাধিপত্য, ইতিমধ্যে হাজার হাজার বৎসরের প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি মিশরে বৎসরাধিক কাল বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, (ঐ সময়টাই আমি অবশ্য জর্মনিতে ছিলুম না কিন্তু হিটলারের তাবৎ বক্তৃতা এবং গ্যোবেল্‌স্‌-এর অনেকগুলো বেতার মারফৎ শুনেছিলুম) হিটলারের পতন, যুদ্ধশেষের কয়েক বৎসর পর পুনরায়—একাধিকবার—জর্মন-ভ্রমণ, বন্ধুমিলন এবং যারা যুদ্ধ থেকে ফেরে নি তাদের বিধবা, পুত্র-কন্যার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ—আরো কত কি—এসবের বর্ণনা দফে দফে দেব। কিন্তু বিধাতা বোধ হয় সেটা চান নি। আমি যাতে অকরুণ অকারণে নিরীহ বঙ্গ-পাঠকের মস্তকোপরি অষ্টাদশ ভলুম নিক্ষেপ না করি তাই তিনি এই চল্লিশ বৎসর আমাকে ননস্টপ তুর্কীনাচন নাচিয়েছেন এবং তার ডান্‌স্‌ফ্লর কন্যাকুমারী থেকে সিমলে, মসৌরী, পিণ্ডিদাদনখান থেকে কামাখ্যা! আর সব বাদ দিন—অষ্টাদশপদী এ খট্টাঙ্গ পুরাণ রচনা করার জন্য নিদেন যেটুকু দেশকালপাত্রের তথা অবকাশের প্রয়োজন তার একরত্তিও তিনি আমাকে দেন নি। তাঁকে বার বার নমস্কার।

"পাগলা" রাজা মুহম্মদ তুগলক সর্বদাই তাঁর প্রজাদের মঙ্গল কামনা করতেন। কিন্তু অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন বলে মাত্রাবোধ ছিল তাঁর কম এবং প্রায়ই লঘু অপরাধে মারাত্মক গুরু দণ্ড দিয়ে বসতেন—অনেক স্থলে মঙ্গলা-কাঙ্ক্ষী পিতা যে রকম পুত্রকে তস্য উপকারার্থে মাত্রাধিক লাঠ্যৌষধি সেবন করান। তাই পরলোক গমনের কিয়দ্দিন পূর্বে তিনি আপসোস করেছিলেন, "আমি প্রজাদের কল্যাণার্থে যে-সব আদেশ দিতুম তারা সেগুলো অমান্য তো করতই, তদুপরি আমার পুণ্য উদ্দেশ্যও তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারলো না।" তাঁর মৃত্যুর পর রাজ-ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন লিখলেন, প্রজা-সাধারণের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে মহারাজ আনন্দিত হলেন ও প্রজাসাধারণও হুজুরের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল!

অষ্টাদশী খট্টাঙ্গ পুরাণ লোষ্ট্র চিরসহিষ্ণু বঙ্গীয় পাঠকের শীর্ষদেশে নিক্ষেপ না করতে পেরে আমি হর্ষোদ্বেলিত কণ্ঠে শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ আমেন আমেন জপ করছি এবং আচণ্ডাল গৌড়জনও সেই বিকট মধুচক্র পান না করতে পেরে ঘন ঘন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছেন।

কিন্তু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আপ্তবাক্য রূপে বলেছেন, "যে-লোক মুলো খেয়েছে তার ঢেকুরে মুলোর গন্ধ থাকবেই।" তাই এই চল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞতা যে আমার লেখাতে কিছু না কিছু বেরিয়ে যাবেই যাবে এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু যে-ইঙ্গিত পূর্বেই দিয়েছি তারই পূর্ণার্থ প্রকাশ করে বলি, সে-সব অভিজ্ঞতা সুসংলগ্ন ভাবে কালানুক্রমে লিখে উঠতে পারি নি। কিন্তু আমি ভরসা রাখি যে সুচতুর পাঠক আমার প্রকাশিত পুস্তক থেকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত টুকিটাকি ছিটেফোঁটা জুড়ে নিয়ে একটি জিগশো পাজ্‌ল্‌ সমাধান করতে পারবেন—অর্থাৎ একটি মোজাইক[১] নির্মাণ করতে পারবেন, তদর্থঃ মোটা-মুটি একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি পেয়ে যাবেন। যদিও তার আউট লাইনগুলো সূক্ষ্ম শার্প হবে না, বহু ডীটেল বাদ পড়ে যাবে কিন্তু তাতে করে কিছু আসে যায় না। তদুপরি ভারতের প্রায় সর্বশেষ আলংকারিক বলেছেন, সব কিছু সবিস্তর বর্ণনা ক'রো না; পাঠককে ইঙ্গিত দেবে ব্যঞ্জনা দেবে মাত্র যাতে করে সে তার কল্পনাশক্তির সদ্ব্যবহার করার সুযোগ পায়। তাই কবিগুরুও আপ্তবাক্য বলে গেছেন ঃ

"একাকী গায়কের নহে তো গান,
মিলিত হবে দুইজনে;
গাইবে একজন খুলিয়া গলা
আরেকজন গাবে মনে।"

যে দেশে বার বার গিয়েছি তারই এক গুণী বলেছেন, "যে সব কথা সবিস্তর বলতে চায়, তার কোনো কথাই বলা হয় না।" "অনেক কথা যাও যে বলি কোনো কথা না বলি। (তাই) তোমার ভাষা বোঝার আশা দিয়েছি জলাঞ্জলি ॥"

বলেছেন পুনরপি ভাষার জহুরী বিশ্বকবি।

মোদ্দা কথা ঃ কোনো পুস্তকের সব ছত্রই যদি আণ্ডার-লাইন করো তবে কোনো ছত্রই আণ্ডার-লাইন করা হয় না।

শ্রদ্ধেয় সুনীতি চট্টোপাধ্যায় একখানা বিরাটাকার বাংলা ব্যাকরণ লেখার

১ অধুনা বঙ্গীয় পাঠক লেখক মোজাইক বলতে হাইলি পলিশটু, অতিশয় মসৃণ এবং সচরাচর একরঙা মেঝেকেই বোঝেন, বোঝান। আমি শব্দটি মূলার্থে ব্যবহার করেছি। পাথরের ছোট ছোট রঙবেরঙের টুকরো এমনভাবে সাজানো হয় যে তার থেকে একটি ছবি ফুটে ওঠে। মোজাইক তাই চিক্কণ মসৃণ তো হয়ই না বরঞ্চ তার বৈশিষ্ট্য ঠিক বিপরীত। যে কোনো দুটি পাথরের টুকরো বা কুচি ঠায় ঠাঠ অঙ্গাঙ্গি একজোড় হতে পারে না বলে সে অসমতল। তাই অতিশয় মসৃণ মেঝেতে (যাকে আজকের দিনে মোজাইক বলা হয়) মানুষের পা হড়কায় মোজাইকে সেটা প্রায় ১০০% অসম্ভব; অনেকে মনে করেন যে পা যেন না হড়কায় এই নিতান্ত প্র্যাকটিকাল উদ্দেশ্য নিয়েই মোজাইকের গোড়া পত্তন হয়।

পর অনুভব করলেন, "হয়ত বড্ড বেশী বলা হয়ে গেছে।"[১] তাই রচনা করলেন একটি ক্ষুদ্র ব্যাকরণ। পথে দেখা হতে বললেন, "এবারে একটা সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ লিখেছি; আগেরটা ছিল ক্ষিপ্ত ব্যাকরণ!" আমার এ-লেখাটাতে তাঁর ইরশাদ-নির্দেশ মস্তকাভরণ হয়ে রইল।

আরেক গুণী আরেকটি সরেস উপদেশ দিয়েছেন: "স্বেচ্ছায়. সজ্ঞানে লেখাতে কিছু কিছু ভুল রেখে দিয়ো। পাঠক সেগুলো ধরতে পারলে বিমলানন্দ অপিচ আত্মপ্রসাদ অনুভব করে। মনে মনে বলে, "আমিই বা কম যাই কিসে! ব্যাটা লেখক যতই বড়ফাট্টাই করুক না কেন আমি, হ্যাঁ, আমি তার সব কটা বমাল ধরতে পারি।" হয়তো বা কাগজে "ভ্রম" সংশোধন করে চিঠি লিখবে। ছাপা হলে তারে আর পায় কেডা? পাড়ার সবাইকে সেটা দেখাবে। সে শংকরের কান মলতে পারে, অবধূতের নাসিকা কর্তন-কর্মে সিদ্ধহস্ত। আপনার বইয়ের আরো তিন কপি সে কিনবে। সে যে কেরামতি মেরামতি করেছে সেগুলো সহ বিয়ে-সাদীতে প্রেজেন্ট করবে। আপনার অন্যান্য তাবৎ বই গ্যাঁটের কড়ি খর্চা করে বাড়িতে তুলবে—ভুলের সন্ধানে, আত্মপ্রসাদ লাভের জন্য।

আমাকে অবশ্য সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় ভুলের কলংক লেখার উপর ছিটোতে হয় না। সদাপ্রভু আমার হাত দিয়ে নিত্য নিত্য তামাক খান আর আমি খাই পাঠক পণ্ডিতের কানমলা।

ঈশ্বর সদ্‌গুরু জগদ্‌গুরু মন্নাহ জগন্নাথ আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন পরলোক গমনের দিন দুই পূর্বে তাঁরই সম্মুখে তাঁর চিকিৎসক তাঁর সহধর্মিণীকে বলেন, "আর দুধটাতে একটু জল দিয়ে সেটা পেতলে নেবেন—উনি তাহলে সহজেই হজম করতে পারবেন।" ক্ষিতিমোহন জানতেন তাঁর মৃত্যু আসন্ন। কিন্তু যে লোক আজীবন রসিকতা করেছে মৃত্যুভয় তাকে স্বধর্মচ্যুত করতে অক্ষম। মৃদু কণ্ঠে বললেন, "সিডা আর হাসপাতালে[২] করন লাগবো না। গয়লাই আপন বাড়িতে কইরা লয়।"

বিধাতা বলুন, নলরাজের অন্তরে প্রবিষ্ট কলিই বলুন, তিনি ঐ গয়লার মত আমার রচনাতে অনবরত জল মেশাচ্ছেন। অধম এ লেখককে আমার গুর্বীর মত আর জল মেশাতে হয় না।

আগাতা ক্রিস্টি বিয়ে করেন এক আর্কিয়োলজিস্ট্ বা প্রত্নতাত্ত্বিককে। ক্রিস্টি যখন বার্ধক্যে উপনীত হলেন তখন এক দরদী যুবতী তাঁকে শুধোন, "আপনি বুড়িয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আপনার স্বামী আপনাকে অবহেলা করছেন না তো! আফটার অল—পুরুষের মন।"

মাদাম শ্যানা হাসির ঝিলিক খেলিয়ে বললেন, "তোমরা তো বিয়ে করার

---

২ ঘটিরা কেন "হাঁস" পাতাল লেখেন, এ- বাঙালবুদ্ধির সেটা অগম্য। ইংরিজীতে তো "Hos" (pital)-এ কোন অনুনাসিক নেই। ঠিক সেরকম "হুঁশ"। ফার্সীতে অনুনাসিক নেই।

সময় অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে দুম্ করে ঝুলে পড়ো ! আম্মো প্রথম বারে তাই করেছিলুম। দ্বিতীয় বারে নির্বাচনটি হৃদয়ের হাতে ছেড়ে না দিয়ে দিলুম হেডাপিস অর্থাৎ ধুরন্ধর ব্রেন বক্‌স্‌টিকে। সে ফরমান দিলে বিয়ের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করাটাই শ্রেয়তর প্রস্তাব। কিন্তু নিতান্তই যদি করতে হয়, তবে কোনো প্রত্নতাত্ত্বিককে।"…খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর মাদাম শেষ তত্ত্ব, গভীরতম তত্ত্ব প্রকাশ করে বললেন, "জানো তো, যে জিনিস যত বেশী প্রাচীন হয়, প্রত্নতাত্ত্বিকের কাছে তার মূল্য তত বেশী। 'কজিটো এর্গো সুমে'র ছকে ফেলে অতএব আমি যত বুড়োচ্ছি ততই ও'র কাছে আমার মূল্য বাড়ছে।"

বিধাতা গয়লা আমার লেখাতে যেমন যেমন শনৈঃ শনৈঃ ব্যাকরণের ভুল বাড়াচ্ছেন, শৈলীর শিরদাঁড়া আর ভাষার পাঁজর কটা মট মট করে ভাঙছেন, আমার বইয়ের কাটতি তেমন তেমন হুশ্ হুশ্ করে বেড়ে যাচ্ছে। পূর্বে যে-স্থলে আড়াই শ' বইয়ের এক সংস্করণ কাটতে ঝাড়া কুড়িটি বছর কেটে যেত এখন মাত্র উনিশটি বৎসর !

হরি হে তুমিই সত্য।

এই যে হনুমানী লম্ফ দিয়ে আমি মবলগ চল্লিশটি বছর অতিক্রম করলুম নানাবিধ প্রবন্ধ গল্পমারফৎ, এ-চল্লিশ বৎসরের একটা সাদামাটা বোঁচাভোঁতা মোজায়িক গড়ে তুলেছি, যার উল্লেখ পূর্বেই করেছি, এবং এটাকে দু'যুগের সেতুবন্ধ স্বরূপ বিবেচনা করা যেতে পারে সে-সম্বন্ধে এবং বর্তমান লিখন সম্বন্ধে একটি সাবধান বাণী আমাকে চতুর্থ বা পঞ্চম বারের মত পাঠকের দরবারে পেশ না করলে আমি গুরুহীন তথা ধর্মভ্রষ্ট হব।

সেই এই ঃ

১৯৪৪ সালে যখন স্বরাজ কোন্ শুভাশুভ লগ্নে অবতীর্ণ হবেন, কি রূপ নিয়ে অবতীর্ণ হবেন, বামন অবতার না এক আজব নয়া ক্লীব শিখণ্ডি অবতার —এবং সেও অতিশয় ক্ষুদ্রস্য ক্ষুদ্র ধুলি পরিমাণ অংশাবতার হয়ে (আজ তো অহরহ চতুর্দিকে সেই নপুংসকাবতারই দেখতে পাচ্ছি) এই দিলীপ ভগীরথের (একদা) প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হবেন—সে যুগে আমাদের মনে স্বরাজ সম্বন্ধে স্পষ্টাস্পষ্ট কোন ধারণাই ছিল না। ১৯২০।২১-এ গাঁধীজী এক বৎসরের ভিতর (ভাগ্যিস দশ মাস দশ দিন বলেন নি) স্বরাজ আনবেন বলে দিলাশা দেন। কবিগুরু তখন তাঁকে মুখোমুখি বলেন, এক বৎসরের ভিতর যদি না আসে তবে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ জনগণমনে যে নৈরাশ্যজনিত কর্মবিমুখ জড়ত্ব এনে দেবে সেকথা ভেবেছেন কি ? মহাত্মাজী বলেন, আমি মরালি স্থিরনিশ্চয় যে প্রত্যেক ভারতীয় যদি আমার কর্মসূচী গ্রহণ করে তবে এক বৎসরের ভিতর আমরা স্বরাজ লাভ করবই করবো। (এর মাত্র আঠারো বৎসর পর হিটলারও রণশঙ্খে ফুৎকার দেবার পূর্বে বলেন, প্রত্যেক জর্মন সৈন্য যদি সূচাগ্রেণ সুতীক্ষেণ ভিদ্যতে যা চ মেদিনী পরিত্যাগ করে পশ্চাৎপদ না হয় অপিচ শত্রুকে নিধন করতে করতে প্রকৃত বীরের ন্যায় সে ভূমিতে দণ্ডায়-

মান সেখানেই মৃত্যুবরণ করে তবে আমার জয়লাভ অনিবার্য। অতিশয় হক কথা—সাধু, সাধু। উত্তম, উত্তম। কিন্তু জিজ্ঞাস্য ঃ আমাদের যখন অজানা নয় যে প্রত্যেক মানুষেরই কর্মক্ষমতা, আত্মোৎসর্গপ্রবৃত্তি, শৌর্যবীর্য পরিচয়-দানের একটা সীমা আছে তখন প্রত্যেকটি লোক শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সংগ্রাম করে করে ধূলিশয্যা গ্রহণ করবে এহেন আশা করাটা পূর্বাভিজ্ঞতাসম্মত নয়—এটাকে বরঞ্চ ধর্মরাজের দ্যূতক্রীড়ার সময় "এবারে আমি জিতব, এবারে আমি জিতবই জিতব" দুরাশা দুরাশায় গড়া পিরামিডের সঙ্গে তুলনা করে যেতে পারে। তদুপরে হিটলার অবশ্যই বলতে পারতেন, নিয়তি (হিটলার ঈশ্বর-বিশ্বাসী ছিলেন না, কট্টর নাস্তিকও না, কিন্তু নিয়তির অদৃশ্য লিখনে দৃঢ় বিশ্বাস ধরতেন) কখনোই কোন মানুষের স্কন্ধে সে বোঝা চাপান না যেটা সে বইতে পারবে না।

তা সে যাই হোক যাই থাক, কর্মক্ষেত্রে দেখা গেল গাঁধীজীর প্রতিশ্রুত এক বৎসর অতি সরেস রবারের মত—বড্ডই ইলাস্টিক, বিলম্বিত—উভয়ার্থে—হওয়ার আশ্চর্য ক্ষমতা ধারণ করে। যতই মারিবে টান ততই যাবে বেড়ে।

এস্থলে আমাকে বাধ্য হয়ে কিছুটা জীবনস্মৃতি মন্থন করতে হবে। পাঠক, অসংখ্যবার আমার অপরাধ মার্জনা করেছো। আরেকবার করলে হয়তো এক-শতে পেঁছে তুমি রত্নাকরের মত মোক্ষলাভ করে যাবে। আর কথায় বলে যাহা বাহান্ন তাহা তিরনব্বুই (হায় হায় পাঠক, দ্যাখ তো না দ্যাখ, বিধাতা গয়লা আমার হাত দিয়ে কি কৌশলে তামাক খেয়ে নিলেন, অতি সাধারণ একটি প্রবাদ গুবলেট করে দিলেন)। কিন্তু আমার জীবনস্মৃতি লিপিবন্ধ করার মত দুর্মতি আমার কখনো হবে না সে আমি জানি। ওদিকে আবার আমার চেয়েও পাপিষ্ঠজন ইহসংসারে আছে। তারা সর্বক্ষণ আমাকে টুইয়ে টুইয়ে অনুযোগ বিনয় করে, আমি যেন আমার আত্মজীবনী লিখি, কারণ আপনার মত বিচিত্র অভিজ্ঞতা ক'জনের আছে (অর্থাৎ খুনখারাবী করে পৃথিবীতে কোন্ দীনতম দেশের কারাগারের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন আমি করি নি ?), পৃথিবীর কোন্ দেশ আমি চষি নি (অর্থাৎ কোন্ দেশের পুলিস আমাকে "গুন্ডা আইনে" ফেলে—যে আইনানুযায়ী নগরপাল যেকোন গুণ্ডাকে চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর শহর ছেড়ে অন্যত্র যাবার মোক্ষম আদেশ দিতে পারেন—সেদেশ থেকে বের করে দেয় নি ?)। মোদ্দা কথা আমি অকপটে সত্যবর্ণন করলে তেনারা বগল বাজিয়ে নৃত্য করতে করতে বলবেন, "বলেছিলুম তখনই বলেছিলুম।" হয়তো বা একটি ছড়াও সঙ্গে জুড়বেন ঃ

'বাইরে তোমার লম্বা কোঁচা
ঘরেতে চড়ে না হাঁড়ি,
খেতে মাখতে তেল জোটে না,
কেরোসিনে বাগাও তেড়ি।

যাও হে, যাও হে, কালাচাঁদ
আর এসো না আমার বাড়ি
এবার এলে আমার বাড়ি
দেব তোমায় খ্যাঙরার বাড়ি ॥

পক্ষান্তরে এবার আমার জীবন সম্বন্ধে নির্বিকার উদাসীন পাঠক বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই, কোন্ দুষ্ট, পরশ্রীকাতর, বিঘ্নসন্তোষী জুগুপ্সা দ্বারা তাড়্যমান হয়ে এনারা আমাকে জীবনস্মৃতি লিখতে বলেন।

কিন্তু ভবদীয় সেবককে তার কিছুটা, সামান্যতম অংশটা এস্থলে নিবেদন করতেই হবে। নইলে (১) সে-পটভূমি নির্মিত হবে না যার সাহায্য বিনা পাঠক আমার তাবৎ বক্তব্য সম্যক হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

অপরন্তু (২) পূর্বলিখিত চল্লিশ বৎসর যে মুষ্টিযোগ প্রসাদাৎ আমি ডুবসাঁতার মেরে মোজায়িক নির্মাণ করেছিলুম এস্থলেও তদ্বৎ। সেই পদ্ধতিই অবলম্বন করবো।

১৯৪৪-এর কাছাকাছি আমি বে-car (বে-কার) তো বটিই, এবং নির্জলা বেকার। শ্যামপেন বরগণ্ডী মাথায় থাকুন জল এস্তেক জোটে না। মাথার উপরে ছাতখানাও যদি না থাকে তবে ট্যাপই বা কোথায় কুঁজোই বা কই? কাজেই রাস্তার কল থেকে আঁজলা আঁজলা জল খেতুম। তদভাবে পার্কের পুকুর কিংবা মাগঙ্গার স্তন্যরসই ছিল আমার সম্বল।

অবস্থা যখন চরমে তখন শ্রীমান কানাই (ভজু-কানাই) সরকারের সঙ্গে দেখা। তার হঠাৎ মনে পড়ে গেল, (আমি যখন শান্তিনিকেতন কলেজে পড়তুম সে তখন ইস্কুলে) যে আমি তখন ইস্কুলের সাহিত্যসভায় বেনামীতে কয়েকটি রচনা পেশ করি। সেগুলি এমনই ও'চা যে আমি স্বয়ং পড়লে "সাধু-সু সাধু-সাধু" রব ওঠার পরিবর্তে "দুয়ো দুয়ো দুয়ো" ধ্বনি সভাস্থলের চতুর্দিকে মুখরিত হত। ওদিকে মহারাজ শ্রীমান ভজু-কানাই সাহিত্যসভার সেক্রেটারি (আমরা আড়ালে বলতুম "স্যাঁকা রুটি"), তারে মারে কেডা।[৩]

সেই কানাইয়ের সঙ্গে দেখা কলকাতায়। ছেলেবেলায় বিস্তর কাঁচকাঁচারা একটুখানি সিনিয়র ছাত্রদের হীরো ওয়ারশিপ করে। আমার রচনা পড়ে সে যে বিস্তর "সাধু-স-সাধু" কুড়িয়েছিল তার থেকে তার একটা অন্ধ ধারণা হয়ে গিয়েছিল আমি কালে রীতিমত ডাকসাইটে কেউকেডা লেখক হব। তাই দেখা

৩ শ্রীমান কানাই যখন শান্তিনিকেতনে এলেন তখন অন্য এক কানাই সেখানে বর্তমান। গুবলেট এড়াবার জন্য তখন তার দাদা 'ভজুর" সঙ্গে তার নাম জুড়ে দিয়ে "ভজু-কানাই" নাম রাখা হল। আরেকটি উদাহরণ চমৎকার; একটি এমনি ছোটখাটো একমুঠো ছেলে এল যে সবাই তার নাম দিল "সিকি"। ওমা, পরের বৎসর সে তার ছোট ভাইকে নিয়ে এল—সে আরো ক্ষুদে, একদম মাটির সঙ্গে কথা কয়। তার নাম রাখা হল "দুয়ানী"!

হওয়া মাত্রই আমাকে পকড়কে নিয়ে গেল স্বর্গত সুরেশ মজুমদার মহাশয়ের সমীপে।

আহা ! এ-রকম আরেকটি সংবাদপত্র কর্ণধার আমি ত্রিভুবন চষেও পাই নি! কিন্তু আজ না, মোকা পেলে আরেকদিন তাঁর দেহ, মন ও সর্বোপরি তাঁর হৃদয়ের সবিস্তর বর্ণন দেব। তিনি আড়নয়নে আমার দিকে একবার মাত্র তাকিয়েই কানাইয়ের দিকে তাকিয়ে কি যেন একটা মুদ্রা দেখালেন। এরকম বিনা মেহনতে আমি কোনো পরীক্ষা পাস করি নি।

"সত্যপীর" ছদ্মনামে সপ্তাহে দুবার দুই কলম, আফটার এডিট লিখতুম। সে কাহিনী দীর্ঘ। শুধু দুঃখের সঙ্গে বলি সে-আমলে যাঁরা সবে সাবালক হতে যাচ্ছেন সেই আমি আজ হয়ে গেলুম তাঁদের পেট্ রাইটার, অর্থাৎ আমি তাঁদের ফ্যান। হায়, আজ তাঁদের দরবারে কল্কে পেতে হলে আমাকে রীতিমত কসরৎ করতে হয়। সব সময় পাই নে। এখন যদি সেই প্রায় ত্রিশ বৎসরের পুরনো 'সত্যপীর' নাম দিয়ে কিছু লিখি—অতিশয় সভয়ে বৃদ্ধ বরজলালের মত ক্ষীণকণ্ঠে অর্থাৎ শ্লথ অক্ষম হস্তে লিখিত যৎকিঞ্চিৎ পাঠাই তবে সেটা ছাপা হয়—ইংরেজীতে যাকে বলে অন্ এ রেনি ডে। রবীন্দ্রনাথ বৃদ্ধ বয়সে একটি কবিতা নিম্নের কটি ছত্র দিয়ে আরম্ভ করেন ঃ—

"ডাক্তারেতে বলে যখন মরেছে এই লোক
তাহার তরে বৃথাই করা শোক।
কিন্তু যখন বলে জীবন্মৃত
তখন শোনায় তিতো
আমার হ'ল তাই—"

পরে কবি বুঝলেন, গোড়ীয় পাঠক মাত্রই তাঁর এ-বিনয় অট্টহাস্যসহ তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবে। তাই পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় এ-ছত্র কটি তিনি নাকচ করে দিলেন।

আর আমার বেলা ?

জীবন্মৃত না। "খাবি-খেকো, গঙ্গাযাত্রার আস্ত জীবন্মৃত।"

সে-কথা থাক্।

ঐ সময় অন্যান্য যাবতীয় বিষয়বস্তুর মধ্যে আমার একটি বক্তব্যে আমি বার বার ফিরে আসতুম। বলতুম, "স্বরাজ আমাদের দিগ্বলয় চক্রের মতই নিম্নে বা ঊর্ধ্বে দৃষ্টির বাইরে থাকুন না কেন এই বেলাই তার জন্য কিছু কিছু প্রস্তুতির প্রয়োজন। ২। স্বরাজলাভের সঙ্গে সঙ্গেই ভারত পৃথিবীর সর্বদেশের এম্বেসি, লিগেশন, কনসুলেট, ট্রেড কমিশন নিযুক্ত করবে। ৩। সে-সব দফতরের জন্য বিদেশী ভাষা জাননেওলা লোকের প্রয়োজন হবে। ৪। বাঙালী ভাষা শেখার জন্য বিশেষ বুদ্ধি ধরে। অতএব এইবেলাই সাততাড়াতাড়ি কলকাতা-তেই ভিন্ন ভিন্ন ভাষা শিখবার ব্যবস্থা করা অতীব প্রয়োজনীয় জরুরী কাজ। কারণ প্রথম ধাক্কাতেই যাঁরা ফরেন সার্ভিসে ঢুকতে পারবেন তাঁরা দেশদেশান্তরে

ঘুরে বেড়াবেন এবং ফলে তাঁদের ছেলে এমনকি মেয়েরাও একাধিক ভাষা ইচ্ছা অনিচ্ছায় শিখে নেবে। তখন আমাদের কলকাতার মেধাবী ছেলেরাও এদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না। ফলে ভালো ভালো চাকরি, যারা প্রথম ধাক্কায় ঢুকেছিল, বংশানুক্রমে তাদের গোষ্ঠীপরিবারের একচেটে সম্পত্তি হয়ে যাবে। এ-কিছু আজগুবী নয়া হাল নয়। বিসমার্ক এমনি কি তাঁর পূর্বেও যেসব খানদানী পরিবার ফরেন অফিসে প্রথম ধাক্কাতেই প্রবেশ করেছিল তাদের বংশধরগণকে গণতান্ত্রিক ভাইমার রিপাবলিক কমিয়ে দিয়ে মেধাবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোককে ঢোকাতে পারেন নি। এমন কি হিটলারও এঁদের বিশেষ কাবু করতে পারেন নি। এঁরা মস্করা করে বলতেন, নাৎসীদের দিয়ে এসব কাজকর্ম করানো যায় না; আমাদের মত স্পেৎসি (স্পেৎসিয়ালিস্‌ট্‌=স্পেশালিস্ট=ওয়াকিফহাল) না থাকলে তাবৎ ফরেন আপিস এবং সঙ্গে সঙ্গে ওদের নিযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন দেশের দূতাবাসগুলো তছনছ বানচাল হয়ে যাবে।"

আমার এসব সাবধান বাণীতে খুব কম লোকই তখন কান দিয়েছিলেন। একাধিকজন আমাকে বলেন, "আরে মশাই, আগে স্বরাজ ফলটি পেকে মাটিতে পড়ুক!"

আমার পেটেণ্ট উত্তর ছিল, "রাঁধে মেয়ে কি চুল বাঁধে না?"

আজ আমাদের কানে জল গেছে। আজ ম্যাক্‌স্‌মুলার ভবনে, রুশ পাঠ-চক্রে ভিড়—এমন কি কোনো কোনো বাড়ির বৌ-ঝি-রা এদের মধ্যে আছেন। শ্রীযুক্ত মনোজ বসুর ধর্মপত্নী ও পুত্রবধু কয়েক বৎসর আগে একই রুশ ক্লাসে পড়াশুনো করতেন।

কিন্তু ইতিমধ্যে ঘোড়া পালিয়েছে। আস্তাবলে এখন চাবি মারাটা বন্ধ্যা-গমনের ন্যায় নিষ্ফল। সংস্কৃত সুভাষিত কয়, প্রদীপ নির্বাপিত হয়ে যাওয়ার পর তেল দিয়ে কি লাভ, যৌবনান্তে বিবাহ করে কি ফল পাবে!

সেই ১৯৪৪ থেকে কানমলা খেয়ে খেয়ে—অর্থাৎ এ-সব বাবদে লেখা সাধারণ জনের কৌতূহল উদ্রেক না করাতে—আমি অন্য সব বিষয়ে নিয়ে লিখতে আরম্ভ করলুম। যাঁরা "দেশ" পত্রিকায় (এ পত্রিকাতে ১৯৪৮।৪৯-এ আমার সর্বপ্রথম পুস্তক "দেশে-বিদেশে" ধারাবাহিকরূপে বেরোয় এবং সে-সম্বন্ধে "দেশ" পত্রিকার সুযোগ্য একনিষ্ঠ সম্পাদক শ্রীমান সাগরময় ঘোষ তাঁর অনবদ্য "সম্পাদকের বৈঠক" পুস্তকে কীর্তন করেছেন।[৪] সে যুগ থেকে—বস্তুত ১৯৪৪ থেকে—

৪ "দেশে-বিদেশে"ই আমার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা, এটা প্রায় সর্বজনসম্মত অভিমত। আমাকে যখন কেউ প্রশ্ন করেন, আমার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা কি? আমি উত্তরে বলি, বার বার চেষ্টা দিয়েছি, কিন্তু এখনো "সর্বশ্রেষ্ঠ" রচনা লিখতে সক্ষম হই নি। জনৈক ফরাসী লেখককে একই প্রশ্ন শুধোলে পর তিনি দুই কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে (শ্রাগ্‌ করে) বলেন "না, না! আপনি কি জানেন না, আমার প্রত্যেকটি রচনাই সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা।" স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, বিনয় প্রকাশ বাবদে এই মহাত্মাকে ভৃগুপদলাঞ্ছিত কৃষ্ণবাসুদেবের সঙ্গে তুলনা করা যায় না।

আমি কয়েক মাস, কখনো বা দু'এক বৎসর বাদ দিয়ে—ঢাকের বাদ্যি থেমে গেলেই ভালো শোনায়—'দেশ' পত্রিকায় প্রধানত "পঞ্চতন্ত্র"ই লিখে আসছি) আমার এই "পঞ্চতন্ত্র" মাঝেমধ্যে পড়েছেন তাঁরাই জানেন আমি এখন প্রধানত "অজগর আসছে তেড়ে। /আমটি আমি খাব পেড়ে।" কিংবা ঔড্র পদ্ধতিতে "ক'-রে কমললোচন শ্রীহরি /। করেন শংখচক্রধারী" ধরনের নির্বিষ অজাতশত্রু রচনাতে নিজেকে সীমাবন্ধ করে রাখি।

কিন্তু ইতিমধ্যে মেঘে মেঘে বেলা হয়ে গিয়েছে। আমি তখন ছিলেম মগন গহন ঘুমের ঘোরে। স্বরাজ লাভের সঙ্গে (১) ভারতীয় রাষ্ট্রদূতরা মদন-ভস্মের মত বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়লেন। তাঁরা যে-সব দেশে অবস্থান করছেন তাদের সমস্যা, ভারতের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ইত্যাদি ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় সম্বন্ধে বিবৃতি দিতে লাগলেন; কখনো স্বেচ্ছায় কখনো পার্লিমেণ্টে তাড়া খেয়ে আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মারফৎ। তাদের দারাপুত্রপরিবারও এ-সব দেশকে কেন্দ্র করে সাহিত্য নিম-সাহিত্য প্রকাশ করলেন। (২) দলে দলে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, জর্নলিস্ট, সাহিত্যিক, ছাত্রছাত্রী, টুরিস্ট, সরকারী কর্মচারী গয়রহ নিত্যি নিত্যি দুনিয়াটা চষে ফেলতে লাগলেন। তাঁদের অনেকেই গানা থেকে অল্-আলেমীন সীদী অল-বররাণী, পানামা থেকে তাশকেন্দ ভন্নাদিভস্তক সম্বন্ধে এস্তের এস্তের প্রবন্ধ কেতাব লিখলেন। অনেক সময় অগ্রপশ্চাৎ সম্যক বিবেচনা না করে। পরে সে-বইয়ের কিয়দংশ সানুষ্ঠানে ভস্মীভূত করা হল। চার্বাক বলেছেন ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ? কিন্তু এস্থলে পুনরা-গমন আদৌ অসম্ভব নয়। বিশাখাপট্টনমে যখন জাপানী বোমা পড়ে তখন সরকারের হুকুমে ট্রেজারি অফিসার জমায়েৎ কারেনসি নোট পুড়িয়ে দিল্লীতে খবর দিলেন তিনি সাকুল্যে তাবৎ নোট ভস্মীভূত করেছেন। উত্তম। দু'বৎসর যেতে না যেতে তার কিয়দংশ গুড়ি শুড়ি কি করে যে হাটবাজারে মদ্যালয়ে ক্লাবে আত্মপ্রকাশ করল কেউ জানে না।...এবং সব চেয়ে মোক্ষম তত্ত্ব (৩) ইংরেজ আমলে আমাদের বৈদেশিক নীতি কি হবে সে নিয়ে আমাদের কোনো শিরঃ-পীড়া ছিল না।।এখন ঐ বিষয় কানু ভিন্ন গীত নেই। অধুনা ডিহি পোদ্দালিয়া ২/১ক/ক নং থার্ড বাইলেন শালপাতা ঠোঙা-বিতরণীর সহ-শাখা-কমিটির রক থেকে আরম্ভ করে টাটা-বিড়লা-লীভার ব্রাদারজের গোপনতম আলোচনা কক্ষে ঐ এক কানুর গীত। যেমন মনে করুন এই যে ইংরেজ কমন মার্কেটে ঢোকার জন্য বেহায়া বেশরম হ্যাংলামোর চূড়ান্তে পেঁৗচেছে, টা-পেনি হে-পেনি লুক-সুমবের্গ বেলজিয়ামের মত দেশের পা চাটছে সর্ব ইজ্জৎ সর্ব ইমান আবরু বাকিংহাম প্রাসাদস্থ স্কেটিং করার পুকুরে গলায় পাথর বেঁধে বিসুহাথ পানীমে ডুবিয়ে দিয়ে—দ্য গলের প্রেতাত্মারূপী বর্তমান সরকার তাদের পশ্চাদ্দেশে দু-চার-খানা সবুট সরেস কিক্ কসাবে না তো—গোষ্ঠ-সমদ যে রকম পেনালটি পেলে, কালী (মোলা) আলী ফোকটে বেমক্কা নাহক্কো পেনালটি পেলে যে-রকম কালী আলীর (কালীঘাট মোলা আলী) কাছে পুজো শিরণী মানৎ করে।

এই সব এবং অন্যান্য নানাবিধ কারণে—ট্রেনজিসটারের সুলভতা ভুলবেন না—দেশের লোক, রকের রকফেলার এস্তেক পাড়ার পাদিপিসি পর্যন্ত নানা বিষয়ে এমনই ওয়াকিবহাল হয়ে গিয়েছেন যে ১৯৪৪ সনে যা ছিল কঠিন বিষয়-বস্তু, স্পেশালাইজড তত্ত্বতথ্য, আজ তার অনেক কিছু হয়ে গিয়েছে ক ম ন ন-লে জ। যেমন ধরুন ১৯৪৪—চুয়াল্লিশ কেন প্রায় ১৯৫২।১৯৫৩ অর্থাৎ যত দিন না নাপাক সরকার উভয় বঙ্গের যাতায়াতের জন্য "ভিজা"-প্রথা প্রচলন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গসন্তান চোখের জলে নাকের জলে শিখলো, ভিজা কারে কয় এবং প্রথম আপন সরকার—ভারতীয় হলে ভারত সরকার পাকিস্তানী হয়ে পাক সরকারের কাছ থেকে যে সর্বপ্রথম দশ টাকা না পনেরো টাকা খর্চা করে একখানি পাসপর্ট যোগাড় করতে হয়। তার জন্যে কিউয়ে দাঁড়াও, ফর্ম বের করো এবং বিরাটতম চার পৃষ্ঠাব্যাপী তিন দফে (ইন্ ট্রিপলিকেট!) সেগুলো ফিল আপ করো। পাক্কা দেড়ঘণ্টা থেকে দু'ঘণ্টা লাগে, মশয়।

এই ফর্ম যদি আপনি স্বয়ং ফিল আপ করেন তবে আন্তর্জাতিক প্রাথমিক আইনকানুন সম্বন্ধে আপনার বেশ খানিকটে জ্ঞান হয়ে যাবে।

কিন্তু দোহাই ধর্মের, আপনার নিরাপত্তার জন্যে তথা পাসপর্ট আপনি আখেরে যেন পান তার জন্য আপনি সে-ফর্ম স্বয়ং ফিল আপ না করে করাবেন ঐ আপিসের আশেপাশে যে সব প্রফেশনাল ফর্ম ফিল আপ করেনওলারা আছে। অপরাধ নেবেন না; বেহারী ভাইয়ারা যে রকম ইটালিয়ান ব্যুরোতে, অর্থাৎ ইঁটের উপর বসে প্রফেশনালকে দিয়ে মনিঅর্ডার ফর্ম ফিল আপ করায়। হুবহু সেই রকম। অ। আপনি বুঝি ইংরিজীতে এম এ ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট, পি এচ ডি, ডি লিট। তাই আপনার দেমাক। কোন্‌খানে ব্লক ক্যাপিটেল হরফে লিখবেন আর কোন্‌খানে সাদামাটা হরফে, যে সব জায়গা দফতর ফিল আপ করবে, করে ফেললেন আপনি, যে জায়গাটা শুদ্দুমাত্র খালাসীদের (যারা একদা পাকিস্তানী ছিল কিন্তু অধুনা ইণ্ডিয়ান, আবার কখন রঙ বদলাবে তার স্থিরতা নেই এবং ইতিমধ্যে বেআইনী কায়দায়—যার জন্য তিন মাসের তরে শ্রীঘর শ্বশুরালয়—যে যোগাড় করেছে তিন-তিনখানা পাসপর্ট: প্রথমটাতে সে ভারতীয় নাগরিক, দ্বিতীয়টাতে সে পাক্কা ব্রিটিশ, তৃতীয়টাতে সে পাকিস্তানী। পুলিস সন্দেহ করে শুধোলে সে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলবে সে ভারতীয় এবং ভারতীয় পাসপর্ট তার ছিল কিন্তু সেটা খোয়া গেছে: তার মতলব আরেকখানা পাবার। পেলে এটা বা আগেরটা বিক্রী করে দেবে। এই কলকাতাতেই যারা নোট জাল করে তারা স্পেয়ার টাইমে করে পাসপর্ট জাল। এরা সে পাসপর্ট কিনে নিয়ে অত্যুৎকৃষ্ট কেমিকাল দিয়ে খালাসীর ফোটোগ্রাফ সেই পাসপর্ট থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। যে ব্যক্তি গুণ্ডা বা ফেরার বলে পাসপর্ট যোগাড় করতে পারে নি তার ফোটো ছাপা হবে সেখানে—জায়গাটায় নতুন ফোটো কেমিকাল লাগিয়ে।...এতে বেশ কাঁচা দু-পয়সা আমদানি হয়। খিদিরপুর অঞ্চলে নাকি একটা "(প্রাইভেট) লিমিটেড" কোম্পানী হয়েছে—ভাবছি কিছু শেয়ার কিনবো) সেটা ফিল আপ করে

বসলেন আপনি। সে ভুলটা ধরিয়ে দেবে আপনারই এক ভাগ্নে—"উনিশটিবার ম্যাট্রিক সে/ঘায়েল করে থামলো শেষে।" তখন ছিঁড়ে ফেলুন সেই তিনপ্রস্থ ফর্ম, ফের দাঁড়ান কিউয়ে—ফের, ফিনসে। আর সব চেয়ে মারাত্মক অদৃশ্য ফাঁদ যেটি সদাশয় সরকার, অবশ্য অতিশয় অনিচ্ছায় কিন্তু সরকারী পয়সার যাতে অপচয় না হয় সেই শুভ ব্রত গ্রহণ করে আপনার জন্য পেতেছেন। "অদৃশ্য" কেন বললুম এখখুনি বুঝতে পারবেন। আমরা তথা পাকিস্তানীরা বিলেত ফ্রান্সের তুলনায় তো সবে স্বরাজ পেয়েছি। আমাদের সরকারকে কোন্ কোন্ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে হয় সে-সম্বন্ধে খুব একটা স্পষ্ট ধারণা নেই। ইংরেজ একদা যে সব প্রশ্ন শুধোত তার বেশ-কিছু বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে—মহারাণীর রাজত্ব যেন হিটলারের "সহস্রবর্ষের রাইষ"-এর মত অজরামর হয়ে থাকে। মহারাণীর রাজত্বে যেন কস্মিনকালেও—মহাপ্রলয়ে তাবৎ মণ্ডলসমূহ তথা অগণিত নক্ষত্ররাজি লোপ পাওয়ার পরও সূর্য কখনো অস্তমিত না হয়।৫···তা সে যাক গে। এখানে পাসপর্ট ফরম তৈরী করার সময় ভারতীয় হুজুরদেরই স্থির করতে হয় আমরা কোন কোন প্রশ্ন শুধবো। পয়লা ঝটকাতেই সব প্রশ্ন হুজুরদের মনে আসে না। পরে হঠাৎ চিৎকার করে ওঠেন, "ঐয্যা! অমুক প্রশ্নটা তো শুধনো হয় নি!" কিন্তু হায় তখন তো আর তাবৎ ছাপা ফর্ম বাতিল করে দেওয়া যায় না। তাই বের করলেন এক নয়া কৌশল। নূতন প্রশ্ন রবর স্ট্যাম্পে বানিয়ে নিয়ে চাপরাসীকে দিলেন হুকুম,"প্রত্যেক ফর্মে মারো এই ইস্টাম্পো।" চাপরাসী ভটাভট সেই কর্ম করতে লাগলো ফর্মের এক সংকীর্ণ কোণে। এখন হয়েছে কি, আপনি পেলেন ৩৭৩৮৫ নম্বরের ফর্ম। ততক্ষণে রবর স্ট্যাম্পের হরফগুলো সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে সেটি হয়ে গিয়েছে নখের মত পালিশ। তখন ফর্মে একটা ঝাপসা ঝাপসা ফিকে বেগনী রঙের কুয়াশা-কুয়াশা মাত্র দেখা যায় —অবশ্য আপনি যদি সেটি সাতিশয় মনোযোগসহ নিরীক্ষণ করেন। সেটা দেখে আপনার মনে কিছুতেই সন্দেহ হবে না যে এটা খয়ে যাওয়া রবর স্ট্যাম্পের অবদান—আপনি যতই সন্দেহ-পিচেশ হোন না কেন? অ! ভুলে গিয়েছিলুম আপনি ইংরিজীতে ডি. লিট কিংবা যাই হোন না কেন, যেখানে কোনো অক্ষরের চিহ্নমাত্র নেই তার পাঠোদ্ধার করবেন কি করে? তাই আপনি নিশ্চন্ত মনে ফর্ম পাঠিয়ে দিলেন হেড আপিসে। এক মাস পরে সেটি এল ফেরত। এবং সঙ্গে লেখা আছে "আপনি অমুক নম্বর প্রশ্নের উত্তর দেন

৫ এই বেত্তমীজ বড়ফাট্টাই শুনে এক ফরাসী বলেছিল, "কিছু ভয় কোরো না, মিঞা। করুণাময় পরমেশ্বর তোমাদের কসাইসুলোভ "করুণ" হস্তে ভারতীয় তথা অন্যান্য "কালা আদমী"দের তুলে দিয়ে ডাইনীর হাতে পুত্র তুলে দেওয়ার মত জবরদস্ত গুণা করার পর হুজুরের হুশ হল। তিনি তোমাদের হাতে অন্ধকারে কালা-পীলা আদমীদের কোন ভরসায় এখন ছাড়েন। তাই তিনি সূর্যাস্ত একদম বন্ধ করে দিয়েছেন।

নি কেন ?" আপনি খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে যাবেন সে প্রশ্নটা কোথায় ? শেষটায় হার মেনে যাবেন সেই প্রফেশনালের ইঁটের পাঁজাতে। সে লেটেস্ট খবর রাখে। সে সেই বেগনী কুয়াশার মধ্যিখানে সঠিক জায়গায় উত্তরটি লিখে দেবে। শুধু কি তাই ! আপনি যে সব উত্তর দিয়েছেন আপনার জ্ঞান আপনার বিবেক অনুযায়ী সেগুলো চেক্ অপ্ করতে করতে সে বিষম খাবে, আঁতকে উঠবে আর গোঙরাতে গোঙরাতে বলবে, "এসব কি উত্তর দিয়েছেন। বরঞ্চ আপনার কৃষ্ণপ্রাপ্তি হলেও হতে পারে কিন্তু এসব উত্তর দিলে পাসপর্ট-প্রাপ্তি হবে না।" সে জানে, হুজুররা কি উত্তর শুনতে চান এবং শুধু তাই নয়, আজ কি উত্তর শুনতে চান, মত পালটে পরশু দিন ফের কোন্ উত্তর শুনতে চান। সে নূতন ফর্ম তার বাক্স থেকে বের করবে—আপনাকে ফের কিউয়েতে ধন্না দেবার 'গন্ধযন্তনা' থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে—এবং এমন সব আকাশকুসুম, সোনার পাথরবাটি উত্তর লিখবে যে এবারে আপনার বিষম খাবার, আঁতকে ওঠবার পালা।

কিন্তু আপনি পাসপর্ট পেয়ে যাবেন। যদিস্যাৎ না পান তবে জানবেন অন্য কোনো ব্যাপারে আপনার জীবন "নিষ্কলঙ্ক" নয়। পুলিস আপনার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে, কিংবা আপন ফাইল (দাঁসিয়ে) থেকে আবিষ্কার করেছে, আপনি ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে রুশ লেখক গর্কি'র "মাদার" পড়েছিলেন, কিংবা—ওয়েল নেভার মাইণ্ড—"কিছু একটা" আছে।

এমন সময় আপনার এক উকীল বন্ধু আপনাকে বললে, "সংবিধানে প্রত্যেক ভারতীয়কে জন্মগত অধিকার দিয়েছে, যত্রতত্র গমনাগমনের স্বাধীনতা। ঠোকো মোকদ্দমা। পেত্যয় যাবেন না, আপনার চেয়েও শতগুণে তালেবর এক খলিফে ব্যক্তি সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত লড়ে বিদেশ যাবার পাসপর্ট পেয়েছিলেন। তিনি বগল বাজিয়ে প্লেনের টিকিট কাটতে ধাওয়া করেছিলেন কি না জানি নে, আমরা হুঁশিয়ার করছি,

ঘুঘু দেখেই নাচতে শুরু
ফাঁদ তো বাবা দেখোনি।

কিংবা "না আঁচিয়ে" ভরসা কই ! কিংবা সুকুমার রায়ী ভাষায়

কেই বা শোনে কাহার কথা
কই যে দফে দফে।
গাছের পরে কাঁঠাল দেখে
তেল দিয়ো না গোঁফে ॥

পাসপর্ট পাওয়ার পর একটি

বৈষ্ণব হইতে মনে গেল বড় সাধ।
তৃণাদপি শোলোকেতে ঘটালো পরমাদ ॥

সে তৃণটি এস্থলে 'পী ফরম্'। বিদেশের হোটেলে তো আপনাকে মুফতে থাকতে দেবে না, রেস্তোরাঁতে মাগনা খেতে দেবে না, অতএব আপনার বিদেশী মুদ্রার প্রয়োজন। সে মুদ্রা ক্রয় করার তরে আপনি দিশী মুদ্রা দিতে প্রস্তুত,

কিন্তু "পী ফর্মের" পীঠস্থান রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সবিনয় বলবে, "এদানীর বিদেশী অর্থের বড়ই অনটন। সরি!" কথাটা খুবই সত্য, সে-কথা আমি কোনো ব্রাহ্মণ বন্ধুর কাছ থেকে পৈতে ধার করে সেইটে ছুঁয়ে কসম খেতে রাজী আছি।

সবই জানি। শুধু জানি নে, পাসপর্ট না পেলে যে-রকম মোকদ্দমা করা যায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিদেশী কড়ি না দিলে তার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করা যায় কি না।

এ পর্যায়ে কিন্তু একটি শেষ কথা না বললে অন্যায় হবে। কর্তারা যে যাকে তাকে চট করে বিদেশ যেতে দেন, তার প্রচুর কারণ আছে! কিন্তু সেকথা আরেক দিন হবে।

মোদ্দা কথায় ফিরে যাই।

ত্রিশ বৎসর পূর্বে এই সব বহুবিধ যাবতীয়, হরেকরকম্বা সমস্যা সম্বন্ধে সবাই ছিল উদাসীন। মার খেয়ে খেয়ে, এবং তার চেয়েও নির্মমতর অভিজ্ঞতা —পয়সাওয়ালা কি করে সর্ববাধা অতিক্রম করে সর্বত্র যাতায়াত করেন বিজনেস-মেন দেশের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য বিদেশে যাবার তরে সর্ব ছাড়পত্র সংগ্রহ করে ড্যাংড্যাং করে রওয়ানা দিলেন, আপনি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন, সে তো বুঝি, কিন্তু সঙ্গে তাঁর বিরাটকলেবরা ভামিনী গোটাদুত্তিন বালক পুত্র এবং কন্যা—এনারা যাচ্ছেন দেশের কোন্ "সম্পদ বৃদ্ধি" করতে, এবং এনাদেরই একজন

উনিশটিবার ম্যাট্রিকে সে
ঘায়েল করে চললো হেসে
বিলেত কিংবা ওয়াশিংটন
মুদ্রা মেলা, হাজার টন।

এ তো বিদেশের কথা। কটা লোকই বা বিদেশে যাবার মত রেস্ত ধরে! দেশের ভিতরকার সমস্যাই বা কিছু ছেড়ে কথা কয় নাকি? একদা, ভূমিকম্প হলে, যথেষ্ট বৃষ্টিপাত না হলে, টাইগার হিল থেকে কুয়াশার দরুন কাঞ্চনজঙ্ঘার দর্শন না পেলে, বাঁজী পাঁঠি বাচ্চা না বিয়োলে অন্যথা বউ সাত নম্বরের বাচ্চা বিয়োলে, পর্যাপ্ত পরিমাণে স্কচ চুকুস চুকুস করে না চাখতে পারলে, গণ্ডায় গণ্ডায় রামমোহন রবি ঠাকুর না জন্মালে আমরা "বণিকের মানদণ্ড"-র উত্তরাধিকারিণী মহারাণীর (পাড়ার ঘোষাল বলতো, ব্যাটাদের ঘিনপিতও নেই —বেনের এঁটো গরগর করে খেল রাজার বেটা-বেটি) বাজার সরকার বড়লাটের খুলিতে ডবল বম্ ফাটাবার চেষ্টা করতুম—অবশ্য সঙ্গোপনে মনে মনে।

সুস্থাবস্থায় কিন্তু সেই মনেই অতিশয় বেয়াদব প্রশ্ন শুধতো এসব বর্গীদের "খাজনা দেব কিসে?"

গুরু বড় দুঃখে বলেছিলেন, "শ্মশান থেকে মশান থেকে ঝোড়ো-হাওয়ায় হা হা করে উত্তর আসে আব্রু দিয়ে, ইজ্জৎ দিয়ে, ইমান দিয়ে—বুকের রক্ত দিয়ে।"

একই নিঃশ্বাসে গুরুর সেই ভবিষ্যৎ বাণীর সঙ্গে আমার পরবর্তী যুগের অক্ষম সাবধান বাণীর কথা তুলি কোন পাপমুখে ? কিন্তু পাঠক ক্ষণতরে চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন, এটা আমার দম্ভ নয়। ঝাড়া তিনটি মাস মেসের ভাত না খেলে (কিংবা উপস্থিত আমি যে নার্সিং হোমের ঘুটে খাচ্ছি যে বস্তুর অভিজ্ঞতা না থাকলে) মায়ের রান্নার প্রকৃত মূল্য কে কখন বুঝতে পেরেছে ? যুধিষ্ঠিরকে যে নরক দর্শন করানো হয়েছিল সেটা বিধাতার কোন উটকো খামখেয়ালী নয়। নইলে স্বর্গপুরীর অপ্সরাদের সঙ্গে দুদণ্ড রসালাপ বিশ্রম্ভালাপ করার পূর্ণানন্দটা তিনি তারিয়ে তারিয়ে চাখতেন কি প্রকারে ? গব গব করে গিলতেন, আমরা যে-রকম মেসের রান্না হড় হড় করে গিলে রেকর্ড টাইমে পাপ বিদেয় করি।…এইবারে শ্যানা পাঠক নিশ্চয় বুঝে ফেলেছেন, আমার প্রবন্ধ সাতিশয় মনোযোগ সহকারে পঠন কেন অবশ্য কর্তব্য, একান্ত অবর্জনীয়। তার চেয়েও ইম্পর্টেনট প্রবন্ধ : তার চেয়ে আরো ইমপরটেনট কর্তব্য, আমার বই কিনুন —চাই পড়ুন, চাই না বা পড়ুন।

ত্রিশ বৎসর পূর্বে আমি পুনঃ পুনঃ বলেছিলুম, "আরো কঠোরতর, আরো নির্মমতর খাজনা দিতে হবে স্বরাজ লাভের পর ? এইবেলাই যদি সে-খাজনার সন্ধান না নাও তবে তোমার কপালে বিস্তর গর্দিশ আছে। এই দেখুন না আজ পূর্ব বাঙলার হাল। কাল যে পশ্চিম বাঙলায় হবে না তার আশ্বাস দেবেন কোন্ পলিটিকাল গোঁসাই ?—আমি অবশ্য এসব দুর্যোগের ভবিষ্যৎ বাণী আপ্তবাক্য রূপে প্রকাশ করি নি। কিন্তু যা-কিছু নিবেদন করেছিলুম সেটা কেউ কান পেতে শোনে নি। (বলতে ইচ্ছে করছে এখন তবে খাও কানমলা, "কান টানলে মাথা আসে" সেটা যেমন সত্যি, ঠিক তেমনি সত্যি "কান না পাতলে কানমলা খেতে হয়")।

ও঱া বলতেন বা ভাবতেন, আমার বক্তব্য স্পেশালাইজ্ড নলেজ ; এসব এখন তকলীফ বরদাস্ত করে আমরা পড়বোই বা কেন, বুঝতে যাবোই বা কেন ? আগে স্বরাজ আসুক তারপর অন্য কথা। আমি সবিনয় বলেছিলুম, "রাঁধে মেয়ে কি চুল বাঁধে না ?"

মার খেয়ে অপমান সয়ে সয়ে আমরা এখন অনেক কিছু শিখে ফেলেছি— এই যেমন খানিকক্ষণ আগে পাসপর্ট কি প্রকারে পেতে হয়, সেটা পাওয়ার পরও আপনার কপালে আর কোন্ কোন্ গর্দিশ আছে সে সম্বন্ধে অতিশয় যৎকিঞ্চিৎ সাতিশয় সংক্ষেপে নিবেদন করেছি।

তারই ফলে একদা যে সব তথ্য নিয়ে শুধু স্পেশালিশ্টরা আলোচনা করতেন, যেগুলো নিছক "স্পেশালাইজ্ড্ নলেজ" ছিল—এখন সেগুলো হয়ে গিয়েছে ডাল-ভাত "কমন নলেজ"। একদা যেমন বিশেষজ্ঞরাই শুধু মাথা ঘামাতেন, পৃথিবী ঘোরে না সূর্য ঘোরে, পরবর্তী যুগে সেই সমস্যার সমাধান কমন নলেজ হয়ে দাঁড়াল !

চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বঙ্গসন্তান "আমার য়ুরোপ ভ্রমণ", "লণ্ডনে বঙ্গ মহিলার ঘরকন্না", "নরওয়েতে প্রথম বঙ্গরমণী" উৎসাহ ও কৌতুহল সহকারে

পড়তো। এখন এত শত লোক নিত্য নিত্য বংগো ইন্ কংগোতে উইক এণ্ড্ কাটাতে যায়, জবলুল্ অল্ অল্-বীরাতে হানিমুনের প্রথমার্ধ চুষে আসে যে "ক্রান্স ভ্রমণ" কিংবা "মন্তে কার্লো দর্শন" শিরোনামা এখন সে অবজ্ঞার চোখে দেখে, লেখক পরিচিতজন হলে গেরেমভারি মুরুব্বীর মত তাকে পেট্রোনাইজ করে পিঠ চাপড়ে বলে, "লেগে থাকো ছোকরা; এখনো হাদ্রামুৎ অঞ্চলে অমুসলমানকে ঢুকতে দেয় না বটে কিন্তু তুমিই হয়তো একদিন সেখানকার সেই বিরাট প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ যেখানে একদা শেবা'র রানী বাস করতেন সেইটে সকলের পয়লা দেখে এসে তাবৎ গৌড়জনকে তাক লাগিয়ে দেবে।"

একদা আমি "দেশে-বিদেশে" নাম দিয়ে কাবুল সম্বন্ধে একখানা পুস্তক রচনা করি। প্রকাশকালে বইখানা কিছু লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শুনেছি, এখনো নাকি কেউ কেউ বইখানা পড়ে। আমি জানি, কেন? তার একমাত্র কারণ যদিও কাবুল পৃথিবীর অন্যপ্রান্তে অবস্থিত নয়, এবং উত্তর মেরুতে অভিযান করার মত বিপজ্জনকও নয়, তবু একাধিক কারণে—প্রধানতম কারণ অবশ্য এই যে আফগান সরকার চট করে সব্বাইকে ও-দেশে যাবার অনুমতি-লাঞ্ছন ভিজা-পারমিট মঞ্জুর করে না, এবং এই একটি কারণই পূর্বে উদ্ধৃত "তৃণাদপি শোলকের" মত কাবুলগামীর সম্মুখে অলংঘ্য প্রতিবন্ধন; কাবুলী প্রবাদও বলে—"সিংহের এক বাচ্চাই ব্যস (যথেষ্ট)।" বইখানি তাই এখনো লিক্‌লিক্ করে টিকে আছে।

গৌড়জনের কমন নলেজ এ-কালে এতই সুদূরবিস্তৃত—ভয়ে ভয়ে বলি, কুলোকে বলে শুদু বিস্তারই আছে—গভীরতা আদৌ নেই এবং সে-বিস্তারও নাকি বড্ড পল্লবগ্রাহী—যে তাদের মন পাওয়া প্রতিদিন কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। শুনতে পাই, বিকৃত যৌনজীবন, এবনরমাল সেক্‌স্, সমকাম, সাদিজ্‌ম্, মাসোখিজ্‌ম্, পিকচার পোস্টকার্ড, ব্লু ফিলম ইত্যাদি ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়বস্তু বেহদ্দ রগরগে ভাষায়, সর্ববিধ অসম্ভব অসম্ভব ফোটোগ্রাফ-সহ পরিবেশন করলেও তাঁরা যে শুধু নাসিকা কুঞ্চিত করেন তাই নয়, বাঁ দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে, ডান ভুরু ঈষৎটাক উত্তোলন করে বলেন, "ছোঃ! চাঃ!! পুঃ!!! এগুলো আবার কি? ক-অ-অ-বে কোন আদ্যিকালে এ-সব তো কমন নলেজেরও নিচের স্তরে নেমে গিয়েছে। পুলিসের নাকের সামনে পেভমেণ্টে বিক্রী হয়, জলের দরে। শোনো নি বুঝি—'থাকো কোন্ ভবে কোন্ দুনিয়ায়?'—যবে থেকে ডেনমার্কে এসব মালের উপর থেকে ব্যান তুলে দেওয়া হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে তার বিক্রি দশ আনা পরিমাণ কমে গিয়েছে! তাবৎ বস্তু, সাকুল্যে বিষয় ব্যান তুলে দেওয়ার ফলে যখন তিন দিনের ভিতর কমন নলেজ হয়ে গেল, তখন আর ওসব মাল কানা কড়ি দিয়েও কিনবে কে? শুনেছ, এখন নাকি দিনেমার প্রকাশক ওসব মাল তালাক দিয়ে ধর্মগ্রন্থ ছাপবে! সেক্‌স্ যখন স্পিরিচুয়াল লেভেলে উঠে গিয়েছে তখন স্পিরিচুয়াল বই অর্থাৎ গ্রন্থ ছাপানোই প্রশস্ততর।"

হ্যাঁ, তদুপরি আরেকটি খবর আমি কাগজে পড়েছি। তত্ত্বটি আমি বাল্য-

কালেই শুনেছিলুম। "পরিপূর্ণ স্বাদ পেতে হলে চুম্বনটি চুরি করে নিতে হয়।" "এ কিস টু বী দি সুইটেসট্ হ্যাজ টু বি স্টোলেন।" সম্মানিত মার্কিন কাগজে পড়লুম, নাম ছিল "লেডি চ্যাটারলিজ লয়ারজ"—"লাভারজ" নয়—অর্থাৎ কি না মার্কিন মুলুককে যখন লেডি চ্যাটারলি কেতাবখানা অশ্লীল কিংবা কাব্য-রসের অত্যুৎকৃষ্ট উদাহরণ কি না ঐ নিয়ে মোকদ্দমা উঠলো তখন এক বাঘা উকিল বিচারগৃহ প্রকম্পিত করে ওজস্বিনী ভাষায় তাঁর সুদীর্ঘ বক্তৃতা শেষ করে আবেগোচ্ছল কণ্ঠে বললেন, "ধর্মাবতার তথা সম্মানিত জুরি মহোদয়গণ। লেডি চ্যাটারলি পুস্তকে গ্রন্থকার যে অপূর্ব কলানৈপুণ্য ও সত্য শাশ্বত সাহিত্যরস সৃষ্টি করেছেন তাই নয়, যৌনজীবনকে তিনি স্পিরিচুয়াল লেভেলে (আধ্যাত্মিক স্তরে, তুলে নিয়েছেন, তুলে ধরেছেন।"

এই শেষ অভিমতটি শুনে এক পরিপক্কা সমাজে সম্মানিতা ফরাসী নাগরী মৃদু দুষ্টু মেয়ের স্মিত হাস্য হেসে বললেন, "সর্বনাশ! আমি তো এ্যাদ্দিন জানতুম যৌন সম্পর্কটা নিষিদ্ধ পাপাচার। এখন থেকে ঐ আনন্দের অর্ধেকটাই মাঠে মারা গেল।"

নিষিদ্ধ হোক্, কিংবা পুলিসসিদ্ধ তথা শাস্ত্রসম্মত হোক আর নাই হোক বিদগ্ধ গৌড়ীয় পাঠক এখন চান কড়াপাকের মাল, তত্ত্ব ও তথ্য সম্বলিত—একদা যে রকম "নৃত্যসম্বলিত" গ্রামফোন রেকর্ড সাদামাটা রেকর্ডের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিল। অর্থাৎ পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর আগে আমি যে সওগাৎ পরিবেশন করেছিলুম তাঁরা অধুনা সেই বস্তু চান।

কিন্তু আমি পোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরাই।

ইতিমধ্যে আবার অন্য দিক থেকে আরেক বিপরীত বায়ু বইতে আরম্ভ করেছে। জীবনসংগ্রাম কঠোরতর হয়েছে, পাপাচারের উত্তাল তরঙ্গ গিরিচূড়া লঙ্ঘন করে ঊর্ধ্বমুখে উৎক্ষিপ্ত, দিনান্তে বলীবর্দের ন্যায় কর্মক্লান্তজন স্বগৃহে পেঁছিবে না টিয়ার গ্যাসে অন্ধ হবে এবং/কিংবা গুলি খেয়ে পঞ্চভূতে লীন হবে সেই দুশ্চিন্তায় সে ম্রিয়মাণ মোহ্যমান।

ঠিক এই একই অবস্থাতে ফরাসী সাহিত্যের তদানীন্তন গ্রাঁ মেৎর্ (গ্র্যান্ড মাস্টার) কি উপদেশ দিয়েছিলেন সেটি অবহিত চিত্তে শ্রবণ ক'রে কর্ণ সার্থক তথা পুণ্যার্জন করুন।

প্যারিসের এক অসহিষ্ণু "গাঁব" অর্থাৎ যিনি অবোধ্য মডার্নস্য মডার্ন গাবিতা লেখেন আনাতোল ফ্রাঁসকে প্রায় শাসিয়ে হুঁশিয়ার করে তালিম দেন, "কবিতা পড়াটা কিছু ছেলেখেলা নয়, যে ছ্যাবলামো এ্যাদ্দিন ধরে চলে আসছে। "মডার্ন" কবিতা আগাপাস্তলা সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু।[৬] এ "কবিতা"-দেউলের প্রতি

৬ পঞ্চাশাধিক বৎসর পূর্বে যখন মডার্ন কবিতা (গাবিতা) তার বিজয়াভিযানের উত্তুঙ্গ শিখরে তাণ্ডব নৃত্যে নিমগন তখন কতিপয় গুণীজ্ঞানী লণ্ডনে একটি বিতর্ক সভা আহ্বান করেন। বিষয়বস্তু "আধুনিক কবিতা বনাম প্রাচীন ("রোমান্টিক, 'সাবেকী) কবিতা। দুই পক্ষ আপন আপন বক্তৃতা শেষ করায়

পাঠককে তীর্থযাত্রীর ন্যায় অবনত মস্তকে অগ্রসর হতে হয়। ভক্তিশ্রদ্ধা তথা (সুচ্যগ্রেণ সুতীক্ষ্ণেণ) একাগ্রতা সহ মডার্ন পোয়েট্রির দ্বারস্থ হতে হয়।" ("মডার্ন পোয়েট্রি শুড্ বি এপ্রোচট উইদ ডিভোশন অ্যান্ড কনসানট্রেশন")

এ-উদ্ধৃতি দেওয়ার পর ক্লাস যেন দিবাদ্বিপ্রহরে সাক্ষাৎ যমদূতের দর্শন পেয়ে সাতঙ্কে ভগবানকে স্মরণ করছেন—যে ক্লাস আযৌবন প্রকাশ্যে একাধিক-বার তাঁর নাস্তিকতা প্রচার করেছিলেন; এর থেকেই সর্ব আস্তিক সর্ব নাস্তিক অনায়াসে বুঝে যাবেন সেই 'গবির আপ্তবাক্য' শুনে তাঁর হৃদয়ে কী মারাত্মক গগনচুম্বী পাতালস্পর্শী ভীতির সৃষ্টি হয়েছিল। উচ্চকণ্ঠে সৃষ্টিকর্তাকে আবাহন জানিয়ে প্রার্থনা করছেন:

"হেভ্ন্ ফর্বিড্!" দেবভাষায় বলা হয় "ঈশ্বর রক্ষতু", মুসলমান বলে "লা হাওলা কুয়োতি ইল্লা বিল্লা।" বাঙলায় এস্থলে ঠিক কি বলা হয় জানি নে। ভূত দেখলে লোকে রাম নাম স্মরণ করে অবশ্য। কিন্তু এস্থলে প্রার্থনা রয়েছে, নাস্তিক ক্লাস বলছেন, "ঈশ্বরাদেশে এ-হেন অপকর্মে যেন বিরত হয়।"

এর পরই ক্লাস বলেছেন, "আমি জানি বেচারী (সাধারণ) ফরাসীকে সমস্ত দিন সামান্য রুটি-মাখমের জন্য কী রকম মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়।"

এস্থলে এগোবার পূর্বে পাঠককে ফের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, "ত্রেতা" যুগটি আমি লিখছি ("দ্বাপরের" পরে। কেন, সেটা যাঁরা তাপসী অহল্যার কাহিনী পড়েছেন তাঁরাই জানেন) হাসপাতালে। (যদিও খানদানী ভাষায় এটি "নার্সিং হোম" বা "মেডিকাল সেণ্টার" নামে সগৌরবে প্রচারিত, তথাপি আমার সামান্য অভিজ্ঞতা প্রতিবাদ জানিয়ে অজ্ঞজনকে হুঁশিয়ার করে বলে, এটা 'হোম' তো নয়ই, এবং আচার আচরণ, প্রাচীন যুগীয় সাজসরঞ্জাম দেখে মনে হয়, 'মেডিকাল সেণ্টার'-এর নাম পালটে এটাকে 'মেডীঈভাল—মধ্যযুগীয়—কান্তার' নাম দিলেই এর প্রতি সত্য বিচার করা হয়, কিংবা 'মেডীঈভাল হাণ্টার'ও বলতে পারেন,

---

পর সভাপতি গ্র্যাণ্ড মাস্টার এড্মাণ্ড গস্ (ইনিই বোধ করি তরু দত্তের ইংরিজী কবিতা পুস্তকের অবতরণিকা বা এবং শ্রীমতীর পরিচিত পত্রিকা লিখে দেন। ইনি সাহিত্যরস আস্বাদনে এবং তার মূল্যায়নে অদ্বিতীয় ছিলেন) বলেন, "কবিতা মাত্র দু'রকমের হয়; উত্তম কবিতা ও নিকৃষ্ট কবিতা।. মডার্ন (অর্বাচীন) কবিতা ও ওল্ড (প্রাচীন) কবিতা এ রকম কোনো ভাগাভাগি বা শ্রেণীবিভাগ করা যায় না।

৭ এ তত্ত্বও এমন কিছু "আমরি আমরি মার্কা শিক্ (chic), দের্নিয়ে ক্রী (dernier cri), আ লা মদ্ (a la mode) অভিনয় নয়। চার্লস ল্যাম্ (lamb) বহু পূর্বেই বলেছেন, আহার আরম্ভের পূর্বে আমরা যে রকম প্রার্থনা করি (গ্রেস পড়ি) উত্তম কাব্য পাঠের পূর্বেও সে-রকম উপাসনা করা কর্তব্য। এবং ভিন্ন ভিন্ন কাব্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা। ল্যাম্ অবশ্য সুপ্রতিষ্ঠিত যশলব্ধ কাব্যের জন্যই—যে-সব কাব্য সেঞ্চুরি এগজামি-নিশেন পাস করেছেন (শতাব্দী বিজয়ী কাব্য) -এই নবীন ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন।

এবং এখানে কি 'শিকার' হয় তার আলোচনা করে অসুস্থ শরীর নিয়ে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে চাই নে)। সবসুদ্ধ মিলিয়ে এখানকার কর্তৃপক্ষই স্মৃতিভ্রষ্ট হন, আমি যে আনাতোল ফ্রাঁসকে উদ্ধৃত করার সময় পর্বতপ্রমাণ ভুলভ্রান্তি করবো সেটা অত্যন্ত স্বাভাবিকএবং "কার্সিং" (প্রুফরীডার মশাই, আমি 'কার্সিং' 'অভিসম্পাত' 'অভিশপ্ত'-ই লিখেছি—সজ্ঞানে ; "নার্সিং" লিখি নি) "বম্" বাবদে যাঁদের সমান্যতম অভিজ্ঞতা আছে, অর্থাৎ এ-পুরী থেকে সুস্থ অস্থি নিয়ে নিতান্তই ভগবদ্‌কৃপায় বেরুতে পেরেছেন তাঁরা যে আমাকে ক্ষমাসুন্দর চক্ষে দেখবেন সেটা ততোধিক স্বাভাবিক।

ফ্রাঁস বলেছেন, "বেচারী ফরাসী যখন ক্লান্ত দেহে শ্লথ পদে বাড়ি পেঁৗছে একখানা পুস্তক হাতে তুলে নেয় (অর্থাৎ, অত্যধিক মদ্যপান করে বউকে না ঠেঙিয়ে, কিংবা ঝটপট জুয়ো খেলতে বসে বউ বাচ্চার জন্য দু'মুঠো অন্ন কেনার রেস্ত উড়িয়ে না দিয়ে—লেখক) তখন, ঈশ্বর রক্ষতু, আমি তার কাছ থেকে 'সশ্রদ্ধ একাগ্রতা' (ডিভোশন অ্যান্ড কনসানট্রেশন) মোটেই কামনা করি নে—" বলছেন ফ্রাঁস। তারপর তিনি যেন নিবেদন করছেন : "আমি যা দিতে চাই, এবং সেই আমার উজোড় করে দেওয়া, (অল্ আই উয়োণ্ট টু গিভ) তার যেন একটুখানি শ্রান্তি বিনোদন হয়, তার যেন একটুখানি ফুর্তি জাগে (রিলেকসেশন, এন্‌টারটেনমেন্‌ট্, এম্যুজমেণ্ট হয়)। এবং যেদিন ঐ সবের ফাঁকে ফাঁকে ঐ বেচারী ফরাসীকে কোনো প্রকারের কোনো ইনফরমেশন দিতে পারি, সেদিন আমার আনন্দের সীমা পরিসীমা থাকে না (মাই জএ নোজ নো বাউন্‌ড্‌জ)।"

দম্ভী মসিয়ো মরিসকে,—আমার পাঠকদের মধ্যে দম্ভী কেউ নেই, কিন্তু যদিস্যাৎ কোনো উটকো দম্ভী মাল ছিটকে এসে গোলে হরিবোল দিয়ে থাকেন তবে তাঁকে বলছি, অবহিতচিত্তে প্রণিধান করো, যে-ফ্রাঁসকে ফরাসীদেশের লোক গ্রাঁ মেৎর্, গ্র্যান্ড মাস্টার, গুরুদেব বলে একবাক্যে স্বীকার করে সাহিত্যের ময়ূর সিংহাসনে বসিয়েছিল তিনি কতখানি বিনয় সহকারে বলছেন, তাঁর "নগণ্য" অর্ঘ্য কি? এবং সেটা এমনি যৎসামান্য অকিঞ্চিৎকর যে তার জন্য কোনো পাঠকের কাছ থেকে কোনো প্রকারের ডিভোশন বা কনসান্‌ট্রেশন তিনি চান না।

এবং সর্বশেষে মসিয়ো মরিসকে একটুখানি ধূলি পরিমাণ উপদেশ দিচ্ছেন : "তদুপরি সর্বোপরি, হে মসিয়ো মরিস, তুমি যদি শতাব্দীর পর শতাব্দী ভ্রমণ করতে করতে পেরিয়ে যেতে চাও তবে হাল্কা হয়ে ভ্রমণ করো।" (ইফ্ ইউ উয়োণ্ট টু ট্র্যাভেল থ সেঞ্চুরিজ, ট্র্যাভেল লাইট!)

কী মহান আপ্তবাক্য! মরিস, তুমি যদি চাও যে তোমার রচনা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে লোকে পড়ুক, তবু সে-রচনার ঘাড়ে বিস্তরে বিস্তর ভারি মাল চাপিয়ো না। অর্থাৎ যে-মাল কনসানট্রেশন চায়, ডিভোশন চায়।

ব্যাসদেব এ-তত্ত্বটির প্রথম আবিষ্কারক। গণপতিকে যখন তিনি মহাভারতের ডিকটেশন নেবার জন্য মনোনীত করেন তখন তাঁর মাত্র একটি শর্ত ছিল, তুমি নিজে না বুঝে কোনো বাক্য লিখতে পারবে না।" গণপতি 'গণে'র অর্থাৎ সাধারণজনের, mass-এর প্রতিভু। অতএব তিনি লিখবেন সব কিছু নিজে

প্রথমটায় বুঝে নিয়ে যাতে করে জনগণও সব কিছু বুঝতে পারে। তাই বোধ হয় কাব্যতত্ত্ববিশারদ তলস্তয় মন্তব্য করেছিলেন, মহাভারতের মত কাব্য ইহসংসারে আর নেই।

আনাতোল ফ্রাঁস হুবহু এই আদর্শটিই শ্রীমান মরিসের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন।

অবনত মস্তকে, করজোড়ে, দাঁতে দাঁতে কুটো কেটে স্বীকার করছি, প্রাগুক্ত তত্ত্বটি আবিষ্কার করতে এবং সেটা হৃদয়ঙ্গম করতে আমার অনেকখানি সময় লেগেছিল। অবশ্য মসিয়ো মরিসের মত "সশ্রদ্ধ একাগ্রতার" প্রত্যাশা করার মত হিমালয় বিনিন্দিত উত্তুঙ্গ দম্ভ আমার কস্মিনকালেও ছিল না। আমি ভুল করেছিলুম অন্য ক্ষেত্রে। আমি মনে করেছিলুম দেশবিদেশ ঘুরে আমি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, একাধিক ভিন্ দেশে বাধ্য হয়ে যে দু'একটি ভাষা নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি, বহুবিধ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিরীক্ষণ এবং তার নির্যাস গলাধঃকরণ করেছি, নানান ধরনের নানান চিড়িয়ার সঙ্গে মোলাকাৎ-সহবাসের ফলে যে আদর-অনাদর, দাগা-মহব্বৎ পেয়েছি, প্রবাসের নিরানন্দ দিনে, নির্জন ত্রিযামা শর্বরীতে আকাশকুসুম চয়ন করেছি, দীর্ঘ, দীর্ঘকাল ধরে মাতৃবিরহের অসহ কাতরতা এবং তার চেয়েও নিষ্ঠুর উপলব্ধি যে পুত্রবিরহিণী আমার মা-জননী আমার চেয়ে কত লক্ষ গুণে কাতর নিরানন্দ নিরালোক দিনযামিনী যাপন করছেন আমার প্রত্যাগমন প্রত্যাশা করে—এর মধ্যে অসাধারণ অলৌকিক এমন কোনো সৃষ্টিছাড়া উপাদান-উপকরণ নেই যেটা আমার মত নিতান্ত সাধারণজনসুলভ সাধারণ ভাষায় প্রকাশ করলে গৌড়ীয় পাঠকের বোধগম্য হবে না, তাঁর দিকচক্রবাল অতিক্রম করে মহাশূন্যে বিলীন হবে না।

আমি জানতুম, এবং এখনো দৃঢ়বিশ্বাস পোষণ করি যে, হাড় আলসে, রকবাজীতে দিগ্বিজয়ী ফোকটে টু পাইস কামাবার তরে বাপের কামানো ফোর পাইস ঝট্‌সে ঝেড়ে দিতে প্রস্তুত, এবং পাড়ায় একটি সর্বজনসেবী পাঠাগার নির্মাণের জন্য হোক কিংবা নির্মাণান্তে দলাদলি বশতঃ সেটিকে বীরদর্পে ভস্মীভূত করাই হোক, উভয় মহৎ কর্মের জন্য, তদভাবে সর্বকর্মের জন্য, তদভাবে কর্মহীন "কর্মে"র জন্যই হোক, চাঁদা তোলাতে যে বাঙালী অদ্বিতীয়, অপরাজেয়, যে বাঙালী গত বিশ্বযুদ্ধের সময় ঐ মহৎ ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য হিটলার স্তালিনের চাঁদা তোলার প্রয়াস পদ্ধতি বর্ণনা শুনে "শিশু! শিশু!!" বলে অট্টহাস্য দ্বারা গোরশয্যাশয়ী ঐ দুই মহাপ্রভুকে লজ্জা, আত্মজুগুপ্সায় ঘন ঘন ঘূর্ণায়মান করাতে ভানুমতী বিশারদ, সেই বাঙালী, আবার বলছি, সেই বাঙালী—অন্য জাত যারা ভ্রমণব্যপদেশে কলকাতাতে এসে সভয়ে, আমাদের রঙ্গভূমি থেকে সম্মানিত ব্যবধান রক্ষা করে, আমাদের কীর্তিকলাপের খুশবাইটুকু মাত্র পেয়েছে তারা কিছুতেই প্রত্যয় যাবে না যে বাঙালী বই পড়ে।

হ্যাঁ বই পড়ে। অধিকাংশ স্থলেই অবৈধ কিন্তু মার্জনীয় পদ্ধতিতে। কিন্তু পড়ে।

তাই আমি হয়েদরে ধরে নিয়েছিলুম, আমার বক্তব্য বস্তু যতই হ য ব র ল মার্কা হোক না কেন সেটা তার কাছে কিছুতেই সম্পূর্ণ অপরিচিত হতে পারে না—নিতান্ত দু' একটি উৎকট ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়া। কারণ প্রকৃত পাঠকের কাছে কোনো বিষয়ই সম্পূর্ণ অজানা নয়, আবার কোনো বিষয়ই সম্পূর্ণ জানা নয়। তাই এক আরব গুণী বলেছেন, "পুস্তক, সে যেন একটি ছোট্ট বাগান, যেটি তুমি অনায়াসে পকেটে পুরে সর্বত্র নিয়ে যেতে পারো।" যখন খুশি তাতে ডুব মেরে ভ্রমরগুঞ্জন কোকিলের কণ্ঠ, বসরাই গোলাপের খুশবাই, সারা দিনমান ঝরণার গান সব কিছুই পেতে পারো। তেমন বই যদি বেছে নাও তবে সে বাগিচায় মিশরের পিরামিড, হিমালয়ের গিরিশ্রেণী, পাভলোভা—পাভলোভাই বা কেন—উর্বশী মেনকার নৃত্যও দেখতে পাবে। এমন কি এমন বই অর্থাৎ এমন বাগিচাতেও তুমি প্রবেশ করতে পারো যে বাগিচা তোমাকে আরো লক্ষ লক্ষ বাগিচার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারে। যেমন ধরো, প্যারিসের জাতীয় গ্রন্থাগার সম্বন্ধে একখানি প্রামাণিক পুস্তক। কত লক্ষ বাগবাগিচার সঙ্গে সে যে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবে সেটা নির্ভর করে শুধু তোমার কৌতূহলের উপর।

আরেক জ্ঞানী বলেছেন, "একখানা পুস্তক যেন একখানা ম্যাজিক কার্পেট; তারই উপর আরামসে তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে তুমি যত্রতত্র যেতে পারো, যা ইচ্ছা তাই এমন কি তোমার সেরকম 'রুচি' হলে 'যাচ্ছেতাই' দেখতে পারো।"

তবে হ্যাঁ, আমার মনে ধারণা ছিল, ম্যাজিক কার্পেট রাজারাজড়ার মিনার, অধুনা মার্কিন মুল্লুকের চন্দ্রস্পর্শী প্রাসাদাদির থেকে গা বাঁচিয়ে বহু উধর্বলোক দিয়ে উড্ডীয়মান হয় বলে পাঠক সব কিছু স্পষ্ট দেখতে পায় না। আমার রচনা হবে যুগ-মানানসই হেলিকপ্টার,—অনেক নিচু দিয়ে যায় বলে, অনেক মন্থরে চলে বলে পাঠক হয়তো অনেক আধ-চেনা জিনিসের চোদ্দ আনা চিনে নেবে।

কিংবা বলি, ম্যাজিক কার্পেটের সন্ধানে অতদূরে যাই কেন? এই কাছেই তো "বাঙলাদেশ", নিত্য নিত্য যার ক্রন্দনধ্বনি আমাদের কানে আসছে, কিন্তু সে-কথা থাক। সেই বাঙলাদেশের ঢাকার এক কুট্টি ফেরিওয়ালা আম বেচতে এসে বাড়ির সামনের লন্-এর উপর ঝুড়িটা রেখেছে। বাবু উপরের বারান্দা থেকে আমগুলোর দিকে চোখ বুলিয়ে ঈষৎ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, "কি আম আনছো, মিয়া, বড় যে ছোডু ছোডু (ছোট ছোট)।" কুট্টি এক গাল হেসে উপরবাগে তাকিয়ে বললে, "ছোড তো লাগবই, কর্তা—উচা থনে ছোড় তো লাগবোই। লাম্যা আহেন মহারাজ, তখন দেখবাইন অনে, বরো বরো।"

কিন্তু হায়, আমার পাঠক মহারাজা নেমে এলেন না। আমগুলোর সত্য রূপ তাঁরা নিকটে এসে দেখতে রাজী হলেন না।[৮] সেটা হয়ে যেত "স্পেশা-

৮ উন্নাসিক দার্শনিক বলেন, কাছের থেকে দেখাটাই সব চেয়ে সত্য দেখা তার তো কোনো প্রমাণ নেই। হিমালয়ের সর্বোচ্চ চূড়োর উচ্চতা সম্বন্ধে সত্যজ্ঞান উপলব্ধি করতে হলে তার ডগার উপর বসে সেটাকে দেখতে হয়, এমন নির্দেশ দেয় কোন্ অর্বাচীন! বরঞ্চ সুদূর দার্জিলিঙ থেকে সেটাকে দেখলে

লাইজড নলেজ"। তখন তাঁরা চাইতেন "কমন নলেজ"। এখন তাঁরা চান "স্পেশালাইজড নলেজ"।

কিন্তু অধম এ-প্রবন্ধটা, ইস্পলুপ্তজন আর দ্বিতীয়বার বিলম্বুস্কানিয়ে গমনাগমন "করিবেক" না।

এখন থেকে আমি শুদ্ধমাত্র অতিশয় সাদামাটা, সাতিশয় নির্জলা "কমন নলেজ" পরিবেশন করবো।

কিন্তু না, পুনরপি না। যদ্যপি উন্নাসিক সম্প্রদায় উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে বারংবার বলছেন সেক্স্ "কমন নলেজ" হয়ে গিয়েছে, এবং আমিও এইমাত্র যে প্রতিজ্ঞাপাঠ লিপিবন্ধ করলুম তার কালি একনো শুকোয় নি, এবং যার অর্থ, আমি এখন থেকে শুধু "কমন নলেজ" নিয়ে লিখব তার অর্থ এই নয় যে আমি ইহসংসারের তাবৎ "কমন নলেজ"-এর বিশ্বকোষ রচনা করতে বসে যাবো। সংসারের বিস্তর পোড়-খাওয়া এক ধনী বাপ মৃত্যুকালে অন্যান্য উপদেশ দিতে দিতে বলেছিল, "আর হ্যাঁ, প্রতি গ্রাসে পাঁচটা করে মাছের মুড়ো খাবি।" পয়সা-ওলা সে বাড়িতে পাকা রুই বাঘা কাৎলা গোত্রের বড় মাছের মুড়ো ভিন্ন অন্য কোন মাছের মুড়ো কস্মিনকালেই প্রবেশলাভ করে নি। ছেলে বেচারী একই গ্রাসে পাঁচটা রুই মাছের মুড়ো খেতে গিয়ে দমবন্ধ হয়ে মৃত পিতার "অনুজ" হওয়ার উপক্রম। বাবা বলতে চেয়েছিল চুনোপুঁটি কেঁচকি পোনার মুণ্ডু খেয়ে সস্তায় আহারাদি সমাপন করবি। আমি কমন নলেজের চুনোপুঁটির মুণ্ডু গিলতে রাজী আছি কিন্তু রাঘব বোয়ালের বাঘা মুণ্ডু এক গরাসে গেলবার চেষ্টা করতে রাজী নই। যদিও মুণ্ডু তো দুটোই। সেক্স্ কমন নলেজ আবার পুরাতন ভৃত্যও কমন নলেজ।

দ্বিতীয়ত, "এ যৌবন জলতরঙ্গ রুধিবে কে রে? হরে মুরারে হরে মুরারে" আর্তনাদ করেছিলেন কবি আকুল কণ্ঠে। এখন "এ যৌন বটতলা প্লাবন রুধিবে কে রে? আই জি রে, পি সি রে?" আমি বাস করি একতলায়। খুব বেশী দিনের কথা নয়, তেড়ে নেমেছে কলকাতার বর্ষা। গৃহিণী দুরু দুরু বুকে চৌকাঠে দাঁড়িয়ে দেখছেন, রাস্তা থেকে পেভমেণ্টে জল উঠেছে। এইবারে পেভ-মেণ্ট ছাড়িয়ে ঘরের ভিতরে জল ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার আবর্জনা ময়লাও অপর্যাপ্ত পরিমাণে। (পৌর পিতারা নিশ্চয়ই উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করেছিলেন এবং মার্কিন টুরিস্টদের দাওয়াৎ করেছিলেন দেখে যেতে, আমাদের কলকাতা কী সুন্দর, কী সাফ, কী সুৎরো) এবং তার পর কেলেঙ্কারি কাণ্ড। ডারু সি-তে জল ঢুকে, না জানি কোন্ বৈজ্ঞানিক কারণে উজান বাইতে আরম্ভ করল কোথা

তার সম্বন্ধে সত্যজ্ঞান জন্মায়। বিস্তৃত ফ্রেস্কো পেনটিং সম্বন্ধে সেটা আরো বেশী প্রযোজ্য। আর কে বললে আপনি আম দেখছেন! এটা স্বপ্ন, মায়া, মতিভ্রম অনেক কিছুই হতে পারে। এবং সর্বশেষে শুধোবেন, ফেরিওলাই বা কে, বাবুই বা কে? উত্তরে শঙ্করাচার্য কপচে বলবেন, "নত্বং নাহম্ নায়ম লোকঃ। তুমি নেই, আমিও নেই, এই পৃথিবীও নেই। আমি তেন্ নাহম্ ছার!

থেকে নানাবিধ স্রোত, ভেসে আসতে লাগল নানাবিধ "অবদান"। বীভৎস রস এস্থলেই সমাপ্ত হোক।

হুবহু একদম সে-ই প্রক্রিয়ারই পুনরাবৃত্তি হল যৌন-'সাহিত্য' মারফৎ। প্রথম ছেয়ে গেল পেভমেণ্ট, তারপর হুড় হুড় করে ঢুকলো ঘরের ভিতরে। কিন্তু সত্যিকার রগড় তো শুরু হল তার পর। যৌন জীবনের যে-সব আবর্জনা আমরা ডারু সি দিয়ে, সুয়ারেজ দিয়ে বাড়ি থেকে নগর থেকে বের করে দিয়েছি সেগুলোকে কোন্ এক পিচেশ মার্কা উচাটন মন্ত্রে আবাহন জানালো বাইরের সেই আবর্জনা, সেই বিদেশ থেকে আমদানি যৌন-বটতলীয় 'মাল' যা ধীরে ধীরে ছেয়ে ফেলেছিল কুল্লে পেভমেণ্ট, তাবৎ ফুটপাথ—পুলিসের নাকের ডগায় সুড়সুড়ি দিতে দিতে) আমি পুলিসের ঘাড়ে কুল্লে বেলেল্লাপনার বালাই চাপাতে চাই নে ; দেশের লোক যদি এ-মাল চায় তবে পুলিস আর কতখানি ঠেকাবে ? (দেশ-বিদেশের একাধিক ডাঙর ডাঙর কর্ণধার কখনো সোল্লাসে, কখনো বা মুচকি হেসে, কখনো বা বক্রোক্তি করে 'আপ্তবাক্য' ঝেড়েছেন, "এ নেশন (কানট্) বি রং।"

এই হৈ-হুল্লোড়, জগঝম্প বাদ্যির মধ্যিখানে কে কান দেবে, মশাই, আপনার গুণগুনানি প্যানপ্যানিতে। আপনার বক্তব্য যতই অসুস্থতাই হোক না কেন তাকে দেখতে হবে সুস্থ মাথায়, অধ্যয়ন করতে হবে শান্তচিত্তে অযথা উত্তেজিত না হয়ে। কিন্তু তাতে কোনো ফায়দা হবে না, এখন থেকে বলে দিচ্ছি। এই যে সেদিন শ্যামাপুজোর সাঁঝ থেকে ভোর অবধি বেধড়ক, আচমকা, নানাবিধ কর্ণপটহ বিদারক বাজী ফাটালে কলকাত্তাইরা,—সে অন্তে আপনি পাকা সুরেলা হাতে বীণাযন্ত্রে দরবারি কানাড়া বাজালে কান দিত না যেদো-মেধো কেউই। তাই কবি শাবাশ শাবাশ রব ছেড়ে বলেছেন

ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং কোকিল জলদাগমে

বর্ষাকাল এসেছে। এখন মস্ত দাদুরী পাগলা কোলা ব্যাঙের পালা। কোকিল যে মৌনতা অবলম্বন করলো সেটা অতিশয় 'ভদ্র' কর্ম (বিচক্ষণেরও বটে)। জন্ম-অভিজ্ঞাত জাতভদ্রই এ-আচরণ ভিন্ন অন্য আচরণ কল্পনা করতে পারে না।

তা আমি যতই কমন নলেজ নিয়ে পড়ে থাকতে চাইনে কেন, আমার একদল হাউফন্নাসিক (হাফ-গেরস্ত তুলনীয় নয়, থুড়ি থুড়ি, এই দেখুন, ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যতই সন্তর্পণে আপনি যৌনের প্রতি সামান্যতম ইঙ্গিত দিয়েছেন কি, না, অমনি দ্যাখ্-তো-না-দ্যাখ্ ঐ খাটালের বোটকা গন্ধের অর্ধ্যান্যায্য বখরাটি আপনি পেয়ে যাবেনই যাবেন) – হ্যাঁ, কি বলছিলুম, এক দল অর্ধ-উন্নাসিক পাঠক আমাকে সঙ্গ দিয়েছেন বহু বৎসর ধরে। কেন, বলতে পারবো না। কখনো ভেবেছি, অনুকম্পা বশতঃ। লক্ষ্য করেন নি এই তত্ত্বটি, পথে যেতে যেতে দেখলেন দুই অজানা টীমে ফুটবল খেলা হচ্ছে, তার একটি স্পষ্টত দুর্বল ; আপন অজানতে দেখবেন, আপনার দরদখানি আ—স্তে আ—স্তে ঐ দুবলা টীমের পাল্লার উপর ভর দিচ্ছেন। কখনো ভেবেছি, হয়তো আমার "মুসলমানী চিন্তাধারা, ভাষার যাবনিক কায়দা-কেতা" তার নূতনত্বের জন্য

কোনো কোনো একঘেয়েমি-ক্লান্ত পাঠককে আকৃষ্ট করেছে। আমি অবশ্য সে-সম্বন্ধে অল্পই সচেতন ছিলুম; আমি জ্ঞানত এমন কোনো বিষয় এমন কোনো ভাষা ব্যবহার করি নি যা শুধুমাত্র যাবনিকতা দ্বারা 'নিত্যনবীনে'র সন্ধানী-জনের পাঁজরে কাতুকুতু দিয়েছে, জড় রসনায় চুলবুল জাগাবার চেষ্টা করেছে। যাবনিক জিনিস আমি আলিঙ্গন করেছি, পাঠকের সম্মুখে পেশ করেছি তখনই, যখন অনুভব করেছি সে যাবনিকতার মধ্যে বিশ্বজনীন ভাব সঞ্চারিত আছে, যে যাবনিকতা দেশকালপাত্র উত্তীর্ণ হয়ে শাশ্বত হবার অধিকার লাভ করেছে। "কোণের প্রদীপ মিলায় যথা জ্যোতিঃ সমুদ্রেই।" বলা বাহুল্য খৃষ্টীয়, অখৃষ্টীয়, জনপদসুলভ ভাবধারা, আমার আবাল্য পরিচয়ের খাসিয়া সাঁওতাল সভ্যতার প্যাটার্ন আমি ঠিক সেই ভাবেই গ্রহণ করেছি যে ভাবে আমি যাবনিক চিন্তামণিকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছি।...এই পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা অতিক্রম করার সময় কিছু পাঠক সর্বদাই আমাকে সঙ্গ দিয়েছেন, বিশেষ করে দুর্দিনে

দুর্দিনে বলো, কোথা সে সুজন যে তোমার সাথী হয়?
আঁধার ঘনালে আপন ছায়াটি সেও, হায়, হয় লয়॥

তঙ্গদস্তীমে কৌন কিসকা সাথ দেতা হৈ?
কি ছায়া ভী জুদা হোতা হৈ ইনসাঁসে তারীকীমে॥

এঁদের বয়েস হয়েছে। এঁদের অনেকেই এখন গভীরে প্রবেশ করতে চান। আমি তাই একটা মধ্যপন্থা অবলম্বন করবো। দয়া করে আমার সহৃদয় পাঠক সমুদয় তাঁদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ এই অধম লেখককে তার মধ্যপন্থা অবলম্বনের প্রদোষে, তার ধূসর জীবনের গোধূলিতে তাকে আশীর্বাদ করবেন।

আমার অনুরোধ, আমার মূল লেখাটি পড়ার সময় যদি কৃপালু পাঠক অল্পাধিক নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লহরীতে দোলা খেতে খেতে এগিয়ে যান, সে-রস-স্রোতে (যদি আদৌ রসসৃষ্টিতে আমি কথঞ্চিৎ সক্ষম হই) ভেসে ভেসে সমুখপানে চলতে থাকেন তবে হঠাৎ সে-স্রোত থেকে সরে গিয়ে ফুটনোটের গভীরে ডুব দেবেন না।

আর যাঁরা ফুটনোটের গভীরে গিয়ে কিছুক্ষণ সে-গভীরে অবগাহন করার পর ডুবসাঁতার দিয়ে পুনরায় ভেসে উঠে স্রোতোপরি অন্যান্য পাঠকদের সঙ্গে সম্মিলিত হন তাঁরা তখন নিশ্চয়ই আমাকে সস্নেহ আশীর্বাদ জানাবেন।

দ্বাপর

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে রাতদুপুরেই হোক আর দিনদুপুরেই হোক চট করে বলতে পারবেন না, আপনি যে হোটেলে শুয়ে আছেন সেটা কোন্ শহরে। টোকিও ব্যাংকক, কলকাতা, কাবুল, রোম, কোপেনহাগেন যে কোনো শহর হতে পারে। আসবাবপত্র, জানালার পর্দা, টেবিল ল্যাম্প যাবতীয় বস্তু এমনই এক ছাঁচে ঢালা

যে স্বয়ং শার্লক হোমস্‌কে পর্যন্ত তাঁরা সব কটা পুরু পুরু আতসী কাচ মায় তার জোরদার মাইক্রোস্কোপ্‌টি বের করে ওয়াটসনকে কার্পেটের উপর ঘোড়া বানিয়ে, নিজে তার পিঠে দাঁড়িয়ে, ছাতের উপর তাঁর স্বহস্তে নির্মিত আলা হোমস্‌ স্প্রে ছড়িয়ে—বাকিটা থাক্‌, ব্যোমকেশ ফেলুদার কল্যাণে আজ 'ইস্কুল বায়'ও সেগুলো জানে—তবে বলবেন, "হয় মন্তে কার্লোর রেজিনা হোটেল নয় য়োহানেসবর্গের অল হোয়াইট হোটেল।" দূর-পাল্লার এ্যারোপ্লেনের বেলাও আজকের দিনে তাই। একবার তার গর্ভে ঢুকলে ঠাহর করতে পারবেন না, এটা সুইস এ্যার, লুফ্‌ট্‌ হান্‌জা, এ্যার ইণ্ডিয়া না কে এল এম। তিমির পেটে ঢুকে নোয়া কি আর আমেজ-আন্দেশা করতে পেরেছিলেন এটা কোন্‌ জাতের কোন্‌ মুল্লুকের তিমি?

ইণ্ডিয়ান মানেই নেটিভ, মানে রদ্দী। আস্তে আস্তে এ ধারণা কমছে। নইলে জর্মনি এ-দেশের সেলাইয়ের কল, রুশ কলকাতার জুতো কিনবে কেন?

অতএব এ্যার ইণ্ডিয়া কোম্পানির এ্যারোপ্লেনকে একটা চান্‌স্‌ দিতেই বা আপত্তিটা কি? অন্য কোম্পানিগুলো তো প্রায় সব চেনা হয়ে গিয়েছে। অবশ্য আরেকটা কথা আছে। ঐ কোম্পানির এক ভদ্রলোক বুদ্ধি খাটিয়ে তদ্বিরতদারক করে আমার সুখ-সুবিধার যাবতীয় ব্যবস্থা না করে দিলে হয়তো আমার যাওয়াই হত না। তাঁর নাম বলবো না। উপরওলা খবর পেলে হয়তো কৈফিয়ৎ তলব করে বসবেন, কোনো একজন ভি আই পিকে সাহায্য না করে একটা থাড্ডো কেলাস 'নেটিভ' রাইটারের পিছনে তিনি অপিসের মহামূল্যবান সময় নষ্ট করলেন কেন? তবে কি না তাঁর এক ভি আই পি মিত্রও আমাকে প্রচুরতম সাহায্য করেছিলেন। তাঁকে না হয় শিখণ্ডীরূপে খাড়া করবেন।

ভাবছিলুম চুঙ্গী ঘরের (কাসটম্‌সের) উৎপাত থেকে এই দুই দোস্তো কতখানি বাঁচাতে পারবেন। ইতিমধ্যে এক কাস্টমিয়া আমার কাগজপত্র পড়ে আমার দিকে মিটমিটিয়ে তাকিয়ে শুধোলে "আপনিই তো আপনার বইয়ে চুঙ্গী ঘরের কর্মচারীদের এক হাত নিয়েছেন, না?"

খাইছে। এযাত্রায় আমি হাজতবাস না করে মানে মানে কলকাতা ফিরতে পারলে নিতান্তই পণ্ডাপিতার আশীর্বাদেই সম্ভবে। কে জানে, এই কাস্টমিয়াই হয়তো হালে কয়েকজন ডাঙর ভি আই পি কাম সরকারী কর্মচারীকে বেআইনীতে মাল আনার জন্য নাজেহাল করেছিলেন।... এত দিন কলকাতা করপরেশনের অত্যুৎসাহ ও মাত্রাধিক কর্মতৎপরতা বশতঃ জলের কল খুললে যে রকম জল না বেরিয়ে শব্দ বেরতো সেই রকম আমার ব্লটিং পেপারের লাইনিংওলা গলা দিয়ে কথা না বেরিয়ে বেরোল ঘস ঘস খস খস চোঁ-ওঁ-ওঁ-ওঁ ধরনের কি যেন একটা বদখৎ আওয়াজ।

নাঃ। এ-লোকটির রসবোধ আছে কিংবা এঁর বাড়িতে মাসে একদিন করপরেশনের কলের জল আসে বলে ঐ ভাষা বাবদে তিনি সুনীতি চাটুয্যে মশাইকে তাক লাগিয়ে উত্তম ধ্বনিতত্ত্ববাদের কেতাব লিখতে পারবেন। বললেন, "নিশ্চিন্ত মনে ঐ আরাম চেয়ারটায় বসুন। আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।" তারপর ডাইনে

বাঁয়ে তাকিয়ে কী এক অশ্রুত টরেটক্কার সংকেত করলেন আর সঙ্গে সঙ্গে জনাচারেক বাঙালী কাস্টমিয়া আমাকে ঘিরে যা আদর-আপ্যায়ন আরম্ভ করলেন যে হৃদয়ঙ্গম করলুম, দেবীর প্রসাদে মূক যে-রকম বাচাল হয়, আমি কেন, হরবোলাও মূক হতে পারে।

প্রতিজ্ঞা করলুম, চুঙ্গীঘর লেখাটি আমিই ব্যান্ করে দেব। কার যেন দুশো টাকা ফাইন হয়েছে। অবশ্য অন্য অকারণে, কিন্তু জরিমানা ইজ্ জরিমানা! আপনার কারণ ভিন্ন বলে আপনি তো আর মেকি টাকা দিয়ে শোধবোধ করতে প্যারবেন না।

কিন্তু এত সব বাখানিয়া বলছি কেন?

শুনুন। জীবনে ঐ একদিন উপলব্ধি করলুম, সাহিত্যিক—তা সে আমার মত আটপৌরে সাহিত্যিক হওয়ার মধ্যেও একটা মর্যাদা আছে।

* * *

এসব যে বাখানিয়া বলছি তার আরো একটা কারণ আছে।

আমার নিজের বিশ্বাস, প্লেনের-পটের ভিতরকার তুলনায় এ্যারপোর্টের আজব আজব তাজ্জব চিঁড়িয়া দেখতে পাওয়া যায় ঢের বেশী। পাসপর্ট, কাস্টমস, হেলথ অফিসে, রেস্তরাঁয় তাদের আচরণে কেউ বা সংকোচের বিহ্বলতায় অতীব ম্রিয়মাণ, কারো বা গড্ ড্যাম্ ডোন্টো কেয়ার ভাব—ওদিকে একটি বিগতযৌবনা মার্কিন মহিলা এ্যারোপ্লেনে অর্ধনিদ্র যামিনী কাটিয়ে আলুথালু-কেশ, হৃত-পাউডার-রুজ, এঞ্জিনের পিস্টন বেগে পলস্তারা পলস্তরা ক্রীম-পাউডার-রুজ মাখছেন, এদিকে তাঁর কর্তা প্লেনে সস্তায় কেনা স্কচ স্যাঁট স্যাঁট করছেন; আর ঐ সুদূরতম প্রান্তে দেখুন,—দেখুন বললুম বটে, কিন্তু দেখার উপায় নেই—কালো বোরকাপরা জড়োসড়ো গণ্ডা দুই মক্কাতীর্থে হজ যাত্রিনীর গোঠ। এঁরা নিশ্চয়ই চলতি ফ্যাশানের ধার ধরেন না। বেশীর ভাগ আঁকড়ে ধরে আছেন পুঁটুলি—হ্যাঁ বেনের পুঁটুলি। গোরুর গাড়িতে গয়নার নৌকোয় ওঠার সময় যে পুঁটুলি সঙ্গে নেন। ও'রা ভাড়া বাবদ কয়েক হাজার টাকা দিয়েছেন নিশ্চয়ই। অনায়াসে হাল্কা সুটকেস কিনতে পারতেন। দু-একজনের ছিলও বটে। কিন্তু ওদের কাছে গোরুর গাড়ি যা, হাওয়াই জাহাজও তা—এদের মক্কা পেঁছিলেই হল। হায়, এঁরা জানেন না, প্লেনে ভ্রমণ—তা সে যে কোনো কোম্পানিই হোক না কেন—গোরুর গাড়িতে মুসাফিরী করার তুলনায় ঢের বেশী তকলীফদায়ক। এমন কি প্লেনে এঁদের পক্ষে হায়া-শরম বাঁচিয়ে চলাও কঠিন। কলকাতার বস্তিতে কি হয় জানি নে, কিন্তু এঁদের যখন প্লেনে করে যাবার রেস্ত আছে তখন এঁরা নিশ্চয়ই সেখানকার নন। আর গ্রামাঞ্চলে কেউ কখনো প্রাতঃকৃত্যের জন্য কিউ দেয় না। অথচ প্লেনে প্রাতঃকৃত্যে জন্য এঁদের কিউয়ে দাঁড়াতে হবে—মেয়েমদ্দে লাইন বেঁধে। সে-কথা পরে হবে। তবে হজ যাত্রীদের জন্য স্পেশাল প্লেনে যদি স্পেশাল ব্যবস্থা থাকে তার তথ্য জানি নে। কোনো কোম্পানী অপরাধ নেবেন না।

* * *

"শুভক্ষণে দুর্গা স্মরি প্লেন দিল ছাড়ি
দাঁড়িয়ে রহিল পোর্টে সব বেরাদরই শুষ্ক চোখে।"

পূর্বেই নিবেদন করেছি প্লেনের ভিতরে দেখবার মত কিচ্ছুটি নেই। খেয়া-পারে রেলগাড়িতে যা দেখতে পাওয়া যায় তার চেয়েও কম। আর সর্বক্ষণ আপনার চোখের তিন ফুট সামনে, সমুখের দুটো সীটে দুটো লোকের ঘাড়। তারো সামনে সারি সারি ঘাড়। দোস্ত আমার এ প্লেনের 'মালিক'। অতএব আমার জন্য উইণ্ডো সীটের ব্যবস্থা করেছেন—অর্থাৎ বাঁদিকে তাকালে বাইরের আকাশ দেখা যায় মাত্র, বলতে গেলে পৃথিবীর কিছুই না। একে রাত্রি, তদুপরি আল্লায় মালুম, বিশ হাজার না পাঁচিশ হাজার ফুট উপর দিয়ে প্লেন যাচ্ছে। কিছু দেখতে চাইলে ত্রিনয়নের প্রয়োজন। উপরেরটা হয়তো কিছু বা দেখতে পায়। তবে ভারতীয় প্লেনে একটা বড় আরাম আছে। যদিও অধিকাংশ যাত্রী ভারতীয় নয়—বিদেশী, এবং প্রধানতঃ ইয়োরোপীয়। তারা জানে, ইণ্ডিয়ানরা বেলেল্লাপনা পছন্দ করে না। কাজেই অতিরিক্ত কলরোল, এবং ছাগলের দরে হাতি কেনার মত স্কেচ ভোদকা সেবনজনিত মাঝে-মধ্যে তদতিরিক্ত কলহরোল থেকে নিশ্চিন্ত মনে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

এ-বাবদে এখানেই থাক। কারণ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর, সম্মানীয় শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব, ভদ্র প্রবোধ ও অন্যান্য অনেকেই প্লেনের ভিতরকার হাল সবিস্তর লিখেছেন।

জাগরণ, তন্দ্রা, ঘুম সবই ভালো। কিন্তু তিনটিতে যখন গুবলেট পাকিয়ে যায় তখনই চিত্তির। এ-যেন জ্বরের ঘোরে দুদিন না তিনদিন কেটে গেল বোঝ-বার কোনো উপায় নেই।

চিৎকার চেঁচামেচি। রোম! রোম!! রোম!!!

২

ক্যাতলিকদের তো কথাই নেই। প্রটেসটান্ট্দের ঈষৎ সংযত কৌতূহল। বিশেষ করে মার্কিনদের। দেশে ফিরে বড়ফাট্টাই করতে হবে, হ্যাঁ তেমন কিছু না, তবে কি না, হ্যাঁ, দেয়ালের আর গম্বুজের ছবিগুলো ভালো। কী যেন নাম (ভামিনীর দিকে তাকিয়ে) মাইকেল-রাফাএল, না, হল না। লেওনার্দো দা বত্তিচেল্লি। ও! সেটা বুঝি মোনালিসার লীনিং টাওয়ার?"

বললে পেত্যয় যাবেন না, আমি স্বকর্ণে শুনেছি, তাজমহলের সামনে বসে একই বেঞ্চে-বসা এক মার্কিনকে তার মিসিসের উদ্দেশে শুধোতে শুনেছি, "কিন্তু আশ্চর্য, এই ইণ্ডিয়ানরা এ-সব তৈরী করলো কি করে—ফরেন সাহায্য বিনা, অর্থাৎ আমাদের সাহায্য না নিয়ে।"

রোমে নামতেই হল। সেখানে আমার এক বন্ধু বাস করেন। কিন্তু তার

ফোন নম্বর জানা ছিল না বলে যোগসূত্র স্থাপনা করা গেল না। একখানা পত্রা-ঘাত, তদ্বরূণ স্ট্যাম্প যোগাড় করতে না করতেই এ্যার কোম্পানির লোক রাখাল ছেলে যেরকম গোরু খেদিয়ে খেদিয়ে জড়ো করে গোয়ালে তোলে সেই কায়দায় প্যাসেঞ্জারদের প্লেনের গর্ভে ঢোকালে। প্যাসেঞ্জারদের গরুর সঙ্গে তুলনা করাটা কিছুমাত্র বেয়াদবী নয়। মোটা, পাল্টা ঠিক বয়স্ক গরুরই মত লাউঞ্জের মধ্যিখানে একজোট হয়ে বসেছে বটে কিন্তু বাছুরের পাল, অর্থাৎ চ্যাংড়া চিংড়িরা যে কে কোন্ দিকে ছিটকে পড়েছে তার জন্য হুলিয়া শমন বের করেও রত্তিভর ফায়দা নেই। কেউ গেছেন কিওরিওর দোকানে। কাইরোর মত এখানেও খাঁটি ভেজাল দুই বস্তুই সুলভ—এন্তের পড়ে আছে—কিন্তু দুর্লভ, কলকাতার মাছের বাজার-কেও হার মানায় গাহকের কান কাটতে। কেউ বা গেছেন বিনমাশুলের (ট্যাক্স ফ্রী) দোকানে। হয়তো ইতালীয় নামকরা একখানা আস্ত ফিয়াৎ (মোটামুটি, ফা (F) ব্রিকাদ্‌সিয়োনে ; ই (i) ইতালিয়ানা ; আ (a) ওতোমোবিলে ; তু (T) রিনো—এই চার আদ্যাক্ষর নিয়ে FIAT, একুনে, ফ্যাব্রিকেশন (মেড ইন) ইতালি-য়ানা (of Italy) অটোমবীল (of) তুরীনো। তুরীনো সেই শহরের নাম যেখানে এই স্বতশ্চলশকট নির্মিত হয়, ফিয়াৎ শব্দ আবার আরেক প্রাচীন অর্থ ধরে—"ফরমান", "তাই হোক"।) গাড়ি কিনে নিয়ে আসেন! একটি হাফাহাফি আধা-আধি, অর্থাৎ পাতে দেওয়া চলে মার্কিন চিংড়ি ঐ হোথা বহু দূরে বার-এ বসে চুটিয়ে প্রেম করছেন একটি খাবসুরৎ ইতালিয়ান চ্যাংড়ার সঙ্গে। খাবসুরৎ বলতেই হবে—এই রোম শহরে ছবি এঁকে মূর্তি গড়ে যিনি নাম করেছেন সেই মাইকেল এঞ্জেলো যেন এই সদ্য একে গড়ে 'চরে খাওগে, বাছা' বলে ছেড়ে দিয়েছেন। আর ইতালিয়ান যুবক-যুবতীর প্রতি মার্কিনিংরেজের যে-পীরিতি সেটা প্রায় বেহা-য়ামীর শামিল। চিংড়িটা চরে খাবে না কেন? সর্বশেষে বলতে হয়, ইতালির কিয়ান্তি মদ্য দুনিয়ার কুল্লে সুধার সঙ্গে পাল্লা দেয়। সেটা ও মেয়েটা পাওয়া যাচ্ছে ফ্রী, গ্রেটিস অ্যান্ড ফর নাথিং। মুফৎ মে।

প্লেনে ঢুকে দেখি, সত্যি সেটা গোয়ালঘর। মশা খেদাবার তরে গাঁয়ের চাচার বাড়িতে যে-রকম স্যাঁতসেতে খড়ে আগুন ধরানো হত এখানেও সেই প্রতিষ্ঠান। তবে হ্যাঁ, এটা বিজ্ঞানের যুগ। নানা প্রকারের ডিসিনফেকটেনট, ডি অডরেনট স্প্রে করা হয়েছে প্রেমসে। সায়েবদের যা বী ও—বডি ওডার—গায়ের বোটকা দুর্গন্ধ !!

সকালবেলার আলো দিব্য ফুটে উঠেছে। ইতিমধ্যে প্লেনে পাক্কা সাড়ে পনেরো ঘণ্টা কেটেছে। দমদমা ছেড়েছি রাত ন'টায় ; এখন সকাল আটটা। হওয়ার কথা তো এগারো ঘণ্টা! কি করে হলো? বাড়ির কাচ্চাবাচ্চাদের শুধোন।

প্লেন যখন রোম ছাড়ল তখন অপ্রশস্ত দিবালোক।

দিবালোকের সঙ্গে সময়ের সম্পর্ক আছে। যে-দেশে যাচ্ছি, সেই জর্মনির বাঘা দার্শনিক কাণ্ট নাকি বলেছেন কাল এবং স্থান ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে না। (টাইম অ্যান্ড স্পেস আর আ প্রিয়রি কনসেপশন)।

কাজের বেলা কিন্তু দেখলুম, তত্ত্বটা আদৌ সরল সহজ নয়।

বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি, যেন দেশের সকালবেলার সাতটা-আটটা। কিন্তু হঠাৎ হাতঘড়ির দিকে নজর পড়াতে দেখি, সেটি দেখাচ্ছে সাড়ে বারোটা! কি করে হয়? আমার ঘড়িটি তো পয়লা নম্বরী এবং অটোমেটিক। অবশ্য এ-কথা আমার অজানা নয়, অটোমেটিক বেশী সময় কোনো প্রকারের ঝাঁকুনি না খেলে মাঝে-মধ্যে থেমে গিয়ে সময় চুরি করে। কিন্তু কাল রাতভর যা এ-পাশ ও-পাশ করেছি তার ফলে ওর তো দম খাওয়া হয়ে গেছে নিদেন দুদিনের তরে। আমার পাশের সীটে একটি চার-পাঁচ বছরের ছোট্ট মেয়ে। তার পরের সীটে এক বর্ষীয়সী—বাচ্চাটার ঠাকুরমা দিদিমার বয়সী। তাঁর দিকে ঝুঁকে শুধালুম, "মাদাম, বেজেছে কটা, প্লীজ?" মাদামের উস্কোখুস্কো চুল, সকালবেলার 'ওয়াশ', মুখের চুনকাম, ঠোঁটের উপর উষার লালবাতি জ্বালানো হয়নি। শুকনো মুখে যতখানি পারেন ম্লান হাসি হেসে বললেন, "পারদোঁ, মসিয়ো, জ্ন্ পার্ল পা নেদুস্তানি।" অর্থাৎ তিনি 'হিন্দুস্থানী' বলতে পারেন না। ইয়াল্লা। সরলা ফরাসিনী ভেবেছেন, প্লেনটা যখন হিন্দুস্থানী, আমি হিন্দুস্থানের কলকাতাতে প্লেনে উঠেছি, চেহারাও তদ্বৎ, অতএব আমি নিশ্চয়ই হিন্দুস্থানীতে কথা বলেছি। আমি অবশ্য প্রশ্নটি শুধিয়েছিলুম আমার সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত অতিশয় নিজস্ব 'বাঙাল' ইংরিজীতে। ওদিকে এ-তত্ত্বও আমার সবিশেষ বিদিত যে ফরাসীরা নটোরিয়াস একভাষী—ফরাসী ভিন্ন অন্য কোনো ভাষা শিখতে চায় না। তাদের উহ্য বক্তব্য, তাবল্লোক যখন হন্দমুদ্দ হয়ে ফ্রান্সে আসছে, বিশেষ করে কড়ির দেমাক, বন্দুক-কামানের দেমাক, চন্দ্রজয়ের দেমাকে ফাটো ফাটো মার্কিন জাত এস্তেক প্যারিসে এসে ফরাসীর মত নাজুক জবান্ শেখবার ব্যর্থ চেষ্টায় হরহামেশা হাবুডুবু খাচ্ছে তখন ওদের আপন দেশে আপোসে তারা যে কিচিরমিচির করে সেগুলো শেখার জন্য খামোখা উত্তম ফরাসী ওয়াইনে সুনির্মিত নেশাটি চটাবে কেন? তবু মহিলাটির উক্তি শুনে আমারো ঈষৎ ন্যাজ মোটা হল। দুর-দুনিয়ার ভারতীয় প্লেন সার্ভিস না থাকলে মহিলাটি কি কল্পনাও করতে পারতেন যে হিন্দুস্থানীও আন্তর্জাতিক ভাষা হতে চলেছে—খলিফে মুসাফির যে-রকম এ্যার ফ্রান্সে ফরাসী, কে এল এমে ডাচ্, বি ও এ সি-তে ইংরিজীর জন্য তৈরী থাকে।

তখন পুনরপি আপন ঔন অরিজিনাল ফরাসীতে প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করলুম। "আ—আ! বুঝেছি, বুঝেছি। কিন্তু এই সময়-সমস্যাটি ভারি 'কঁপ্লিকে' অর্থাৎ কম্প্লিকেটিভ, জটিল। আমি ওটা নিয়ে মাথা ঘামাই নে।"

"তবু?"

"সব দেশ তো আর এক টাইম মেনে চলে না। ভোয়ালা!—নয় কি? প্যারিসে যখন বেলা বারোটা তখন রেঙ্গুনে—আমি সেখানে বাস করি—বিকেল পাঁচটা-ছটা। কিন্তু আপনাকে ফের বলছি, ওসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোনো লাভ নেই। আমি টাইম কত জেনে যাই আমার অতিশয় বিশ্বাসী মিনিস্ৎর্দ্য লেতেঁরিয়র'কে (হোম সেক্রেটারি, অর্থাৎ ভিতরকার 'ইস্টেরিয়রের' 'এঁতেরিয়র'কে) শুধিয়ে।

সোজা কথায় পেটটিকে। ওখানে যখন লামাসে' ইয়েজ সঙ্গীত (বাঙলায় 'পেটে যখন হুলুধ্বনি') বেজে ওঠে তখন সেটা লাঞ্চের বা ডিনারের সময়। উপস্থিত আমার 'এন্তেরিয়রেতে' সে-সঙ্গীত ক্রেসেণ্ডতে (তার সপ্তকের পঞ্চমে)। তাই এখন রেঙ্গুনে নিশ্চয়ই দেড়টা-দুটো।"

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, "তা এখখুনি বোধ হয় লাঞ্চ দেবে।"

মাদাম যদিও বলেছেন তিনি টাইম নিয়ে মাথা ঘামান না, কিন্তু দেখলুম তার প্র্যাকটিকাল দিকটা খাসা বোঝেন। আপত্তি জানিয়ে বললেন, "রেঙ্গুনে যখন লাঞ্চ তখন এই মিত্রোপাতে (মিৎ=মিড্ল্ ;—রোপা, ইয়োরোপা-র শেষাংশ অর্থাৎ মধ্য-ইয়োরোপে) ব্রেকফাস্ট। জাপানে যারা এ প্লেনে উঠেছে তাদের তো এখন ডিনারের সময় হয় হয়। সুতরাং কোন্ যাত্রী কোথায় উঠেছে, কার পেট কখন ব্রেকফাস্ট/লাঞ্চ/ডিনারের জন্য কান্নাকাটি শুরু করে সে-হিসেব রেখে তো আর কোম্পানি ঘড়িঘড়ি কাউকে লাঞ্চ, কাউকে সাপার, কাউকে স্যানউইচসহ বিকেলের চা দিতে পারে না। তবে কিনা, এরা ব্রেকফাস্টে যে পরিমাণ খেতে দেয় সেটা কলেবরে প্রায় লাঞ্চের সমান। তাই বলছি, এসব টাইমফাইম নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। ট্রেনেও যদি ঘড়ি ঘড়ি ঘড়িটার দিকে তাকান তবে সে জার্নি দীর্ঘতর মনে হয় না ? আমি তো প্যারিসে পৌঁছতে পারলে বাঁচি। 'ব দিয়ো' (দয়ালু ঈশ্বর) ঘণ্টা দেড়েকের ভিতর পৌঁছিয়ে দেবেন। নাতনীটা নেতিয়ে গিয়েছে।"

মহিলাটি যে-ভাবে সবিস্তর গুছিয়ে বললেন সেটা ধোপে টেঁকে কি না বলতে পারবো না, কারণ আমি যতবার এসেছি গিয়েছি, আহারাদি পেয়েছি, তখন ঘড়ি মিলিয়ে দেখি নি কোন্‌টি লাঞ্চ কোন্‌টা কি ? এবং আজকের দিনে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন টাইমের সালংকার সটীক ফিরিস্তি দেবার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে করি নে। রেডিয়ো ট্রানজিস্টারের কল্যাণে এখন বাড়ির খুকুমণি পর্যন্ত জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দেয়, বুঝিয়ে বলে গ্রীনচ মীন টাইম, ব্রিটিশ সামার টাইম, সেন্ট্রাল ইয়োরোপীয়ান টাইম, কোন্‌টা কি ? তবু যে এতখানি লিখলুম, তার কারণ ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন টাইম যে কি ভাবে কসরৎ বিন্ মেহন্নৎ আয়ত্ত করতে হয় সেটা ফরাসী মহিলাটি আমাকে শিখিয়ে দিলেন অতি প্র্যাকটিকাল পদ্ধতিতে। সেটা কি ? রাজা সলমন যেটা গুরুগম্ভীর ভাবে, ধর্মনীতি হিসেবে আপ্তবাক্যরূপে হাজার তিনেক বছর পূর্বে প্রকাশ করে গিয়েছেন—'নো দাইসেলফ্' 'নিজেকে চেনো (চিনতে শেখো)' ! শ'বছর আগে লালন ফকিরও বলেছেন, 'আপন চিনলে খুদা চেনা যায়।' ফরাসী মহিলাটিও সেই তত্ত্বটিই, অতিশয় সরল ভাষায় প্রকাশ করলেন 'আপন পেটটিকে বিশ্বাস করো। তার থেকেই লোকাল টাইম, স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম, সর্ব টাইম জানা হয়ে যাবে। ঐটেই মোক্ষমতম ক্রনোমিটার। বরঞ্চ ক্রনোমিটার মাঝে-মধ্যে বিগড়োয়। আলবৎ, পেটও বিগড়োয়। কিন্তু বিগড়নো অবস্থাতেও সে লাঞ্চ ডিনারের সময়টায় নিগেটিভ খবর দিয়ে জানিয়ে দেয়, তার ক্ষিদে নেই।

ইতিমধ্যে ব্রেকফাস্ট না কি যেন এসে গেছে। মাদাম বলেছিলেন, "সেটা কলেবর" আমি মনে মনে বললুম "বপু"। এ্যাবড়া বড়া ভাজা, সসিজ,

পর্বতপ্রমাণ ম্যাশ্‌ট্‌ পটাটো, টোস্ট-মাখম, মার্মলেড্‌, টমাটো ইত্যাদি কাঁচা জিনিস, আরো যেন কি কি। তখন দেখি, বেশ খাচ্ছি। অতএব পেটের ক্রনোমিটার বলছে এটা কলকাতার লাঞ্চ, অর্থাৎ বেলা একটা-দুটো। ঘড়ি মিথ্যেবাদী, বলছে ন'টা !

৩

অজগাইয়া যে রকম ওয়াকিফ হবার চেষ্টা না দিয়েই ধরে নেয় দিল্লী মেলও তার ধেধ্‌ধেড়ে গোবিন্দপুর ফ্ল্যাগ ইস্‌টিশানে দাঁড়াবে এবং চেপে বসে নিশ্চিন্দি মনে তামুক টানে, আমার বেলাও হয়েছিল তাই। আমার অপরাধ আরো বেশী। আমি জেনেশুনেই অপকর্মটি করেছিলুম। আমি ভালো করেই জানতুম, যে প্লেনে যাচ্ছি সেটা যদিও জর্মনির উপর দিয়ে উড়ে যাবে, তবু সে দেশের কোনো জায়গায় দানাপানির জন্যও নামবে না। অবশ্য এ্যার-ইন্ডিয়ার মুরুব্বী আমার এক গাল হেসে আমায় বলেছিলেন, "এ প্লেনটা কিন্তু প্যারিসে নামে। আপনি সেখানে চলে যান। দু'চারদিন ফুর্তিফার্তি করে চলে যাবেন জর্মনি। খর্চা একই। আর প্যারিস—হেঁহেঁহেঁহে—" সঙ্গে যে মিত্রটি ছিলেন তিনিও মৃদু হেসে সায় দিলেন। দুজনারই বয়স এই তিরিশ-পঁয়ত্রিশ। মনে মনে বললুম, ক্লাব কাবারে তার চেয়ে বেশী আর কি ভেল্কিবাজি দেখাবে ? তদুপরি বানপ্রস্থে যাবার বয়সও আমার বহুকাল হল তামাদি হয়ে গিয়েছে। এ বয়সে 'নির্বাণদীপে কিমু তৈলদানং ?' তাই আখেরে স্থির হল আমি এ্যার-ইন্ডিয়া প্লেন থেকে সুইটজারলেন্ডের জুরিচে (স্থানীয় ভাষায় ৎস্যূরিষ্‌) নামবো। হোথায় চেঞ্জ করে ভিন্ন প্লেনে মোকামে পৌঁছব—অর্থাৎ জর্মনির কলোন শহরে। তাই সই। ফরাসিনীকে বিস্তর বঁ ভোয়াইয়াজ (গুড জর্নি, গুড ফ্লাইট) বলে জুরিচের এ্যার পোর্টে নেমে পাসপর্ট দেখালুম। তারপর গেলুম খবর নিতে কলোনে যাবার প্লেন কখন পাবো। উত্তরে শুনে আমি স্তব্ধ, জড়। দেশে বলে,

"অল্প শোকে কাতর।
অধিক শোকে পাথর।"

তখন বেজেছে সকাল ন'টা। রামপন্টক বলে কি না, কলোন যাবার প্লেন দ্বিপ্রহরে। বিগলিতার্থ আমাকে নিরেট তিনটি ঘন্টা এখানে বসে বসে আঙুল চুষতে হবে।

শুনেছি, যে-রুগী দশ বৎসর ধরে পক্ষাঘাতে অসাড় অবশ সে নাকি মৃত্যুর সময় অকস্মাৎ বিকট মুখভঙ্গি করে, তার সর্বাঙ্গ খিঁচোতে থাকে, হঠাৎ দশ বৎসরের টান-টান-হাঁটু যেন ইলেক্‌ট্রিক শক খেয়ে খাড়া হয়ে থুতনির দিকে গোঁত্তা মারতে চায় এবং মুখ দিয়ে অনর্গল কথা বেরোতে থাকে।

আমার হল তাই। আমি হয়ে গিয়েছিলুম অচল অসাড়। 'স্তম্ভিত' বললুম না, কারণ আজকের দিনের পয়লা নম্বরী এ্যার পোর্টে স্তম্ভ আদৌ থাকে

না। যাই হোক যাই থাক্, আমার মুখ দিয়ে বেরুতে লাগল আতশবাজির ঝটকা, তুবড়ির পর তুবড়ির হিংস্র হিস্ হিস্ আর পটকা, বোমার দুদ্দাড় বোম্‌বাম্। আর হবেই বা না কেন? যে জুরিচের কাউণ্টারের সামনে দাঁড়িয়ে কর্ণপটহবিদারক তথা নয়নান্ধকারক আতশবাজি ছাড়ছি সেই আতশবাজিকেই আপন জর্মন ভাষায় বলে 'বেঙ্গালিশে বেলোয়েষ্টুঙ' অর্থাৎ 'বেঙ্গল রোশনী'; এবং এ-দেশের ফরাসী অংশে বলে 'ফ্য দ্য বাঙাল' অর্থাৎ 'ফায়ার অব বেঙ্গল'।[১] তদুপরি বিশেষভাবে লক্ষণীয়, ফরাসী ভাষায় বঙ্গদেশকে 'বাঙাল' রূপে উচ্চারণ করে। আমি বাঙাল বঙ্গসন্তান। আমি আমার 'জন্মনি, জন্মানি' অধিকার অর্থাৎ বার্থরাইট ছাড়বো কেন? ফায়ার ওয়ার্কস চালাবার যদি কারো হক্ক থাকে তবে সে আমার। হুহুংকার ছাড়লুম ঃ

"কি বললে? ঝাড়া তিনটি ঘণ্টা আমাকে এই এ্যার পর্টে বসে কলোনের প্লেনের জন্য তাম্বিজম-মাম্বিজম করতে হবে? আমার দেশ যে-ভারতবর্ষকে তোমরা অণ্ডর ডিভালাপ্‌ট্ কণ্ট্রি—সাদামাটা ভাষায় অসভ্য দেশ—বলো সেখানেও তো তিন-তিনটি ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয় না, কনেকশনের জন্য। হ্যাঁ, হ্যাঁ—আমি রেলগাড়ির কথাই বলছি। আমি যদি আজ ভারতের যে-কোনো ডাকগাড়িতে করে যে-কোনো জংশনে পেঁছুই তবে আধ ঘণ্টার ভিতর কনেকশন পেয়ে যাই। না পেলে—সেটাও সাতিশয় কালে-কস্মিনে—খবরের কাগজে জোর চেল্লাচেল্লি করি (মনে মনে বললুম—অস্মদ্দেশীয় রেলের কর্তারা তার থোড়াই কেয়ার করেন), এ্যারোপ্লেনের তো কথাই নেই। সে তো আরো তড়িঘড়ি কনেকশন দেয়। আমাকে যত তাড়াহুড়ো করে মোকামে পেঁছে দিতে পারে, ততই তার লাভ। অন্যত্র অন্য প্যাসেঞ্জারের সেবার্থে যেতে পারলে তার আরো দু'পয়সা হয়।...অ! তোমাদের বিস্তর ধনদৌলৎ হয়ে গিয়েছে বলে তোমরা আর পয়স কামাতে চাও না? আর শোনো, ব্রাদার, এ তো হল ট্রেন প্লেনের কাহিনী। গোরুর গাড়ির নাম শুনেছ? বুলক কার্ট? সেই গোরুর গাড়িতে করে যদি আমি দশ-বিশ মাইল যাই তবে সেখানে পেঁছেও সঙ্গে সঙ্গে কনেকশন পাই। বোলপুর থেকে ইলামবাজার গিয়ে নদীর ওপারে তদ্দণ্ডেই অন্য গোরুর গাড়ির কনেকশন হামেহাল তৈরী। বস্তুত তখন ওপারের গাড়োয়ানরা গাহককে পাকড়াও করার জন্য যা হৈ-হুল্লোড় লাগায় তার সামনে আন্তর্জাতিক পাণ্ডা

১ আমার এক সুপণ্ডিত মিত্র বহু গবেষণার পর স্থির করেছেন ঃ এদেশে গুড় তৈরী হত বলে এর নাম গৌড় (এবং গুড় থেকে 'রাম' মদ তৈরী হত বলে তার নাম গৌড়ী—মহাভারতেও এর উল্লেখ আছে—যেমন মধু থেকে মাধবী মদ)। এবং এই গুড় সর্বপ্রথম চীনদেশে রিফাইনড হয়েছিল বলে এর নাম চিনি (পরে মিশরে তৈরী চিনির নাম হল মিস্রি বা মিশ্রী)। তাঁর মতে বারুদ প্রথম আবিষ্কৃত হয় বাঙলা দেশে—আতশবাজীর জন্য। চীনদেশে সেটা সর্বপ্রথম আগ্নেয়াস্ত্রে ব্যবহৃত হয় বলে চীনদেশকে বারুদের আবিষ্কারক বলা হয়—এবং সেটা ভুল।

প্রতিষ্ঠানের জেরুজালেম-পান্ডারা পর্যন্ত নতমস্তক হন। এ-নিয়ে আমি অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত—থুড়ি, পাঁচখানা ইলিয়াড দশখানা ফাউস্ট লিখতে পারি। কিন্তু উপস্থিত সেটা স্থগিত থাক। আমার শেষ কথা এইবারে শুনে নাও। এই যে আমি কন্টিনেনটে এসেছি তার রিটার্ন টিকিটের জন্য কত ঝেড়েছি জানো? এক-একটা টাকা যেন নাক ফুটো করে কুরে কুরে বেরিয়েছে—তোমরা যাকে বলো, পেইং থ্রু দি নোজ্। রোক্কা ছ' হাজার পাঁচশটি টাকা। তারপর ফরেন এক্সচেন্‌জ্ গয়রহ হিসেবে নিলে দাঁড়ায় প্রায় সাড়ে সাত হাজারের মত। এ ভূখণ্ডে থাকবো মাত্র তিনটি মাস। এইবারে হিসেব করো তো বসে, তবে বুঝি তোমার পেটে কত এলেম, এই যে কনেকশনের জন্য আমার তিনটি ঘণ্টা বরবাদ করলে তার মূল্যটা কি? সে না হয় গেল। কিন্তু সে-সময়টা যে বন্ধুবান্ধবীর সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত করলে তার জন্য তোমার হৃদয়বনে কোনো সন্তাপানল প্রজ্জলিত হচ্ছে না? তারা—"

ইতিমধ্যে আমার চতুর্দিকে একটা মিনি মাক্সির মধ্যিখানের মিডি সাইজের ভিড় জমে গিয়েছে। ফ্রী এনটারটেনমেণ্ট। আমার সোক্রোতেস-পারা, কিংবা দ্রৌপদী যে-রকম রাজসভায় আত্মপক্ষ সমর্থন করেছিলেন সেই ধরনের যুক্তিজাল বিস্তার এদের হৃদয়-মনে যেন মলয়বাতাসের হিল্লোল, দে দোল দোল খেলিয়ে গেল। এদের বেশীর ভাগই আমার বেদনাটা সহানুভূতি সহ প্রকাশ করছে। "য়া য়া", "উই উই", "সি সি" যাবতীয় ভাষায় আমাকে মিডিসমর্থন জানাচ্ছে। আমি ফের তেড়ে এগুতে যাচ্ছি এমন সময়—

এমন সময় সর্বনাশ! একটি কুড়ি-একুশ বয়সের কিশোরী, আমি যাকে কেচে-মুছে ইস্ত্রি মেরে ভাঁজ করে পকেটে ঢোকাতে যাচ্ছি, কাউণ্টারের পিছনের কুঠরি থেকে বেরিয়ে এসে তাকে বললে, "আপনার টেলিফোন।" তম্মুহূর্তেই সেই মহাপ্রভু তিলব্যাজ না করে, যেন সসেমিরে দে ছুট দে ছুট। লোকটা নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের "আমারে ডাক দিল কে ভিতর পানে" গানটি জানে।

কিশোরী এক গাল হেসে আমাকে শুধোলে, "আপনার জন্য কি করতে পারি, স্যর?"

দুত্তোর ছাই! আধ-ফোটা এই চিংড়ির সঙ্গে কি লড়াই দেব আমি?

"নাথিং বাট্ ইয়োর লভ্।" বলে দুম্‌দুম্ করে লাউঞ্জের সুদূরতম প্রান্তে আসন নিলুম।

সোফাটা মোলায়েম। সামনে ছোট্ট একটি টেবিল।

বেজার মুখে বসে আছি। এমন সময় দেখি একজন বয়স্ক ভদ্রলোক দু'হাতে দুটি ভর্তি ওয়াইনগ্লাস নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ঠিক যতখানি নিচু হয়ে অপরিচিত জনকে বাও করাটা কেতাদুরস্ত তাই করে শুধোলেন, "ভু পেরমেতে, মসিয়ো"—অর্থাৎ "আপনার অনুমতি আছে, স্যর?" "নিশ্চয়, নিশ্চয়।" যদিও সোফাটির যা সাইজ তাতে পাঁচজন কিংকং অনায়াসে বসতে পারে তবু ভদ্রতা দেখাবার জন্য ইঞ্চিটাক সরে বসলুম। ভদ্রলোক ফের কায়দা-

মাফিক বললেন "ন ভু দেরাঁজে পা, জ ভু প্রী"। এর বাঙলা অনুবাদ ঠিক কি যে হবে, অতখানি ফরাসী জানি নে, বাঙলাও না। মোটামুটি "না, না, ব্যস্ত হবেন না। ঠিক আছে, ঠিক আছে।" উর্দুতে বরঞ্চ খানিকটে বলা যায় তকল্লুফ ন্ কীজীয়ে" ঐ ধরনের কিছু একটা। 'তকল্লুফ' কথাটা 'তকলীফ' (বাঙলায় কিছুটা চালু) অর্থাৎ 'কষ্ট'! মোদ্দা ঃ "আপনাকে কোনো কষ্ট দিতে চাইনে।"

সেই দুটো গ্লাস টেবিলে রেখে একটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। আরেকটা নিজে তুলে নিয়ে বললেন, "আপনার স্বাস্থ্যের মঙ্গলের জন্য।"

চেনাশোনা কিছুই নেই। খোদার খামোখা এ-লোকটা ড্রিংক দিচ্ছে কেন? তবে কি লোকটা কনফিডেন্স ট্রিকস্টার? আমাদের হাওড়া শ্যালদাতে যার অভাব নেই! ভাবসাব (কনফিডেন্স) জমিয়ে বলবে, "দাদা, তা হলে আপনি টিকিট দুটো কিনে আনুন। এই নিন আমার লিলুয়ার পয়সা, আমি মালগুলো সামলাই।"···টিকিট কেটে ফিরে এসে দেখলেন, ভোঁ ভাঁ। আপনার মালপত্র হাওয়া।

কিন্তু এ-লোকটা আমার নেবে কি? ৺সুকুমার রায় (?) একদা একটি ব্যঙ্গচিত্র আঁকেন। বিরাট ভুঁড়িওলা জমিদার টিঙটিঙে দারওয়ানকে শাসিয়ে শুধোচ্ছেন, "চোর ভাগা কিঁও?" দারওয়ান বললে "মেরা এক হাতমে তলওয়ার দুসরেমে ঢাল। পকড়ে কৈসে?"—আমার এক হাতে তলওয়ার, অন্য হাতে ঢাল। ধরি কি করে?

আমার এক পাশে আমার মিত্রের দেওয়া এটাচি, অন্যদিকে এ্যার ইণ্ডিয়ার দেওয়া ছোট্ট একটি বাক্সো। দুটোই তো বগলদাবা করে বসে আছি। লোকটাকে দেখে তো মনেও হচ্ছে না, ও স্বর্গত পি সি সরকার (এ স্থলে বলে রাখা ভালো সরকার কখনো এহেন অপকর্ম করতেন না) যে আমার দুটি বাক্স সরিয়ে ফেলবে। এবং সব চেয়ে বড় কথা, এ-রকম রুচিসম্মত পোশাক-আশাক আমি একমাত্র ডিউক অব উইণ্ডসরকে (উচ্চারণ নাকি উইনজার) পরতে দেখেছি জীবনে একবার। ডিউকের জীবনে একবার নয়, আমার জীবনে একবার। সে বেশের বর্ণনা অন্যত্র দেব।

একখানা কার্ড এগিয়ে দিলেন। তাঁর নাম আঁদ্রে দ্যুপোঁ। তারপর এক গাল হেসে শুধোলেন, "যদি অপরাধ না নেন তবে একটি প্রশ্ন শুধোই, আপনি কি কস্টিঙে বিশেষজ্ঞ?"

আমি থতমত খেয়ে শুধোলুম, "কস্টিঙ? সে আবার কি?"

ভদ্রলোক আরো থতমত খেয়ে কিন্তু চট করে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "সে কি মশাই! এই মাত্র আপনার অনবদ্য লেকচারটি শুনলুম, আপনি ক' হাজার টাকা ঝেড়ে কলকাতা থেকে এ-দেশে আসার রিটরন টিকিট কেটেছেন, এবং কনেকশন না পেয়ে তিন ঘণ্টাতে আপনার কি পরিমাণ অর্থক্ষয় হল তার পুরোপাক্কা, করেক্ট্ টু দি লাস্ট সাঁতিম, ব্যালানস শীট। একেই তো বলে কস্টিঙ। আমি ব্যবসাবাণিজ্য করি। ঐ নিয়ে নিত্যি নিত্যি আমার ভাবনা

চিন্তার অন্ত নেই। কিন্তু সে কথা থাক। আমি আপনার কাছে এসেছি একটি প্রস্তাব নিয়ে। আপনার যখন তিন ঘণ্টা বরবাদ যাচ্ছে তখন এক কাজ করুন না! মিনিট পনেরো পরে এখান থেকে একটা প্লেন যাচ্ছে জিনীভা ঃ আমি সে প্লেনে যাচ্ছি। আপনি চলুন আমার সঙ্গে জিনীভায়। আমার সামান্য একটি বাড়ি আছে সেখানে। আপনার খুব একটা অসুবিধে হবে না। বেডরুম, বাথরুম, ডাইনিংরুম, স্টাডি সব নিজস্ব পাবেন। (আমি মনে মনে মনকে শুধালুম, একেই কি বলে 'সামান্য একটি বাড়ি'?) আমাদের সঙ্গে আহারাদি, দু' দণ্ড রসালাপ করে জিরিয়ে জুরিয়ে নেবেন। তারপর আপনাকে আপনার মোকাম, কলোনগামী প্লেনে তুলে দেব।" তারপর একটু ইতিউতি করে বললেন, "কিছু মনে করবেন না। আমি এ-প্রস্তাবটা নিজের স্বার্থেই পাড়ছি। আমার একটি ছেলে আর দুটি মেয়ে। ষোল, চোদ্দ, দশ। আপনার সঙ্গে আলাপচারী করে তারা সত্যই উপকৃত হবে। এদেশে চট করে একজন ইণ্ডিয়ান পাওয়া যায় না। পেলেও তিনি ফরাসী জানেন না। আর আমার বীবী খাসা রাঁধতে পারেন—"

আমি বাধা দিয়ে বললুম, "কিন্তু এই দশ মিনিটের ভিতর আপনি আমার জন্য জিনীভার টিকিট পাবেন কি করে?"

মসিয়ো দ্যুপোঁ মুচকি হেসে বললেন, "সেই ফরমুলা, ন ভু দেরাঁজে পা'— আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। এটা ওটা ম্যানেজ করার কিঞ্চিৎ এলেম আমার পেটে আছে; নইলে ব্যবসা করি কি করে! কাচ্চা-বাচ্চারা বড় আনন্দ পাবে। প্লেনের ভাড়াটার কথা আপনি মোটেই চিন্তা করবেন না—"

আমি ফের বাধা দিয়ে বললুম, "আপনি ও-বাবদে চিন্তা করবেন না। এ্যার-ইণ্ডিয়ার আমার টিকিটটি অমনিবাস, অর্থাৎ যেখানে খুশী সেখানেই যেতে পারি; তার জন্য আমাকে ফালতো কড়ি ঢালতে হবে না।" (পাঠক, এ ধরনের মোটর অমনিবাসকে কবিগুরু নাম দিয়েছেন বিশ্বম্বহ। এবং তদীয় অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ মোটর গাড়ি, অটমবিলকে, যেটা আপন শক্তিতে চলে, তার নাম দিয়েছিলেন স্বতশ্চলশকট। অতএব এ স্থলে আমার যানবাহন প্লেনের টিকিটকে 'স্বতশ্চল বিশ্বম্বহ মূল্য পত্রিকা' অনায়াসে বলা যেতে পারে)।

একটু থেকে বললুম, 'আমি এখখুনি আসছি।" অর্থাৎ যে-স্থলে যাচ্ছি, যেখানে রাজাধিরাজও ঘোড়ায় চড়ে যেতে পারেন না, অর্থাৎ শৌচাগার।

সেদিকে যাইনি। যাচ্ছিলুম অন্য পথে। এ্যাটাচি বাক্সো সোফাতেই রেখে এসেছি। এরকম সহৃদয় সজ্জনকে বিশ্বাস করে আমি বরঞ্চ ও দুটো হারাবো, অবিশ্বাস করতে ঘেন্না ধরে। গেলুম 'বার'-এ। সেখানে মসিয়ো যে ওয়াইন এনেছিলেন তারই দু' গ্লাশ কিনে ফিরে এলুম সোফায়। একটা গ্লাস তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে তাঁর স্বাস্থ্য কামনা করে বললুম, "আপনার আন্তরিক আমন্ত্রণের জন্য আমার অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু আমার একটা বড়ই অসুবিধে আছে। কলোন এ্যারপর্টে আমার বন্ধুবান্ধবরা অপেক্ষা করছে। তারা খবর নিয়ে নিশ্চয়ই বুঝে গিয়েছে, আমি তিন ঘণ্টা পরে কনেকশন পাবো। আমি আপনার সঙ্গে জিনীভায় গেলে দেরি হয়ে যাবে। তারা বড় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে।"

আর মনে মনে ভাবছি, ইহ সংসারে, এমনকি ইয়োরোপেও, সেই বাগদাদের আবু হোসেনও আছে যারা রাস্তায় অতিথির সন্ধানে দাঁড়িয়ে থাকে। সে একা একা খেতে পারে না।

মঁসিয়ো বড্ডই দুঃখিত হয়ে প্রথম বললেন, "কিন্তু আপনি আবার আমার জন্য ড্রিংক আনলেন কেন ? এ কি দেনা-পাওনা !"

আমি মাথা নিচু করলুম। দ্যুপোঁ বললেন, "তা হলে দেশে ফিরে যাবার সময়ে আমার ওখানে আসবেন ?"

তারপর একটি পকেট-বই বের করে বললেন, "কিছু একটা লিখে দিন। ছেলেমেয়েরা খুশী হবে।" আমি তৎক্ষণাৎ লিখলুম ঃ

"কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত ঘরে দিলে ঠাঁই
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।"

হায় ! ফেরার পথেও দ্যুপোঁর বাড়িতে যেতে পারি নি।

৪

জুরিকের মত বিরাট এ্যারপর্টে কী করে মানুষ একে অন্যকে খুঁজে পায় সেটা বোঝবার চেষ্টা করে ফেল মেরেছি। তাহলে নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হবে এখানকার কর্মচারীদের পেটেপিঠে এলম আছে। তাদেরই একজন আমার সামনে এসে বললে, "আপনার জন্য একটা মেসেজ আছে, স্যার।" আমি সত্যিই বিস্মিত হলুম। আমাকে এই সাহারা ভুমিতে চেনে কে ? বললুম, "ভুল করেন নি তো ?" "এজ্ঞে না। আমি জানি।" সঙ্গে সঙ্গে ছোকরা আমার পুরো নামটি বলে দিল। যদিও সে এদেশেরই লোক তবু আমার মনে হল সে 'দেশ' পত্রিকার 'পঞ্চতন্ত্র' নিত্য সপ্তাহে পড়ে এবং তারই মারফত আমার তোলা নামটি পুরো পাক্কা রপতো করে নিয়েছে। হয়তো ডাকনামটাও জানে। হয়তো 'ভোম্বল' 'কাবলা' জাতীয় আমার সেই বিদকুটে ডাকনামটা যে পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনিতে প্রকাশ করতে চায় না কিন্তু এসব ভাববার চেয়ে ঢের বেশী জানতে চাই, কে আমাকে স্মরণ করলেন !

অ। ফ্রলাইন ফ্রিডি বাওমান ! কিন্তু ইনি জানলেন কি প্রকারে যে আমি আজ সকালে এখানে পৌঁচচ্ছি ? তাঁর মেসেজ খুলে জিনিসটে পরিষ্কার হল। কলকাতা ছাড়ার পূর্বে এ্যার ইন্ডিয়ার ইয়াররা শুধিয়েছিলেন, জুরিকে আমার কোনো পরিচিতজন আছেন কিনা, কেননা ওখানে আমাকে কনেকশনের জন্যে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। খবর পাঠালে ও'রা হয়তো এ্যারপর্টে এসে আমাকে সঙ্গসুখ দেবেন। আমি উত্তরে বলেছিলুম, জুরিকে নেই, তবে সেখান থেকে ত্রিশ-চল্লিশ মাইল দূরে লুৎসেন শহরে একটি পরিচিতা মহিলা আছেন এবং

তাঁর নামঠিকানা দিয়েছিলুম। এ কথাটা ভুলে গিয়েছিলুম বেবাক। "দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি" "গুড়ের পাটালি ; কিছু ঝুনো নারিকেল ;/দুই ভাণ্ড সরিষার তেল ;/আমসত্ত্ব আমচুর—" এর মাঝখানে কবিগুরু যদি তাঁর প্রিয় কন্যাকে ভুলে যান তবে সাতান্নটা হাবিজাবির মাঝখানে আমি যে এটা মনে রাখি নি তার জন্য সদয় পাঠক রাগত হবেন না।

কিন্তু এই সুবাদে সেই খাঁটি জাত সুইস মহিলাটির সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করে দিতে চাই। ফ্রিডি বাওমান। ১৯৪২/৪৩-এ ইনি সেই মহারাজা সয়াজী রাওয়ের বরোদা প্রাসাদে প্রবেশ করেন। আজকের দিনে ক্রিকেট কিংবা/এবং পলিটিকসের সঙ্গে যাঁদেরই সামান্যতম পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন বরোদার শ্রীযুত ফতেহ সিংরাও গায়কোয়াড়কে। এই ফ্রিডির হাতেই তিনি পৃথিবীতে পদার্পণ করেন। অথবা মস্তকাবতীর্ণ করেন। কিন্তু তার উপর আমি 'জোর'দিচ্ছি নে। রাজা মহারাজা ভিখিরি আতুর পৃথিবীতে সবাই নামেন একই পদ্ধতিতে।

আসল কথা, ফতেহ সিং রাও মানুষ হন ফ্রিডির হাতে। তিনি অসাধারণ শিক্ষিতা রমণী—সেই ছাব্বিশ বছর বয়সেই। জর্মন, ফরাসী, স্প্যানিশ, ইংরাজী সব কটাই বড় সুন্দর জানতেন। এ-দেশে এসেছিলেন বেকারীর জন্য নয়। রোমান্টিক হৃদয় ঃ ইন্ডিয়াটা দেখতে চেয়েছিলেন। গ্যোটে তাঁর প্রিয় কবি। গ্যোটের ভারতপুজা তাঁর মনে গভীর দাগ কেটেছিল। ওদিকে তাঁর উত্তম উত্তম পুস্তক পড়ার অভ্যেস চিরকালের। রাজপ্রাসাদের কাজকর্ম'ও গুরুভার নয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি যে কি করে তাঁর প্রিয়সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের বাণীর মর্মস্থলে পৌঁছে গেলেন সেটা বুঝলুম যেদিন তিনি আমাকে বললেন যে ছেলেবেলা থেকেই তিনি সেন্ট ফ্রানসিস আসিসির ভক্ত। এবং সকলেই জানেন, এই সন্তটির সঙ্গেই ভারতীয় শ্রমণ, সন্ন্যাসী, সাধুসন্তের সব চেয়ে বেশী সাদৃশ্য। একদিকে যেমন দরিদ্রনারায়ণের সেবা,অন্যদিকে ঠিক তেমনি পরমাত্মার ধ্যানে মগ্ন হয়ে প্রভু খৃষ্টের সঙ্গে একাত্ম বোধ করতে তিনি এদেশের মরমীয়া সাধক, ইরাণ-আরব-ভারতের সুফীদের সঙ্গে এমনই হরিহরআত্মা যে অনেক সময় বোঝা কঠিন কার জীবনবৃত্তান্ত পড়ছি। খৃষ্টানের, ভক্তের না সুফীর ?

কিন্তু আমার কী প্রগলভতা যে আমি তাঁর জীবনীর সংক্ষিপ্ততম ইতিহাসও লিখতে পারি ! 'দেশ' পত্রিকার প্রিয়তম লেখক শ্রীযুত ফাদার দ্যতিয়েন যদি বাঙলায় তাঁর জীবনী লেখেন তবে গৌড়জন তাহা আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

* * *

কুমারী ফ্রিডীর কথা পুনরায় লিখব। কনটিনেন্ট সেরে, দেশে ফেরার পথে, লুৎসেনে শ্রীমতীর বাড়িতে সপ্তাহাধিককাল ছিলুম—সেই সুবাদে। উপস্থিত ফ্রিডি লিখেছেন, তিনি আমার (এ্যার-ইন্ডিয়া মারফত) টেলেক্‌স পেলেন কাল রাত্রে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি জুরিকের এ্যারপর্টে ট্রাঙ্ক-কল করে জানালেন, আমি জুরিকে নেবেই যেন তাঁকে ট্রাঙ্ককল করি। বরাবর তিনি বাড়িতেই থাকবেন।

মনে হয় কত সোজা। কিন্তু যাঁরা দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াতে চান তাঁদের

উপকারার্থে এস্থলে কিঞ্চিৎ নিবেদন করে রাখি।

প্রথমত আপনাকে টেলিফোন বুথ থেকে ফোন করতে হবে। সে বুথ আবার সদ্‌ ব্রাহ্মণ। আপন দেশজ খাদ্য ভিন্ন অন্য খাদ্য পান না। অর্থাৎ তাঁর বাক্‌সে আপনাকে ছাড়তে হবে এদেশের আপন সুইস মুদ্রা। অতএব গো-খোঁজা করুন, সে সাহারাতে, কোথায় সে পুণ্যভূমি যেখানে আপনার ডলার বা পৌন্ডের বদলে সুইস মুদ্রা দেবে। সবাই তো ইংরিজী বোঝে না। ভুল বোঝে অনেকেই। তারা কেউ বলে ঐ তো হোথায়, কেউ বলবে তার জন্য তো শহরে যেতে হবে। শেষটায় পেলেন সেই কাউন্টার পুণ্যভূমি—আমি অতি, অতি সংক্ষেপে সারছি। পেলেন সুইস বস্তু। তখন আবার ভুল করে যেন শুধু কাগজের নোট না নেন। কারণ ফোন বুথ কাগজার্থযাশী নন; তিনি চান মুদ্রা। সেই মুদ্রা আবার ঐ সাইজের হওয়া চাই। ঠ্যাঙস ঠ্যাঙস করে চলুন ফের ঐ পুণ্যভূমিতে। আরো বহুবিধ ফাঁড়া-গর্দিশ আছে। বাদ দিচ্ছি।

আহ্‌! কী আনন্দ !! কী আনন্দ !!!

"কে বলছেন ? আমি ফ্রিডি।"

"আমি সৈয়দ।"

ঐ যু যা ! ট্রাঙ্ক লাইন কেটে গেল। পাবলিক বুথ থেকে ট্রাঙ্ক-কল করা এক গন্ধযন্ত্রনা। আমি যে দুটি মুদ্রা মেসিনে ফেলে লুৎসের্ন পেয়েছিলুম, তার ম্যাদ ফুরিয়ে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আর দুটো না ফেলার দরুন লাইন কাট অফ্‌ফ। ফের ঢালো কড়ি।

অতি অবশ্য সত্য, ফোন্‌ যন্ত্রের বাকসে সুইটজারল্যান্ডে প্রচলিত তিন তিনটি ভাষা—ফরাসী, জর্মন এবং ইতালীয়—লেখা আছে কোন গুহ্য সরল পদ্ধতিতে যন্ত্রটি ব্যবহার করতে হয়। লেখা তো অনেক কিছুই থাকে। ধর্মগ্রন্থে তো অনেক কিছুই লেখা থাকে। সেগুলো পড়লেই বুঝি মোক্ষলাভ হয় ? জিম-নাস্টিকের কেতাব পড়লেই বুঝি কিঙ্কড় সিঙ-এর মত মাস্‌ল্‌ গজায় ? প্র্যাকটিস করতে হয়। এবং তার জন্য খেসারতিও দিতে হয়। উপযুক্ত গুরু বিনা যোগাভ্যাস করতে গিয়ে বিস্তর লোক পাগল হয়ে যায়। আমি ইতিমধ্যে প্রায় দেড় টাকার মত খেসারতি দিয়ে "হ্যালো হ্যালো" করছি। আর, এ খেসারতির কোনো আন্তর্জাতিক মূল্য নেই। কারণ জর্মনি, ফ্রান্স, ইংলন্ড প্রায় প্রত্যেক দেশই আপন আপন কায়দায় আপন আপন মেসিন চালায়। আর সেখানেই কি শেষ ? তিন মাস পরে যখন ফের সুইটজারল্যান্ডে আসবো, তখন দেখব, বাবুরা এ-ব্যবস্থা পালটে দিয়েছেন। নূতন কোন্‌ এক আবিষ্কারের ফলে যন্ত্রটার ব্যবহার নাকি 'সরলতর' করেছেন। 'সরলতর' না কচু ! তাই যাঁরা এসব ব্যাপারে ওয়াকিফ-হাল নন, যাঁরা এই হয়তো পয়লাবারের মত কন্টিনেন্ট যাচ্ছেন, তাঁদের প্রতি আমার 'সরলতম' উপদেশ, বিনুগুরু এসব যন্ত্রপাতি ঘ্যাঁটাতে যাবেন না। অবশ্য গুরু পাওয়া সর্বত্রই কঠিন; এখানে আরো কঠিন। যে যার ধান্দা নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে হন্তদন্ত। কে আপনাকে নিয়ে যাবে সেই বুথ-গুহায়, শিখিয়ে দেবে সে-গুহায় নিহিতং ধর্মস্য তত্ত্বং।

যাক্ ! ফের পাওয়া গিয়েছে লাইন।

"তুমি লুৎসেনে' কখন আসছো ?"

"অপরাধ নিয়ো না। আমি উপস্থিত যাচ্ছি কলোন। তারপর হামবুর্গ ইত্যাদি। তারপর লন্ডন, নটিংহাম—সেখান থেকে ফেরার পথে লুৎসেন'। তুমি খেদিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত তোমার বাড়িতে।"

"দ্যৎ। কিন্তু তদ্দিনে এখানে যে বড্ড শীত জমে যাবে। গরম জামাকাপড় এনেছো তো ? মাখ্ট্ নিষ্টস্ (নেভার মাইন্ড—আসে যায় না), আমার কাছে আছে।"

"তুমি এখনো ফ্রানসিস আসিসীরই শিষ্যা রয়ে গিয়েছ—কী করে কাতর জনকে মদৎ করতে হয়, সে-ই তোমার প্রধান চিন্তা। আমি কি তোমার স্কার্ট ব্লাউজ পরে রাস্তায় বেরবো ? সে-কথা থাক্। আমাকে এ্যারপর্টে আরো তিন ঘণ্টাটাক বসে থাকতে হবে। চলে এসো না এখানে। আজ তো রববার। তোমাকে আফিস দফতর করতে হবে না।"

"রববার। সেই তো বিপদ। বাড়ি থেকে যেতে হবে লুৎসেন' স্টেশন। সেখান থেকে ট্রেনে করে জুরিক। পঁয়ত্রিশ মাইল। সেখান থেকে বাস-এ করে তোমার এ্যারপর্টে। রববার বলে আজ ঢের কম সার্ভিস। সব কটা উঠতি নাবতিতে টায়-টায়, কোথায় পাবো কনেকশন—"

আমি মনে মনে বললুম, হুঁ। ফের সেই কনেকশন ! ইলামবাজার রাম-পুরহাট ॥

"ফ্রিডি বললে, "আচ্ছা দেখি।"

আমি বললুম, "কতকাল তোমাকে দেখি নি।"

* * *

ফ্রিডি যদি এখানে আসে-ই তবে তার বাস্ দাঁড়ায় কোথায় ? আমি বসে আছি ট্রানজিট প্যাসেঞ্জারের খোঁয়াড়ে। এখানে তো ফ্রিডির প্রবেশ নিষেধ। অবশ্য সে এদেশের রীতিমত সম্মানিতা নাগরিকা (সংস্কৃত অর্থে নয়) সিট্জেন্। কাজেই সে স্পেশাল পারমিট যোগাড় করতে পারবে। তবে সেটা যোগাড় করতে কতক্ষণ লাগবে, কে জানে ? আম আনতে দুধ না ফুরিয়ে যায়। ততক্ষণে হয়তো আমার কলোন-গামী প্লেনের সময় হয়ে যাবে।

বাসস্টান্ডে যেতে হলে আমাকে খোঁয়াড় থেকে বেরোতে হয়। কিন্তু আমাকে বেরুতে দেবে কি ? খোঁয়াড়ের বাইরেই স্বাধীন, মুক্ত সুইটজারল্যান্ড। তার জন্য ভিজার প্রয়োজন। আমার সেটা নেই। তবু চেষ্টা করে দেখাই যাক না, কি হয় না হয়। সুকুমার রায় বলেছেন, "উৎসাহে কি না হয়, কি না হয় চেষ্টায়।" সেইটে পড়ে আমার এক সখা ডাকপিয়নকে বলেছিল, "আমার কোনো চিঠি নেই ? কি যে বলছো ? ফের খুঁজে দেখো। উৎসাহে কি না হয়, কি না হয় চেষ্টায়।"

খোঁয়াড়ের গেটে গিয়ে সেখানকার উর্দীপরা তদারকদারকে অতিশয় সবিনয় নিবেদন করলুম, "স্যার ! আমি কি একটু বাইরে ঐ বাসস্ট্যান্ডে যেতে পারি ?"

"আপনি তো ট্র্যানজিট। না ?"

আমি সরাসরি উত্তর না দিয়ে বললুম, "বাস্-এ করে লুৎসের্ন থেকে আমার একটি বান্ধবী—"

হায় পাঠক, তুমি সেই তদারকদারের প্রতিক্রিয়া যদি তখন দেখতে। "বান্ধবী ! বান্ধবী !! সেরতেন্মা (সার্টন্লি) চের্ৎমান্তে (ইতালিয়ানে, সার্টন্লি)" এবং তার পর জর্মনে "জিযার জিষার" (শিওর, শিওর) এবং সর্বশেষে, যদি না কূল পায়, মার্কিন ভাষায় "শিঁয়োর, শিঁয়োঁ।"

আমি জানতুম, আমি যদি বলতুম, আমার বন্ধু আসছেন, সে বলতো, "নো।" যদি বলতুম আমার বীবী, উত্তর হত তদ্বৎ। যদি বলতুম, বৃদ্ধা মাতা তখনো হত, "না"—হয়তো কিঞ্চিৎ থতমত করে। কিন্তু বান্ধবী ! আমার সাতখুন মাফ !

৫

কলোনের নাম কে না শুনেছে ? বিশেষ করে হেন ফ্যাশনেবল মহিলা আছেন কি যিনি কস্মিনকালেও প্রসাধনার্থে ও-দ্য-কলোন—জর্মনের ক্যলনিশ ভাসার—কলনের জল ব্যবহার করেন নি। বিশ্বজোড়া খ্যাতি এই তরল সুগন্ধটির। '৪৭১১' এবং 'মারিয়া ফারীনা' এই দুইটিকেই সব চেয়ে সেরা বলে ধরা হয়। এ-দেশেও কলোন জল তৈরি হয় কিন্তু ওটা বানাতে হলে যে সাত-আট রকমের সুগন্ধি ফুলের প্রয়োজন, তার কয়েকটি এদেশে পাওয়া যায় না—সর্বোপরি 'প্রাক প্রণালী' তো আছেই। বিলেতেও কলোন জলের এতই আদর যে, হিটলারের সঙ্গে দেখা করার জন্য চেম্বারলেন যখন সপারিষদ কলোন থেকে মাইল বিশেক দূরে গোডেসবের্গ-এর মুখোমুখি, রাইন নদীর ওপারে যে বাড়িতে ওঠেন, তার প্রতি ঘরে কলোন জল, কলোন জলের সুগন্ধ দিয়ে নির্মিত গায়ে মাথার সাবান, দাড়ি কামাবার সাবান, ক্রীম, পাউডার—বস্তুত প্রসাধনের তাবৎ জিনিস—রাখা হয়েছিল হিটলারে আদেশে। চেম্বারলেন এই সূক্ষ্ম বিদগ্ধ আতিথেয়তা লক্ষ্য করেছিলেন কি না জানি নে। কারণ তখন তাঁর শিরঃপীড়া তাঁর এ-অভিসার তাঁর দেশবাসী কি চোখে দেখবে। তাঁর আপন ফরেন অফিস যে সেটা নেকনজরে দেখছে না, সেটা তিনি জানতেন, কারণ ইতিমধ্যেই তারা একটা প্যারডি নির্মাণ করে ফেলেছে ঃ

"ইফ অ্যাট ফার্স্ট ইউ কানট সাকসীড
ফ্লাই ফ্লাই ফ্লাই এগেন।"

বলা বাহুল্য, চেম্বারলেন ফ্লাই করে গিয়েছিলেন। আর আমি তো সেই গোডেসবের্গ-এর উপর দিয়ে কলোন-পানে ফ্লাই করে যাচ্ছিই। সেই সুবাদে প্যারডিটি মনে পড়ল।

জুরিখে ফ্রিডির সঙ্গে মাত্র কুড়ি মিনিট কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলুম। মনটা খারাপ হয়ে আছে।

কলোন শহরের সঙ্গে আমার চল্লিশ বছরের পরিচয়।

এখান থেকে প্রায় চৌদ্দ মাইল দূরে বন। সেখানে প্রথম যৌবনে পড়াশুনা করেছিলুম। ট্রামে, বাস্‌-এ, ট্রেনে, জাহাজে করে এখানে আসা অতি সহজ। আমার একাধিক সতীর্থ কলোন থেকে বন ডেলিপ্যাসেঞ্জারী করতো। তাদের সঙ্গে বিস্তর উইকএণ্ড করেছি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শহরটাকে দেখেছি।

সে-সব সবিস্তর লিখতে গেলে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি হবে। আর লিখতে যাবোই বা কেন? জর্মন টুরিস্ট ব্যুরো যদি আমাকে কিঞ্চিৎ 'ব্রাহ্মণ-বিদায়' করতো তবে না হয়—

যদি নিতান্তই কিছু বলতে হয়, তবে প্রথম নম্বর সম্বন্ধে বলি যে, সেটি আপনি চান কি না চান, কিছুতেই এড়াতে পারবেন না। কলোনের বিরাট গগনস্পর্শী গির্জা। প্যারিসে যে-রকম যেখানেই যান না কেন, এ্যাফ্যাল টাওয়ারটা এড়াতে পারবেন না, কলোনের এই কেথিড্রেলটির বেলাও তাই। তবে এ্যাফ্যাল স্তম্ভ বদখদ, কিন্তু কলোনের গির্জাচুড়ো তন্বঙ্গী সুন্দরী। যেন মা-ধরণী ঊর্ধ্বপানে দু বাহু বাড়ায়ে পরমেশ্বরকে তাঁর অনন্ত অবিচ্ছিন্ন নমস্কার জানাচ্ছেন।

এ গির্জা আবার আমাদের কাছে নবীন এক গৌরব নিয়ে ধরা দিয়েছে।

বছর দুতিন পূর্বে কলোনবাসী প্রায় শ' দুই তুর্কী ও অন্যান্য মুসলমান ঐ গির্জার প্রধান বিশপকে গিয়ে আবেদন জানায়, "এ-বছরে ঈদের নামাজ শীতকালে পড়েছে। বাইরে বরফ; সেখানে নামাজ পড়ার উপায় নেই। হুজুর যদি আপনাদের এই গির্জের ভিতরে আমাদের নামাজ পড়তে দেন, তবে আল্লা আপনাকে আশীর্বাদ করবেন।" বিশপের হৃদয়কন্দরে কণামাত্র আপত্তি ছিল না —কিন্তু··? এ শহরের লোক খৃস্চান। তাদেরই বিত্ত দিয়ে, গরিবের কড়ি দিয়ে এ-গির্জা সাতশ' বছর আগে গড়া হয়েছে। এখনো ওদেরই পয়সাতে এ-মন্দিরের তদারকি দেখভাল চলে। সেও কিছু কম নয়। এরা যদি আপত্তি করে? কিন্তু এই বিশপটি ছিলেন বড়ই সন্তপ্রকৃতির সজ্জন। এবং তার চেয়েও বড় কথা: সাহসী। তিনি অনুমতি দিয়ে দিলেন। মা-মেরী মালিক। তিনি সর্বসন্তানের মাতা।

কিমাশ্চর্যমতঃপরম। তাঁর কাছে কোনো প্রতিবাদপত্র এল না। খবরের কাগজেও এই অভাবনীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ বেরুলো না। অবিশ্বাস্য! অবিশ্বাস্য!! অবিশ্বাস্য!!!

কিন্তু মার্কিন 'টাইম' কাগজে বেরিয়েছে ও বিলেতেও বেরিয়েছে। তারপর সন্দ করে কোন্‌ পিচেশ!

* * *

কলোন এ্যারপর্টে নেমে দেখি, দুটো স্যুটকেসের একটা আমার নেই। ছুট ছুট দে ছুট,—সেই ঘরের দিকে যেখানে 'হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ' সম্বন্ধে তড়িঘড়ি ফরিয়াদ জানাতে হয়। নইলে চিত্তির। অবশ্য এরা নিজের থেকেই হয়তো দু-পাঁচ দিনের ভিতরই আমার বেওয়ারিশ জাদুকে খুঁজে পাবেন, কিন্তু

আমি কোন মোকামে আস্তানা গাড়বো, তার ঠিকানাটা এঁদের না দিলে মাল হস্তগত হবে কি করে? সেটা তখন তার মালিককে হারাবে! কোনো এক গ্রীক দার্শনিক নাকি বলেছেন, "একই নদীতে তুমি দুবার আঙুল ডোবাতে পারবে না একই শিখায় দুবার আঙুল পোড়াতে পারবে না। কারণ প্রত্যেকটি বস্তু প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হচ্ছে।" মানলুম। কিন্তু একই সুটকেস নিশ্চয়ই দুবার, দুবার কেন দুশ' বার হারাতে কোন বাধা নেই। অতি অবশ্য কবিগুরু বলেছেন, "তোমায় নতুন করে পাব বলেই হারাই ক্ষণেক্ষণ/ও মোর ভালবাসার ধন!!" কিন্তু প্রশ্ন, এটা কি হারানো বাক্সের বেলাও খাটে?

আপিস ঘরটি প্রমাণ সাইজের চেয়েও বৃহদায়তন। ভিতরে ফুটফুটে মেমসায়েব বসে আছেন। আমার লাগেজ টিকিট দেখাতেই তিনি মুচকি হেসে বললেন, "নিশ্চিন্ত থাকুন, ওটা খোওয়া যাবে না। কিন্তু বলুন তো, ওটার ভিতর কি কি আছে?"

সর্বনাশ! সে কি আমি জানি? প্যাকিং করছে আমার এক তালেবর ভাতিজা মুখুয্যে। তার বাপ প্রতি বৎসর নিদেন তিনবার ইয়রোপ-আমেরিকা যেতেন। সে নিখুঁত প্যাকিং করে দিত। আমার বেলা এ-বারে করেছে— নিখুঁততর। কোন্ বাক্সে কি মাল রেখেছে কি করে জানবো!

কিন্তু মিসি, বাবা সদয়া। পীড়াপিড়ি করলেন না। আমার ঠিকানাটি টুকে নিলেন। আর ইতিমধ্যে বার বার বলছেন, "এ্যার ইণ্ডিয়া বলুন, লুফট-হানজা বলুন, সুইসএ্যার বলুন কোনো লাইনেই কোন লাগেজ খোওয়া যায় না। আপনি পেয়ে যাবেনই যাবেন।"

আমি মনে মনে বললুম, "বটে!" বেরোবার সময় তাকে বিস্তর ধন্যবাদ জানিয়ে সবিনয়ে বললুম, "গ্নেডিগেস ফ্রলাইন (সদয়া কুমারী)! একটি প্রশ্ন শুধোতে পারি কি?"

সুমধুর হাস্যসহ, "নিশ্চয়, নিশ্চয়।"

আমি বললুম, "তাবৎ হারানো মালই যদি ফিরে পাওয়া যায়, তবে এ-হেন বিরাট আপিস আপনারা করেছেন কেন? আমি তো শুনেছি, কলোন এ্যার পোর্টের প্রতিটি ইঞ্চির জন্য দশ-বিশ হাজার টাকা ছাড়তে হয়।"

প্রত্যুত্তরে প্রতীক্ষা না করেই এক লম্ফে দফতর থেকে বেরিয়ে মালসামান নিয়ে উঠলুম বিরাট এক বাস্-এ।

* * *

বাঁচলুম, বাবা, বাঁচলুম। প্লেনের গর্ভ থেকে বেরিয়ে খোলা মেলায় এসে বাঁচলুম। বাসটি যদিও পর্বতপ্রমাণ, সাগর করিবে গ্রাস হয় অনুমান, তবু চলছে যেন রোলস রইল—রইম খানদানী গতিতে, মৃদু মধুরে। কবিগুরু গেয়েছিলেন, 'কাঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসার ঘায়ে'—আমি গাইলুম, 'বাঁচালে তুমি মোরে ভালো বাস্-এর ছায়ে।'

আহা কী মধুর অপরাহ্ণের সূর্যরশ্মি। কখনো মেঘমায়ায় কখনো আলো-ছায়ায়। দু-দিকের গাছপাতার উপর সে-রশ্মি কভু বা মেঘের ভিতর দিয়ে

আলতো আলতো হাত বুলিয়ে যায়, কভু বা রুদ্রদীপ্ত হয়ে প্রচণ্ড আলিঙ্গন করে। ঐ হোথায় দেখছি, বুড়ো চাষা ঘাসের উপর শুয়ে আছে, চোখের উপর টুপি ঢেকে। তার সবুজ পাতলুন যেন ঘাসের ঝিলিমিলির সঙ্গে 'একতালে যায় মিলি'। এদেশের নবান্ন হতে এখনো বেশ কিছুদিন বাকি আছে। চতুর্দিকে অল্পবিস্তর ফসল কাটা হচ্ছে। আজ রববার। রাইনল্যাণ্ডের লোক বেশির ভাগই ক্যাথলিক। তাদের অধিকাংশই সেদিন সর্বকর্ম ক্ষান্ত দেয়। তাই ক্ষেত-খামারে তেমন ভিড় নেই।···আমিও মোকামে পৌঁছুতে পারলে বাঁচি। ইংরিজীতে প্রবাদ 'এ সিনার হ্যাজ নো সনডে।' 'পাপীর রববার নেই।' আমি তো তেমন পাপিষ্ঠ নই !!

বাস মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রামের ভিতর দিয়ে যায়। সেখানেও রাস্তা নির্জন। বাচ্চাকাচ্চারা কোথায় ? তারা তো ক্লাইপে বা সুধালয়ে যায় না— সেখানে অবশ্যই আজ জোর কারবার, বেজায় ভিড়। আমার পাশের সীটে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসেছিলেন। তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে বললুম, "স্যর, ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে আমি এসব গ্রামের ভিতর দিয়ে গিয়েছি। তখন তো ছেলে-মেয়েরা রাস্তার উপর রোল-স্কেটিং করতো, দড়ি নিয়ে নাচতো, এমন কি ফুটবলও খেলতো। ওরা সব গেল কোথায় ?"

বৃদ্ধ বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, "একাধিক উত্তর হয়তো আছে। চট করে যেটা মনে আসছে সেটা বলতে গেলে বলি ; বদ্ধ ঘরে টেলিভিশন দেখছে।"

আমি একটু ঘাড় চুলকে বললুম, "কিছু যদি অপরাধ না নেন, স্যর, তবে শুধবো, এটা কি সর্বাংশে ভালো ? ফার্সীতে একটি দোহা আছে ঃ—

হর্ চে কুনী, ব্ খুদ্ কুনী
খা খুব্ কুনী, খা বদ্ কুনী ॥
যা করবে স্বয়ং করবে
ভালো করো কিংবা মন্দই করো।

এই যে প্যাসিভভাবে বসে বসে টেলি দেখা, তার চেয়ে রাস্তায় অ্যাকটিভভাবে খেলাধুলো করা কি অনেক বেশী কাম্য নয় ?"

গুণী এবারে চিন্তা-না করেই বললেন, "নিশ্চয়ই। অবশ্য ব্যত্যয়ও আছে। যেমন মনে করুন, আমরা যখন মোৎসার্ট বা শপাঁ শুনি তখন তো আমরা প্যাসিভ। আর তাই বা বলি কি করে ? বেটোফেনকে গ্রহণ করা তো প্যাসিভ নয়। ভেরি ভেরি অ্যাকটিভ কর্ম। কী পরিমাণ কনসানট্রেশন তখন করতে হয়, চিন্তা করুন তো। কিন্তু বাচ্চাদের কথা বাদ দিন—কটা বয়স্ক লোকই বা সে জিনিস করে ?"

বুঝলুম লোকটি চিন্তাশীল। এঁকে খুঁচিয়ে আরো অনেক তত্ত্বকথা জেনে নিই। বললুম, "তা টেলিতে প্রোগ্রাম কিছুই দেয় না ?"

"তা হলে শুনুন, আপনাকে পুরো ফিরিস্তি দিচ্ছি। যদিও আমি ঐ যন্ত্রটির পুজোরী নই। পুরনো ফিল্ম, নয়া থিয়েটার, গর্ভপাতের সেমিনার আলোচনা, পাদ্রিদের বক্তৃতা (এ দুটো তিনি ঠিক পর পর বলেছিলেন সেটা আমার এখনো

স্পষ্ট মনে আছে), রাজনৈতিকদের সঙ্গে ইণ্টারভ্যু, খেলা, কাবারে, ইটালী ভ্রমণ, চন্দ্রাভিযান, ভিয়েটনাম থেকে প্রত্যক্ষদর্শীর প্রতিবেদন, পার্লামেণ্টে হ্যার ভিলি ব্রাণ্ট ও হ্যার শেলের বক্তৃতা—এবং সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে ঐ একই কেচ্ছা, একই অন্তরীণ খাড়াবড়িথোড়থোড়বড়িখাড়া (তিনি জরমনে বলেছিলেন 'একই ইতিহাস'—ডী জেলবে গেশিখটে—)। সর্ববস্তু কুচি কুচি করে পরিবেশন। পরের দিনই ভুলে যাবেন, আগের দিন কি দেখেছিলেন—মনের উপর কোনো দাগা কাটে না। পক্ষান্তরে দেখুন, বই পড়ার ব্যাপারে আপনি আপনার রুচিমত বই বেছে নিচ্ছেন।"

ইতিমধ্যে আমাদের বাস কতবার যে কত ট্রাফিক জামে কত মিনিট দাঁড়িয়েছে তার হিসেব আমি রাখি নি। অথচ এদেশে রিকশা, ঠ্যালা, গোরুরগাড়ি এমন কোনো কিছুই নেই যে-সব হযবরল আমাদের কলকাতাতে নিত্য নিত্য ট্র্যাফিক জ্যাম জমাতে কখনো স্বেচ্ছায় কখনো অনিচ্ছায়—বিশ্ববিজয়ী প্রতিষ্ঠান।

ভদ্রলোক বাইরের দিকে আঙুল তুলে বললেন, "ঐ দেখুন, আরেক উৎকট নেশা। মোটর, মোটর, মোটর। প্রত্যেক জরমনের একখানা মোটরগাড়ি চাই। জরমন মাত্রই মোটরের পূজারী।"

আমার কেমন যেন মনে হল, আমরা বোধ হয় বন্ শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছে গিয়েছি। কিছুটা চেনা-চেনা ঠেকছে, আবার অচেনাও বটে। অথচ একদা এ শহর আমি আমার হাতের তেলোর চেয়ে বেশী চিনতুম। আমি ভদ্রলোককে আমার সমস্যা সমাধান করতে অনুরোধ জানালে তিনি বললেন, "এটা বনই বটে। তবে এ অঞ্চলটা গত যুদ্ধে এমনই বোমারু-মার খেয়েছিল যে এটাকে নতুন করে গড়া হয়েছে। তবে শহরের মধ্যিখানটা প্রায় পূর্বেরই মত মেরামত করে বানানো। আসল কথা কি জানেন, বমিঙের ফলে ঘিঞ্জি পাড়াগুলো যে নষ্ট হয়ে গেল সেগুলোকে ভালো করে, নতুন করে প্ল্যান মাফিক বানাবার চান্সটা আমরা মিস করেছি। তবে এই যে বললুম, শহরের মাঝখানটা মোটামুটি আগেরই মত—হার্ট অব দি সিটি—আর জানেন তো পুরানো হার্টের জায়গায় নতুন হার্ট বসানো মুশকিল। এই ধরুন লুটভিষ্ ফান বেটোফেন—"

আমি বললুম, "ওই নামটার ঠিক উচ্চারণটা আমি আজো জানিনে।"

হেসে বললেন, "ঐ তো ফেললেন বিপদে। মাঝখানের Vanটা যে খাঁটি জর্মন নয় তা তো বুঝতেই পারছেন। ওঁরা প্রাচীন দিনের ফ্ল্যামিশ। তখন তারা 'ভান' না 'ফান' উচ্চারণ করতো কে জানে—অন্তত আমি জানি নে—"

আমি বললুম, "থাক, থাক। এবারে যা বলছিলেন তাই বলুন।"

"সেই বেটোফেনের বাড়ি যদি বোমাতে চুরমার হয়ে যেত তবে সেখানে তো একটা পিরামিড গড়া যেত না।"

"এমন কি তাজমহলও না।"

* * *

দুম্ করে গাড়ি থেমে গেল। এ কি? ও! মোকামে পৌঁছে গিয়েছি। অর্থাৎ বন্ শহরে। এবং সব চেয়ে প্রাণাভিরাম নয়নানন্দদান দৃশ্য—যে পরিবারে

উঠবো তারই একটি জোয়ান ছেলে ভিটরিষ্ উলানোফস্কি প্রবলবেগে হাত নাড়াচ্ছে। মুখে তিন গাল হাসি। পাশে দাঁড়িয়ে তার ফুটফুটে বউ। সে রুমাল দুলোচ্ছে।

৬

লক্ষ্মী ছেলে ডীটরিষ। তার মাঝারি সাইজের মোটরখানা এনেছে। আমার কোনো আপত্তি না শুনে বললে, "আমি মালপত্রগুলো তুলে নিচ্ছি। তুমি ততক্ষণ বউয়ের সঙ্গে দুটি কথা কয়ে নাও। ও তো আপনাকে চেনে না।" মেয়েটিকে বাড়ির কুশলাদি শুধোলুম। কিন্তু বড় লাজুক মেয়ে—কয়েকদিন আগে 'দেশ' পত্রিকায় যে সিগারেট-মুখী 'মর্ডান মেয়ে'র ছবি বেরিয়েছে তার ঠিক উল্টোটি। কোনো প্রশ্ন শুধোয় না। শুধু উত্তর দেয়। শেষটায় বোধ হয় সেটা আবছা-আবছা অনুভব করে একটিমাত্র প্রশ্ন শুধোলে, "বন্ কি খুব বদলে গেছে? আমি অবশ্য প্রাচীন দিনের বন্ চিনি নে। আমার বাড়ি ছিল ক্যোনিষবের্গে।"

সর্বনাশ। এবং পাঠক সাবধান।

ক্যোনিষবের্গ শহরটি এখন বোধ হয় পোলাণ্ডের অধীনে। ঐসব অঞ্চল থেকে লক্ষ লক্ষ নরনারী বাস্তুহারা সর্বহারা হয়ে পশ্চিম জর্মনিতে এসেছে। তাদের বেশীর ভাগই সে-সব দুঃখের কাহিনী ভুলে যেতে চায়। কাজেই সাবধান! ওসব বাবদে ওদের কিছু জিজ্ঞেস করো না।

তবে এ তত্ত্বও অতিশয় সত্য যে মৌকামাফিক দরদ-দিলে যদি আপনি কিছু শুনতে চান তখন অনেক লোকেই, বিশেষ করে রমণীরা অনর্গল অবাধ গতিতে সব কিছু বলে ফেলে যেন মনের বোঝা নামাতে চায়। বিশেষ করে বিদেশীর সামনে। সে দুদিন বাদেই আপন দেশে চলে যাবে। ও যা বলেছিল সেটা নিয়ে খামোখা কোনো ঘোটলার সৃষ্টি হবে না। আমি তাই বেমালুম চেপে গিয়ে বললুম, "ও ক্যোনিষবের্গ! যেখানে এ-যুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কান্ট্ জন্মেছিলেন? এবং শুনেছি তিনি নাকি ঐ শহরের বারো না চোদ্দ মাইলের বাইরে কখনো বেরোন নি! শহরটাকে এতই ভালোবাসতেন!"...

ইতিমধ্যে ডীটরিষ স্টিয়ারিঙে বসে গেছে এবং আমার শেষ মন্তব্যটা শুনেছে। বললে, "ভালোবাসতেন না কচু! আসলে সব দার্শনিকই হাড়-আলসে।"

আমি বললুম, "সে-কথা থাক। তোর বউ শুধোচ্ছিল, বন্ শহরটা কি খুব বদলে গেছে? তারই উত্তরটা দি? বদলেছে, বদলায়ও নি—"

"তুমি, মামা, চিরকালই হেঁয়ালিতে কথা কও—"

আমি বললুম, "থাক্, বাবা থাক্। বাস্-এ এক বৃদ্ধ বিষয়টির অবতারণা করতে না করতেই মোকামে পেঁৗছে গেলাম। আর এ-তাবৎ দেখেছিই বা কি?"

বন্ শহরের নাম করলেই দেশী-বিদেশী সবাই বেটোফেনের নাম সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করে বটে, কিন্তু এ বৎসরে বিশেষ করে। কারণ তাঁর দ্বিশত জন্মশত-বার্ষিকী সম্মুখেই। ডিসেম্বর ১৯৭০-এ। এ-শহর তাঁকে এতই সম্মান করে যে তাঁর সুন্দর প্রতিমূর্তিটি তুলেছে তাদের বিরাটতম চত্বরে, তাদের বৃহত্তম এবং প্রাচীনতম না হলেও তারই কাছাকাছি প্রাচীন ম্যুনস্টার গির্জার পাশে। হয়তো তার অন্যতম কারণ, বেটোফেন ছিলেন সর্বান্তরকরণে ঈশ্বরবিশ্বাসী। শুধু তাঁর সঙ্গীত নয়, তাঁর বাক্যালাপে চিঠিপত্রে সর্বত্রই তাঁর ঈশ্বরে পরিপূর্ণ বিশ্বাস, প্রভুর পদপ্রান্তে তাঁর ঐকান্তিক আত্মনিবেদন বার বার স্বপ্রকাশ।

সেখান থেকে কয়েক মিনিটের রাস্তা — ছোট্ট গলির ছোট্ট একটি বাড়ির ছোট্ট একটি কামরায় যেখানে তাঁর জন্ম হয়। বাড়ির নিচের তলায় বেটোফেন মিউ-জিয়ম। সেখানে তাঁর ব্যবহৃত অনেক কিছুই আছে, যেমন ইয়াসনা পলিয়ানাতে তলস্তয়ের —হত্তর, সম্পূর্ণতর, কারণ সেটা দেড়শ বছর পরের কথা এবং অসম্পূর্ণতম রবীন্দ্রনাথের উত্তরায়ণে, যদ্যপি সেটা তলস্তয়ের প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে।

কিন্তু সেখানে সব চেয়ে মর্মস্পর্শী বেটোফেনের কানের চোঙাগুলো। বত্রিশ বৎসর বয়স থেকেই তিনি ক্রমে ক্রমে কালা হতে আরম্ভ করলেন। বিধাতার এ কী লীলা! বীণাপাণির এই অংশাবতার আর তাঁর বীণা শুনতে পান না। তখন তিনি আরম্ভ করলেন ঐ সব কানের চোঙা ব্যবহার করতে। পাঠক, দেখতে পাবে, তাঁর বধিরতা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যেমন বাড়তে লাগলো সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোঙার সাইজও বাড়তে লাগলো। তাতে করে তাঁর কোনো লাভ হয়েছিল কি না বলা কঠিন। তবে এটা জানি, তার কিছুকাল পরে, যখন তাঁর সঙ্গীতপ্রেমী কোনো সহচর বলতেন. 'বাঃ! কী মধুর সুরেলা বাঁশী বাজিয়ে যাচ্ছে রাখাল ছেলেটি', আর তিনি কিছুই শুনতে পেতেন না তখন বেটোফেন বলতেন, তিনি তন্মুহূর্তেই আত্মহত্যা করতেন যদি না তাঁর বিশ্বাস থাকতো যে সঙ্গীতে এখনো তাঁর বহু কিছু দেবার আছে। আমাদের শ্রীরাধা যে রকম উদ্ধবকে বলেছিলেন, 'যদি না আমার 'বিশ্বাস' থাকতো, প্রভু একদিন আমার কাছে ফিরে আসবেন, তাহলে বহু পূর্বেই আমার মৃত্যু হয়ে যেতো।' এবং সকলেই জানেন, বদ্ধ কালা হয়ে যাওয়ার পরও বেটোফেন মনে মনে সঙ্গীতের রূপটি ধারণ করে বহুবিধ স্বর্গীয় রচনা করে গেছেন, যেগুলো তিনি স্বকর্ণে শুনে যেতে পান নি। আমি যেন কোথায় পড়েছি, তিনি সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশে করুণ আবেদন জানাচ্ছেন, প্রভু যেন তাঁকে একবারের মত তাঁর শ্রুতিশক্তি ফিরিয়ে দেন যাতে করে তিনি মাত্র একবারের তরে আপন সৃষ্ট সঙ্গীত শুনে যেতে পান। তারপর তিনি সধন্যান্তঃ-করণে পরলোকে যেতে প্রস্তুত।

চিন্তাস্রোতে বাধা পড়লো। ডীটরিষ শুধলো, "মামা, কথা কইছ না যে!"

বললুম, "আমি ভাবছিলুম বেটোফেনের কানের চোঙাগুলোর কথা। ওগুলো সত্যি কি তাঁর কোনো কাজে লেগেছিল?"

ডীটরিষ বললে, "বলা শক্ত। কোনো কোনো আধাকালা একখানা কাগজের

টুকরো দু'পাটি দাঁত দিয়ে চেপে ধরে কাগজের বেশীর ভাগটা মুখের বাইরে রাখে। ভাবে, ধ্বনিতরঙ্গ ঐ কাগজকে ভাইব্রেট করে দাঁত হয়ে মগজে পেঁছোয়, কিংবা কান হয়ে। কেউ বা সামনের দু'পাটির চারটে দাঁত দিয়ে লম্বা একটা পেনসিল কামড়ে ধরে থাকে। কি ফল হয় না হয় কে বলবে? আচ্ছা, মামু, তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ, কী রকম অদ্ভুত, প্রিমিটিভ মিনি সাইজের যন্ত্র দিয়ে তিনি তাঁর বিচিত্র সঙ্গীত রচনা করেছিলেন? আমার কাছে ভারি আশ্চর্য লাগে!"

আমি বললুম, "কেন বৎস, ঐ যে তোমার ছোট পিসি, যার সঙ্গে আমার চল্লিশ বছরের বন্ধুত্ব, লীজেল—দেখেছো, ঝড়তি-পড়তি কয়েক টুকরো লেটিসের পাতা, আড়াই ফোঁটা লেবুর রস আর তিন ফোঁটা তেল দিয়ে কি রকম সরেস স্যালাড তৈরী করতে পারে? মুখে দিলে যেন মাখম!!···আর তোর আমার মত আনাড়ীকে যাবতীয় মশলাসহ একটা মোলায়েম মুর্গী দিলেও আমরা যা রাঁধবো সেটা তুইও খেতে পারবি নি, আমিও না। পিসি লীজেল কি বলবে, জানি নে। অথচ জানিস, ঐ অভুক্ত মুর্গীটি তাঁকে তখন দিয়ে দে। তিনি সেটাকে ছোট ছোট টুকরো করে যাকে ফরাসীরা বলে রাগু ফ্যাঁ, রা ফ্রিকাস্ অর্থাৎ লম্বা লম্বা ফালি-ফালি করে কেটে, মুর্গীটাতে আমরা যে-সব বদ-রান্নার ব্যামো চাপিয়েছিলুম সেগুলো রাইনের ওপারে পাঠিয়ে এ্যামন একটি রান্না করে দেবেন যে, প্যারিসের শ্যাফতক্ আর্মরি আর্মরি বলতে বলতে তারিয়ে তারিয়ে খাবে।··· প্রকৃত গুণীজন যা-কিছুর মাধ্যমে যা-কিছু সৃষ্টি করতে পারেন। আমাদের দেশে একরকম বাদ্যযন্ত্র আছে। 'একতারা' তার নাম। তাতে একটি মাত্র তার। তার দুদিকে দুটি ফ্লেক্সিবল বাঁশের কৌশল আছে। সে দুটোতে কখনো জোর কখনো হাল্কা চাপ দিয়ে তার মাঝখানের তারটাকে প্লাক করে নাকি বিয়াল্লিশ না বাহান্নোটা নোট বের করা যায়। তবেই দ্যাখ। বেটোফেনের মত কটা লোক পৃথিবীতে আসে—আমাদের দেশেও গণ্ডায় গণ্ডায় তানসেন জন্মায় না। যদিও আমাদের দেশ তোদের দেশের চেয়ে বিস্তর বিরাটতর, এবং সেখানে কলাচর্যা আরম্ভ হয়েছিল অন্তত চার হাজার বছর পূর্বে। এবং আমাদের কলাজগতে অমরা এখন সাহারাতে। এবং—"

ডীটরিষ বললে, "তুমি আমাদের পার্লামেণ্ট হাউসটা দেখবে না? রাইনের পারে। আমি একটু ঘোরপথে যাচ্ছি। সোজা পথে গেলে দু-পাঁচ মিনিট আগে বাড়ি পেঁছুতুম।

"দ্যাখ ডীটরিষ, তোর পিসি নিশ্চয়ই বিস্তর কেক-পেসট্রি আমাদের জন্য বানিয়ে বসে আছে—"

ডীটরিষের বউ বললে, "মামা, শুধু কেক-পেসট্রি বললেন। ওদিকে পিসি কি কি বানিয়ে বসে আছেন, জানেন? ক্যোনিৎসবের্গের ক্লপসে (ক্যানিসগবেগ' শহরের একরকম কোফ্তা), ফ্রাংকফুর্টের সসিজ, হানোফারের ষাঁড়ের ন্যাজের শুরুয়া—"

আমি বাধা দিয়ে বললুম, "সে তো জানি। কিন্তু লীজের পিসি আমার

জন্যে কি ক্যাঙারু ন্যাজের শুরুয়া তৈরী করেছে ?"...

দুজনাই তাজ্জব। আমি বললুম, "ষাঁড়ের ন্যাজের ভিতর থাকে চর্বি এবং মাংস। তার একটা বিশেষ স্বাদ থাকে। কিন্তু ষাঁড়ের ন্যাজ আর কতটুকু লম্বা ? তার চেয়ে ক্যাঙারুর ন্যাজ ঢের ঢের বেশী। ওটা যদি পাঁচজনকে খাওয়ানো যায় তবে বিস্তর কড়ি সাশ্রয় হয়।"

ঘ্যাঁচ করে গাড়ি থামলো।

"এটা কি রে ? মনে হয়, গোটা আষ্টেক বিরাট বিস্কুটের টিন একটার উপর আরেকটা বসিয়ে দিয়েছে। বললুম আমি।

ডীটরিষ বললে, "এটাই আমাদের পার্লামেন্ট।"

৭

যাকে বলে মর্ডান আর্ট, পিকাসসো উপস্থিত যার পোপস্য পোপ,সেই পদ্ধতিটি জর্মনরা কখনো খুব পছন্দ করে নি। কাইজার দ্বিতীয় ভিলহেলম যাকে এখনো মার্কিনিংরেজ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য দায়ী করে তিনি ১৯০১ খৃষ্টাব্দে আর্ট এবং আর্টের আদর্শ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। তাঁর বক্তব্য ছিল : আর্ট হবে সুন্দর, আর্ট হবে সমাজসেবক, রাষ্ট্রসেবক, আর্ট মানুষের দুঃখদৈন্যের ছবি না এঁকে আঁকবে এমন ছবি, কম্পোজ করবে এমন সঙ্গীত, রচনা করবে এমন সাহিত্য যাতে মানুষ আপন পীড়াদায়ক পরিস্থিতি ভুলে গিয়ে আনন্দসায়রে নিমজ্জিত হবে। আজকের দিনে আমরা এটাকে নাম দিয়েছি এসকেপিজম—পলায়ন-মনোবৃত্তি। বলা বাহুল্য জর্মন আর্টিস্ট—সাহিত্যিক সঙ্গীতস্রষ্টা—কাইজারের এই পথনির্দেশ খবরের কাগজে পড়ে স্তম্ভিত হন। তাহলে আর্টিস্টের কোনো স্বাধীন সত্তা নেই। সে তার আপন সুখদুঃখ, আপন বিচিত্র অভিজ্ঞতা, আপন হৃদয়ে উপলব্ধ ভবিষ্যতের আশাবাদী চিত্র অঙ্কন করতে পারবে না ! সে তাহলে রাষ্ট্রের ভাঁড়, ক্লাউন ! তার একমাত্র কর্তব্য হল জনসাধারণকে কাতুকুতো দিয়ে হাসানো !

কিন্তু জর্মন জনসাধারণ কাইজারের কথাই মেনে নিল। এটা আমার ব্যক্তিগত মত নয়। এই পরিস্থিতিটা বোঝাতে গিয়ে প্রখ্যাত জর্মন সাংবাদিক, সাহিত্যিক, দার্শনিক শ্রীযুক্ত য়োখিম বেসার বলেছেন, জর্মন মাত্রই উপরের দিকে তাকায় ; রাজা কি হুকুম দিলেন সেই অনুযায়ী কাব্যে চিত্রে সঙ্গীতে আপন রুচি নির্মাণ করে।

১৯১৮-এ কাইজার যুদ্ধে হেরে হল্যাণ্ডে পলায়ন করলেন।

তখন সত্য সত্য আরম্ভ হল 'মডার্ন আর্টের' যুগ। যেন কাইজারকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করার জন্য আর্টিস্টরা আরম্ভ করলেন রঙ নিয়ে নিত্য নব উন্মাদ নৃত্য, ধ্বনি নিয়ে সঙ্গীতে তাণ্ডব একসপেরিমেণ্ট, ভাস্কর্যে বিকট বিকট মূর্তি যার প্রত্যেকটাতেই থাকত একটা ফুটো (তার অর্থ বোঝাতে গেলে পুলিস

আমাকে জেলে পুরবে)। আমি ঐ সময়ে জর্মনিতে ছিলুম। মডার্নদের পাল্লায় পড়ে একদিন একটা চারুকলা প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে এক লম্ফে পুনরপি বেরিয়ে এসেছিলুম। একদা যে-রকম কোন এক জু-তে বোকা পাঠার খাঁচার সামনে থেকে বিদ্যুৎ গতিতে পলায়ন করেছিলুম। বোঁটকা গন্ধে।

তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে সেখানে উত্তম দ্রষ্টব্য কিছুই ছিল না। নিশ্চয়ই ছিল। রাস্তার ডাস্টবিন খুঁজলে কি আর খান দুই লুচি, একটা আলুর চপ পাওয়া যায় না? কিন্তু আমার এমন কি দায় পড়েছে!

এরপর ১৯৩৩-এ এলেন হিটলার। তাঁর কাহিনী সবাই জানেন। কিন্তু আর্ট সম্বন্ধে তাঁর অভিমত সবাই হয়তো জানেন না; তাই সংক্ষেপে নিবেদন করছি। হিটলার সর্বক্ষণ কাইজারকে অভিসম্পাত দিতেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, কাইজার যদি কাপুরুষের মত হার না মেনে লড়ে যেতেন তবে জর্মনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভ করতোই করতো।...অথচ আর্ট সম্বন্ধে দেখা গেল হিটলার কাইজার সম্পূর্ণ একমত পোষণ করেন। তিনি কঠিনতর কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে বারংবার বলে যেতে লাগলেন, 'আর্ট হবে সমাজের দাস অর্থাৎ নাৎসীদের দাস। সর্বনিম্নে এই পৃথ্বীতলে তারা যে ন্যায়সম্মত আসন খুঁজছে তারই সেবা করবে আর্টিস্টরা।'

কাইজারের চরম শত্রুও বলবে না তিনি অসহিষ্ণু লোক ছিলেন। তাঁর আমলে তাঁর নির্দেশ সত্ত্বেও যাঁরা মডার্ন ছবি আঁকতেন তাঁদের বিরুদ্ধে তিনি কোনো প্রকারেরই কোনো কিছু করেন নি।

কিন্তু হিটলার চ্যানসেলার হওয়ার পর আরম্ভ হল এঁদের উপর নির্যাতন। উত্তম উত্তম ছবি, নব নব সঙ্গীত ব্যান করা হল। সেরা সেরা পুস্তক পোড়ানো হল—কারণ এগুলো নাৎসী সঙ্গীতের সঙ্গে এক সুরে এক গান গায় না। আমি দূর থেকে এরকম একটা অগ্নিযজ্ঞ দেখেছিলুম। কাছে যাই নি। পাছে প্রভুরা আমার রঙ দেখে আমাকে ইহুদী ঠাউরে আমার নাকটা না কেটে দেন। যদিও আমার নাকটি খাঁটি মঙ্গোলীয়ন। খাটো, বেঁটে, হ্রস্ব। কিন্তু বলা তো যায় না।

হিটলার তাঁর সাধনোচিত ধামে গেছেন। এখন জর্মনরা উঠে পড়ে লেগেছেন 'মডার্ন' হতে। চোদ্দতলা বাড়ি ভিন্ন অন্য কথা কয় না।

তাই এই বিস্কুটটিনপারা পার্লিমেন্ট।

* * *

ডীটরিষকে বললুম, "জানো, ভাগ্নিনা, আমাদের দেশেও এ ধরনের স্থাপত্য হুশ হুশ করে আকাশপানে উঠছে। তারই এক আর্কিটেক্ট এসেছেন আমাদের সঙ্গে তাস খেলতে। ভদ্রলোক সিগার খান। বর্ষাকাল। সিগার গেছে মিইয়ে। ঘন ঘন নিভে যায়। ভদ্রলোক দেশলাই খোঁজেন।...খেলা শেষ হল। তখন কেন জানি নে তিনি তাঁর দেশলাই আর খুঁজে পান না। আমাদের এক রসিক বন্ধু বসে বসে খেলা দেখছিল। সে দরদী কণ্ঠে বললে, 'দাদাদের কাছে আমার অনুরোধ, আর্কিটেক্ট মশায়ের মডেলটি তোমরা কেউ গাপ মেরো না। দেশলাইটির মডেল থেকেই তো তিনি হেথাহোথা সর্বত্র বিয়াল্লিশতলার বিলডিং

হাঁকাচ্ছেন! ওটা গায়েব হলে ওঁয়ার রুটি মারা যাবে যে।"

ডীটরিষ বললে, "জানো, মামু, আমাদের বিশ্বাস প্রাচ্যদেশীয়রা বড্ডই সীরিয়াস। সর্বক্ষণ গুমড়ো মুখ করে, লর্ড বুদ্ধের মত আসন নিয়ে শুধু আত্মচিন্তা মোক্ষানুসন্ধান করে। তারাও যে রসিকতা করে এ কথা ৯৯.৯% জর্মন কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। অথচ তোমার এই বন্ধুটির রসিকতাটি শুধু যে রসিকতা তাই নয়। ওতে গভীর দর্শনও রয়েছে। মডার্ন আর্কিটেকচর সম্বন্ধে মাত্র ঐ একটি দেশলাই দিয়ে তিনি তাঁর তাচ্ছিল্য সিনিসিজমসহ প্রকাশ করলেন কী সাতিশয় সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে! ভদ্রলোক কি তোমার মত লেখেন-টেখেন—লিতেরাত্যোর?"

আমি বললুম, "তওবা, তওবা! ভদ্রলোক ছিলেন আমাদের ফরেন অফিসের ডেপুটি মিনিস্টার; পণ্ডিত নেহরুর সহকর্মী। খুব বেশী দিন কাজ করেন নি। ঐ সব দার্শনিক সিনিক্ রসিকতা তিনি সর্বজনসমক্ষে প্রকাশ করতেন তাঁর ভিন্ন ভিন্ন সহকর্মী মন্ত্রীদের সম্বন্ধে। ঠিক পপুলার হওয়ার পন্থা এটা নয়—কি বলো? কাজেই তিনি যখন ফরেন অফিস থেকে বিদায় নিলেন তখন আমি বলেছিলুম তিনি মন্ত্রিমণ্ডলী থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বিদায় নেবার সময় উল্লাসে নৃত্য করলেন এবং মন্ত্রীমণ্ডলীও তাঁর থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে উল্লাসে নৃত্য করলেন।"

ডীটরিষ চুপ। আমি একটু অবাক হলুম। সে তো সব সময়ই জুৎমাফিক উত্তর দিতে পারে।

সে বললে, "আমার অবস্থাও তাই। যে আফিসে আমি কাজ করি সেটা থেকে বেরুতে পারলে আমিও খুশি হই; ওরাও খুশি হয়।"

৮

ঐ তো সামনে গোডেসবের্গ। ডীটরিষ শুধোলে, "মামু, পিসি বলছিল তুমি নাকি এই টাউনটাকে জর্মনির সর্ব জায়গার চেয়ে বেশী ভালোবাসো? কেন, বলো তো?"

আমি মুচকি হেসে কইলুম, "যদি বলি তোর পিসির সঙ্গে হেথায় আমার 'প্রথম প্রণয়' হয়েছিল বলে?"

ডী। "ধ্যত! আমি ছেলেবেলা থেকেই লক্ষ্য করেছি, লীজেল পিসির ধ্যানধর্ম শুধু কাজ আর কাজ। ফাঁকে ফাঁকে বই পড়া। এবং সে-বইগুলোও দারুণ সিরিয়স। বড় পিসি বরঞ্চ মাঝে মাঝে হালকা জিনিস পড়তো। কিন্তু ছোট পিসি ওসবের ধার ধারতো না। সে যেতো প্রতি প্রভাতে ট্রামে চড়ে বন্ শহরে—যেখানে সে চাকরি করতো—"

আমি। "সেই সূত্রেই তো আমাদের পরিচয়। আম্মো ঐ সকাল আটটা পনেরোর ট্রামে বন্ যেতুম। আমরা আর সবাই দু'তিনটে সিঁড়ি বেয়ে ট্রামে

উঠতুম। আর লীজেল পিসি ডান হাতে একখানা বই আর বাঁ হাতে ট্রামের গায়ে সামান্যতম ভর করে সিঁড়িগুলোকে 'তাচ্ছিলি' করে এক লম্ফে উঠতো ট্রামের পাটাতনে। উঠেই এক গাল হেসে ডাইনে বাঁয়ে সমুখপানে তাকিয়ে বলতো, 'গুটেন্ মরগেন্' "সুপ্রভাত"। ওর ঐ লম্ফ মেরে ওঠার কৈশল দেখে আমি মনে মনে বলতুম একদম 'টম বয়'! ওর উচিত ছিল মার্কিন মুল্লুকে 'কাউ বয়' হয়ে জন্ম নেবার। অথবা 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুঈন'— গুরুদেবের ভাষায়।"

গোডেসবের্গ তখন অতি ক্ষুদ্র শহর। সবাই সবাইকে চেনে। কিন্তু আসল কথা, ঐ আটটা পনেরোর ট্রামে থাকতো পোনেরো আনা কাচ্চাবাচ্চা। ইস্কুলে যাচ্ছে বন্ শহরে। এরা সবাই জানতো যে লীজেল পিসির, অবশ্য তখনো তিনি 'পিসি' খেতাব পান নি, কাছে আছে লেবেনচুস্, দু'একটা আপেল, হয়তো নবাগত মার্কিন চুইংগাম, মাঝে-মধ্যে চকলেট। কাজেই বাচ্চারা সমস্বরে, কোরাস কণ্ঠে বলতো, অন্তত বারতিনেক "সুপ্রভাত—"। তার পর সবাই তার চার পাশে ঘিরে দাঁড়াত। সবাই বলতো, "প্লীজ, এজ্জে, এজ্জে, এই এখানে বসুন।"

আমি বললুম, "বুঝলি ডীটরিষ, তোর পিসি লীজেল ছিল আমাদের হীরইন অব্ দ প্লে। তবে তুই ঠিকই বলেছিস ও কখনো প্রেম-ফ্রেমের ধার ধারতো না। আমি দু'একবার তার সঙ্গে হাফাহাফি ফ্লার্ট করতে গিয়ে চড় খেয়েছি। অথচ আমাদের মধ্যে প্রীতিবন্ধুত্ব ছিল গভীর। আমাকে কত কী না খাইয়েছে —ঐ অল্প বয়সেই বেশ দু'পয়সা কামাতো বলে। তখনকার দিনে ছিল—এখনো নিশ্চয়ই আছে—একরকমের বেশ মোটা সাইজের চকলেট—ভিতরে কন্যাক্। বড্ড আক্রা। কিন্তু খেতে—ওঃ! কী বলবো—মুখে ফেলে সামান্য একটু চাপ দাও। ব্যস হয়ে গেল। ভিজে ভিজে চকলেট আর তরল কন্যাকে মিশে গিয়ে, দ্যাখ তো না দ্যাখ, চলে গেল একদম পেটের পাতালে। কিন্তু যাবার সময় ঐ যে কন্যাক্—তোরা যাকে বলিস ব্র্যানট্ভাইন, ইংরিজীতে ব্র্যান্ডি, নাড়িভুঁড়ির প্রতিটি মিলিমিটার মধুর মধুর চুলবুলিয়ে বুঝিয়ে দিতো, যাচ্ছেন কোন মহারাজ!···আর মনের মিলের কথা যদি তুলিস তবে বলবো, লীজেল ছিল বড্ডই লিবরেল। তাই যদিও নাৎসীরা তখনো ক্ষমতা পায় নি কিন্তু রাস্তাঘাটে দাবড়াতে আরম্ভ করেছে—পিসি সেটা আদৌ পছন্দ করতো না। আমিও না। কিন্তু সত্যি বলতে কি, ইংরেজ যে ইতিমধ্যেই হিটলার বাবদে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে সেটা আমার চিত্তে পুলক জাগাতো। পিসিও সেটা জানতো। ভারতবর্ষের পরাধীনতার কথা উঠলেই সে ব্যথা পেত। বলতো, 'ও কথা থাক না।' ওরকম দরদী মেয়ে চিনতে পারার সৌভাগ্য আমি ইহসংসারে অতি অল্পই পেয়েছি।"

হঠাৎ লক্ষ্য করলুম, ভাগিনা ডীটরিষ কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছে। শুধোলুম, "কি হল রে? তুই কি পরশুদিনের হাওয়া খেতে চলে গিয়েছিস?"

কেমন যেন বিষণ্ণ কণ্ঠে ভেজা-ভেজা গলায় সে বললে, "মামা, তুমি বোধ হয় জানো না, আমার বাবা অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে ওপারে চলে গেল কি করে।"

ডীটরিষের এখন যৌবনকাল। তার বাপ কেন, ঠাকুদ্দাও বেঁচে থাকলে আশ্চর্য হবার মত কিছু ছিল না। বললুম, "আমি তো জানি নে ভাই। কিন্তু আমার জানতে ইচ্ছে হচ্ছে, আবার হচ্ছেও না। কারণ তোর গলাটা কি রকম যেন ভারী-ভারী শোনাচ্ছে—"

"তুমি এইমাত্র বললে না, তুমি পিসি দুজনাই নাৎসীদের পছন্দ করতে না। বস্তুত পিসি-পরিবারের কেউই নাৎসী ছিল না। যদিও আমি তোমার বান্ধবীকে পিসি বলে পরিচয় দিয়েছি, আসলে তিনি আমার মাসি। তাঁরা তিন বোন। আমার মা সকলের ছোট। তিনি বিয়ে করলেন এক নাৎসীকে—কট্টর নাৎসীকে। কেন করলেন জানি নে। প্রেমের ব্যাপার। তবে হ্যাঁ, চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিল। বাড়ি গিয়ে তোমাকে তার ডাইরিটি দেখাবো। আর চেহারাটি ছিল সুন্দর—"

বাধা দিয়ে বললুম, "সে তোর চেহারা থেকেই বোঝা যায়।"

"থ্যাংকউ। আর বাবা ছিল বড্ডই সদয়-হৃদয়—"

"ভাগিনা, কিছু মনে ক'রো না। আমি মোটেই অবিশ্বাস করি না যে তোর পিতা অতিশয় করুণ হৃদয়, শান্ত স্বভাব ধরতেন—তোর দুই মাসিই সে-কথা আমাকে বারংবার বলেচে। কিন্তু আবার বলছি কিছু মনে করো না, তাহলে তিনি নাৎসীদের কনসানট্রেশন ক্যাম্প সয়ে নিলেন কি করে?"

ডীটরিষ চুপ মেরে গেল। কোন উত্তর দেয় না। আমি এবার, বহুবারের পর আবার, বুঝলুম যে আমি একটা আস্ত গাড়োল। এরকম একটা প্রশ্ন করাটা আমার মোটেই উচিত হয় নি। বললুম, "ভাগিনা, আমি মাফ চাইছি। আমি আমার প্রশ্নটার কোনো জবাব চাই নে। ওটা আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি।"

ডীটরিষ বললে, "না, মামু। তুমি যা ভেবেছো তা নয়। আমি ভাবছিলুম, সত্যিই তো, বাবা এগুলো বরদাস্ত করতো কি করে? এবং আরো লক্ষ লক্ষ জর্মন? এই নিয়ে আমি অনেকবার বহু চিন্তা করেছি। তুমি জানো, মার্কিন-ইংরেজ রুশ-ফরাসী ন্যুরেনবের্গ মোকদ্দমায় বার বার নাৎসীদের প্রশ্ন করেছে, 'তোমরা কি জানতে না যে হিটলার কনসানট্রেশন ক্যাম্পে লক্ষ লক্ষ ইহুদীকে খুন করছে?' উত্তরে সবাই গাইগুই করছে। সোজা উত্তর কেউই দেয় নি। জানো তো যুদ্ধের সময় কত সেনসর কত কড়াকাড়ি! কে জানবে কি হচ্ছে না হচ্ছে! আমার মনে হয়, আবার বলছি জানি নে, বাবার কানে কিছু কিছু পৌঁচেছিল। কিন্তু বাবা তখন উন্মত্ত। তিনি চান জর্মনির সর্বাধিকার। তাঁর ডাইরিতে বার বার বহুবার লেখা আছে, ইংরেজ কে? সে যে বিরাট বিশ্ব শুষে খেতে চায় তাতে তার হক্কো কি? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই মানি, তারা যদি আমাদের কিংবা ফরাসীদের মত কলচরড জাত হত তবে আমরা এ-নিয়ে কলহ করতুম না। কিন্তু ইংরেজ জাতটাই তো বেনের জাত। তারা কালচারের কি বোঝে? ওদের না আছে মাইকেল-এঞ্জেলো, না আছে বেটোফেন। আছে মাত্র শেকসপীয়র। ওদের না আছে স্থাপত্য, না আছে ভাস্কর্য, না আছে—" হঠাৎ বললো, "ঐ তো বাড়ি পৌঁছে গিয়েছি।"

৯

"ডু হালুংকে"—সোল্লাসে হুহুংকারে রব ছাড়লো শ্রীমতী লীজেল। "তুই গুণ্ডা—"

আমরা যেরকম কোনো দুরন্ত ছোট বাচ্চাকে আদর করে 'গুণ্ডা' বলে থাকি 'হালুংকে' তাই। শব্দটা চেক ভাষাতে জর্মনে প্রবেশলাভ করেছে। গত চল্লিশ বছর ধরে দেখা হলেই লীজেল এইভাবেই আমাকে 'অভ্যর্থনা' জানিয়েছে।

তারপর আমাকে জাবড়ে ধরে দু'গালে দুটো চুমো খেল।

ডীটরিষ মারফত পাঠককে পূর্বেই বলেছি লীজেল ছিল ন'-সিকে 'টম-বয়'। এবং দু'একবার তার সঙ্গে হাফাহাফি ফ্লার্ট করতে গিয়ে চড় খেয়েছি। তবে এটা হল কি প্রকারে? শুচিবায়ুগ্রস্ত পদ্মীপিসীরা ক্ষণতরে ধৈর্য ধরুন। বুঝিয়ে বলছি। এই ষাট বছর বয়সে তার কি আর 'টমবয়ত্ব' আছে? এখন আমাকে জাবড়ে ধরে আলিঙ্গন করাতে সে শুধু তার অন্তরতম অভ্যর্থনা জানালো।

আমি মনে মনে বললুম, চল্লিশ বছর ল্যাটে, চল্লিশ বছর ল্যাটে। এই আলিঙ্গন-চুম্বন চল্লিশ বছর পূর্বে দিলেই পারতে, সুন্দরী। পরে তাকে খুলেও বলেছিলুম।

ইতিমধ্যে ডীটরিষ আমতা আমতা করে বললে, "আমরা তা হলে আসি। রাত্রের পার্টিতে দেখা হবে।"

ওরা পাশেই থাকে। তিন মিনিটের রাস্তা। ওদের ভাব থেকে বুঝলুম, ওরা মনে করছে বিদ্যা ও সুন্দর যখন বহু বৎসর পর সম্মিলিত হয়ে গেছেন তখন ওদের কেটে পড়াই ভালো। আমাদের প্রেমটি যে চিরকালই নির্জলা জল ছিল সেটি হয়তো তারা গলা দিয়ে নাবাতে পারে নি—হজম করা তো দূরের কথা।

লীজেল আমাকে হাতে ধরে ড্রইংরুমের দিকে নিয়ে চললো। আমি বললুম, "এ কি আদিখেতা! চল্লিশ বছর ধরে যখনই এ বাড়িতে এসেছি তখনই আমরা বসেছি বাবা, মা, বড়দি, তুমি, ছোড়দি রান্নাঘরে। অবিশ্যি মা রান্না নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। আজ কেন এ ব্যত্যয়? তদুপরি ঐ বিরাট ড্রইংরুম! বাপস্! তুই যদি এক কোণে বসিস আর আমি অন্য কোণে, তা হলে এ'কে অন্যকে দেখবার তরে জোরদার প্রাশান মিলিটারি দূরবীনের দরকার হবে; কথা কইতে হলে আমাদের দেশের ডাকহরকরা, নিদেন একটা ট্রাংককল-ফোন্ ব্যবস্থা, আর—"

লীজেল সেই প্রাচীন দিনের মত বললে, "চোক্কোর চোক্কোর। তুই চিরকালই বড্ড বেশী বকর বকর করিস্।"

গতি পরিবর্তিত হল। আমরা শেষ পর্যন্ত রান্নাঘরেই গেলুম।

কিচেনের এক প্রান্তে টেবিল, চতুর্দিকে খান ছয় চেয়ার। অন্য প্রান্তে দুটো গ্যাসউনুন, তৃতীয়টা কয়লার (সেটা খুব সম্ভব প্রাচীন দিনের ঐতিহ্য রক্ষার্থে)। দুই প্রান্তের মাঝখানে অন্তত দশ কদম ফাঁক। অর্থাৎ কিচেনটি তৈরী করা

হয়েছে দরাজ হাতে। বস্তুত লীজেলের মা যখন রাঁধতেন তখন এ-প্রান্ত থেকে আমাকে কিছু বলতে হলে বেশ গলা উঁচিয়ে কথা কইতে হত।

লীজেল একটা চেয়ার দেখিয়ে বললে, "এটায় ব'স্।"

সত্য বলছি, আমার চোখে জল এল। কি করে লীজেল মনে রেখেছে যে, চল্লিশ বৎসর পূর্বে তিনি গত হয়েছেন বছর আটত্রিশেক হবে। তার পিতা আমাকে ঐ চেয়ারটায় বসতে বলতেন। আমি জানতুম, কেন। জানলা দিয়ে, ঐ চেয়ারটার থেকে দূর-দূরান্তের দৃশ্য সব চেয়ে ভালো দেখা যায়। পরে জানতে পেরেছিলুম, তিনি স্বয়ং ঐ চেয়ারটিতে বসে আপন ক্ষেতখামারের দিকে এবং বিশেষ করে তাঁর বিরাট আপেলবাগানের দিকে নজর রাখতেন—(মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে আমাদের যে রকম আমবাগান)। অবশ্যই তিনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে ভালোবাসতেন। নইলে আমাকে তাঁর আপন আসন ত্যাগ করে, আপন অভ্যস্ত আসন ছেড়ে দিয়ে ওখানে বসতে বলবেন কেন? আমি তো সেখান থেকে তাঁর ক্ষেতখামার, আপেলবাগান তদারকি করতে পারবো না—যারা ঘোরাঘুরি করছে তারা তাঁর আপন 'মুনিষ' না ভিন্-জন আমি ঠাহর করবো কি প্রকারে? আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ? সেদিকে আমার কোনো চিত্তাকর্ষণ নেই। একদিন ঐ শেষ কথাটি তাঁকে আস্তে আস্তে ক্ষীণ কণ্ঠে বলতে—যাতে অন্যেরা শুনতে না পায়—তিনি বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করে অতিশয় সুন্দর স্মিতহাস্যে বললেন, "তোমরা ইণ্ডিয়ান। তোমাদের দেশে এখনো কল-কারখানা হয় নি। তোমরা এখনো আছো প্রকৃতির শিশু। শিশু কি মায়ের সৌন্দর্য বোঝে? না। সে শুধু তার মায়ের স্তনরস চায়—সেই স্তনদ্বয়ের সৌন্দর্য কি সে বোঝে? যেমন তার বাপ বোঝে? ঠিক ঐরকম তোমরা তোমাদের মা-জননী জন্মভূমিতে ক্ষেতখামার করে খাদ্যরস আহারাদি করো। তোমরা এখনো কি করে বুঝবে, নৈসর্গিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বলতে কি বোঝায়? সেটা শুধু হয় যখন মানুষ কলকারখানার গোলাম হয়ে হয়। অর্থাৎ মাতৃদুগ্ধ থেকে বঞ্চিত হওয়ার পর, বড় হয়ে সে তার মাতৃদুগ্ধের মূল্য বুঝতে শেখে—"

আমি বললুম, "মানছি, কিন্তু দেখুন গ্রীস, রোম এবং আমার দেশ ভারতবর্ষেও তো কলকারখানা নির্মিত হওয়ার বহু পূর্বে উত্তমোত্তম কাব্য রচিত হয়েছিল এবং সেগুলোতেও বিস্তর প্রাকৃতিক নৈসর্গিক বর্ণনা আছে। তবে কেন—?"...

এসব কথাবার্তা যেন ঐ চেয়ারে বসে কানে শুনতে পাচ্ছি। কত বৎসর হয়ে গেছে। এমন সময় লীজেল আমার মাথায় মারলো একটা গাঁট্টা। আমার স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেল। বিশেষ করে তার ঠাকুরমার ছবিটি।

"কি খাবে বলছিলে?"

আমি আশ্চর্য হয়ে উত্তর দিলুম, "আমি তো কিছুই বলি নি।"

"তুমি চলো, তুমি যে সুপ পছন্দ করতে সেই সুপই করেছি—অর্থাৎ পী সুপ (বলাইশুঁটির সুপ)—এবারে বলো তুমি কি খাবে? তুমি যা খেতে চাও

তার জন্য মাছ, মাংস, ক্রীম আছে।”

আমি বললুম, “দিদি, সুপ ছাড়া আমার অন্য কোনো জিনিসের প্রয়োজন নেই। আর এই জার্নিতে আমার সর্বাঙ্গ অসাড়।...তবে কিনা আমি বঙ্গসন্তান। হেথায় ডান পাশে রাইন নদী। সে নদীর উত্তম উত্তম মাছ খেয়েছি কত বৎসর ধরে। তারই যদি একটা কিছু—”

বেচারী লীজেল!

শুকনো মুখে বললে, “রাইনে তো আজকাল আর সে মাছ নেই।”

আমি শুধোলুম, “কেন?”

বললে, “রাইন নদের জাহাজের সংখ্যা বড্ড বেশী বেড়ে গিয়েছে। তাদের পোড়ানো তেল তারা ঐ নদীতে ছাড়ে। ফলে নদীর জল এমনই বিষে মেশা হয়ে গিয়েছে যে, মাছগুলো প্রায় আর নেই। আমার কাছে যে সব মাছ আছে সেগুলো টিনের মাছ।”

আমি বললুম, “তা হলে থাক।”

১০

বিনু যখন সোয়ামীর সঙ্গে ট্রেনে করে যাচ্ছিল তখন বললে, “আহা ওরা কেমন সুখে আছে।” আমরাও ভাবি ইংরেজ ফরাসী জর্মন জাত কি রকম সুখে আছে। কিন্তু ওদের দুঃখও আছে। তবে আমাদের মতো ওদের দুঃখ ঠিক একই প্রকারের নয়। ওরা খেতে পায়, আশ্রয় আছে। তৎসত্ত্বেও ওদের দুঃখ আছে।

লীজেলদের বাড়ি প্রায় দুশো বছরের পুরনো। সে আমলে স্টীল সিমেণ্টের ব্যাপার ছিল না। বাড়িটা মোটামুটি কাঠের তৈরী। দুশো বছর পরে ছাদটা নেমে আসছে। এটাকে খাড়া রাখা যায় কি প্রকারে!

আমি জিজ্ঞেস করলুম, “লীজেল, এটাকে কি মেরামত করা যায় না?”

লীজেল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, “শুধু ছাদ নয়, দেওয়ালগুলো ঝুরঝুরে হয়ে এসেছে। এ বাড়ি মেরামত করতে হলে কুড়ি হাজার মার্ক (আমাদের হিসাবে চল্লিশ হাজার টাকারও বেশী) লাগবে। বাবা গেছেন, আমার কোনো ভাইও নেই। ক্ষেতখামার দেখবে কে? আপেলবাগানটা পর্যন্ত বেচে দিয়েছি। তাই স্থির করেছি বাড়িটা সরকারকে দিয়ে দেবো। ওরা সব পুরোনো বাড়ির কিছু কিছু বাঁচিয়ে রাখতে চায়। কারণ এ বাড়িটির স্টাইল একেবারে খাঁটি রাইনল্যাণ্ডের।”

আমি বললুম, “এটা মর্টগেজ করে টাকাটা তোলো না কেন?”

লীজেল বললে, “যে টাকাটা কখনো শোধ করতে পারবো না সে টাকা ধার করবো কি করে!”

আমার মনে গভীর দুঃখ হলো। বাড়িটি সত্যিই ভারী সুন্দর। শুধু বাড়িটি নয়, তার পেছনে রয়েছে ফল-ফুলের বাগান, তরি-তরকারির ব্যবস্থা,

কুয়ো, হ্যাণ্ডপাম্প দিয়ে জল তোলার ব্যবস্থা—গ্রামাঞ্চলে উত্তম ব্যবস্থা। ক্ষেত-খামার গেছে যাক। ওদের আপেলবাগান এই অঞ্চলে বৃহত্তম এবং শ্রেষ্ঠতমও ছিল। সেও গেছে যাক। কিন্তু এই সুন্দর বাড়িটা সরকারের হাতে তুলে দিতে হবে, এটা আমার মন কিছুতেই মেনে নিতে চাইল না।

ইতিমধ্যে লীজেলের ছোট বোন মারিয়ানা এল। তিন বোনের ঐ একমাত্র যার বিয়ে হয়েছিল। যে-ডীটরিষ আমাকে নিয়ে যাবার জন্য বন্-এ এসেছিল তার মা। ছেলের বাড়ি দু মিনিটের রাস্তা। সেখানে বউ নিয়ে থাকে।

মারিয়ানা বিধবা। প্রায় সাতাশ বছর পূর্বে তার বিয়ে হয়। বরটি ছিল খাসা ছোকরা—কিন্তু…

এ বাড়ির তিন বোনের কেউই নাৎসী ছিল না। এরা সবাই ধর্মভীরু ক্যাথলিক। ইহুদীরা প্রভু খৃষ্টকে হয়তো ক্রুশবিদ্ধ করেছিল, হয়তো করে নি। যাই হোক, যাই থাক্—তাই বলে দীর্ঘ, সুদীর্ঘ সেই ঘটনার দু হাজার বছর পর ওদের দোকানপাট, ভজনালয়, ওদের লেখা বইপত্র পুড়িয়ে দেবে (মহাকবি হাইনরিষ হাইনের কবিতাও বাদ যায় নি), ইহুদী ডাক্তার, উকীল প্র্যাকটিস করতে পারবে না—এটা ওরা গ্রহণ করতে পারে নি। এটা ১৯৩৪ সালের কথা। তখনো কনসানট্রেশন ক্যাম্প আরম্ভ হয় নি। যখন আরম্ভ হল তখন আমি দেশে। যুদ্ধ পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছে। চিটি-চাপাটির[১] গমনাগমন সম্পূর্ণ রুদ্ধ। কিন্তু আমার মনে কণামাত্র সন্দেহ ছিল না যে লীজলেদের পরিবার এ-প্রকারের নিষ্ঠুর নরহত্যা শুধু যে ঘৃণার চোখে দেখবে তাই নয়, এরা যে এর বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারছে না সেটা তাদের মনকে বিকল করে দেবে।…এ সব শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমি যখন জর্মনি যাই তখন লীজেল আমাকে বলেছিল, "ডু হালুঙ্কে, তুই তো ভালো করেই চিনিস, আমাদের এই মুফেনডার্ফ গ্রাম। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের না হোক, জর্মনির ক্ষুদ্রতম গ্রাম। সেই হিসেবে আমরা প্রখ্যাততম গ্রাম। এখানে মাত্র একটা দুটো ইহুদী পরিবার ছিল। দিদি সময়মত ওদেরকে সুইটজারল্যাণ্ডে পাচার করে দিয়েছিল।

এবারে আরম্ভ হবে ট্রাজেডি।

মারিয়ানা বড় সরলা। এ-সব ব্যাপার নিয়ে আদৌ মাথা ঘামাতো না। অবশ্য সেও ছিল আর দুই দিদির মত পরদুঃখকাতর।

বিয়ে করে বসলো এক প্রচণ্ড পাঁড় নাৎসীকে। কেন করলো, এ মূর্খকে শুধোবেন না। মেয়েরা কেন কার প্রেমে পড়ে, কেন কাকে বিয়ে করে এ-নিগূঢ়

১ আমার এক গুণী সখা আমাকে একদা বলেন, 'সিপাহী বিদ্রোহে'র সময় চাপাটিরুটির মারফৎ 'বিদ্রোহী'রা একে অন্যকে খবর পাঠাতো বলে 'চিঠিচাপাটি' সমাসটি নির্মিত হয়। কোনো এবং কিংবা একাধিক বিদগ্ধজন যদি এ-বিষয়ে 'দেশ' পত্রিকায় সবিস্তর আলোচনা করেন তবে এ-অজ্ঞজন উপকৃত হবে। কিন্তু দয়া করে আমাকে সরাসরি লিখবেন না। এটা পাঞ্চজন্য। আমি ছাড়াও পাঁচ-জনের উপকারার্থে।

তাঁরা দেবতারাও আবিষ্কার করতে পারেন নি।

তারপর যুদ্ধ লাগল। সেটা শেষ হল।

* * *

এইবারে মার্কিন ইংরেজদের কৃপায় দেশের শাসনভার পেলেন নাৎসীবৈরীরা। এঁরা খুঁজে খুঁজে বের করলেন নাৎসীদের। তখন আরম্ভ হল তাদের উপর নির্যাতন। আজ ধরে নিয়ে যায়। তিন দিন তিন রাত্তির গারদে নির্জন কারাবাসের পর আপনাকে ছেড়ে দিল। আপনি ভাবলেন, যাক বাঁচা গেল। দশ দিন যেতে না যেতে আবার ভোর চারটেয় আপনাকে গ্রেফতার করে ঠাসলো গারদে। (এই যে আপনাকে ছেড়ে দিয়েছিল সেটা শুধু আপনার পিছনে গোয়েন্দা রেখে ধরবার জন্য কারা কারা আপনার সহকর্মী ছিল ; কারণ স্বভাবতই আপনি তাদেরই সন্ধানে বেরোবেন। দ্বিতীয়ত এরা আপনার দরদী বন্ধু। আপনার দৈন্য-দুর্দিনে—একমাত্র তারাই আপনাকে সাহায্য করবে—অবশ্য যদি তাদের দু' পয়সা থাকে।...এটা কিছু নবীন ইতিহাস নয়। আমাদের এই স্বদেশী আন্দোলনের সময়, পরবর্তী যুগে 'মহামান্য' টেগার্ট সাহেবের আমলে—

বারে বারে সহস্র বার হয়েছে এই খেলা।
দারুণ রাহু ভাবে তবু হবে না মোর বেলা॥)

সর্বশেষে মারিয়ানার স্বামীর তিন বছরের জেল হল। সেখানে যক্ষ্মা। বেরিয়ে এসে ছ মাসের পরই ওপারে চলে গেল।

পাঠক ভাববেন না,

আমি নাৎসীবৈরীদের দোষ দিচ্ছি।

বার বার শুধু আমার মনে আসছে ঃ—

এদেশের লোক সবাই কৃশ্চান।

এদেশের প্রভু, প্রভু খৃষ্ট আদেশ দিয়েছেন, ক্ষমা, ক্ষমা, ক্ষমা।

জানি মানুষ এত উঁচুতে উঠতে পারে না।

কিন্তু সেই চেষ্টাতেই তো তার খৃষ্টত্ব, তার মনুষ্যত্ব।

১১

হুররে হুররে, হুররে।

কৈশোরে অবশ্য আমরা বলতাম, হিপ্‌ হিপ্‌ হুররে।

পুরোপাক্কা ক্রেডিট নিশ্চয়ই এ্যার ইণ্ডিয়া কোম্পানির।...দীর্ঘ হাওয়াই মুসাফিরির পর অঘোরে ঘুমিয়েছিলাম সকাল আটটা অবধি। নীচে নাবতেই লীজেল চেঁচিয়ে বললে, "ডু হালুংকে ! তোর হারানো সুটকেস ফিরে পাওয়া গিয়েছে।"

"কি করে জানলি ?"

"আমাদের তো টেলিফোন নেই। চল্লিশ বছর আগে এই গোডেসবের্গের যে

বাড়িতে তুই বাস করতিস তার টেলিফোন নম্বরটি তুই কলোনের 'হারানো প্রাপ্তি'র দফতরে সুবুদ্ধিমানের মত দিয়ে এসেছিলি। আশ্চর্য! সে নম্বর তুই পুতুপুতু করে এত বৎসর ধরে পুষে রেখেছিলি কি করে আর সেটা যে কলোনের সেই 'হারানো প্রাপ্তি'র দফতরে আপন স্মরণে এনে ওদের দিয়েছিলি সেটা আরো বিস্ময়জনক। তোর পেটে যে এত এলেম তা তো জানতুম না। আমি তো জানতুম তোর পশ্চাৎদেশে টাইম বম রাখতে হয় (আমরা বাঙলায় বলি, 'পেটে বোমা না মারলে কথা বেরোয় না'), ফিউজের হিস্‌হিস্‌ শুনে তবে তোর বুদ্ধি খোলে! সে-কথা থাক। কালোনের দফতর সেই নম্বরে ফোন করে, আর তোর সেই প্রাচীন দিনের ল্যাণ্ডলেডির মেয়ে 'আনা'সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেল তুই আমাদের বাড়িতে উঠেছিস। তা ছাড়া যাবি আর কোন্‌ চুলোয়! আনা'র বিয়ে হয়েছে এক যুগ আগে। ভাতার আর বাচ্চা দুটো রয়েছে। তাই সেখানে না উঠে আমাকে আপ্যায়িত করতে এসেছিস। ফের বলছি সে-কথা থাক। আনা কিন্তু বুদ্ধিমতী মেয়ে—"

আমি বাধা দিয়ে বললুম, "হবে না কেন? আমি ওদের বাড়িতে ঝাড়া একটি বছর ছিলুম। আমার সঙ্গ পেয়েছে বিস্তর।"

লীজেল আমার দিকে কটমটিয়ে তাকিয়ে কোনো মন্তব্য না করে বললে, "সে জানে আমাদের টেলিফোন নেই। কিন্তু আমাদের পাশের বাড়ির মহিলার আছে। তাকে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছে যে তার সুটকেসটি পাওয়া গিয়েছে এবং কলোন দফতরে জমা পড়েছে।"

আমি বললুম, "সর্বনাশ! আমাকে এখন ঠ্যাঙস ঠ্যাঙস করে যেতে হবে সেই ধেড়ধেড়ে-গোবিন্দপুর কলোনে? আধখানা দিন তাতেই কেটে যাবে। হেথায় এসেছি ক'দিনের তরে? তারও নিরেট চারটি ঘণ্টা মেরে দিয়েছে জুরিক। কনেকশন ছিল না বলে। আমি—"

লীজেল বাধা দিয়ে বললে, "চল্লিশ বৎসর পূর্বে প্রাথমিক পরিচয়ে তোকে যে একটা আকাট মূর্খ ঠাউরেছিলুম সেটা কিছু ভুল নয়; কলোনের দফতরে তোর প্র্যাকটিকাল বুদ্ধি ব্যত্যয়। অবশ্য আমি কখনো বলি নে এক্‌সেপ্‌শন্‌ প্রুভজ দি রুল, আমি বলি রুল প্রুভজ দি এক্‌সেপ্‌শন্‌। তো সুটকেস তারাই এখানে পৌঁছে দেবে।"

* * *

ওঃ! কী আনন্দ, কী আনন্দ! কাল রাত্রে ভয়ে ভয়ে আমি আমার হারিয়ে না যাওয়া বড় সুটকেসটি খুলি নি। যদি দেখি, এদের এবং আমার অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবের জন্য ছোটখাটো যে-সব সওগাৎ এনেছি সেগুলো এই বড় সুটকেসটিতে নেই। এটাকেই নাকি বিদেশী ভাষায় বলে অসট্রিচ মনোবৃত্তি।

ইতিমধ্যে বাড়ির সদর দরজাতে ঘা পড়লো। লীজেল সেথায় গিয়ে কি যেন কথাবার্তা কইলে। মিনিট দুই পরে সেই হারিয়ে-যাওয়া-ফিরে-পাওয়া সুটকেসটি নিয়ে এসে আমার সামনে রেখে বললে, "তোদের এ্যার-কোমপানি তো বেশ স্মার্ট ঃ কম্‌পিটেন্‌ট্‌। এত তাড়ঘাড়ি হুলিয়া ছেড়ে বাক্সটাকে ঠিক ঠিক পকড়

করু তোর কাছে পেঁৗছে দিলে।" আমার ছাতি সুশীল পাঠক, ইঞ্চি ছয়—মাফ করবেন,আজকাল নাকি তাবৎ মাপ সেন্টিমীটার মিলিমীটারে বলতে হয়—অর্থাৎ ১৫ মিলিমীটার কিংবা সেন্টিমীটারও হতে পারে—আমার প্রিন্স অব ওয়েলস্ অর্থাৎ বড় বাবাজী যে ইস্কেলখানা রেখে দিয়ে ঢাকা চলে গিয়েছেন সেটাতে তার হদিস মেলে না) ফুলে উঠলো।

* * *

বাকসোটা খুলে দেখি, আমার মিত্র মিত্র যে-সব বস্তু খাদি প্রতিষ্ঠান থেকে কিনে দিয়েছিল তার সবই রয়েছে (১) বারোখানা মুর্শিদাবাদী রেশমের স্কার্ফ, (২) উড়িষ্যার মোষের শিঙে তৈরী ছ'টি হাতি, (৩) পূর্ববৎ ঐ দেশেরই তৈরী পিঠ চুলকানোর জন্য ইয়া লম্বা হাতল, (৪) দশ বাণ্ডিল বিড়ি (এগুলো অবশ্য লীজেল পরিবারের জন্য নয় ; এগুলো আমার বন্ধুর জন্য), (৫) ভিন্ন ভিন্ন গরমমশলা এবং আচার, (৬) বর্ধমানের রাজপরিবারের আমার একটি প্রিয় বান্ধবীর দেওয়া একখানি মাকড়সার জালের মত সূক্ষ্ম স্কার্ফ (তাঁর শর্ত ছিল সেটি যেন আমি আমার সর্বশ্রেষ্ঠা বান্ধবীকে দিই), (৭) তিনটি ফার্স্ট ক্লাস বেনারসী রেশমের টাই, কাশ্মীরের ম্যাংগো ডিজাইনের শালের মত ওগুলো বর্ধমানেরই দেওয়া, (৮) দুই পৌণ্ড দক্ষিণ ভারতের কফি ও পূর্ববৎ ওজনে দার্জিলিঙের চা।···এবং একখানা বই ঠাকুর রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে—তাঁর এক বিশেষ পূজারিণীর জন্য, তিনি বাস করেন সুইটজারল্যাণ্ডে। আর কি কি ছিল ঠিক ঠিক মনে পড়ছে না। বেশ কিছু কাসুন্দোও ছিল। এই ইয়োরোপীয়ানদের বড্ডই দেমাক, তাদের মাস্টার্ড নিয়ে। দম্ভজনিত আমার উদ্দেশ্য ছিল এদেরকে দেখানো যে আমাদের বাঙলাদেশের কাসুন্দো এ-লাইনে অনির্বচনীয়,অতুলনীয়। পাউডার দিয়ে তৈরী ওদের মাস্টার্ড দু'দিন যেতে না যেতেই মসনে ধরে সবুজ হয়ে অখাদ্যে পরিবর্তিত হয়। আর আমাদের কাসুন্দো ? মাসের পর মাস নির্বিকার ব্রহ্মের মত অপরিবর্তনশীল।

লীজেলকে বললুম, "দিদি, এসব জিনিস ঐ বড় টেবিলটার উপর সাজিয়ে রাখ্। আর খবর দে ডীটরিষ ও তার বউকে। মারিয়ানা আর তুই তো আছিসই। যার যা পছন্দ তুলে নেবে।"

লীজেল বললে, "এটা কি ঠিক হচ্ছে ? এখান থেকে তুই যাবি ড্যুসেলডর্ফে—সেখানে তোর বন্ধু পাউল আর তার বউ রয়েছে। তারপর যাবি হামবুর্গে ; সেখানে তোর বান্ধবীর (তিনি গত হয়েছেন) তিনটি মেয়ে রয়েছেন। তারপর যাবি স্টুটগার্ট-এ। সেখানে রয়েছেন তোর ফার্স্ট লভ। এখানেই যদি ভালো ভালো সওগাৎ বিলিয়ে দিস তবে ওরা পাবে কি ?"

একেই বঙ্গভাষায় বলে পাকা গৃহিণী। কোন্ গয়না কে পাবে কে জানে।

১২

গডেসবের্গ সত্যিই বড় সুন্দর। এ শহরের সৌন্দর্য আমাকে বার বার আহ্বান করেছে। রাস্তাগুলো খুবই নির্জন। এতই নির্জন যে পথে কারো সঙ্গে দেখা হলে সে সম্পূর্ণ অচেনা হলেও আপনাকে অভিবাদন জানিয়ে বলবে, 'গুটেন টাহ্'। আপনিও তাই বলবেন। রাস্তার দুপাশে ছোট ছোট গেরস্তবাড়ি। সবাই বাড়ির সামনে যেটুকু ফাঁকা জায়গা আছে তাতে ফুল ফুটিয়েছে। যদি কোন বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আপনি ফুলগুলোর দিকে মুগ্ধনয়নে তাকিয়ে থাকেন তবে প্রায়ই বাড়ির কর্তা, কিংবা গিন্নী, কিংবা তাদের ছেলেমেয়ের একজন বাড়ি থেকে বেরিয়ে আপনার সঙ্গে কথা জুড়ে বসবে। শেষটায় বলবে, "আপনিও আমাদেরই একজন ; কিছু ফুলটুল চাই ? বলুন না, কোন্‌গুলো পছন্দ হয়েছে।" তারপর একগাল হেসে হয়ত বলবে, "প্রেমে পড়েছেন নাকি ? তাহলে লাল ফুল। হাসপাতালে রুগী দেখতে যাচ্ছেন নাকি ? তাহলে সাদা ফুল।" আমি একবার শুধিয়েছিলুম, "আর যদি আমার প্রিয়ার সঙ্গে ঝগড়া হয়ে থাকে, তাহলে কি ফুল পাঠাব ?" যাকে শুধিয়েছিলুম তিনি তখন দু'গাল হেসে বলেছিলেন, "সবুজ ফুল। সবুজ ঈর্ষার রঙ।" আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, "সবুজ ফুল এদেশে দেখি নি কখনো। আমাদের দেশেও সবুজ ফুল একেবারেই বিরল।" ভদ্রলোক বললেন, "আমাদের দেশেও। কিন্তু আমাদের এক প্রতিবেশীর বাড়িতে সবুজ ফুল আছে। আমি এখুনি এনে দিচ্ছি।"

"ও মশাই, দাঁড়ান দাঁড়ান, আমার সবুজ ফুলের তেমন কোনো প্রয়োজন নেই — ও মশাই—"

কিন্তু কে বা শোনে কার কথা !

মিনিট দুই যেতে না যেতেই সেই মহাত্মার পুনরাবির্ভাব। হাতে একটি সবুজ গোলাপ। চোখেমুখে যে আনন্দ তার থেকে মনে হলো তিনি যেন বাকিংহাম প্রাসাদ কিংবা কুতুবমিনার কিংবা উভয়ই কুড়িয়ে এনেছেন। আমি বিস্তর "ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ডাংকে শ্যোন, ডাংকে রেষট শ্যোন্" বলে অজস্র ধন্যবাদ জানালুম।

ইতিমধ্যে বাড়ির দরজা খুলে গেল। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছরের একটি মহিলা ডেকে বললেন, "ওগো, তোমার কফি—"

হঠাৎ আমাকে দেখে কেমন যেন চুপসে গেলেন।

ভদ্রলোক বললেন, "চলুন না। এক পাত্র কফি—হেঁ হেঁ—"

আমি বললুম, "কিন্তু আপনার গৃহিণী—?"

"না, না, না—আপনি চিন্তা করবেন না। আমার গৃহিণী খাণ্ডারিণী নয়। অবশ্য সে আপনাকে কখনো দেখে নি। চলুন চলুন।"

বসার ঘরে ঢুকে ভদ্রলোক আমাকে কফি টেবিলের পাশে সযত্নে বসিয়ে বললেন, "আপনাকে চল্লিশ বৎসর পূর্বে কত না দেখেছি। আমার বয়েস তখন চোদ্দ-পনেরো। কিন্তু ভয়ে আপনার সঙ্গে পরিচয় করতে পারি নি—"

আমি বাধা দিয়ে বললুম, "সে কি ?"

"এজ্ঞে, আমি জানতুম, আপনি ইণ্ডিয়ান। আর ইণ্ডিয়ানরা সব ফিলসফার ! তারা যত্রতত্র যার তার সঙ্গে কথা কয় না। তাই। আপনি ধীরে ধীরে পা ফেলে যেতেন রাইন নদের পারে। আমি কত না দিন আপনার পিছন পিছন গিয়েছি। আপনি একটি বেঞ্চিতে বসে রাইনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি যেন ভাবতেন। তখন কি আর বিরক্ত করা যায় ?"

আমি বললুম, "ব্রাদার, এটা বড় ভুল করেছ। তখন আমার সঙ্গে কথা কইলে বড়ই খুশী হতুম।"

ইতিমধ্যে বাড়ির গৃহিণী কেক ইত্যাদি নিয়ে এসে আমাদের টেবিলে রাখলেন। তাঁর গাল দুটো আরো লাল হয়ে গিয়েছে, ফোটা ফোটা ঘাম ঝরছে এবং তিনি হাঁপাচ্ছেন। অর্থাৎ এ পাড়ায় কোনো কেকের দোকান নেই বলে তিনি কুড়ি মিনিটের রাস্তা ঠেঙিয়ে কেক টার্ট নিয়ে এসেছেন।

এ স্থলে যে কোনো ভদ্রসন্তান ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মাফ চাইতো। বলতো, 'এ সবের কি প্রয়োজন ছিল ?' কিন্তু আমি চাই নি। আমাকে বেয়াদব মূর্খ যা খুশী বলতে পারেন।

আমি শুধু আমার পকেট থেকে একটি রুমাল বের করে তাঁর কপালটি মুছে দিলুম।

১৩

ভ্রমণকাহিনী লিখতে লিখতে মানুষ আশকথা পাশকথার উত্থাপন করে। গুণীরা বলেন এটা কিছু দুষ্কর্ম নয়। সদর রাস্তা ছেড়ে পথিক যদি পথের ভুলে আশপথ পাশপথ না যায় তবে অচেনা ফুলের নয়া নয়া পাখির সঙ্গে তার পরিচয় হবে কি প্রকারে ? কবিগুরুও বলেছেন,

"যে পথিক পথের ভুলে,
এল মোর প্রাণের কূলে—"

অর্থাৎ প্রণয় পর্যন্ত হতে পারে। তাই আমি যদি মাঝে মধ্যে এদিক ওদিক ছিটকে পড়ি তবে সহৃদয় পাঠক অপরাধ নেবেন না।

* * *

আলেকজান্ডার ফন্ হুমবল্টের নাম কে না শুনেছে ? নেপোলিয়ন, গ্যোটে, শিলারের সমসাময়িক। দুই কবির সঙ্গে তাঁর ভাবের আদান প্রদান হত। এবং অনেকেই বলেন, ঐ সময়ে পাশ্চাত্য মহাদেশগুলোতে নেপোলিয়নের পরেই ছিল হুমবল্টের সুখ্যাতি। আসলে তিনি ছিলেন বৈজ্ঞানিক এবং পর্যটক— ওদিকে কাব্য দর্শন অলঙ্কার শাস্ত্রের সঙ্গেও সুপরিচিত।

কিন্তু তাঁর পরিপূর্ণ পরিচয় দেওয়া আমার শক্তির বাইরে এবং সে উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এ-লেখাটি আরম্ভও করি নি।

হুম্‌বল্‌ট্‌ গত হন ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে। যেহেতু তিনি ভিন্ন ভিন্ন দেশের মধ্যে বৈজ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক যোগাযোগের জন্য (দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ককেশাস সাইবীরিয়া পর্যন্ত) অতিশয় সযত্নবান ছিলেন তাই ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে বার্লিনের জর্মন পররাষ্ট্র দফতরের উৎসাহে ঐ দেশে জনসাধারণ একটি প্রতিষ্ঠান—এন্‌ডাওমেণ্ট দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর, ওয়াকফ্‌, যা খুশী বলতে পারেন—নির্মাণ করলো, নাম ঃ আলেকজাণ্ডার ফন্‌ হুম্‌বল্‌ট্‌ স্টিফটুঙ্‌। তাদের একমাত্র কর্ম তখন ছিল বিদেশী ছাত্রদের বৃত্তি দিয়ে জর্মনিতে পড়াশুনো করার ব্যবস্থা করে দেওয়া। আমার বড়ই বিস্ময় বোধ হয়, জর্মনির ঐ দুর্দিনে (ইনফ্লেশন সবে শেষ হয়েছে; তার খোঁয়ারি তখনও কাটে নি) সে কি করে এ-প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করলো? আমরা বলি 'আপনি পায় না খেতে—।' অনেক চিন্তা করে বুঝেছিলুম, দয়াদাক্ষিণ্য আর্থিক সচ্ছলতার উপর নির্ভর করে না। লক্ষপতি একটা কানাকড়ি ভিখিরিকে দেয় না, অথচ আমি আপন চোখে দেখেছি এক চক্ষুষ্মান ভিখারি এক অন্ধ ভিখিরিকে আপন ভিক্ষালব্ধ দু'চার আনা থেকে দু'পয়সা দিচ্ছে। আমার এক চেলা ইদানিং আমাকে জানালে গঙ্গাম্বরূপা ইন্দিরাজীও নাকি বলেছেন, গরীবই গরীবকে মদৎ দেয়।

সে আমলে ইণ্ডিয়া পেত মাত্র একটি স্কলারশিপ—আজ অনেক বেশী পায়।[১] সেটি পেলেন আমার বন্ধু সতীর্থ বাসুদেব বিশ্বনাথ গোখলে।[২] ইনি সর্বজনপূজ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বর গোখলের ভ্রাতুষ্পুত্র। তার চার বৎসর পর পেলুম আমি। সে-কথা থাক। মাঝে মাঝে গাধাও রাজমুকুট পেয়ে যায়।…

গোডেস-বের্গ শহরের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ দেখি, একটি বাড়ির সম্মুখে মোটা মোটা হরফে লেখা।

আলেকজাণ্ডার ফন হুম্‌বল্‌ট স্টিফটুঙ্‌

আমারে তখন আর পায় কে? লম্বা লম্বা পা ফেলে তন্দণ্ডেই সে বাড়িতে উঠলুম।

আমি অবশ্যই আশা করি নি যে সেই চল্লিশ বৎসর পূর্বেকার লোক এ আপিস চালাবেন।

কিন্তু এনারাও ভদ্রলোক। অতিশয় ভদ্রভাবে শুধোলেন,

"আপনি কোন্‌ সালে হুম্‌বল্‌ট বৃত্তি পেয়েছিলেন?"

"১৯২৯।"

---

১ দয়া করে আমাকে প্রশ্ন শুধিয়ে চিঠি লিখবেন না, কি কৌশলে এ স্কলারশিপ পাওয়া যায়।

২ দয়া করে "গোখলে" উচ্চারণ করবেন না।

ভদ্রলোক যেন সাপের ছোবল খেয়ে লম্ফ দিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন।

আমিও তাজ্জব বনে গিয়ে বললুম,

"কি হল ?"

"কী ! চল্লিশ বছর পূর্বে !"

"এজ্ঞে হাঁ !"

"মাইন গট্ (মাই গড্) এত প্রাচীন দিনের কোনো স্কলারশিপ হোল্ডারকে আমি তো কখনো দেখি নি !"

আমি একটুখানি সাহস পেয়ে বললুম, "ব্রাদার, ইহসংসারে তুমিও অনেককিছু দেখো নি, আম্মো দেখি নি। তুমি কি আপন পিঠ কখনো দেখেছ ? তাই কি সেটা নেই ?"

* * * *

যেহেতু আমি এ-বাড়িতে ঢোকার সময় আমার ভিজিটিং কার্ড পাঠিয়ে দিয়েছিলুম, তাই তারা ইতিমধ্যে চেক-অপ ক'রে নিয়েছে, আমি সত্য সত্যই ১৯২৯-এ স্কলারশিপ পেয়ে এ-দেশে এসেছিলুম।

হঠাৎ ভদ্রলোকের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

"অ—অ—অ। জানেন, আপনি আমাদের প্রাচীনতম স্কলারশিপ হোলডার ?"

আমি সবিনয়ে বললুম,

"তা হলে আমাকে আপনাদের প্রাচ্যদেশীয় যাদুঘরে পাঠিয়ে দিন। টুটেন-খামেনের মমির পাশে কিংবা রানী নক্রেটাট্রির পাশে আমাকে শুইয়ে দাও।"

১৪

সুইটজারল্যান্ড, জর্মনি, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেনে টাকাকড়ির এমনই ছড়াছড়ি, সে কড়ি কি করে খরচ করবে যেন সেটা ভেবেই পায় না। বিশ্বময় (সঠিক বলতে পারবো না, তবে বোধ হয় চীন এবং লৌহ-যবনিকার অন্তরালের দেশগুলো এখনো অপাংক্তেয়) গণ্ডায় গণ্ডায় স্কলারশিপ ছড়ানোর পরও হুম্‌বল্‌ট ওয়াক্‌ফের হাতে বেশ-কিছু টাকা বেঁচে যায়।

তাই তারা প্রতি বৎসর একটা জব্বর পরব করে। তিন দিন ধরে জর্মনিতে যে শত শত হুম্‌বল্‌ট স্কলার ছড়িয়ে আছে এবং যারা একদা স্কলার ছিল, উপস্থিত জর্মনিতেই কাজকর্ম করে পয়সা কামাচ্ছে, তাদের সবাইকে তিন দিনের তরে বাড্ গডেসবের্গে নেমন্তন্ন জানায়। যারা বিবাহিত, তাদের বউ কাচ্চা বাচ্চা সহ ;—বলা বাহুল্য ঐ উপরোক্ত সম্প্রদায়, যারা কাজকর্ম করে পয়সা কামায়। আসা-যাওয়ার ট্রেন ভাড়া, হোটেলের খাইখর্চা, তিনদিন ধরে নানা-বিধ মীটিং পরব নৃত্যগীত, অনুষ্ঠানে যাবার জন্য মোটরগাড়ি—এক কথায় সব —সব। প্রাচীন দিনে আমাদের দেশে যে-রকম জমিদারবাড়িতে বিয়ের সময়

দশখানা গাঁয়ের বাড়িতে তিন দিন ধরে উনুন জ্বালানো হত না।

হ্যার পাপেনফুস্ স্টিফটুঙের অন্যতম কর্তাব্যক্তি। আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে বললেন, "আপনার তুলনায় জর্মনিতে উপস্থিত যে-সব প্রাক্তন স্কলার আছেন তাঁরা নিতান্তই শিশু—"

আমি বললুম, "আমার হেঁটোর বয়স।"

পাপেনফুস ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকালেন। অর্থাৎ বুঝতে পারেন নি। সব দেশের ইডিয়ম, প্রবাদ তো একই ছাঁচে তৈরী হয় না। আমি বুঝিয়ে দেওয়ার পর বললুম, "আমাকে যে আপনাদের পরবে নিমন্ত্রণ করেছেন তার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আপনাদের পরব আসছে সপ্তাহ তিনেক পরে। ওদিকে আমাকে যেতে হবে কলোন, ড্যুস্‌লে্‌ডর্ফ, হামবুর্গ, স্টুটগার্ট—এবং সর্বশেষ স্টুটগার্ট থেকে প্রায় ত্রিশ চল্লিশ মাইল দূরে পাড়াগাঁয়ে আমার প্রাচীন দিনের এক বিধবা বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে। আমরা একসঙ্গে পড়াশুনো করেছি। তার অর্থ আমার স্কলারশিপের মত তিনিও চল্লিশ বছরের পুরনো—প্লাস তাঁর বয়স।"

লক্ষ্য করলুম, যে তৃতীয় ব্যক্তি 'সভাস্থলে' উপস্থিত ছিলেন তাঁর চোখে ঠোঁটে কেমন যেন একটুখানি মৃদু হাসি খেলে গেল। এর অর্থ হতে পারে ঃ—

(১) এ তো বড় আশ্চর্য! ষাট বছর বয়সের প্রাচীনা প্রিয়ার অভিসারে যাচ্ছে এই নাগর!

কিংবা

(২) এর এক-প্রিয়া-নিষ্ঠতাকে তো ধন্যি মানতে হয়!

(রামচন্দ্রকে বলা হয় একদারনিষ্ঠ।)

ইতিমধ্যে কর্তা বললেন, "সে কি কথা! আপনি আসবেন না, সে তো হতেই পারে না। আপনার ভাষায়ই বলি আপনার মত 'মিউজিয়ম পীস' আমাদের কর্তাব্যক্তিদের গুণীজ্ঞানীদের দেখাতে পারবো না, সে কি একটা কাজের কথা হল? ওনাদের অনেকেই ভাবেন, আমাদের আলেকজাণ্ডার ফন্ হুম্‌বল্ট স্টিফ্‌টুঙ বুঝি পরশু দিনের বাচ্চা। অথচ আমাদের প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন কবে সেই ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে—অবশ্য যুদ্ধের ফলস্বরূপ জর্মনি যখন তছনছ হয়ে গেল তখন কয়েক বৎসর প্রতিষ্ঠান দেউলে হয়ে রইল। এঁদের আমি দোষ দিই নে—সব জর্মনই তো ঐতিহাসিক মমজেন হয় না। অতএব চল্লিশ বছরের পূর্বেকার জলজ্যান্ত একজন বৃত্তিধারীকে যদি ওদের সামনে তুলে ধরতে পারি, তখন হুজুরদের পেত্যয় যাবে—"

আমি মনে মনে বললুম, ঈশ্বর রক্ষতু। যাদুঘরে যে-রকম পেডেস্টালের উপর গ্রীক মূর্তি খাড়া করে রাখে, সে রকম নয় তো! তা করুক, কিন্তু জামা-কাপড় কেড়ে নিয়ে লজ্জা নিবারণার্থে কুল্লে একখানা ডুমুরপাতা পরিয়ে দিলেই তো চিত্তির—'

কর্তা বলে যেতে লাগলেন, "আপনি পরবের সময় কন্টিনেন্টে যেখানেই থাকুন না কেন, আমরা সানন্দে আপনাকে একখানা রিটার্ন টিকিট পাঠিয়ে দেব।

এখানে হোটেলের ব্যবস্থা যানবাহন সবই তো আমরা করে থাকি। তারপর আপনি ফিরে যাবেন আপন মোকামে।" বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন, "আপনি কি মাত্র তিনটি দিনও স্পেয়ার করতে পারবেন না ?···আচ্ছা, তবে এখন চলুন আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ খেতে।"

বড্ডই নেমকহারামী হয়। তদুপরি এরা আমাকে আবার দুই যুগ পরে আবার নেমক দিতে চায়। একদা যে প্রতিষ্ঠান যে জর্মন জাত এই তরুণকে স্কলারশিপ-নেমক দিয়েছিল, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে, তাদেরকে নিরাশ করি কি প্রকারে ?

আমি সকৃতজ্ঞ পরিপূর্ণ সম্মতি জানালুম।

* * *

রেস্তোরাঁটি সাদামাটা, নিরিবিলি, ছোটখাটো, ঘরোয়া। ব্যান্ড-বাদ্যি, জ্যাজ-ম্যাজিক, খাপসুরৎ তরুণীদের ঝামেলা, কোনো উৎপাতই নেই। বুঝতে কোনো অসুবিধা হল না যে এ রেস্তোরাঁতে আসেন নিকটস্থ আপিস-দফতরের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা! তার অন্যতম প্রধান কারণ 'মেনু' (খাদ্যনির্ঘণ্ট দেখেই আমার চক্ষুস্থির। তড়িতেই হিসেব করে দেখলুম এখানে অতি সাধারণ লাঞ্চ খেতে হলেও নিদেন পনেরো মার্ক লাগার কথা। আমাদের হিসেবে তিনখানা করকরে দশ টাকার নোট। অবশ্য গচ্চাটা আমাকে দিতে হবে না। কারণ ওঁরা আমাকে নিমন্ত্রণ করে এনেছেন। এবং এ-দেশের রেস্তোরাঁতে যে ব্যক্তি অর্ডার দিল সে-ই পেমেন্ট করবে—যে খেলো তার কোনো দায় নেই।

কিন্তু এ-স্থলে সেটা তো কোনো কাজের কথা নয়।

যাঁরা আমাকে নিমন্ত্রণ করে এনেছেন তাঁরা আমাকে মেনু এগিয়ে দিয়ে বলেছেন, "কি খাবেন, বলুন।" আমি কি তখন তাঁদের ঘাড় মটকাবো ?

আমি শুধোলুম, "আপনারা কি এই রেস্তোরাঁতেই প্রতিদিন লাঞ্চ খেতে আসেন ?"

"এজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কি খান, মানে, কোন্ কোন্ পদ।"

"সুপ, মাংস আর পুডিং। কখনও বা আইসক্রীম—তবে সেটা বেশীর ভাগ গ্রীষ্মকালে। মাঝে মাঝে শীতকালেও।"

আমি অবাক হয়ে শুধোলুম, "শীতকালে আইসক্রীম !"

তখন আমার মনে পড়লো আমরাও তো দারুণ গরমের দিনে গরমেতর চা খাই। তবে এরাই বা শীতকালে আইসক্রীম খাবে না কেন ?

আমি অতিশয় সাদামাঠা লাঞ্চ অর্ডার দিলুম। যে হাঁস সোনার ডিম পাড়ে তার গলা মটকাতে নেই।

॥ ১৫ ॥

আহারাদির কেচ্ছা শুরু হলেই আমি যে বে-এক্তেয়ার হয়ে যাই আমা সম্বন্ধে সে বদনাম এতই দীর্ঘকালের যে তার সাফাই এখন বেবাক তামাদি—ইংরিজী আইনের ভাষায় 'টাইম-বার' না কি যেন বলে—হয়ে গিয়েছে। তাই পাঠক 'ধর্মাবতারের' সম্মুখে করজোড়ে স্বীকার করে নিচ্ছি "আমি দোষী, অপরাধ করেছি।"

কিন্তু আমি জাত-ক্রিমিনাল। আমার মিত্র এবং পৃষ্ঠপোষক জেল সুপারিনটেনডেনট তাঁর একাধিক প্রামাণিক পুস্তকে লিখেছেন, এই বঙ্গদেশে 'জাত-ক্রিমিনাল' হয় না! হুঁ! আমি জাত-ক্রিমিনাল সেটা জানার পূর্বেই তিনি এসব দায়িত্বহীন 'বাক্যবিন্যাস' করেছেন। তাই আমি আবার সেই লাঞ্চের বর্ণনা পুনরায় দেব।

সুপ আমি বড্ড বেশী একটা ভালোবাসি নে।

এ বাবদে কিন্তু আমি সমুদ্রের বেলাভূমিতে সম্পূর্ণ একাকী নুড়ি নই। ডাচেস অব উইন্ডসর (উচ্চারণ নাকি 'উইনজার') অতি উত্তম রান্নাবান্না করতে পারেন। তা সে অনেকেই পারেন। কিন্তু তিনি আরেকটি ব্যাপারে অসাধারণ হুনুরি। ভোজনটি কি প্রকারে 'কম্‌পোজ' করতে হবে—এ-তত্ত্বটি তিনি খুব ভালো করে জানেন। '

অপরাধ নেবেন না। আমরা বাঙলী মাত্রই ভাবি ভোজনে যত বেশী পদ দেওয়া হয় ততই তার খানদানিত্ব বেড়ে যায়। তিন রকমের ডাল, পাঁচ রকমের চচ্চড়ি, তিন রকমের মাছ, দু-তিন রকমের মাংস, চিনিপাতা দই আর কত হরেক রকমের মিষ্টি—তার হিসেব নাই বা দিলুম।

আর প্রায় সব-কটাই অখাদ্য! কারণ, এতগুলো পদের জন্য তো এতগুলো উনুন করা যায় না, গোটা দশেক পাচক ডাকা যায় না। অতএব বেগুনভাজা মেগনোলিয়ার আইসক্রীমের মত হিম, চিনি-পাতা দই পাঞ্জাব মেলের এনজিনের মত গরম, লুচি কুকুরের জিভের মত চ্যাপ্‌টা, লম্বা,—খেতে গেলে রবারের মত। আজকাল আবার ফ্যাশন হয়েছে ঘি-ভাত বা পোলাউয়ের বদলে চীনা ফ্রাইড রাইস। চীনারা 'র' উচ্চারণ করতে পারে না। অতএব বলে 'ফ্লাইড লাইস'—অর্থাৎ 'ভাজা উকুন'! তা সে যে উচ্চারণই করুক আমার তাতে কানাকড়ি মাত্র আপত্তি নেই। শুনেছি মহাকবি শেকসপীয়র বলেছেন, 'গোলাপ যে-নামে ডাকো গন্ধ বিতরে'। তাই 'ফ্রইড্‌ রাইস' বলুন বা 'ফ্লাইড লাইস'ই বলুন—সোওয়াদটি উত্তম হলেই হল। কিন্তু আজকালকার কেটারাররা (হে ভগবান, এই সম্প্রদায়কে বিনষ্ট করার জন্য আমি চেঙ্গিস খান হতে রাজী আছি) নেটিভ পাচক দিয়ে 'ফ্লাইড্‌ লাইস' নির্মাণ করেন। সত্য সত্য তিন সত্য বলছি, সে মহামূল্য সম্পদ জিহবাগ্র স্পর্শ করার পূর্বেই আপনি বুঝে যাবেন এই অভূতপূর্ব বস্তু 'উকুন ভাজা'। আলবৎ, আমি নতমস্তকে স্বীকার করছি, 'উকুন ভাজা' আমি কেটারার-সম্প্রদায়ের অবদান—মেহেরবাণীর পূর্বে কখনো খাই নি। তাই

গোড়াতেই বলেছি, আমরা মেনু কম্পোজ করতে জানি নে।

তা সে থাক, তা সে যাক্। পরনিন্দা মহাপাপ। এখানেই ক্ষান্ত দিই। বয়স যত বাড়ে মানুষ ততই খিটখিটে হয়ে যায়।

পুরনো কথায় ফিরে যাই। ডাচেস অব উইনজার নাকি তাঁর লাঞ্চ ডিনারে নিমন্ত্রিতজনকে কখনো সুপ পরিবেশন করেন না। অতিশয় অভিজ্ঞতালব্ধ তাঁর বক্তব্য ঃ এই যে বাবুরা এখন ডিনার খেতে যাবেন তার আগে তেনারা গিলেছেন গ্যালন গ্যালন ককটেল হুইস্কি। জালা জালা শেরি, পোর্ট। সক্কলেরই পেট তরল বস্তুতে টইটম্বুর—ছয়লাপও বলতে পারেন। ডাচেসের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা-প্রসূত সুচিন্তিত অভিমত ঃ এর পরও যদি হুজুররা তরল দ্রব্য সুপ পেটে ঢোকান, তবে, তার পর আর রোস্ট ইত্যাদি নিরেট সলিড দ্রব্য খাবেন কি প্রকারে? তাই তাঁর ডিনারে 'নো সুপ!' অবশ্য ডাচেস সহৃদয়া মহিলা। কাজেই যাঁরা নিতান্তই সুপাসক্ত তাঁদের জন্য সুপ আসে। ওদেরকে সঙ্গে দেওয়ার জন্য তিনিও মাঝে মাঝে দু-চার চামচ সুপ গলাতে ঢালেন।

অতএব আমাকেও নিতান্ত সঙ্গ দেওয়ার জন্য হুম্‌বল্‌ট স্টিফ্‌টুঙ প্রদত্ত লাঞ্চে কিঞ্চিৎ সুপ সেবন করতে হল।

বাঃ! উত্তম সুপ। ব্যাপারটা তাহলে ভালো করে বুঝিয়ে বলি।

যে সব দেশের কলোনি নেই—বিশেষ ভারত, সিংহল কিংবা ইন্দোনেশিয়ায় —তারা গরম মশলা পাবে কোত্থেকে? কেনার জন্য অত রেস্ত কোথায়? শত শত বৎসর ধরে তাদের ছোঁকছোঁকানি শুধু গোলমরিচের জন্য! শুনেছি, ভাস্কো দা গামা ঐ গোলমরিচের জন্য অশেষ ক্লেশ করে দক্ষিণ ভারতে এসেছিলেন। কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন, কলম্‌বস্‌ও নাকি ঐ একই মতলব নিয়ে সাপ খুঁজতে গিয়ে কেঁচো পেয়ে গেলেন—অর্থাৎ ভারতবর্ষ আবিষ্কার করতে গিয়ে আমেরিকায় পৌঁছে গেলেন। এর পর ইয়োরোপীয়রা দক্ষিণ আমেরিকায় ঝাল লাল লংকা আবিষ্কার করলো, কিন্তু ওটা ওদের ঠিক পছন্দ হল না! যদ্যপি আমরা ভারতীয়রা সেটি পরমানন্দে আলিঙ্গন করে গ্রহণ করলুম।

ইতিহাস দীর্ঘতর করবো না।

ইতিমধ্যে জর্মনির এতই ধনদৌলত বেড়ে গিয়েছে যে, এখন সে শুধু কালা মরিচ কিনেই পরিতৃপ্ত নয়—এখন সে কেনে দুনিয়ার যত মশলা। বিশেষ করে 'কারি পাউডার' আর লবঙ্গ, এলাচি, ধনে ইত্যাদির তো কথাই নেই। তবে কি না আমি কন্টিনেন্টের কুত্রাপি কাঁচা সবুজ ধনেপাতা দেখি নি। কিন্তু ভয় নেই, কিংবা ভয় হয়তো সেখানেই। যেদিন কন্টিনেন্টের কুবের-সন্তানরা ধনেপাতা-লংকা-তেঁতুল-তেলের চাটনির সোয়াদটি বুঝে যাবেন সেদিন হবে আমাদের সর্বনাশ। হাওয়াই-জাহাজের কল্যাণে কুল্লে ধনেপাতা হিল্লি-দিল্লী হয়ে চলে যাবেন কাঁহা কাঁহা মুল্লুকে। এটা তো এমন-কিছু নয়া অভিজ্ঞতা নয়। ভারত বাঙলাদেশের বহু জায়গাতেই আজ আপনি আর চিংড়ি মাছ পাবেন না। টিনে ভর্তি হয়ে তাঁরা আপনার উদরে না এসে সাধনোচিতধামে (অর্থাৎ কন্টিনেন্টে—যেখানে চিংড়ি মাছ কেন সর্বভারতীয় যুবকই যেতে চান) প্রস্থান করেন। একমাত্র

কোলা ব্যাঙ সম্বন্ধেই আমাদের কোন দুঃখ নেই। যাক্ যত খুশী যাক্। ওটা ফরাসীদের বড়ই প্রিয় খাদ্য। তবে কিনা বাঙালোর থেকে তারস্বরে এক ভদ্রলোক প্রতিবাদ করেছেন : পাইকিরি হিসেবে এ-ভাবে কোলা ব্যাঙ বিদেশে রফ্‌তানী করায় ঐ-অঞ্চলে মশার উৎপাত দুর্দান্তরূপে বৃদ্ধি পেয়েছে ; কারণ ঐ কোলা ব্যাঙরাই মশার ডিম খেয়ে তাদের বংশবৃদ্ধিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করতো।

এটা অবশ্যই একটা সমস্যা—দুশ্চিন্তার বিষয়। কিন্তু আমার ভাবনা কি ? আমার তো একটা মশারি আছে।

"গুরুমে" ভোজনরসিকরা বলেন সুইটজারল্যাণ্ডের জর্মনভাষী অঞ্চলের খাদ্যই সবচেয়ে ভোঁতা। অথচ নেপলিয়ন না কে যেন বলেছেন, "ইংরেজ এ-নেশন অব্ শপকীপারজ্" (অবশ্য ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে 'সাকী' নামক ছদ্মনামের এক অতিশয় সুরসিক ইংরেজ লেখক বলেন "আমরা এখন এ নেশন অব শপ্‌লিফ্‌-টারজ্" অর্থাৎ আমরা এখন দোকানের ভিড়ে চটসে এটা-ওটা-সেটা চুরি করতে ওস্তাদ) এবং "সুইসরা এ নেশন অব্ হোটেলকীপারজ্"। এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে তাবৎ ইয়োরোপে সুইসরাই পরিচ্ছন্নতম হোটেল রাখে। কিন্তু প্রশ্ন : তোমার হোটেল-রেস্তোরাঁ যতই সাফসুৎরো রাখো না কেন, তোমার রেস্তোরাঁর সুপে ব্লণ্ড, ব্রুনেট, কালো চুল না পাওয়া গেলেও (দিনের পর দিন তিন রঙের চুল আবিষ্কার করতে করতে আমার এক মিত্র—সুইটজারল্যাণ্ডে নয়, অন্য এক নোংরা দেশের হোটেলে—একদিন মেনেজারকে শুধোলেন "আপনার রান্নাঘরে তিনটি পাচিকা আছেন ; না ? একজনের চুল ব্লণ্ড, অন্যজনের ব্রুনেট এবং তেসরা জনের কালো। নয় কি ?" মেনেজার তো থ ! এই ভদ্রলোকই কি তবে শার্লক হোম্‌সের বড় ভাই মাইক্রফ্‌ট্ হোম্‌স্ ? সবিনয়ে তথ্যটা স্বীকার করে শুধোলে, "স্যার, আপনি জানালেন কি করে ? আপনি তো আমাদের রসুই-খানায় কখনো পদার্পণ করেন নি !" বন্ধু বললেন, "সুপে কোনো দিন ব্লণ্ড, কখনো বা ব্রুনেট এবং প্রায়ই কালো চুল পাই—কালোটাই পাতলা সুপে চোখে পড়ে বেশী। এ তত্ত্বে পৌঁছবার জন্য তো দেকার্ত কাণ্ট-এর দর্শন প্রয়োজন হয় না। আমি বলছি ঐ কালো চুলউলীকে যদি দয়া করে বলে দেন, সে যেন আর পাঁচটা হোটেলের পাঁচজন পাচকের মাথায় যে রকম টাইট সাদা টুপি পরা থাকে ঐরকম কোনো একটা ব্যবহার করে। আমার মনে হয় ওর মাথায় দুর্দান্ত খুসকি" —পাঠক অপরাধ নেবেন না,এ-কেচ্ছাটা বলার প্রলোভন কিছুতেই সম্বরণ করতে পারলুম না।) সুদ্ধমাত্র সুইস হোটেলের সুপমধ্যে হরেকরকম্বা চুল নেই বলেই যে দুনিয়ার লোক হন্দমুন্দ হয়ে সে-দেশে আসবে এও কি কখনো সম্ভব ? আমার সোনার দেশ পুব্ পশ্চিমওতর বাঙলায় সুপ তৈরী হয় না। অতএব প্লাটিনাম ব্লণ্ড, সাদামাটা ব্লণ্ড, চেশনাট ব্রাউন, মোলায়েম ব্রাউন, কালো, মিশ-কালো কোনো রঙের কোনো চুলের কথাই ওঠে না। 'মোটেই মা রাঁধে না, তার তপ্ত আর পান্তা।' কিংবা বলতে পারেন, 'হাওয়ার গোড়ায় রশি বাঁধার মত।' তাই বলে কি মার্কিন সুইস টুরিস্ট এ-দেশে আসে না !

'বিজনেস ইজ বিজনেস'—তাই সুইসরা পর্যন্ত তাদের রান্নাতে প্রাচ্যদেশীয় মশলা ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছে।

আমার কাছে একখানা সুইস সাপ্তাহিক আসে। তার কলেবর প্রায় ষাট পৃষ্ঠা। একদা কেউ ল্যাটে এলে আমরা ঠাট্টা করে বলতুম 'কি বেরাদর, কেপ অব গুড হোপ হয়ে এলে নাকি?'—সুয়েজ কানাল যখন রয়েছে। এখন কিন্তু এটা আর মস্করা নয়। এ্যার মেলের কথা অবশ্য ভিন্ন। কিন্তু ষাটপৃষ্ঠা বপুধারী পত্রিকা তো আর এ্যার মেলে পাঠানো যায় না। খর্চা যা পড়বে সেটা সাপ্তাহিকের দাম ছাড়িয়ে যাবে। হিন্দীতে বলে 'লড়কে সে লড়কার গু ভারি'—বাচ্চাটার ওজনের চাইতে তার মলের ওজন বেশী।

সেই পত্রিকার একটি প্রশ্নোত্তর বিভাগ-আছে। কেউ শুধোল "মাংস আলু তরকারি সহ নির্মিত ভোজনের মেন ডিশ (পিয়েস দ্য রেজিস্তাঁস) খাওয়ার পর যেটুকু তলানি সস্ (শুকনো শুকনো ঝোল, কলকাত্তাইয়ারা কাইও বলে থাকে) পড়ে থাকে তার উপর পাঁউরুটি টুকরো টুকরো করে ফেলে দিয়ে কাঁটা দিয়ে সেগুলো নাড়িয়ে চাড়িয়ে চেটেপুটে খাওয়াটা কি প্রতোকোলসম্মত—এটিকেট মাফিক, বেয়াদবী 'অভদ্রস্থতা' নয় তো?"

উত্তর: "পৃথিবীতে এখন এমনই নিদারুণ খাদ্যাভাব যে ঐ সসটুকু ফেলে দেওয়ার কোন যুক্তি নেই।" (অবশ্য তার সঙ্গে রুটির টুকরোগুলোও যে গেল সে বাবদে বিচক্ষণ উত্তরদাতা কোনো উচ্চবাচ্য করেন নি। কারণ রুটিটি পরের ভোজনেও কাজে লাগতো কিংবা গরীব-দুঃখীকেও বিলিয়ে দেওয়া যেত—এঁটো প্লেটের তলানি সস তো পরবর্তী ভোজনের জন্য বাঁচিয়ে রাখা যায় না, কিংবা গরীব-দুঃখীকেও বিলোনো যায় না—লেখক) তারপর তিনি বলছেন, "কিন্তু আপনি যদি নিমন্ত্রিত হয়ে কোথাও যান তবে এই কার্পণ্যটি করবেন না।" তার মানে আপনার বাড়ির বাইরের এটিকেট যেন বাড়ির ভিতরের চেয়ে ভালো হয়। আমি কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন মত ধরি। আমার মতে বাড়ির এটিকেট, আদবকায়দা যেন বাইরের চাইতে ঢের ঢের ভালো হয়।

প্রশ্ন: "কোহিনূর প্রস্তর কোন ভাষার শব্দ?"

উত্তর: "ফার্সী।"

(সম্পূর্ণ ভুল নয়। 'কোহ্' = পাহাড়—ফার্সীতে। যেমন কাবুলের উত্তর দিকে কোহীস্তান রয়েছে [আমার সখা আব্দার রহমান ঐ কোহীস্তানের লোক]। কিন্তু কোহ্-ই-নূরের 'নূর' শব্দটি 'নু' সিকি আরবী। খাঁটি ফার্সীতে যদি বলতেই হয় তবে'নূর'-এর বদলে'রওশন'বা'রোশনী' [বাঙলায়'রোশনাই'] ব্যবহার করে বলতে হয় কোহ্-ই-রওশন্। শুদ্ধ আরবীতে বলতে হলে'জবলুন (পাহাড়) নূর।'···কিন্তু এ রকম বর্ণসংকর সমাস সর্বত্রই হয়ে থাকে। 'দিল্লীশ্বর'ইত্যাদি।)

প্রশ্ন: "আমার বয়স বত্রিশ; আমি বিধবা। আমার ষোলো বছরের ছেলের একটি সতেরো বছরের ভেরি ডিয়ার ক্লাস ফ্রেন্ড প্রায়ই আমাদের এখানে আসে। কিন্তু কিছুদিন ধরে সে আমার সঙ্গে ভাবভালোবাসা জমাবার চেষ্টা করছে। আমি করি কি?"

উত্তর ঃ "আপনি ওকে সঙ্গোপনে নিয়ে গিয়ে বলুন,'তুমি তোমার অল্পবয়সী মেয়েদের সঙ্গে প্রেমট্রেম করো। আমি তোমার মায়ের বয়সী। তোমার বয়সী মেয়ের তো কোনো অভাব নেই'। কিন্তু, আমার মনে হয়, ছেলেটার বোধ হয় মাদার কমপ্লেকস্ আছে—অতি অল্প বয়সেই তার মা গত হন। কাজেই সে একটি মায়ের সন্ধানে আছে"—তার পর আরো নানাপ্রকার হাবিজাবি ছিল।

এ-উত্তর যে-কোনো গোগর্দভ দিতে পারতো।

কিন্তু এই প্রশ্নোত্তরমালা নিতান্তই অবতরণিকা মাত্র।

* * *

কয়েক মাস পূর্বে—মনে হল—একটি প্রাচীনপন্থী মহিলা—প্রশ্ন শুধোলেনঃ "আজকালকার ছেলে-ছোকরারা এমন কি মেয়েরাও বড্ড বেশী মশলাদার খানা খাচ্ছে। আমি গ্রামাঞ্চলে থাকি। সেদিন বাধ্য হয়ে আমাকে শহরে যেতে হয়। যদি জানতুম, শহরের 'মাই লড" রেস্তোরাঁওলারা কি জঘন্য ঝাল, মাস্টার্ড (আমাদের কাসুন্দো—লেখক) আর মা মেরিই জানেন কি সব বিদকুটে বিদকুটে বিজাতীয় মশলা দিয়ে যাবতীয় রান্না করেন, তবে কি আমি সে রেস্তোরাঁয় যেতুম ! এক চামচে সুপ মুখে ঢালা মাত্রই আমার সর্বাঙ্গ শিহরিত হতে লাগলো। আমার কপালে সেই শীতকালে, ঘাম জমতে লাগলো। মনে হলো, আমার জিভে যেন কেউ আগুন ঠেলে দিয়েছে। আমার চোখ থেকে যা জল বেরুতে আরম্ভ করলো সেটা দেখে আমার কাছেরই একটি সহৃদয় প্রাইভিট শুধলো—'মাদাম, আমি বহু দেশ-বিদেশ দেখেছি—যেখানে টিয়ার গ্যাস্ ছাড়া হয়; কিন্তু আমাদের এই সুইটজারল্যাণ্ডে তো কখনো দেখি নি। শোকাতুরা হয়ে কান্না করলে রমণীর চোখে যে অশ্রুজল বেরোয় এটা তো তা নয়।

একদা সুইস কাগজে প্রশ্ন বেরলো ঃ "এই যে আমরা প্রতিদিন আমাদের রান্নাতে মশলার পর মশলা বাড়িয়েই চলেছি এটা কি স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো ?"

সেই 'সবজান্তা' উত্তরিলা ঃ

'মাত্রা মেনে খেলে কোনো আপত্তি নেই। কোনো বস্তুরই বাড়াবাড়ি করতে নেই।" (মরে যাই ! এই ধরনের মহামূল্যবান উপদেশ পাড়ার পদীপিসি, ইস্কুল বয় সবাই দিতে পারে !—লেখক)। তার পর সবজান্তা বলছেন "ডাক্তারদেরও আধুনিক অভিমত, 'মেকদার-মাফিক মশলাদার খাদ্য ভোজনস্পৃহা আহাররুচি বৃদ্ধি করে।' তদুপরি আরেকটা গুরুত্বব্যঞ্জক তত্ত্ব আছে। আপনি যদি আপনার ভোজন ব্যাপারে সর্বক্ষণ 'এটা খাবো না ওটা ছোঁব না' এ রকম পুতপুত করে আপনার ভোজন-যন্ত্রটিতে ন'সিকে মোলায়েম করে তোলেন (ইংরিজীতে একেই বলে 'মলিকড্ল্' করেন) তবে কি হবে ? আপনি যতই চেষ্টা দিন না কেন, আপন বাড়িতে তৈরী মশলা বিবর্জিত রান্না-মাত্রই খাবো তথাপি ইহসংসারে বহুবিধ ফাঁড়া-গর্দিশ আছে যার কারণে আপনাকে হয়তো কোনো রেস্তোরাঁতে এক বেলা খেতে হল। কিংবা মনে করুন, আপনি নিমন্ত্রিত হলেন। শক্তসমত্ত জোয়ান আপনি। কি করে বলবেন আপনি ডায়েটে আছেন ? ওদিকে রেস্তোরাঁ বলুন, ইয়ার বখশীর বাড়িই বলুন সর্বত্রই সর্বজন শনৈঃ শনৈঃ গরম মশলার মাত্রা

বাড়িয়ে যাচ্ছেন তো যাচ্ছেনই। পরের দিন আপনি কাৎ। অতএব"—আমাদের সবজান্তা বলছেন, "কিছু কিছু মশলা খেয়ে নেওয়ার অভ্যাসটা করে ফেলাই ভালো।"

কিন্তু মশলাপুরাণ এখানেই সমাপ্ত নয়। সেটা পরে হবে।

ইতিমধ্যে আমি দুম্ করে প্রেমে পড়ে গেলুম।

কবিগুরু গেয়েছেন:

যদি পুরাতন প্রেম
ঢাকা পড়ে যায় নব প্রেম জালে
তবু মনে রেখো।

কিন্তু এ-আশা রাখেন নি, সেই প্রথম প্রিয়াই পুনরায় তাঁর কাছে ফিরে আসবে। আমার কপাল ভালো।

লাঞ্চ সেরে মৃদুমন্থরে যখন বাড়ি ফিরছি তখন বাস্‌স্ট্যান্ডের বেঞ্চিতে বসেই দেখি বেঞ্চির অন্য প্রান্তে যে-মেয়েটি বসেছিল সে জলজল করে আমার দিকে তাকাচ্ছে। আমার দুশমনরা তো জানেনই, এস্তেক দোস্তরাও জানেন, আমি কন্দর্পকিউপিডের সৌন্দর্য নিয়ে জন্মাই নি। তদুপরি বয়স যা হয়েছে তার হিসেব নিতে গেলে কাঠাকালি বিঘেকালি বিস্তর আঁক কষাকষি করতে হয়। সর্বশেষে সেটা ভগ্নাংশে না ত্রৈরাশিকে দিতে হবে তার জন্য প্ল্যাঁশেৎ মারফৎ ঈশ্বর সুকুমার রায়কে নন্দনকানন থেকে এই য ব ন ভূমিতে নামতে হবে!

অবশ্য লক্ষ্য করেছিলুম, আমি ওর দিকে তাকালেই সে ঝটিতি ঘাড় ফিরিয়ে নেয়।

রোমান্টিক হবার চেষ্টাতে বলেছিলুম, "মেয়েটি।" কিন্তু তার বয়স হবে নিদেন চল্লিশ, পঁয়তাল্লিশ এমন কি পঞ্চাশও হতে পারে। কিন্তু তাতে কি যায় আসে। বিদগ্ধ পাঠকের অতি অবশ্যই স্মরণে আসবে, বৃদ্ধ চাটুয্যে মশাই যখন প্রেমের গল্প অবতারণা করতে যাচ্ছেন তখন এক চ্যাংড়া বক্রোক্তি করে বলেছিল[১] চাটুয্যে মশাই প্রেমের কী-ই বা জানেন। মুখে আর যে-কটা দাঁত যাবোযাচ্ছি যাবোযাচ্ছি করছে তাই নিয়ে প্রেম।

চাটুয্যে মশাই দারুণ চটিতং হয়ে যা বলেছিলেন তার মোদ্দা: ওরে মূর্খ প্রেম কি চিবিয়ে খাবার বস্তু যে দাঁতের খবর নিচ্ছিস! প্রেম হয় হৃদয়ে।... একদম খাঁটি কথা। ভলতের, গ্যোটে, আনাতোল ফ্রাঁস, হাইনে আমৃত্যু বিস্তরে বিস্তর বার ফট ফট করে নয়া নয়া হুরী পরীর সঙ্গে প্রেমে পড়েছেন। এই সোনার বাঙলাতেও দু'একটি উত্তম দৃষ্টান্ত আছে। তা হলে আমিই বা এমন কি ব্রহ্মহত্যা করেছি যে ফুট করে প্রেমে পড়বো না।

বললে পেত্যয় যাবেন না, অকস্মাৎ একই মুহূর্তে একে অন্যকে চিনে গেলুম। যেন 'আকাশে বিদ্যুৎ-বহ্নি পরিচয় গেল লেখি।'

১ বইখানা আমার চুরি গেছে। কাজেই উল্টোসুল্টো হয়ে গেলে পাঠক অপরাধ নেবেন না।

একসঙ্গে আমি চেঁচালুম "লটে।"

সে চেঁচালে "হ্যার সায়েড।"

তারপর চরম নির্লজ্জার মত সেই প্রশস্ত দিবালোকে সর্বজন সমক্ষে আমাকে জাবড়ে ধরে দুই গালে ঝপাঝপ এক হুন্দর বা দুই টন চুমো খেল।

সুশীল পাঠক, সচ্চরিত্রা পাঠিকা, মায় দেশের মরালিটি-রক্ষিণী বিধবা পদ্দীপিসি এতক্ষণে একবাক্যে নিশ্চয়ই নাসিকা কুঞ্চিত করে "ছ্যা ছ্যা" বলতে আরম্ভ করেছেন। আমি দোষ দিচ্ছি নে। এস্থলে আম্মো তাই করতুম—যদি মা নাটকের হেরোইন আমার প্রিয়া লটে (তোলা নাম 'শাল ট') হত। বাকিটা খুলে কই।

ওর বয়স যখন নয়-দশ আমার বয়স ছাব্বিশ। আমি বাস করতুম ছোট গোডেসবের্গ টাউনের উত্তরতম প্রান্তে লটেদের বাড়ির ঠিক মুখোমুখি। ওদের পাশে থাকতো দুই বোন গ্রেটে ক্যাটে। আরো গোটা পাঁচেক মেয়ে—তাদের বাড়ির পরে। কারোরই বারো-তেরোর বেশী নয়।

লটে ছিল সবচেয়ে ছোট।

আমার জীবনের প্রথমা প্রিয়া।

আর সব কটা মেয়ে এ তথ্যটা জানতো এবং হয়তো অতি সামান্য কিছুটা হিংসে হিংসে ভাব পোষণ করতো। ওদের আশ্চর্য বোধ হত হয়তো, যে লটে তো ওদের তুলনায় এমন-কিছু গুলেবাকাওলী নয় যে সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে এসে আমি এরই 'প্রেমে মজে যাবো'। এটা অবশ্য আমি বাড়িয়ে বলছি। 'প্রেমে মজার' কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আমার বয়স ছাব্বিশ, ওর নয় কি দশ।

আসলে ব্যাপারটি কি জানেন? জর্মনদের ভিতর যে-চুল অতিশয় বিরল, লটের ছিল সেই চুল। দাঁড়কাকের মত মিশমিশে কালো একমাথা চুল। ঠিক আমার মা-বোনদের চুলের মত। ওর চুলের দিকে তাকালেই আমার মা-বোনদের কথা, দেশের কথা মনে পড়তো। আর লটে ছিল আমার বোনেদের মত সত্যিই বড় লাজুক। সকলের সামনে, নিজের থেকে, আমার সঙ্গে ককখনো কথা বলতো না।

আমাদের বাড়ির সামনে ছিল একচিলতে গলি। সেখানে রোজ দুপুর একটা দুটোয় আমরা ফুটবল খেলতুম। আমার বিশ্বাস তুমি পাঠক, আমাদের সে টিমের নাম জানো না। আমিও অপরাধ নেবো না। আমরা যে আই এফ এ শীল্ডে লড়াই দেবার জন্য সে আমলে ভারতবর্ষে আসি নি তার মাত্র দুটি কারণ ছিল। পয়লা: অতখানি জাহাজ ভাড়ার রেস্ত আমাদের ছিল না, এবং দোসরা: আমাদের 'কাইজার টীমে' পুরো এগারো জন মেম্বার ছিলেন না। আমরা ছিলুম মাত্র আট্টো জন। তৃতীয়ত, যেটা অবশ্য আমাদের ফেভারেই যায়, আমাদের ফুটবলটি ছিল অনেকটা বাতাবী নেবুর মত। ওরকম ফুটবল দিয়ে কি সমদ, কি জুম্মা খান ককখনো প্যাটার্ন-উইভিং ড্রিবলিং ডজিং ডাকিঙের সুযোগ পান নি।

হায়, হায় ! এ-জীবনটা শুধু সুযোগের অবহেলা করে করেই কেটে যায় ।

এসব আত্মচিন্তা যে তখন করেছিলুম তা নয় ।

চল্লিশ বছর পর পুনরায় এই প্রথম আমাদের পুনর্মিলন । লটে হঠাৎ শুধুলো, "হ্যার সায়েড ! তুমি বিয়ে করেছো ?"

শুনেছি ইহুদীরা নিতান্ত গঙ্গাযাত্রায় জ্যান্ত মড়া না হলে কোনো প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন শুধিয়ে শাক দিয়ে মাছ ঢাকা দেয় । আমি শুধলুম, "তুই ?"

খল খল করে হেসে উঠলো ।

"কেন ? আমার আঙ্গুলে এনগেজমেণ্ট রিং বিয়ের আংটি দুটোই এখনো তোমার চোখে পড়ে নি ! আমি তো দিদিমা হয়ে গিয়েছি । চলো আমাদের বাড়ি ।"

আমি সাক্ষাৎ যমদর্শনের ন্যায় ভীত চকিত সন্ত্রাসগত হয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠলুম, "সে যদি আমায় ঠ্যাঙায় ।"

দুটি মিষ্টি মধুর ঠোঁটের উপর অতিশয় নির্মল মৃদু হাসি এঁকে নিয়ে বললে, "বটে ! আমার জীবনের প্রথম প্রিয়কে সে প্যাঁদাবে ? তা হলে সেই হালুংকেটাকে আমি ডিভোর্স করবো না !"

তওবা, তওবা !